বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মনিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মনিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা

গবেষক
মো: সাইদুর রহমান

পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নিবন্ধন ক্রম : ৯৯/২০১১-২০১২

তত্ত্বাবধায়ক
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো: সাইদুর রহমান রচিত 'বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মনিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য জমা দেননি কিংবা কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া যাচ্ছে যে, 'বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মনিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার একক রচনা। এই অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ আমি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য জমা দেইনি কিংবা কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মো: সাইদুর রহমান)

গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ

৯৯/২০১১-২০১২

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

- প্রসঙ্গকথা ॥ ১ - ৬
- অবতরণিকা ॥ ৭ -৩৩

- **প্রথম অধ্যায় : মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা** ॥ ৩৪ - ১৩৬

  ১.১ : জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়

  ১.২ : ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– মারমা

  ১.২.১ : লংবাই আক্কা (থালা নৃত্য)

  ১.২.২ : ক্যায়াহ্ আক্কা (বাঘনৃত্য)

  ১.২.৩ : কৃত্যনাট্য পাঙখুং

  ১.২.৪ : মারমা জ্যা ও জ্যা-নৃত্য

  ১.২.৫ : মারমা তান্ত্রিক ধ্যান : পরিবেশনা ও বিশ্লেষণ

  ১.৩ : পর্যালোচনা

- **দ্বিতীয় অধ্যায় : মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা** ॥ ১৩৭ - ২৪৪

  ২.১ : জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়

  ২.২ : ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– মণিপুরী

  ২.২.১ : রাসনৃত্য

  ২.২.২ : মণিপুরী নটপালা

  ২.২.৩ : মণিপুরী খেলা : থাঙ-তা

  ২.৩ : পর্যালোচনা

- **তৃতীয় অধ্যায় : গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা** ॥ ২৪৫ - ৩০৩

  ৩.১ : জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ : ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– গারো

৩.২.১ : রে-রে

৩.২.২ : সাম্বিল মিসারা

৩.৩ : পর্যালোচনা

- **চতুর্থ অধ্যায় : পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণ** ॥ ৩০৪ - ৩২৬

৪.১ : অনুশীলন উপাদানের পুনঃ আলোচনা

৪.২ : তুলনামূলক পর্যালোচনা

৪.৩ : সম্ভাবনা নিরূপণ

- **উপসংহার** ॥ ৩২৭ - ৩৩১
- গ্রন্থপঞ্জি এবং সহায়ক নির্দেশিকা ॥ ৩৩২ - ৩৪১
- পরিশিষ্ট ॥ ৩৪২ - ৩৫৫

১. ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রশ্নপত্র

২. আলোকচিত্র

প্রসঙ্গকথা :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যচর্চায় এ পর্যন্ত যে সকল গবেষক, সমালোচক, শিক্ষক, নির্দেশকসহ অন্যান্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যারা স্থানীয় নাট্যকলা এবং নৃগোষ্ঠী নাট্যকলা বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রন্থ/প্রবন্ধ রচনা অথবা নাট্য নির্মাণ-বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ অবদান রেখেছেন 'বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মণিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা' শীর্ষক এই গবেষণা তাদের উত্তরসূরি। এঁরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে বৃটিশ উপনিবেশ এবং তৎপরবর্তী কালের রাজনৈতিক-সংস্কৃতি সৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিভাজন– লোক-অলোক, নাগরিক-গ্রামীণ, ফোক-মডার্ন, আদিবাসী-বাঙালি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ– এ জাতীয় তাত্ত্বিক বাহাসের বিপরীতে বাংলার চিরায়ত বর্ণিল সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সম্প্রীতিকেই সর্বাধিক গুরুত্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাংলার চিরায়ত ভাব ও সহজ দর্শনকে মিলিয়েছেন বদলে যাওয়া শহরায়তনিক শিল্পমন ও রুচির সাথে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঐ সকল মানুষের নাট্য ভাবনার সাথী হতে পেরে এবং তরুণ প্রজন্ম যারা অবিরাম শ্রম আর মেধার বিনিময়ে নাট্যের চাকাটিকে নিয়ত প্রাণবন্ত রেখেছেন তাদের সহযাত্রী হতে পেরে পরম আনন্দ বোধ করছি।

গবেষণা প্রকল্পটি গ্রহণ পূর্বের ভাবনা ছিল এমন যে, পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রটি হতে হবে সমজাতীয় সংস্কৃতি পরিমণ্ডলের বাইরের অনাবিষ্কৃত (গবেষকের কাছে) 'ভিন্ন' কোনো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং এই গবেষণা থেকে লব্ধ ফলাফল হতে হবে এমন যেন নাট্যচর্চায় এর প্রায়োগিক উপযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু এই অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ (synopsis) রচনার পূর্ব-পর্যন্ত অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মতো মারমা, মণিপুরী এবং গারোদের সাথে আমার প্রত্যক্ষ বা সরাসরি যোগ-সংযোগ-সংসর্গ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিষয়টি এভাবেও বলা যেতে পারে– একজন 'বাঙালি', 'মুসলিম' এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির নাট্যকর্মী হিসেবে 'ভিন্ন' সংস্কৃতির বা নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যিক ও পরম্পরাগত পরিবেশনার অন্তর্গত নৃত্য, নাট্য, পালা প্রভৃতির সাথে আমার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বা পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা মোটেই সমৃদ্ধ ছিল না। একজন নাট্য-পেশাজীবী হওয়ার সুবাদে কেবল নাট্যকর্মের সূত্রে হাতেগোনা দু-একবার দু-একটি নৃগোষ্ঠী অঞ্চলে গমন-পরবর্তী কিছু মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হওয়া এবং টোকেন স্বরূপ একটি দুটি পরিবেশনা পর্যবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্পর্কের পরিধি। এক্ষেত্রে শিল্পকলা একাডেমির পক্ষকালব্যাপী নাট্যকর্মশালা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বান্দরবান সদরে অবস্থানহেতু কয়েকজন মারমা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সখ্য গড়ে তোলা, অথবা বন্ধুবর নাট্যকর্মী/নির্দেশক শুভাশিষ সিনহার কারণে কমলগঞ্জ শ্রীমঙ্গল অঞ্চল ভ্রমণপূর্বক আরও কিছু মণিপুরীর সাথে পরিচিত হওয়া এবং একটি দুটি পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা, মোটকথা

এই হচ্ছে মারমা ও মণিপুরী জনদের সাথে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্পর্কের পূর্ব-অভিজ্ঞতা। অপরদিকে গারোদের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতাটিও ঋদ্ধ নয়। ক্ষেত্র-সমীক্ষা সম্পাদনে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রাক্কালে তরুণ গারো কবি পরাগ রিচিলের সাথে যোগাযোগসূত্রে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়েই কোনো গারো সদস্যের সাথে প্রত্যক্ষ সংসর্গ তৈরি হয়। সব মিলিয়ে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলোই হচ্ছে সর্বসাকল্যে প্রাক-ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রত্যক্ষ সংসর্গের পরিধি। তবে প্রত্যক্ষ যোগ-সংযোগ-সংসর্গে সংখ্যা-পরিধির থেকে পরোক্ষভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিধিটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল এবং এই অভিজ্ঞতাটিই বস্তুত গবেষণা কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকর্মী হওয়ার সুবাদে 'আদিবাসী নাট্য'/'নৃগোষ্ঠী নাট্য'/'এথনিক থিয়েটার'সহ নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বেশকিছু গবেষণা/গ্রন্থ/প্রবন্ধের সংস্পর্শে এসে এদের নানাবিধ পরিবেশনাসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ থেকে জানা-বোঝার পরিসরটি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আর এই আগ্রহটিকে আরও তীব্র করে তোলে ঢাকা শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে অথবা কখনো নাট্য কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রদর্শিত বেশ কিছু নৃগোষ্ঠী নৃত্য, গীত, নাট্য ও পালা পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা। এই সকল পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই বস্তুত 'ভিন্ন' সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর পারফরম্যান্স জ্ঞান সম্পর্কে জানার বা অনুসন্ধান আকাঙ্ক্ষাকে সুনির্দিষ্ট করে এবং গবেষণা প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

তবে এই আকাঙ্ক্ষার পূরণ অথবা বাস্তবায়নের প্রারম্ভে কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত– জাতিগত দিক থেকে আমি একজন বাঙালি এবং মুসলিম, যাদের সাথে অর্থাৎ বৃহৎ (মুসলমান) এবং ক্ষুদ্রের (প্রান্তিক/নৃগোষ্ঠী) অস্বস্তিকর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে বহমান, দ্বিতীয়ত– 'অপর' সংস্কৃতি বা নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতির সাথে আমার গবেষণা-পূর্ব প্রত্যক্ষ যোগ-সংযোগ-সংসর্গের পরিধি অত্যন্ত সীমিত, অর্থাৎ 'পূর্ব-পরিচিত' এই সম্পর্কসূচক অবস্থানটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং তৃতীয়ত– এমনকি বসবাসসূত্রে নির্ধারিত কোনো নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের 'বাঙালি অধিবাসী'ও নই যে, 'প্রতিবেশী' হিসেবে অন্তত খানিকটা 'বাড়তি' সুবিধা (মেনে নেওয়া বা গ্রহণ করা অর্থে) পেতে পারি। আর এই সকল নেতিবাচক পূর্বাবস্থার কারণে ক্ষেত্র-সমীক্ষা অঞ্চলে আমার অবাধ বিচরণ-সম্ভাবনা নানা শঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং শেষাবধি ক্ষেত্র-সমীক্ষার অঞ্চলগুলোতে আপাদমস্তক একজন অপরিচিত 'আগন্তুক' হিসেবেই অনুপ্রবেশ করতে হয়। যেহেতু গবেষণা প্রকল্পটি 'ক্ষেত্র সমীক্ষা' নির্ভর এবং নির্দিষ্ট সময় ও পরিধির অন্তর্গত তাই 'আগন্তুক'/ 'অতিথি' পরিচয়টিই গবেষণার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ পর্ব– ক্ষেত্র-সমীক্ষা সম্পাদনের পথে বড় একটি মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও 'আগন্তুক' সংকট মোকাবেলা করে 'অপর' কোনো সংস্কৃতি বিষয়ে জানা, বোঝা এবং তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত গবেষক ব্রোনিস্ল কাসপার ম্যালিনোস্কির (১৮৮৪-১৯৪২) নিবিড় প্রত্যক্ষানুসন্ধান (Intensive field-work) পদ্ধতি আমাদের অজানা নয়, তথাপিও বক্ষ্যমাণ

গবেষণায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। কেননা ম্যালিনোস্কির নিবিড় প্রত্যক্ষানুসন্ধান পদ্ধতি বা 'জাতিতাত্ত্বিক জরিপ' পদ্ধতিটি মূলত এমন এক সর্বব্যাপী প্রক্রিয়া যা নৃবিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে একটি নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনাচারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং এই পদ্ধতি গবেষককে নির্ধারিত নৃগোষ্ঠী-অঞ্চলে একটানা দীর্ঘ সময় বসবাসসূত্রে উক্ত জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক চিন্তা ও জ্ঞান কাঠামোর গভীরে প্রবেশ এবং আস্থা অর্জনপূর্বক তথ্যানুসন্ধান করার কথা বলে। কিন্তু আমার গবেষণার পদ্ধতি, পরিধি এবং সময়ের সীমাবদ্ধতায় সেটি সর্বাত্মকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ক্ষেত্র-সমীক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণত বা প্রধানত নৃবিজ্ঞান নয়, বরং নৃবিজ্ঞানের একটি মাত্র অংশ– জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনার প্রদর্শন/উপস্থাপন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, পারফরম্যান্স জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। এই বিবেচনা থেকে আমার গবেষণা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকারগ্রহণ, রেকর্ডিং, ইমেজ-ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। আর এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য করার নিমিত্তে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে খোদ নৃগোষ্ঠী (মারমা, মণিপুরী ও গারো) অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে অবস্থান (পরিবেশনা অনুসারে দুই থেকে তিন সপ্তাহ) করার সংকল্প গ্রহণ করি এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা যায় ততটা আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা, রেকর্ডিং করা এবং চিত্র ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। এই দুরূহ কাজটি করা সম্ভব হয়েছে কেবল সমীক্ষা সময়টিতে কয়েকজন নৃগোষ্ঠী বন্ধুর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে থাকা এবং তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে। তাছাড়া গবেষণার শুরু থেকে শেষাবধি বিভিন্ন পর্যায়ক্রমগুলোর সুষ্ঠু সম্পাদনে একাধিক ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই আমি গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সফল হতে পেরেছি। এ জন্য প্রথমেই যাদের প্রতি আমার অন্তরের গহিন থেকে শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই তারা হলেন মারমা, মণিপুরী ও গারো জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত সেই সকল শিল্পী-কুশীলব, যারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং অসীম ধৈর্য সহকারে আমার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশনাগুলো প্রদর্শন করেছেন, আলাপচারিতায় মত্ত হয়েছেন, যখন যা কিছু বুঝতে চেয়েছি, জানতে চেয়েছি দিয়েছেন নিঃশঙ্ক চিত্তে।

এ কাজটি সহজ হতো না যদি না এর পেছনে কয়েকজন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতো। এ পর্যায়ে প্রথমেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই লুভা নাহিদ চৌধুরী এবং বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের প্রতি। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এই গবেষণার 'ক্ষেত্র-সমীক্ষা' পর্বটি সম্পাদনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় তিনটি নৃগোষ্ঠী অঞ্চলে পুনঃপুন গমন, অবস্থান, কুশীলবদের পরিবেশন-ব্যায় নির্বাহসহ সমীক্ষাকালীন যাবতীয় আর্থিক ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়েছে। এ জন্য লুভা নাহিদ চৌধুরীর আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছাকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি। এই প্রসঙ্গে বন্ধু কমল খালিদকেও বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই, যার কল্যাণে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতার বিষয়টি ফাউন্ডেশনের কাছে উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেতে চাই শিশির দত্ত এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্ট (বিটা) ও বিটার বান্দরবান শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং দুর্গম পার্বত্যময়তা বিবেচনায় বান্দরবান অঞ্চলের ক্ষেত্র-সমীক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে জেলা সদরে অবস্থান করেই পরিচালনা করতে হয়েছে। অর্থাৎ সদরে থেকেই বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে গমন, অবস্থান এবং পুনরায় ফিরে আসতে হয়েছে সদরে। এক্ষেত্রে বান্দরবান সদরে অবস্থিত বিটা প্রদত্ত আবাসন সুবিধা গ্রহণ করে এই অঞ্চলের সমীক্ষণ প্রক্রিয়াটি সম্পাদনে সক্ষম হই, এ জন্য শিশির দত্ত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে এই পাহাড়ি অঞ্চলে যাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে, সহযোগিতায়, পরামর্শে, নেতৃত্বে এবং দিকনির্দেশনায় মারমাদের সাংস্কৃতিক আঙিনায় পৌঁছাতে পেরেছি এবং কাজটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি তাদের প্রতি আমার ঋণ পাহাড়সম। এদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন– মং ক্য শুয়েন্যু নেভি, লাভলু মারমা, অং জাই, বামং, চ্য থুই প্রু, মং মং মারমা, মনিরুল ইসলাম মনু, বাবুল চৌধুরী প্রমুখ। অপর দিকে গারো এবং মণিপুরী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের ক্ষেত্র-সমীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও রয়েছে বেশ কিছু মানুষের নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ এবং সক্রিয় উপস্থিতি। এদের মধ্যে দুজন বন্ধুকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই, এরা হলেন– গারো কবি পরাগ রিচিল এবং মণিপুরী থিয়েটারের কর্ণধার, নাট্যকর্মী শুভাশিস সিনহা। এদের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে, পরামর্শে, এবং উদ্যোগের কারণেই অতি সহজে অপর/ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে প্রবেশ করার সুযোগ পাই এবং পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষেত্র-সমীক্ষা কার্যক্রমটি সফল করতে সক্ষম হই। এই পর্যায়ে আরও যাদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই তারা হলেন, ময়মনসিংহ অঞ্চল (ধোবাউড়া, দুর্গাপুর, ফুলবাড়ী) এবং টাঙ্গাইল, মধুপুর অঞ্চলের– সৃজন সাংমা (গবেষণা কর্মকর্তা, বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোনা), জনিক নকরেক (গারো আদিধর্ম– সাংসারেক অনুসারী), ম্যারী রংডি, স্টিফেন রিচিল, তুসি হাগিডক, মতেন্দ্র মানকিন, নগেন্দ্র মান্দা প্রমুখ। শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার অঞ্চলের জ্যোতি সিনহা, বিধান সিংহ, সমরজিৎ সিংহ, রণজিৎ সিংহ, মনিভদ্র, কৃষ্ণকুমারী, গোপীমোহন সিংহ, রাশকান্ত সিংহ প্রমুখ। ক্ষেত্র-সমীক্ষা সম্পাদন পর্বে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এই পর্যায়ে আমি সস্নেহে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তর এবং আমার প্রিয় ছাত্র মেধাবী ছাত্র মেহেদি তানজীরের প্রতি। গবেষণা সহযোগী হিসবে ক্ষেত্র-সমীক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে মেহেদি সাংগঠনিক বা কৌশলগত দায়িত্ব পালনেই কেবল আন্তরিক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন আমার অনুসন্ধিৎসু চিন্তা, শিল্প-ভাবনা ও সম্ভাবনা যাচাই কার্যক্রমের একজন সৃজনশীল সহযাত্রী। তাঁর বিশেষ সক্রিয়তার কারণে গবেষণার পুরো সময়টাতে আমরা ক্রমাগতভাবে বিশ্লেষণী বাহাসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হই এবং এই অনুসন্ধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পথে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হই।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সার্বিক কার্যক্রমের নানা পর্যায়ে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্বের আন্তরিক ও জ্ঞানগর্ভ সান্নিধ্য গবেষণার নির্ধারিত কক্ষপথে অবিচল থাকতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার খণ্ডকালীন কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের আমার শিক্ষক এবং সহকর্মীদের প্রতি। আমার এই গবেষণা বিষয়ে তাদের বুদ্ধিদীপ্ত মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ আমাকে উত্তর উত্তর সমৃদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে শুরুতেই স্মরণ করতে চাই আমার শিক্ষক এবং নাট্যগুরু অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদের প্রতি। কেননা তাঁর অধীনে লোকনাট্য বিষয়ে এম. ফিল গবেষণা করার সূত্রে অর্জিত লোকনাট্য বিষয়ক জ্ঞানতাত্ত্বিক পাঠ বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি সম্পাদনে বিশেষ শক্তি, প্রেরণা ও প্রণোদনা জুগিয়েছে। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার শিক্ষক ড. ইস্রাফিল শাহিন, ওয়াহিদা মল্লিক এবং রহমত আলীসহ তরুণ সহকর্মী সুদীপ চক্রবর্তী, আবুল বাশার, আহমেদুল কবির, আশিকুর রহমান, শাহমান মৈশান, কাজী তামান্না হক, আহসান খান, অমিত চৌধুরী প্রমুখ সকলের প্রতি, যাদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ এবং পরামর্শ আমাকে এই কাজে নিরবধি থাকতে সহায়তা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বন্ধুবর তানভির আহমেদ সিডনী এবং আলীম আল রাজীর প্রতি যারা নানা সময়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধসহ নানা তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে আমাকে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বাংলাদেশের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, সংগঠক এবং গবেষক লুবনা মরিয়াম আপাকে যিনি মণিপুরী নৃত্য বিষয়ে বিশ্লেষণী মতামত দিয়ে এবং সহায়ক গ্রন্থাবলির জোগান দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই 'সাধনা' সদস্য নৃত্যশিল্পী সুইটি দাসের প্রতি, যিনি মণিপুরী নৃত্যের প্রায়োগিক বিষয়ের খুঁটিনাটি অনেক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি- শ্রীমঙ্গল, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি- বিরিশিরি, ট্রাইবাল কালচালার ইন্সটিটিউট– বান্দরবান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতি যেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি।

এইক্ষণে আমার সহধর্মিণী ইয়াসমিন হোসেন রানুকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই। যার অসীম ধৈর্য আর ঈর্ষান্বিত ত্যাগের কল্যাণে আমি আমার গবেষণা কার্যক্রমের এই দীর্ঘ পথে একাগ্র থাকতে সক্ষম হয়েছি। তিনি প্রথাগত সংসার ধর্মের সকল দায়িত্ব এবং জটিলতা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে গবেষণা কর্মে নিরবচ্ছিন্ন থাকার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে তাঁর এই মহান ত্যাগ এবং উদারতায় আজীবনের ঋণী করে রেখেছে।

সবশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করতে চাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ স্যারের প্রতি। স্যারের মমতা এবং সৌহার্দপূর্ণ সান্নিধ্যে গবেষণাকালীন সৃষ্ট সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে

সম্মুখে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর বিশ্লেষণী সাহচর্য, জ্ঞানতাত্ত্বিক উপদেশ আর সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং পদ্ধতিগত পরামর্শের ওপর ভিত্তি করেই আমি আমার গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের পথে অবিচল থেকে অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পাদনে সক্ষম হয়েছি। স্যারের প্রতি আজীবনের কৃতজ্ঞতায় আমি গর্বিত।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

উদ্দীপনা

বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যায়ে 'লোকনাট্যের' পঠন-পাঠন, রীতি-পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং নাট্য-নির্মাণে বেশ কিছু 'তাত্ত্বিক নির্মিতি'[১] নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই সুনির্দিষ্ট হতে থাকে। বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত এক শ্রেণির সংস্কৃতি-প্রেমী নাট্য-গবেষক এবং বিশেষজ্ঞের প্রদত্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় নাট্যকলা– 'লোকনাট্যের' উপাদান, অনুষঙ্গ, বিষয়, আঙ্গিকের সাথে পাশ্চাত্যনির্ভর নাট্য-চিন্তা ও জ্ঞানের সেতুবন্ধ সুদৃঢ় হয় এবং পরিবেশনামূলক সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গের আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় নতুন এক ধরনের শিল্পরূপ ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। সাধারণভাবে যা 'শেকড় সন্ধানী' নাটক, 'দেশজ নাট্য রীতি', 'বাঙলা নাট্যাঙ্গিক' প্রভৃতি একাধিক বিশেষণ ও তাত্ত্বিক বয়ানে পরিচিতি লাভ করে। বলা যায় শহরকেন্দ্রিক নাট্যে যুক্ত হওয়া নতুন এই প্রবণতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকার নাট্যচর্চায় ঔপনিবেশিক আনুকূল্যে সৃষ্ট কলকাতাকেন্দ্রিক পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অন্ধ 'অনুকরণ'[২] প্রবণতার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে।

নব্বইয়ের শেষভাগে নাট্যকলা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে একজন সার্বক্ষণিক নাট্যজীবী হিসেবে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সাথে যুক্ত হই এবং গভীর আস্থা জ্ঞাপন করি সেই সকল 'তাত্ত্বিক নির্মিতির' প্রতি যা বাংলাদেশের 'সংস্কৃতি' ঘনিষ্ঠ 'নতুন' নাট্যভাষা নির্মাণে সর্বাধিক কার্যকর হতে পারে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। অতঃপর নাট্য নির্দেশনা, শিক্ষকতা, গবেষণা (এম. ফিল.), অভিনয়, নাট্য কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে সমসাময়িক নাট্যভাবনার সাথে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত নাট্যমূলক উপাদান, অনুষঙ্গের মেলবন্ধনের চেষ্টায় থেকেছি অবিরত এবং আন্তরিক। তবে দীর্ঘ সময় ধরে অভিনেতা/ কুশীলব/ ছাত্র/ শিক্ষার্থীদের সাথে পারস্পরিক এবং বহুবিধ প্রায়োগিক সম্পর্কে যুক্ত থাকার কারণে প্রায়ই একটি শূন্যতার উপলব্ধি তৈরি হয় অথবা বলা যায় এক ধরনের অভাব বোধ অনুভূত হয় যে– শহরকেন্দ্রিক নাট্য-নির্দেশনা, নাট্য-নির্মাণ, পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যদি দেশজ নাট্যকলার 'তাত্ত্বিক নির্মিতি' কার্যকর হতে পারে, তবে এই ভূখণ্ডে প্রচলিত 'অপর' (Other)[৩] ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির পরিবেশনামূলক শিল্পকলার নিরীক্ষাসূত্রে অভিনেতার প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ বা অনুশীলনে কার্যকর হতে পারে এমন কিছু পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নির্ণয় করা সম্ভব হবে না কেন? কেন অভিনেতার প্রস্তুতিমূলক

---

১ বিস্তারিত দেখুন– সাইদুর রহমান লিপন, *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা নং ২৩-২৬ এবং ১৩৩-১৫১

২ বিস্তারিত দেখুন– প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

৩ বিস্তারিত দেখুন– Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (Other/ other), *Key Concepts in Post-Colonial Studies*, Routledge, London and New York, 2004, P. 169

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন বা প্রশিক্ষণ পরিচালনায় পাশ্চাত্য নির্দেশিত পদ্ধতিগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বে চর্চিত হতে থাকবে? কিন্তু এইরূপ কৌতূহল-উদ্দীপক মনোভঙ্গির বিপরীতে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি যে– দৈহিক, মনো-দৈহিক, ভাব-আবেগ, ইন্দ্রিয়, দম-ধ্যান-মনোসংযোগ প্রভৃতি বিষয়ে ইউরো-আমেরিকান অনুশীলন পদ্ধতিগুলোর প্রায়োগিক উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা যদি প্রতিষ্ঠা পেয়েই থাকে, তবে এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের কি যুক্তি থাকতে পারে? তাছাড়া এই প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আদতে আমি কি অভিনেতার প্রস্তুতিতে পাশ্চাত্যের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বিপরীতে অবস্থান করছি না? আসলে এই প্রশ্নের সরল উত্তর হচ্ছে– না, প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো অনুশীলন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে খারিজ করার নিমিত্তে নয় অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে গৌণ-গুরুত্বে প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে এই গবেষণা নয়। বরং শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় বিরাজমান সকল পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সমান্তরালে এমন কিছু অনুশীলন পদ্ধতি অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হচ্ছে, যা কার্যত বাংলায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রচলিত ও প্রথাগত পারফরম্যান্স জ্ঞানের সাথে নগরায়তনে প্রচলিত পারফরম্যান্স জ্ঞানকেন্দ্রিক অনুশীলন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমঝোতা করতে সক্ষম হতে পারে। আরও সহজ করে বললে যা দাঁড়ায় তা হলো– অভিনেতার প্রস্তুতিতে এমন কিছু অনুশীলন উপাদান অনুসন্ধানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হচ্ছে, যা মূলত জাতি-সংস্কৃতিতে প্রচলিত বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের পরিবেশন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি; কুশীলবের দৈহিক, মনো-দেহিক, ভাব ও বিশ্বাসগত প্রস্তুতি এবং প্রয়োগের ঐতিহ্যিক ও পরম্পরাগত চর্চা থেকে উৎসারিত বা অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং শহরায়তনিক নাট্যধারায় প্রচলিত পাশ্চাত্য-অনুসৃত অনুশীলন প্রক্রিয়ার সমান্তরালে কার্যকর হতে পারে। একজন সার্বক্ষণিক নাট্যকর্মী হিসেবে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সাথে দীর্ঘ পথ চলায় এবং মহড়া কক্ষ, শ্রেণিকক্ষ, কর্মশালাগৃহে অভিনেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্কসূত্রে ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হওয়া এই উপলব্ধি অর্থাৎ জাতি-সংস্কৃতি নির্ভর অনুশীলন উপাদানের অভাব বোধ থেকেই বর্তমান গবেষণা সম্পাদনের ব্রত গ্রহণ করি।

***

প্রেক্ষাপট

বক্ষ্যমাণ গবেষণার শিরোনাম– 'বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মণিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা' নির্ধারণের সাথে সাথে এমন কিছু প্রশ্ন এসে ভিড় জমায়, যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা ব্যতীত গবেষণার নির্ধারিত কক্ষপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। যেমন– কেন এবং কী অর্থে 'জাতিতাত্ত্বিক' শব্দটির ব্যবহার করা হলো অথবা এই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু অপরিহার্য ছিল? কেন নৃগোষ্ঠী নাট্য/আদিবাসী নাট্য/ইন্ডিজেনাস থিয়েটার ইত্যাদি পরিভাষার পরিবর্তে 'জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা' শব্দের ব্যবহার করা হচ্ছে? যেহেতু দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'ইনডিজেনাস', 'আদিবাসী' এবং 'নৃগোষ্ঠী' বা 'ক্ষুদ্র

Dhaka University Institutional Repository

নৃগোষ্ঠী' ইত্যাদি পরিভাষার রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক বয়ান অদ্যাবধি সর্বগ্রহণযোগ্যতায় মীমাংসিত নয়, সেক্ষেত্রে গবেষকের অবস্থান কি হওয়া উচিত? কেন বৃহত্তর 'বাঙালি' সংস্কৃতির প্রচলিত পরিবেশনা-প্রেক্ষিতের বাইরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা 'নৃগোষ্ঠী'র পরিবেশনামূলক প্রেক্ষিত গ্রহণ করা হলো? উপস্থাপন/প্রদর্শন অর্থে 'পরিবেশনা' (পারফরম্যান্স) এবং নাট্য-পরিবেশনা অর্থেও যখন 'পারফরম্যান্স' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত তখন গবেষণাতে এই শব্দগুলোর প্রায়োগিক মীমাংসা কী হওয়া উচিত? বস্তুত এই সকল প্রশ্নের বিপরীতে গবেষকের ব্যক্তিগত ও সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে গবেষণার নির্ধারিত কক্ষপথে সুনির্দিষ্ট এবং অবিচল থাকা সম্ভব বলে মনে করি।

'জাতিতাত্ত্বিক' পরিভাষাটির মাধ্যমে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ নামের ভূ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল সাংস্কৃতিক-জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ও স্বকীয় অবস্থানকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বস্তুত 'জন'[৪] (people) থেকে 'জাতি' এবং 'জাতিতত্ত্ব' (ethnology) থেকে 'জাতিতত্ত্বীয়' বা সম্বন্ধীয় অথবা 'জাতিতাত্ত্বিক'[৫] (ethnological) শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। 'জন' বা 'জাতি' এক্ষেত্রে একটি 'সাংস্কৃতিক শব্দ'[৬] এবং সংস্কৃতি হচ্ছে একটি চলমান প্রবাহ, যা যুগে যুগে বহু ও বিচিত্র সব সাংস্কৃতিক উপাদান– ভাষা, বর্ণ, শরীরের গঠন ও রক্ত, ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস, সভ্যতা প্রভৃতির সংঘাত, মিলন, আত্তীকরণের নিরন্তর স্রোতধারায় জনগোষ্ঠী তার নিজ সত্তা বা জাতির পরিচয়কে নির্মাণ-বিনির্মাণ করে। ফলে 'জাতিতাত্ত্বিক' সংস্কৃতি বা 'জাতি-সংস্কৃতি' বলতে একটি জনগোষ্ঠীর বিশেষ, স্বকীয় এবং অভ্যস্ত সামূহিক জীবনাচার বা চর্যাকে বোঝানো হচ্ছে। আর এই বিবেচনায় বাংলাদেশে বসবাসরত 'ইন্ডিজেনাস', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী', 'নৃগোষ্ঠী', 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'পাহাড়ি', 'বনবাসী' পরিচয়ের সকল জনগোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র 'জাতিসত্তা' হিসেবে 'জাতিতাত্ত্বিক' সংস্কৃতি-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও এই সকল জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বা অন্তর্গত বিষয়, তথাপিও এই নামবাচক পরিচয় যতটা না 'ঐতিহাসিক' তারও অধিক 'রাজনৈতিক' এবং আরোপিত অথবা অধিপতিশীল ডিসকোর্স দ্বারা অপরায়িত। তাছাড়া জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্ক ও বিশ্লেষণে মত-দ্বিমত থাকলেও বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 'ইন্ডিজেনাস', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী', 'নৃগোষ্ঠী', 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'পাহাড়ি', 'বনবাসী' মানুষদেরকে সাধারণত 'ভিন্ন' বা 'অপর' সংস্কৃতি হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভ স্বতন্ত্র জাতি বা জাতিসত্তা হিসেবে যাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করছে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, গড়ন এবং গঠন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির সাথে একমত পোষণ করা যেতে পারে :

---

৪ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২ পৃ. ২৩

৫ বিস্তারিত দেখুন– শিপ্রা সরকার, *ম্যালিনোস্কির মাঠ-গবেষণা সামাজিক তত্ত্ব ও অন্যান্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৩

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

> Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.[৭]

স্বাভাবিকভাবেই 'জাতিতাত্ত্বিক' সংস্কৃতির এই ধারণাটি কর্তৃত্ববাদী আধুনিক 'রাষ্ট্র' দ্বারা আরোপিত/নির্ধারিত 'জাতিরাষ্ট্রের'[৮] (nation-state) কল্পিত একরূপী সমাজ (homogenous culture)– যেখানে সকল 'ভিন্ন', 'অন্য' বা 'বহু'কে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে 'ভারতীয়', 'বাঙালি' বা 'আমেরিকান' পরিচয়ের তকমা লাগিয়ে দেয়, এইরূপ তাত্ত্বিক বাহাস থেকে অনুপ্রাণিত অথবা গৃহীত হয়নি। কর্তৃত্ববাদী 'জাতীয়' বা 'জাতীয়তাবাদী' সাংস্কৃতিক সমাজের একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে 'বহুত্ব'কে বা অপরাপর সংস্কৃতিকে (প্রান্তিক, সংখ্যালঘু, নৃগোষ্ঠী) ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করে প্রবল প্রতাপে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা– '[Increasingly] 'national' cultures are being produced from the perspective of disenfranchiseed minorities.'[৯] 'জাতীয়তাবাদ' ধারণার অসার অথচ ভয়ঙ্কর রূপ সম্পর্কে উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবী একবাল আহমদ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন আরও তীব্র ও প্রত্যক্ষ ভাষায় তাঁর *টেররিজম, দেয়ারস অ্যান্ড আওয়ারর্স* গ্রন্থে। 'জাতীয়তাবাদের লক্ষ্যই হলো একদিকে নিজেকে মহান হিসেবে উপস্থাপন, অন্যদিকে 'অপরকে' ক্ষুদ্র করা, তাকে শত্রু হিসেবে প্রমাণ করা। জাতীয়তাবাদ তাই একই সঙ্গে দুই ধরনের মিথ্যা– নিজের ব্যাপারে ও অন্যের ব্যাপারে।'[১০]

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতটিও কর্তৃত্ববাদী আচরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। বরং ক্রমাগতভাবে মর্যাদা আর অধিকারহরণের পীড়নমূলক বাস্তবতায় 'বাংলাভাষী ছাড়াও আরো বহু [জনসংখ্যার হিসেবে] ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস আছে এটা আজ অস্বীকৃত'[১১] অথবা 'আদিম',

৭ Helena Ruotsala, *Field work at home :Possibilites and Limitations of Native Research,* Pille Runnel (edited), *Rethinking Ethnology and Folkloristics,* Tartu Nefa Ruhm, Estonia, 2001, P. 125

৮ বিস্তারিত দেখুন– Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *Key concepts in Post-Colonial Studies* (Nation / Nationalism and Globalization), routledge, London and NewYork, 2004, P. 148 -155 & 110 -115

৯ Homi K. Bhabha. *The location of culture,* Routledge, London and New York, 1994, P. 8

১০ হাসান ফেরদৌস, *সাদা মানুষেরা ক্ষেপে উঠেছে কেন?* প্রথম আলো, ঢাকা, বধুবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

১১ মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া (সম্পা :), *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র,* অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. xxx

'সরল', 'অনুন্নত', 'বিচ্ছিন্ন', 'বিচিত্র' প্রভৃতি নেতিবাচক ক্যাটাগরি বা বর্ণের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে হরহামেশাই। ঐতিহাসিকভাবেই এই সকল জনগোষ্ঠীর সমাজচিন্তা ও জ্ঞানকাঠামোতে রাষ্ট্রচেতনার পরিবর্তে গোষ্ঠীচেতনা প্রবল হয়ে থাকে। সম্ভবত এ কারণেই ভাষা, ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস, অভ্যাস, আচার, আচরণ, রুচি, খাদ্য, পোশাক, ক্রীড়া, নৃত্য-গীত-শিল্পকলা, সব কিছুতেই দেখা যায় সুস্পষ্ট ঐকিক সামষ্টিকতা বা 'সাংস্কৃতিক একক'[১২]। ফলে জাতিগত (ethnic) পরিচয়, গঠন, কাঠামো চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করণে জাতিসত্তার ঐতিহ্যিক বা পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক চর্চার অন্বেষণ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে ওঠে এবং এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যিক পরম্পরাসূত্রেই নৃগোষ্ঠীর এথনিসিটি (ethnicity) নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে থাকে। কেননা– Ethnicity refers to the fusion of many traits that belong to the nature of any ethnic group : a composite of shared values, beliefs, norms, tastes, behaviors, experiences, consciousness of kind, memories and loyalties.[১৩] সুতরাং, জাতিরাষ্ট্রের 'জাতির' বিপরীতে অবস্থিত ঐতিহাসিক 'জন' বা 'জনগোষ্ঠী'র জাতিগত সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক চর্চা সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বক্ষ্যমাণ গবেষণায় 'জাতিতাত্ত্বিক' (ethnological) বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য নৃবিজ্ঞানে জাতিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার উদ্দেশ্যও তাই, অর্থাৎ– Ethnography is the work of describing a culture. The essential core of this activity aims to understand another way of life from the native point of view।[১৪] তবে নিশ্চিতভাবেই নৃবিজ্ঞানের সামগ্রিকতা নয় বরং অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা বা পরিবেশনামূলক শিল্পকলাকেই বক্ষ্যমাণ গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাভাষা, বাঙালি, বাঙালি জাতীয়তাবাদের, সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৭১-এর কষ্টার্জিত স্বাধীনতা। অতঃপর 'বাংলাদেশ'– একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সদ্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রটির সাংস্কৃতিক আদর্শ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সংখ্যার প্রতাপে (ভাষা ও ধর্ম) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদী চেহারাটি ক্রমশই 'অপর' সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর বিপরীতে আগ্রাসী রূপে আবির্ভূত হয়– 'রাষ্ট্র বহু ভাষার, বহু জাতির, বহু সংস্কৃতির দেশ বাংলাদেশকে একক বাঙালি জাতি রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীকে বিলুপ্ত ঘোষণাও করে।'[১৫] ফলে অস্বীকৃতি, উপেক্ষা আর উদাসীনতার পটভূমিতে

---

১২ মেসবাহ কামাল, *বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসী সাম্প্রতিক সমস্যাবলী : একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক পর্যালোচনা*, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া (সম্পা :), *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৯৮

১৩ Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *Key Concepts in Post-Colonial Studies*, Routledge, London and New York, 2004, P. 80

১৪ James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Holt, Rinehart and Winston, Florida, 1979, P. 3

১৫ পপেন ত্রিপুরা, *'আদিবাসী' মানে 'আদিবাসিন্দা' নয়*, আদিবাসী বার্তা, www.adibashibarta.com/home/details/1024/, ০৯.০৮. ২০১৬, মঙ্গলবার, সময়- ১০.২১ মিনিট.

'নৃগোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী', 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'ট্রাইবাল', 'ইন্ডিজেনাস' 'পাহাড়ি', 'বনবাসী' জনগোষ্ঠী কেবলই একটি স্পর্শকাতর 'বিষয়' বা 'সমস্যা' হিসেবে সর্বত্র উপস্থাপিত/চিহ্নিত হয়। আর এ সমস্যার পুরোটা জুড়েই রয়েছে ভূমি, ভাষা, ধর্ম, দর্শন তথা জাতিসত্তার অধিকার, উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিষয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়া-না-পাওয়ার বিষয়টি। অপরদিকে বুদ্ধি ও জ্ঞানভিত্তিক বয়ান, বিবৃতি ও বাহাসের আসরে এই 'সমস্যা' একটি জটিল ও মীমাংসাতীত বিতর্কের টাটকা 'ইস্যু'তে পরিণত হয়েছে। তথাপিও স্পর্শকাতর এই 'বিষয়ে' গবেষণা হয়েছে বিস্তর। বিদ্যায়াতনিক জ্ঞানকাণ্ডের আর্কাইভও সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নাই। আর এ বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তকের সংখ্যা গণনার পর্যায় অতিক্রম করেছে বহু আগেই। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, আজ অবধি এই 'সমস্যা'র গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি বরং 'আদিবাসী' ও 'বাঙালি'র পারস্পরিক সম্পর্কে ধোঁয়াশার কালো মেঘ জমে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর অনাস্থার চেহারা। যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে দাবি/অধিকার আদায়ের সংগ্রাম– কখনো তা রক্তক্ষয়ী আবার কখনো শান্তিপূর্ণ উপায়ে। যেমন– ১৯৯৪ সালে *জাতীয় আদিবাসী পরিষদ* বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকারসহ জাতিগত পরিচয়, নিরাপত্তা, উন্নয়ন, এবং অংশগ্রহণসহ নানাবিধ বিষয়ে ১৩টি দাবি উত্থাপন করে। *ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজেনাস ডে* উপলক্ষে ২০০২ সালের ৯ আগস্টের 'বাংলাদেশ ইন্ডিজেনাস পিওপিল'স ফোরাম সংগঠিত একটি শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে বিবিসির নিউজ টাইটেল করা হয়েছিল এমন যে, Bangladesh tribes march for right।[১৬] অপরদিকে আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে পরবর্তী বহু বছর ধরে এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পুনরায় ঘনীভূত হয়ে উঠছে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দেয়াল। ফলে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই' শীর্ষক অধিকার আদায়ের আন্দোলন বর্তমানে একটি কারেন্ট ইস্যুতে পরিণত হয়েছে–

> ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মাঝে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির (পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি) মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে দীর্ঘ দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের। পাহাড়ে বইতে শুরু করে শান্তি ও স্বস্তির বাতাস। সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন জনসংহতি সমিতির সদস্যরা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য ১৬ বছরেও (২০১৩ সালে যখন এটি লেখা হচ্ছে) এ চুক্তির বাস্তবায়ন হয়নি। বরং পার্বত্য এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে বেড়েছে ক্ষোভ, হতাশা, এমনকি মানবাধিকার লঙ্ঘনও বেড়েছে আশংকাজনকভাবে। বর্তমান সরকার এ চুক্তির কিছু কিছু বিষয়ে অন্তরিকতা দেখালেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর দীর্ঘসূত্রিতার জালে আটকা পড়ে চুক্তিতে

---

১৬ Tone Bleie, *Tribal Peoples Nationalism and the Human Rights Challenge : The Adivasis of Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, 2005, P. 288

Dhaka University Institutional Repository

> সাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি আদিবাসীদের মধ্যে হতাশা বাড়তে বাড়তে অবিশ্বাসের চারাগাছ বড় হয়ে উঠছে।[১৭]

স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চনার এই প্রেক্ষাপটে 'আদিবাসী' ও 'বাঙালি'র সম্প্রীতির সহাবস্থানে অস্থিরতা দানা বাঁধছে ক্রমশই। যদিও সমস্যার সমাধানে নেওয়া হচ্ছে নানান পদক্ষেপ, তথাপিও রাষ্ট্রীয় বা অন্যান্য মহলের গৃহীত কোনো উদ্যোগই যেন সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দেয়াল ভাঙতে পারছে না। অধিকন্তু যেকোনো পর্যায়ের 'আদিবাসী' 'বাঙালি' বিতর্কের শেষ পরিণতি যেন অনেকটা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে– ডিম আগে, না মুরগি আগে, অর্থাৎ ওরা (আদিবাসী) আগে না আমরা (বাঙালি) আগে, এই জাতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক বয়ান, বিবৃতি আর বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে একাধিক 'শ্রেণিকরণ (classification) এবং বর্গকরণের (Catagorization)'[১৮] মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে এঁদের পরিচয়, উৎস, গঠন, অবস্থান নির্ণয়ের উপর্যপরি ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া। এঁরা কি 'ক্ষুদ্র' না 'বৃহৎ', 'আদি' না 'স্থানীয়', 'জাতি' না 'উপজাতি', 'আগে' না 'পড়ে' 'সংখ্যার বিচারে নৃগোষ্ঠী নাকি জাতিসত্তার মৌলিকত্বে নৃগোষ্ঠী', 'ধর্মে হিন্দু/খ্রিষ্টান/বৌদ্ধ' নাকি 'পৌরাণিক ও সর্বপ্রাণবাদী', এই জাতীয় কৌশলী যুক্তিতর্কের চাপে পড়ে অধিকার আদায়ের মৌলিক ইস্যু বা 'সমস্যা' সমাধানের প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত অনেকটাই যেন ধূসর বিবর্ণ হয়ে পড়ে–

> [কিন্তু] এটা এখন বলা প্রয়োজন, যতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই গবেষকরা 'আদিবাসী সমস্যা' উল্লেখ করুন না কেন, বাস্তবে সমস্যা আদিবাসীদের নয়– তাদের হচ্ছে দুর্ভোগ। সমস্যা হচ্ছে অধিপতি জাতির, সেটা যে প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই ভাবি না কেন। অধিপতি জাতির আধিপত্যই 'আদিবাসী'দের কোণঠাসা করে রাখে। এই যদি বাস্তবতা হয়, তাহলে গবেষণা হতে হবে খোদ অধিপতি জাতিকে নিয়ে– তার অহংকার আর হিংস্রতার ভিত্তিকে উন্মোচন করতে হবে, রাষ্ট্রের নির্যাতন-নিপীড়ন সামর্থ্যকে উন্মোচন করতে হবে। রাষ্ট্রের গঠনে প্রবল জাতির প্রতি পক্ষপাতকে শনাক্ত করতে হবে।[১৯]

স্পষ্টতই এটি একটি রাজনৈতিক 'সমস্যা' যা একই সাথে সাংবিধানিক ও জাতিসত্তার অধিকার সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত এবং এই অধিকার রক্ষার দায় রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। 'ওরা' অর্থাৎ নেতিবাচক। 'আমরা' অর্থাৎ ইতিবাচক। 'ওরা' একই সঙ্গে ঈর্ষা ও অনুকম্পার পাত্র, অথচ 'কাঙ্ক্ষিত ও উপহাসমূলক...'[২০]– এই

১৭ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী : ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১২৭

১৮ মাহমুদুল হাসান ও সুমন সাঈদ ফেরদৌস, *'ইন্ডিজেনাস'– এর অনুসন্ধান : বাংলাদেশের বিদ্যায়তনিক জগতের দোনোমনা*, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া (সম্পা :), *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৫৬

১৯ ইলিরা দেওয়ান ও মানস চৌধুরী, *'শান্তিচুক্তি'র পর : বাংলাদেশের বিদ্যোৎসাহী মহল এবং রাষ্ট্রের অবিশ্লেষিত ক্ষমতা*, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া (সম্পা :), *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৮

২০ হাফিজ রশিদ খান, *আদিবাসী জীবন আদিবাসী সংস্কৃতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসার দায়িত্বটিও এক্ষেত্রে সংখ্যা-প্রবল বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতির এই 'আমরা' বা 'আমাদেরকেই' গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু বক্ষ্যমাণ গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে এই সকল তর্ক বিতর্ক সম্পৃক্ত নয়, সেহেতু এই বিষয়গুলোকে বিশদ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করারও কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কিন্তু এই বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ নেই, আর সে কারণেই 'নৃগোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী', 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'ইন্ডিজেনাস' ইত্যাদি পরিভাষার বৈশ্বিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত এবং এ সংশ্লিষ্ট বাহাস ও বিতর্কের তাত্ত্বিক নির্মিতি বিষয়ে সজাগ থেকেই একটি সাধারণ (common) পারিভাষা– 'জাতিতাত্ত্বিক' শব্দটি নির্বাচন করা হয়েছে। 'জাতিতাত্ত্বিক' পরিভাষাটির প্রায়োগিক ব্যঞ্জনায় প্রথাগত রাজনৈতিক তর্কের চেয়ে নৃবিজ্ঞানের যোগসূত্র নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ এবং তা প্রচলিত বিতর্ক ও বাহাসের সাথে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রচনা করবে না বলেই মনে করা হয়েছে। ফলে 'জাতিতাত্ত্বিক' শব্দটি গ্রহণের মাধ্যমে বিতর্ক নয় বরং 'অপর'কে মেনে নেওয়ার আন্তরিকতা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'জাতিতাত্ত্বিক' শব্দটির অধীনে বাংলাদেশে বসবাসরত সকল স্বতন্ত্র ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক-জনগোষ্ঠীকে 'জাতি' বা 'জাতিসত্তা' হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। আর এই যুক্তিতেই 'নৃগোষ্ঠী নাট্য', 'ইন্ডিজেনাস থিয়েটার', 'আদিবাসী নাট্য' বা 'উপজাতীয় নাট্যের' পরিবর্তে জাতিগত নাট্যকলা এই অর্থে 'জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা' বিষয়টিকে অভিসন্দর্ভের শিরোনামে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া 'জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা' নিরীক্ষার সূত্রে অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, অনুন্নত, বিচ্ছিন্ন তকমা লাগানো 'অপর' জাতিসত্তার প্রচলিত এবং প্রথাগত পারফরম্যান্স জ্ঞান বৃহত্তর 'বাঙালী সংকর জন'[২১] বা জাতির ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক-উত্তর শহরায়তনিক নাট্যের পারফরম্যান্স জ্ঞানতত্ত্বে কতটুকু কার্যকর হতে পারে অথবা মেলবন্ধন রচনা করতে সক্ষম এই বিষয়টিও অভিসন্দর্ভের চিন্তা মূলে সক্রিয় রয়েছে।

তবে বক্ষ্যমাণ গবেষণায় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল জাতিসত্তার তাবৎ নাট্যমূলক পরিবেশনা বা জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বা সেই সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা দুটোই এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা গবেষণা প্রকল্পের পরিধি অনুসারে কেবল তিনটি জনগোষ্ঠী– মারমা, মণিপুরী এবং গারোদের এই গবেষণার বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই মারমা, মণিপুরী এবং গারোদেরকে নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য 'বিষয়' হিসেবে গ্রহণ করা অথবা এদের সংস্কৃতি-সামগ্রিকতাকে বিশদ বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করে 'জাতিতাত্ত্বিক' জ্ঞানচর্চা করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। কেবল নির্দিষ্ট তিনটি জাতিসত্তার পরিবেশনামূলক শিল্পকলার অন্তর্গত নৃত্য, নাট্য, খেলাধুলা, ধ্যান ও দশা trance থেকে নির্বাচিত নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবেশনাকে মাঠ-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নাট্য-নিরীক্ষণের 'বিষয়' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর নির্বাচিত নৃত্য, নাট্য, খেলাধুলা, ধ্যান ও দশা'র পরিবেশন প্রক্রিয়া, রীতি-বৈশিষ্ট্য, মনো-দৈহিক ভঙ্গিগত উপস্থিতি, দেহের ভাষা ও

---

২১ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২ পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

শৈলীর পদ্ধতিগত ব্যবহার, সুর-ছন্দের প্যাটার্ন, ভাব-রস এবং ইন্দ্রিয়জাত অভিব্যক্তির প্রকাশ ও প্রদর্শনসহ নানা ক্ষেত্রে যে সকল প্রায়োগিক কৌশল, প্রথা, পদ্ধতি, উপাদান, অনুষঙ্গ তথা সার্বিক পারফরম্যান্স জ্ঞান জাতিসত্তার পরিবেশনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে, কেবল সেই সকল বিষয়কে বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভ রচনায় নাট্য-নিরীক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

***

পর্যালোচনায় পূর্ববর্তী সাহিত্য, গবেষণা ও নাট্যকর্মসমূহ

শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় বিরাজমান যে তাত্ত্বিক-প্রতিবেশে বক্ষ্যমাণ গবেষণা তার নিরীক্ষালব্ধ প্রায়োগিক উপাত্ত (উপাদান) ব্যবহারের বা চর্চার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হচ্ছে, সেই প্রেক্ষাপটে জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার সামগ্রিক অবস্থান এবং এ বিষয়ক গবেষণা, রচনা এবং নাট্য নির্মাণ-বিনির্মাণ ও প্রদর্শনে এ পর্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শুধু বাংলাদেশেই নয় বর্তমান বিশ্ব-পরিমণ্ডলে নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য 'বিষয়' হিসেবে অথবা 'জাতিরাষ্ট্রের' অভ্যন্তরীণ বহু সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে বিপক্ষে প্রদত্ত বয়ান, বিবৃতি ও বাহাসের স্পর্শকাতর একটি 'ইস্যু' বা 'সাবজেক্ট' হিসেবে আদিবাসী/ইন্ডিজেনাস, ট্রাইবাল/উপজাতি তথা 'জাতিতাত্ত্বিক' বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, বিশেষত– কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রের 'বিষয়' হিসেবেও 'আদিবাসী', 'নৃগোষ্ঠী', 'উপজাতি', 'ট্রাইবাল','পাহাড়ি' জনগোষ্ঠী 'বিষয়' হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। অসংখ্য শিল্প ও সাহিত্যকর্ম এই সকল প্রান্তিক জাতিসত্তার মানুষদের স্বপ্ন, জীবন, প্রকৃতি, ধর্ম, অধিকার আর সংগ্রামের গল্প, গাথাকে চিত্রিত করেছে বহু ও বিচিত্র্য সব কাব্যিকতায়। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন*, মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার*, *হাজার চুরাশির মা*, *চৌট্টিমুণ্ডা ও তার তীর*, আল মাহমুদের *উত্তর পাহাড়ের ঝরনা*, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ*, আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, শওকত আলীর *কপিল দাস মুর্মুর শেষ কাজ*, মহীবুল আজীজের *মঙচিঙের অলৌকিক অভিজ্ঞতা*, রাশেদা মাহমুদের *আমি বনাম শোয়ে প্রু বনাম আমরা*, নাজনীন পারভীনের *গিদিতা রেমা*, রাজীব নূরের *মনে কর, কল্পনা চাকমা মরেনি*, সুভাষ দত্তের *বসুন্ধরা*, তানভীর মোকাম্মেলের *কর্ণফুলীর কান্না* প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। এমনকি বিভিন্ন জাতিসত্তা-পরিবারে অসংখ্য সদস্যের রচিত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থের পাতায় পাতায় বর্ণিত হয়েছে এঁদের জীবন-সংগ্রাম আর অধিকারের কথা।

কিন্তু এক্ষেত্রে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় (নাটক রচনায়, তত্ত্বে, নির্মাণে বা প্রয়োগে) জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গ বা বিষয়সমূহ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এমনটা দাবি করা যায় না। তথাপিও শহরকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপ থিয়েটার পরিমণ্ডলে নাট্য-রচনা, নির্মাণ-বিনির্মাণ বা প্রদর্শনে জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির যেসব উপাদান, অনুষঙ্গ, বিষয় বা গল্প-গাথাকে যুক্ত করে বহু ও বিচিত্র মানুষদের জীবন, সংগ্রাম ও তাদের শিল্পভাবনা তুলে ধরা হয়েছে, সেই সকল উদ্যোগের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের *নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের* প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে স্বীকার্য। ড. সেলিম আল দীনের গবেষণাগার নাট্য– *একটি মারমা রূপকথা* এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রায়োগিক প্রয়াস। সেলিম আল দীন 'গবেষণাগার নাট্য' চর্চার মাধ্যমে মারমা রূপকথা *মনরি মাংৎসুমুই* পালাটিকে *একটি মারমা রূপকথা* নামে 'আধুনিককালের শিল্পমনস্কতায়' কৃত্যনাট্যের আবরণে উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে নির্দেশকের শিল্পভাবনা, প্রয়োগরীতি এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি আলোচনাও তুলে ধরেন–

> 'একটি মারমা রূপকথা'য় মারমা গোষ্ঠীতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ইঙ্গিত আছে এবং যে উৎসবে–পার্বণে মূল পালাটি পরিবেশিত হয় তা থেকেও নিশ্চিত হওয়া যায় মূলত এটা কৃত্যভিত্তিক নাটক। সেই কৃত্যকে আধুনিককালের দৃষ্টিতে রচয়িতার সৃজনশীল প্রয়াসে পুনর্সৃষ্টি করা সমীচীন বলে মনে করেছি। সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছে এই কৃত্যনাটকের আদলকে বাংলা মঞ্চে আনার কাজটা একটা নতুন পথের সন্ধান বলেও বিবেচিত হতে পারে।[২২]

তিনি 'একটি মারমা রূপকথা' আখ্যানটিতে সচেতনভাবে 'আধুনিক থিয়েটারের কৌশল' এবং গল্পের পরিণামে এক 'নবতর ব্যাখ্যা'র সমন্বয় ঘটিয়ে জাতিতাত্ত্বিক বিষয় অবলম্বনে নাট্য-নির্মাণ করেন এবং এই নির্মাণ প্রক্রিয়াকে তিনি 'নব্য জাতিগত থিয়েটার' অর্থাৎ 'নিও এথনিক থিয়েটার'[২৩] নামে অভিহিত করেন। সেলিম আল দীন বিশ্বাস করেন নৃ-গোষ্ঠী পুরাণে বিবৃত বিচিত্র অতিলৌকিকতার আড়ালে জীবন ও জগতের এক শাশ্বত রূপের পরিচয় বিদ্যমান। এদের বিচ্ছিন্ন অথচ সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, বহুবর্ণিল কৃত্য ও ভৌগোলিক নিসর্গ বাঙলা নাট্যে নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম। ফলে 'একটি মারমা রূপকথা' নির্মাণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যত 'ওদের'কে (ক্ষুদ্র জাতিসত্তা) 'আমাদের' (বৃহত্তর বাঙালি) শিল্পায়তনে গ্রহণ করে নেওয়ার একটি সচেতন নাট্য-প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ মারমা নৃগোষ্ঠীর কৃত্যমূলক একটি পালাকে (মনরি মাংৎসুমুই) সমকালীন নাট্যভাবনা, শিল্পরুচি ও জ্ঞান দ্বারা নির্মাণ, বিনির্মাণ অতঃপর বাঙলা-দর্শক সমাজে প্রদর্শনের

২২ সেলিম আল দীন, *গবেষণাগার নাট্য : একটি মারমা রূপকথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১
২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

মাধ্যমে কার্যত শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় একটি জাতিতাত্ত্বিক 'পালা'র গ্রহণ ও আত্তীকরণের প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক থেকে– এই প্রথমবারের ন্যায় স্বাধীনতা পরবর্তী কোনো নাট্যকার জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির একমুখী মোড়লপনার বিপরীতে 'অপর' বা বহু-জাতিভিত্তিক সংস্কৃতিকে সম গুরুত্বে গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর এই নাট্য প্রয়াস কার্যত শহরায়তনিক ও বিদ্যায়তনিক প্রেক্ষিতে জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার গুরুত্ব, সম্ভাবনা এবং অপরিহার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

> জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের পাঠক্রমে 'লঘু নৃগোষ্ঠীর নাট্য' অন্তর্ভুক্ত করা এবং গবেষণাগার নাট্যরূপে একটি মারমা রূপকথা এবং পরবর্তী পর্যায়ে বনপাংশুল রচনার মাধ্যমে এ দেশের বিদ্যায়তনিক পরিসরে ও নাগরিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এথনিক থিয়েটারের চর্চার ক্ষেত্রে সেলিম আল দীন পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক চর্চার একজন যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব হয়েও সেলিম আবার একরৈখিক জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক চর্চার অধিপতিশীলতার ধারণার বিপরীতে নিজেকে বাংলাদেশের বহুজাতিসত্তাগত সংস্কৃতির একজন নিবিড় পর্যবেক্ষকে পরিণত করেছিলেন। পাশাপাশি, প্রান্তিকায়িত পৌরাণিকতালগ্ন কৌম জীবনধারা-সংবলিত বিভিন্ন জাতিসত্তার শিল্প-নির্যাসকে একাডেমির বিদ্যাচর্চায় আত্মস্থ করেছেন ও ঢাকার অধিপতিশীল সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গেও সবলে সমীকৃত করেছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও ইতিহাস সেলিম আল দীনের এ সংবেদনশীলতা অক্ষয় হয়ে থাকবে।[২৪]

ড. আফসার আহমদ তাঁর *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য* গ্রন্থে একাধিক নৃগোষ্ঠী (মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, গারো, মণিপুরী) নাট্য বিষয়ে বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি অংশগ্রহণমূলক প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কৃত গবেষণায় নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং পরিবেশনা সম্পর্কে এইরূপ ধারণা পোষণ করেণ যে–

> বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন অঞ্চলের এসব নৃগোষ্ঠী ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং অ্যানিমিস্ট (সর্বপ্রাণবাদী)। তবু জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক এবং অভিন্ন। প্রকৃতিবাদী জীবন বিশ্বাসের সঙ্গে আচরিত ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্মিলন ঘটেছে তাদের মৌখিক ধারার সাহিত্যে। তাই নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রাচীন ইতিহাস, লোককাহিনী, কিচ্ছা, কিংবদন্তি, পূজাপার্বণ, কৃষিভিত্তিক ও ধর্মীয় কৃত্যমূলক উৎসবাদি উপলক্ষে আয়োজিত নানা রকম আচার অনুষ্ঠানে এই অভিন্নতাই প্রাকাশিত।[২৫]

---

২৪ শাহমান মৈশান, *সেলিম আল দীন*, বণিক বার্তা, বিশেষ সংখ্যা/কালপুরুষ পর্ব ৪, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬
২৫ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬

আফসার আহমেদ তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের প্রধান নৃগোষ্ঠীসমূহের নাট্যকৃতির বিবিধ প্রবণতা ও কৃত্যমূলক নাট্য সৃষ্টির পশ্চাতে স্থানীয় জনমানসের দৈনন্দিন সামাজিক জীবন, লোকসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষিনির্ভর কৃত্যানুষ্ঠানের যে সকল প্রভাব সুস্পষ্ট সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাই একটি নৃগোষ্ঠীর জাতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে সম্যক ধারণা লাভ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত কৃত্যমূলক পরিবেশনাসমূহকেই মূল বা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন– মানব সংস্কৃতির মৌল সূত্রাদি অন্বেষণ করাই যার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। নৃগোষ্ঠী জনগণের বিশ্বাসে, ঐতিহ্যে, চর্চায় বহমান এই সকল কৃত্যমূলক পরিবেশনার নাট্য-উপাদান, অনুষঙ্গ, রীতি-পদ্ধতি-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণসূত্রে অতঃপর জাতিগত থিয়েটার বা নৃগোষ্ঠী নাট্যের (Ethnic Theatre) ধারণা স্পষ্ট করেন– '[তাই] কোন আখ্যানপালা বা নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সামাজিক কিংবা ধর্মীয় কৃত্য সংযুক্ত হয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা নৃগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও মানস ভাবনার আলোকে একান্তভাবে যখন আসরে উদ্ভাসিত হয় তখন তা নৃগোষ্ঠী নাট্য বা জাতিগত থিয়েটার (Ethnic Theatre) নামে অভিহিত।'[২৬] জাতিগত থিয়েটারের ধারণাকে স্পষ্ট করার মধ্য দিয়ে বস্তুত তিনি মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, গারো, মণিপুরী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর নাট্যমূলক উপাদান, অনুষঙ্গ তথা নাট্যনমুনাকে মধ্যযুগের বাঙলা আখ্যান কাব্য, লোকনাট্য, যাত্রার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সমান্তরাল গুরুত্ব ও সম্ভাবনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

ড. লুৎফর রহমানের *নৃগোষ্ঠী-নাট্য : গারো* গ্রন্থে বাংলাদেশে বসবাসরত গারো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, সংকট এবং অস্তিত্বের লড়াইয়ের সূত্রে নৃত্য, গীত ও আখ্যানের অন্তর্গত গূঢ় অভিব্যক্তি এবং নাট্য-বীজের সক্রিয়তা সন্ধানের মাধ্যমে 'কৃত্যের অন্তর্গত সৌন্দর্য ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা'[২৭] তুলে ধরেন। তিনি গ্রন্থের সূচনা আলাপনে গারো জনগোষ্ঠীর নাট্যচর্চাকে 'জাতিগত থিয়েটার' বা 'নৃগোষ্ঠী নাট্য বা Ethnic Theatre হিসেবে উল্লেখ করেন, অতঃপর জাতিগত থিয়েটারের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, উৎসব-অনুষ্ঠানসমূহ বিশ্লেষণ করেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এই সকল কৃত্যমূলক পরিবেশনার অন্তঃস্রোত হিসেবে সক্রিয় রয়েছে 'নাট্য' এবং 'নাট্যমূলক' উপাদান। তিনি মনে করেন– নৃত্য, গীত গারোদের উৎসব অনুষ্ঠানের কৃত্যমূলক অনুষঙ্গ হলেও এর পটভূমিতে রয়েছে উক্ত জনপদের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য, যা ঐ সকল অনুষ্ঠানে দর্শক/বিশ্বাসীদের উপস্থিতিতেই উপস্থাপিত হয়ে থাকে। 'সুতরাং, গারো নৃত্য প্রকৃত অর্থে নাটক থেকে দূরবর্তী কিছু নয়। এই সকল নৃত্যকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে কারো আপত্তি থাকতে পারে– কিন্তু তা যে নাট্যমূলক তাতে আর সন্দেহ কি! কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২৭ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

তাদের করণীয় 'Imitation of action'[২৮]। সুতরাং গারো সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত নাট্যমূলক উপাদানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসূত্রে শহরায়তনিক প্রেক্ষাপটে একটি স্বতন্ত্র ও স্বকীয় শিল্পরীতি হিসেবে এর তাৎপর্য তুলে ধরাই এই গবেষণার লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

এছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের *থিয়েটার স্টাডিজ* পত্রিকা এবং মণিপুরী থিয়েটারের *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়েছে জাতিসত্তার পরিবেশনামূলক শিল্পকলার বিশ্লেষণ ও গবেষণাধর্মী বেশ কিছু সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। গবেষণামূলক এই সকল কাজ ছাড়াও *নাটক ও নাট্যতত্ত্ব* বিভাগের শিক্ষাকার্যক্রমের অংশ হিসেবে নৃগোষ্ঠী আখ্যান এবং কিংবদন্তি অবলম্বনে বেশকিছু নাট্য প্রযোজনা– *মিমাংচিনা, ম্যা চ্য ক্যান, আলংনাবাহ* প্রভৃতি নির্মাণ ও প্রদর্শন করা হয়।

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ *Reading Against the Orientalist Grain : Performance and Politics Entwined with a Buddhist Strain* গ্রন্থে নেপাল, তিব্বত, সিকিম, ভুটান এবং বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নৃগোষ্ঠীর 'পরিবেশনা' (performance) বিশ্লেষণ করেন এবং প্রাচ্যের 'পরিবেশনা' ও 'রাজনীতি'র (politics) পারস্পরিক বুনন ও সম্পর্ক অনুসন্ধান করেন–

> I examine the production and exchange of meaning for the explicit political purpose of seeking to expose, and thereby subvert transactions of power, and the maintenance of power regimes, both in Orientalism's 'natural' tendency for dealing with the 'Orient' and the hegemony of culture mobilized in 'benign' and 'exotic' 'Oriental' performances.[২৯]

অধ্যাপক ইসরাফিল শাহিন ও তাঁর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক এথনোগ্রাফিক অভিজ্ঞতার আলোকে শেষ কৃত্যানুষ্ঠান বা *সাং গ্রো পোয়ে* কৃত্যের পুনঃসৃজন/নির্মাণ ও প্রদর্শন করা হয় নাগরিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দর্শক পরিবেষ্টনে। এছাড়া থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী নির্দেশনায় মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প অবলম্বনে *বিছন* নাটকে সাঁওতালদের জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী পরিবেশন করা হয়। উভয় কর্মই নাগরিক দর্শক সমাজে এথনোগ্রাফিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নাই।

সাইমন জাকারিয়া *প্রণমহী বঙ্গমাতা* গ্রন্থে কৃত্যনাট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতাল এবং মণিপুরীদের পরিবেশনা শিল্পকলা যথাক্রমে *কারাম উৎসব* এবং *রাস* উৎসবের বর্ণনা করেন। অপরদিকে গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় নৃগোষ্ঠীর

---

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২৯ Syed Jamil Ahmed, *Reading Against the Orientalist Grain : Performance and Politics Entwined with a Buddhist Strain,* Anderson Printing House Pvt. Ltd. Kolkata, 2008, P. 6

বিষয়, উপাদান ও অনুষঙ্গ ব্যবহারযোগে নাট্য-নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অগ্রগামী নাট্যদল *ঢাকা থিয়েটার*। টাঙ্গাইলের মধুপুর গড় অঞ্চলে বাঙালিদের অহেতুক কর্তৃত্বপরায়ণতা এবং বন ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের পটভূমিতে সেলিম আল দীন রচিত এবং নাসির উদ্দীন নির্দেশিত *বনপাংশুল* নাটকটি শহরায়তনিক দর্শক সম্মুখে গারোদের দুঃখ, দুর্দশার চিত্রকে সমকালীন নাট্যভাবনায় প্রদর্শন করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার নাট্য– *একটি মারমা রূপকথা*'কে পরে *ঢাকা থিয়েটার* প্রযোজনায় পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে শহরায়তনিক দর্শকদের মাঝে 'নিও এথনিক থিয়েটার' ধারণাটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও দলটির বেশকিছু প্রযোজনায় নৃগোষ্ঠী সমস্যা নাট্য-প্লটের প্রধানবস্তু না হলেও ঘটনা বা প্রসঙ্গ আকারে বিভিন্ন দৃশ্যে স্থান লাভ করেছে। যেমন *যৈবতী কন্যার মন* নাটকে রাখাইন প্রসঙ্গ, *কেরামত মঙ্গল* নাটকে হাজং ও গারো প্রসঙ্গ, *চাকা* নাটকে সাঁওতাল প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়। অপরদিকে শহরায়তনিক নাট্যচর্চার নেতৃত্বস্থানীয় নাট্যদল *আরণ্যক* প্রযোজিত এবং মামুনুর রশীদ নির্দেশিত *রাঢ়াঙ* নাটকে বাংলাদেশের সাঁওতালদের ভূমি অধিকার, আত্মমর্যাদা সুরক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী একজন সাঁওতালের নিদারুণ সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়। বরিশালের শব্দাবলী থিয়েটার প্রযোজিত এবং সৈয়দ দুলাল নির্দেশিত নাটক *নীল ময়ূরের যৌবন* নাটকে পাহাড়ি জনপদের নিদারুণ বঞ্চনা আর অধিকারহীনতার গল্প ফুটে ওঠে। আমিনুর রহমান মুকুল নির্দেশিত *পালাকার* নাট্যদলের প্রযোজনায় *মানগুলা* নাটকে হাজংদের জীবন-সংগ্রাম এবং অধিকারের প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। মণিপুরী সম্প্রদায়ের একজন প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকর্মী, নির্দেশক এবং নাট্যকার শুভাশিস সিনহা তাঁরই জনপদে প্রতিষ্ঠা করেন 'মণিপরী থিয়েটার'। এই থিয়েটারে তিনি অন্যান্য নাটকের পাশাপাশি নিজ সংস্কৃতির প্রচলিত আখ্যান, উপাদান, অনুষঙ্গ অবলম্বনে নাট্য চর্চা করে থাকেন।

সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক নাট্যায়তনে জাতিসত্তা বিষয়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা এবং নির্মাণ-বিনির্মাণের খতিয়ান। গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক এই সকল কর্মের মধ্য দিয়ে সেলিম আল দীন নৃগোষ্ঠীর আখ্যান/পালা কি প্রক্রিয়ায় *গবেষণাগার নাট্যে* নিরীক্ষার বিষয় হতে পারে তার পথ অনুসন্ধান করেছেন এবং একই সাথে বহু জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিরাজমান নাট্যমূলক উপাদান, অনুষঙ্গে গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। আফসার আহমেদ তাঁর গবেষণায় কৃত্যমূলক নাট্যের মূলে দৈনন্দিন জীবনের আচার, বোধ ও বিশ্বাসের ক্রিয়াশীলতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। লুৎফর রহমান গারো নৃত্য, গীত, ক্রীড়া এবং উৎসবের মধ্যে নাট্যের বীজ ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে এগুলোকে নাট্যমূলক পরিবেশনা হিসেবে অভিহিত করার চেষ্টা করেছেন। মামুনুর রশীদ, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, সৈয়দ দুলাল, আমিনুর রহমান মুকুল নৃগোষ্ঠী-বিষয় নিয়ে শহরায়তনিক অভিনেতাদের অংশগ্রহণে জাতিসত্তার জীবন ও সংগ্রামের গল্প পুনঃরূপায়ণের মাধ্যমে 'অপর' সংস্কৃতি প্রসঙ্গে নাগরিক অভিজ্ঞতা বা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্তি ও আবেগের সম্মুখীন করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এই সকল উদ্যোগের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবেই স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শহরায়তনিক

নাট্যচর্চার সামগ্রিক প্রতিবেশে জাতিসত্তার জীবনচর্যা, দর্শন, অধিকার ও সংগ্রামের বিষয়গুলোর সাথে স্বল্প পরিসরে হলেও ক্রম-পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে। ফলে সম্পাদিত সকল গবেষণাকর্ম এবং কতিপয় সফল নাট্য প্রযোজনা জাতিতাত্ত্বিক নাট্যের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার প্রয়োজনীয়তাকেই যে শুধু উপলব্ধি করায় তা নয় বরং বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় বহু-সংস্কৃতির উপাদান, অনুষঙ্গের গ্রহণ ও আত্তীকরণের ক্ষেত্রে জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা বিষয়ে অধিকতর গবেষণার গুরুত্ব ও চাহিদাকেও সময়ের দাবি করে তোলে।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সম্পাদিত এই সকল উদ্যোগ শহরায়তনিক নাট্যচিন্তা ও জ্ঞানকাণ্ডে (ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক- উত্তর) গভীর অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সম্ভাবনার প্রশ্নে দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে এমনটা দাবি যায় না। কেননা গবেষণাগার নাট্যে অথবা গ্রুপ থিয়েটার চার্চায় নির্মিত নাট্যসমূহ বর্তমানে গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ কেবলই স্মৃতিমাত্র। অপরদিকে গ্রন্থ রচনা অথবা গবেষণার অনুসন্ধিৎসু ফলাফলসমূহ নৃগোষ্ঠীনাট্য বা কৃত্যনাট্য বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হলেও জাতিসত্তার ঐতিহ্যিক বা পরম্পরাগত পারফরম্যান্স জ্ঞানের আশ্রয়ে অভিনেতার মনো-দৈহিক অভিজ্ঞতাকে নিত্য-চর্চায় বা অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করা যায় অথবা এই জ্ঞান অভিনেতার দৈহিক, মনো-দৈহিক প্রস্তুতির বা অনুশীলনের সূত্র বা উৎস গ্রহণ করা যায়– এরূপ চিন্তাযুক্ত কোনো গবেষণা অদ্যাবধি সম্পাদিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

***

গুরুত্ব

> Training must begin not with the actor but with the preparation of his place of habitation. First you prepare the water and then you release the fish into it, not other way around. And the water must be living; the fish will die in stagnant water.[৩০]

বলা হয়ে থাকে অভিনেতার জীবন দুটি– একটি 'দৈহিক জীবন' physical life, অপরটি 'আন্তর জীবন' inner life। তবে এটা যেন ঠিক পানিতে থাকা মাছের অস্তিত্বের মতো, একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন। অর্থাৎ আন্তরবিহীন দেহের উপস্থিতি অথবা দেহ-ভাষার যথাযথ প্রকাশবিহীন আন্তরের ক্রিয়াশীলতা দুটোই অসম্পূর্ণ এবং অর্থহীন। তাই অভিনয় বিষয়ক সকল প্রকার তত্ত্বের (Acting theory) উদ্ভাবন ও পরিচালন প্রক্রিয়া কেন্দ্রস্থিত হয় কেবলই 'দেহ' এবং 'আন্তরের' অবিচ্ছেদ্য যুগলমিলনে বিনির্মিত একজন প্রাণবন্ত অভিনেতাকে

৩০ Jurij Alschitz, *Training forever,* part 1, European Association for Theatre Culture, Berlin, 2013, p. 20

ঘিরে। মাইকেল চেখভের ব্যাখ্যায় তাই ব্যাক্তির (অভিনেতার) 'শরীর' (human body) চিহ্নিত হয় দেহ ও মনের অবিচ্ছিন্ন তথা 'মনো-দৈহিক' (psycho-physical) সত্তা রূপে–

> The human body and mind are inseparable. No work of the actor is completely psychological nor exclusively physical. The physical body of the actor (and character) must always be allowed to influence the psychology and vice versa. For this reason, all of the actor's exercises must be psycho-physical and not executed in a mechanical fashion.[৩১]

অভিনেতার দেহ এবং মনো-দেহের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখেই বস্তুত প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাদারি এবং শৌখিন সকল পর্যায়ের মঞ্চাভিনয়ে অভিনেতার দেহ, মন এবং মনো-দেহের অনুশীলন ও সক্ষমতার উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নানাবিধ প্রতিষ্ঠিত 'পদ্ধতি' (method)। কার্যত দেহ ও মনের বহুস্তরায়িত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে অভিনেতাকে সম্ভাবনা ও সক্ষমতার সীমাহীন দিগন্তে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে এই সকল 'পদ্ধতির' উদ্দেশ্য। কেননা Acting is a demonstration of self with or without disguise.[৩২] সঙ্গত কারণে self বা সত্তার (দেহ ও মন) প্রস্তুতির বিষয়টিই অনুশীলনের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু অভিনেতার মনো-দৈহিক সত্তা হচ্ছে সমাজ-সংস্কৃতি প্রদত্ত কতকগুলো 'নমুনা' বা 'চিহ্নের' সমষ্টিগত ফলাফল, যা ব্যক্তির প্রকাশ ভঙ্গি ও প্রদর্শন ক্ষমতাকে প্রথাগতভাবে নির্দিষ্ট প্যাটার্নে আবদ্ধ করে এবং তা সমষ্টির সাথে যোগাযোগ ও বোঝাপড়ার মাধ্যম বা বাহন হিসেবে কাজ করে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে একজন 'সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত চেতনা ঐ সমাজের সমষ্টিগত চেতনার প্রতিফলন মাত্র।'[৩৩] স্বভাবতই ব্যক্তির আচার, আচরণ, আবেগ, অনুভূতি, উপলব্ধি তথা মনো-দেহের সামগ্রিক ভঙ্গি বা প্যাটার্নের প্রাথমিক ও মৌলিক ভিত্তি এবং উৎস হয়ে ওঠে তার সমাজ এবং সংস্কৃতি। কেননা–

> 'It [culture] denotes a historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life.'[৩৪]

---

৩১ Michael Chekhov, *On the technique of acting*, A Harper Resource Book, New York, 1985, P. xli
৩২ Joseph Chaikin, *The Presence of The Actor*, Theatre Communications Group, New York, 1972, P. 2
৩৩ শিপ্রা সরকার, *ম্যালিনোস্কির মাঠ-গবেষণা : সামাজিক তত্ত্ব ও অন্যান্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১০৩
৩৪ Clifford Geertz, *the interpretation of cultures*, Fontana Press, London, 1993, P. 89

আর এ কারণে সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে ব্যক্তির মুখের বুলি বা 'ভাষা'র চেয়ে দেহের বুলি (expression of the body) গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো সামাজিক সঙ্কেতচিহ্নক– social signs– signs of identity & behavioural sings[৩৫] রূপে আন্তঃ যোগাযোগের 'ভাষা' (পরিচয়চিহ্ন, পোশাক, অলঙ্করণ, মেকাপ, কেশ-বিন্যাস, উলকি, কণ্ঠধ্বনি, সম্ভাষণ, বিনয়-বিনম্রতা, কদুক্তি, বেইজ্জতি, দেহের ভঙ্গি-গতি-শৈলী, মূক বা অবাচনিক যোগাযোগ ইত্যাদি) রূপে প্রকাশ পায়। বস্তুত সংস্কৃতি প্রদত্ত/নির্ধারিত অর্থপূর্ণ 'চিহ্ন' বা 'শারীরী-ভাষা' (nonverbal) সমূহই সমাজে প্রচলিত নানা বিষয়ভিত্তিক শিল্পরূপ ও রীতি দর্শন বা প্রদর্শনে দর্শক/ভক্তের বোঝাপড়া বা যোগাযোগকে সহজ এবং আপন করে তোলে। অর্থাৎ সঙ্কেতচিহ্নযুক্ত কুশীলবের মনো-দৈহিক সত্তা সম্পূর্ণ উপস্থিতি নিজেই একটি 'বিষয়' বা the human body as a means of communication[৩৬] হয়ে বোঝাপড়ার বাহন বা মাধ্যম হয়ে ওঠে।

> [But] the spectator in theatre is faced with the task of reading the body/face in a constant state of flux and action. […] In performance establishing the 'I am here in this space' is achieved both by verbal and gestural *deixis*. In speaking the dialogue, the actor is also using the body to point to her/his relation to the on-stage dramatic world, her/his action within it.[৩৭]

সুতরাং অভিনেতার দৈহিক এবং মনো-দৈহিক প্রস্তুতি বা অনুশীলনের ক্ষেত্রে দেহের ও মনো-দেহের ভাষা, ভঙ্গি, সুর, ছন্দ, আবেগ-অনুভূতি, ইন্দ্রিয়, শৌর্য, ধ্যান-দশা প্রভৃতি জানা-বোঝা এবং চর্চায় অন্তর্গত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর এক্ষেত্রে অভিনেতার সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে স্মৃতি বা অভিজ্ঞতায় থাকা সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রচলিত 'চিহ্ন'-স্বরূপ 'দেহ-ভাষা', 'ভঙ্গি', 'সুর-ছন্দ', 'ইন্দ্রিয়-ভাব-আবেগগত প্রকাশ', দম ও ধ্যানসমূহই হতে পারে প্রয়োগ, প্রস্তুতি বা চর্চার অত্যন্ত কার্যকর উপায়। কেননা এগুলো প্রথাগত, আরোপিত বা নির্দেশিত নয়, তাই স্মৃতিতে, অভিজ্ঞতায়, চেনা, জানা বা দেখার অভিজ্ঞতায় লুকিয়ে থাকা শারীরী ভাষা-সঙ্কেতের সাথে অভিনেতা/কুশীলবগণ অতি সহজাতভাবেই হতে পারেন স্বতঃস্ফূর্ত এবং সৃজনশীল সম্ভাবনাময়। তাই এটি হতে পারে একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়াতে 'আমাদের জাতীয় জীবনের উৎসবের ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই তো আমরা অভিনয়ের [অনুশীলন/প্রস্তুতির] এই মডেলটি খুঁজি। কারণ এটি আমাদের। এবং প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির বিষয়।'[৩৮] কেননা স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে থাকা সাংস্কৃতিক 'চিহ্ন'সমূহ (নিজের অথবা অপরের) ব্যক্তির একান্ত ফ্যামিলিয়ার

৩৫ Elaine Aston and George Savona, *Theatre As Sign-System: A Semiotics of Text and Performance,* Routhledge London, 1991, P. 153

৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৩৮ ইস্রাফিল শাহীন, *অভিনয় তত্ত্ব*, অপ্রকাশিত গ্রন্থ, পৃ. ৩

এক্সপেরিয়েন্সে লুকিয়ে থাকে, তাই এগুলোর প্রকাশ, প্রদর্শন, উপস্থাপন অথবা চর্চা বা অনুশীলনের উপাদান হিসেবে গ্রহণ, আত্তীকরণের মাধ্যমে অভিনেতা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজাত হয়ে উঠতে পারেন কেবল তাই নয়, বরং অভিনেতার সামগ্রিক-ভঙ্গি বা শৈলীটি হয়ে ওঠে সংস্কৃতি সাপেক্ষ একটি ব্যাপার।

সুতরাং অভিনেতার প্রস্তুতি বা অনুশীলনের (training) লক্ষ্যই যদি হয় এমন যে, একটি চাপমুক্ত সৃজনশীল প্রতিবেশে 'আন্তর জীবনের' (inner life) বহুমুখী স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে 'দৈহিক জীবনের' (physical life) প্রকাশ সক্ষমতাকে সাবলীল করে তোলা, অথবা অনুশীলনের উদ্দেশ্য যদি হয় পবিত্র ও পরমানন্দীয় 'অপর' বা 'অন্য' কোনো কাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার বা second reality[৩৯]-র মনো-দৈহিক ভঙ্গিগত অভিজ্ঞতা উপভোগ করা, তবে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উৎস থেকে আহরিত নানাবিধ 'সঙ্কেতচিহ্নক' উপাদান বা অনুষঙ্গের সহায়তায় সৃষ্টি করা যেতে পারে সেই নিরাপদ প্রতিবেশ (prepare the water) যেখানে অভিনেতা (release the fish) তাঁর সৃষ্টিশীল দেহ ও মনের পরমানন্দীয় অভিজ্ঞতায় প্রাণবন্ত ও সজীব হতে পারেন। তাছাড়া সংস্কৃতি নির্ধারিত/প্রদত্ত 'চিহ্ন', 'নমুনা' এবং 'সংকেত'-এ বিরাজমান বিশেষায়িত শরীর-ভঙ্গি, সুর, ছন্দ, ভাব, রস, ধ্যান, ইন্দ্রিয়, ক্রীড়া থেকে নির্বাচিত মৌলিক কিছু উপাদান, পদ্ধতি, প্রক্রিয়ার সাথে শহরকেন্দ্রিক অভিনেতার বোঝাপড়া পরিণামে শহরায়তনিক নাট্যচর্চার সাথে প্রান্তিক সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও পারস্পরিক সমঝোতার সম্ভাবনা মজবুত করতে পারে। সুতরাং এই গবেষণায় অভিনেতা দৈহিক ও মনো-দৈহিক প্রস্তুতি বা অনুশীলনের কৌশল, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া হিসেবে এমন কিছু সাংস্কৃতিক 'চিহ্ন'– উপাদান, অনুষঙ্গের মোকাবিলা করার কথা বলা হচ্ছে যা ঐতিহ্যিক ও পরম্পরাগত 'বহু' এবং 'অপর' জাতিসংস্কৃতি থেকে আহরিত। অপরদিকে এই গবেষণা 'বৃহত্তর' ও 'শক্তিশালী' এবং 'ক্ষুদ্র' ও 'দুর্বল'– বিভাজিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনাস্থাপূর্ণ সংঘাত-সংস্কৃতির বিপরীতে (অন্তত সীমিত পরিসরে হলেও) শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় বহুজাতিক সমঝোতা, গ্রহণ-আত্তীকরণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিতে পারে।

***

কৃত্য (Ritual), নাট্য (Theatre), এবং পরিবেশনা (Performance)

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে 'পরিবেশনা' শব্দটিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃত্য, নাট্য, গীত, নৃত্য, খেলা, দম, ধ্যান প্রভৃতি ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গকে একদিকে যেমন 'পরিবেশনা' শব্দটি দিয়ে উক্ত বা উল্লেখ করা হয়– কৃত্য-পরিবেশনা, নাট্য-পরিবেশনা, নৃত্য-পরিবেশনা, গীত-পরিবেশনা, খেলা, দম ও ধ্যান পরিবেশনা প্রভৃতি। অপরদিকে কোনো জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, কৃত্য, কর্ম থেকে শুরু করে 'বিনোদনমূলক

---

৩৯ Richerd Schechner, *Performance Studies: An Introduction,* Routhledge, London, 2002, P. 45

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শন' সবকিছুকেই 'পরিবেশনা'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু 'পরিবেশনা' (Performance) পরিভাষাটির পরিধি আরও বিস্তৃত, অবাধ এবং সর্বাত্মক। এটি কেবল নির্দিষ্ট কিছু কৃত্য, নাট্য বা নৃত্যের প্রদর্শনকে নয়, অথবা কতিপয় সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীকেও নয়, বরং এই শব্দটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানবকুলের তাবৎ কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে।

> Performance must be construed as a "broad spectrum" or "continuum" of human actions ranging from ritual, play, sports, popular entertainments, the performing arts (theatre, dance, music), and everday life performances to the enactment of social, professional, gender, race, and class roles, and on to healing (from shamanism to surgery), the media, and the internet.[৪০]

পরিধির এই ব্যপকতা সত্ত্বেও শহরায়তনিক শিল্পকলার প্রেক্ষিতে কৃত্যনাট্য/ কৃত্য পরিবেশনা (ritual/ritual theatre), নৃত্যনাট্য/ নৃত্য পরিবেশনা (dance theatre), গীতিনাট্য/ গীতি পরিবেশনা (musical theatre) নাট্য/নাটক পরিবেশনা (Theatre-Performance) প্রভৃতি শিল্পরূপ ও আঙ্গিকের সাথে 'পারফরম্যান্স' শব্দটি নানা অর্থ ব্যঞ্জনায় (প্রদর্শন, উপস্থাপন, অনুকরণ, অভিনয় প্রভৃতি) জড়িয়ে থাকায় 'পরিবেশনা' শব্দটির ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা প্রশ্রয় পেয়েছে। এমতাবস্থায় কৃত্য (Ritual), নাট্য (Theatre), এবং পরিবেশনা (Performance) পরিভাষাসমূহের প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও একটি সুস্পষ্ট অবস্থান থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি।

বাংলা একাডেমির অভিধান অনুসারে কৃত্য (Ritual) শব্দের অর্থ হলো, যাবতীয় আচারানুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার ও প্রথাগত অনুষ্ঠান। অর্থাৎ কৃত্য বলতে কেবল ধর্ম-সংশ্লিষ্ট কতিপয় আনুষ্ঠানিকতাকেই নির্দেশ করে না বরং ধর্ম অথবা ধর্ম-নিরপেক্ষ সেই সকল প্যাটার্ন বা নমুনা বা চিহ্নভিত্তিক ক্রিয়া, কর্ম, আচার-আচরণকে নির্দেশ করে যা সম্পূর্ণতই প্রাত্যহিক (daily) ও সাধারণ (ordinary) জীবনের প্রকাশ থেকে আলাদা এবং বিশেষায়িত। কৃত্যের সাথে নাট্যের যোগ বহু প্রাচীন, এমনও বলা হয়ে থাকে যে, নাট্যের উদ্ভব কৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা থেকেই। 'আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব, ধর্ম, চণ্ডী, মনসা, গাজী, মানিকপীরের কৃত্যের অবলম্বন যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা আসর ও দর্শক অবলম্বন করেই বিস্তারিত হয়। কৃত্যকে বাদ দিয়ে বাঙলা নাটকের রূপ-রীতি অন্বেষণ নিরর্থক বলেই প্রতীয়মান হবে।'[৪১] আবার প্রক্রিয়া এবং কার্যকারিতার দিক থেকে 'কৃত্য' এবং 'নাট্যে'র মধ্যে রয়েছে গভীর সাদৃশ্য। কেননা উভয়ে মানুষের মনো-দৈহিক সত্তায় বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট কিছু রূপান্তর বা স্থানান্তরমূলক পরিবর্তন ঘটায়। যদিও

---

৪০ Richerd Schechner, *Performance Studies: An Introduction,* Routhledge, London, 2002, P. 2

৪১ সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, (সম্পা:) সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.৩২৬

রূপান্তর বা স্থানান্তরের ব্যাপ্তি এবং স্থায়িত্বের বিষয়টি অনুষ্ঠান বা ইভেন্ট নির্ধারিত 'সময়'-এর সাথে সম্পর্কিত তথাপিও কৃত্য এবং নাট্য উভয়ে মানুষকে (পূজারি, ভক্ত/অভিনেতা, দর্শক) দৈনন্দিন বা জাগতিক চেতন স্তরকে অতিক্রম করে বিশেষ, পরমানন্দীয় অথবা দশাগত (ট্রান্স) স্তরে উন্নীত করে, পুনরায় দৈনন্দিন ও জাগতিক চেতন স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বিষয়টিকে শেখনারের উচ্চারিত 'পরিবেশনা' (Performance) এর আলোকে এভাবেও বিশ্লেষণ করা যায়–

> I call performances [ritual & theatre] where performers [believer/worshipper & actor/spectator] are changed 'transformations' and those where performers are returned to their starting places 'transportations'. 'Transportation' because during the performance the performers are 'taken somewhere' [second reality] but at the end, often assisted by others, they are 'cooled down' and re-enter ordinary life just about where they went in.[৪২]

ফলে প্রদর্শন, উপস্থাপন, অনুকরণ, অভিনয় প্রভৃতি কার্যের ক্ষেত্রে এমন একটি সূত্র ক্রিয়াশীল যা কেবল কৃত্য অথবা নাট্যের ক্ষেত্রে নয় বরং ব্রহ্মাণ্ডে মানবকুলের তাবৎ কর্মকাণ্ড এবং আচরণকেই 'পরিবেশনা' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কী সেই সূত্র, অথবা 'পরিবেশনা'র আয়তন বা স্থানটিইবা কোথায়? এক্ষেত্রেও শেখনারের উক্তিতে বলা যায়– A performance takes place only in action, interaction and relation.[৪৩] অর্থাৎ অন্য সকল শর্ত অথবা প্রতিবেশকে গৌণ করে কেবল পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং সম্পর্ক এই তিনের ঘটমান-বর্তমানেই সম্পাদিত হয় 'পরিবেশনা', যা একাধারে নাট্য সৃজনেরও মূল শক্তি।

বাঙলা অঞ্চলে পূর্বকাল থেকেই 'নাট্য' শব্দটি একাধিক রূপ ও অর্থ ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে– 'সেকালে নৃত্য গীত ও অভিনয় একযোগে হইত। এবং ইহার নাম ছিল "নাট" বা "নাটগীত"।[৪৪] বলা হয়ে থাকে যে 'নট' ধাতু থেকেই 'নাট্যের' উৎপত্তি এবং পাণিনি সর্বপ্রথম এই শব্দের ব্যবহার করেন– 'পাণিনির পূর্বে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কেহ করেন নাই। বৈদিক সাহিত্যে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কোথাও নাই। পাণিনি 'নাট' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছে– "নটানাং ধর্ম্ম আম্নায়ো বা"– নটদিগের ধর্ম বা শিক্ষানীতি। পাণিনির সময়ে 'নৃত্য' ও 'নাট্যে' কোনো পার্থক্য ছিল কিনা কিছুই জানা যায় না।'[৪৫] পতঞ্জলির (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) সময়ে নটের গীত বা গান করাকে 'গাথা' অর্থে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে যা আখান বা গীতি-আখ্যান/ গীতিকা রূপে

---

৪২ Richard Schechner, *Performative Circumstances From the Avant Garde To Ramlila,* Seagull Books, Calcutta, 1983, P. 97

৪৩ Richerd Schechner, *Performance Studies: An Introduction,* Routhledge, London, 2002, P. 24

৪৪ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৫

৪৫ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), *ভরত নাট্যশাস্ত্র ১*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অধিক প্রচলিত। জানা যায়, বৈদিক কালে মহব্রত যজ্ঞে যুবা নারীগণ যজ্ঞকুণ্ডের চারধারে নৃত্য পরিবেশন করতো এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে কৌতুকের আশ্রয়ে ঝগড়া ও লড়াইয়ের অনুকরণ করে কিছু কিছু পালার অভিনয় প্রদর্শন করা হতো। 'প্রথম প্রথম নটের কাজ ছিল চিত্তরঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করা। নর্তক-নির্ণয়ে নর্তকের সংজ্ঞা তাহাই দেওয়া হইয়াছে। "অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্। নটেন দর্শিতাং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।"[৪৬] মূলত বৈদিক যুগেই শরীরে নানা অঙ্গভঙ্গি এবং গীতযুক্ত নানা কথোপকথনের আশ্রয়ে নৃত্য একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* প্রণয়নের সূত্রে 'নৃত্য' (মার্গ) ও 'নৃত্ত' (দেশী) দুটি বিভক্ত ধারায় প্রসিদ্ধ হয় এবং 'নাট্যধর্মী' (Stylisation) এবং 'লোকধর্মী' (Improvisation) দুটি বিশিষ্ট রীতিতে সংস্কৃত-নাট্যে প্রতিষ্ঠা পায়। বস্তুত নাট্যের সংজ্ঞা এবং নাট্যের প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট হয় এই সময়ে–

> There is well-established maxim related to Sanskrit theatre style, namely *avasthanukrtir natyam*, which means that *natyam* or drama is the *anukrtis* or imitation of *avastha* or the state of being. Through *avastha natyam* is essentially related to life. But the mode of relationship is totally misunderstood by many without knowing the real thing or an event; what is being imitated is the state of the thing or the event. The state again is not merely the outer semblance of the thing or an event, but the inner truth, which necessarily relates to the outer reality also but much more than that. Imitation also then becomes not merely the imitation of the outer most layer of a thing or an event, it is a process which goes deep into the inner-most layer. Then *anukrti* becomes not merely imitation but re-creation.[৪৭]

এই যুক্তিতে সংস্কৃত নাট্য ঐতিহ্যে 'নাট্য' শুধুমাত্র specific set of gestures performed by performers in any given performence অথবা visible/sonic set of events[৪৮] নয়, তারও অধিক কিছু অর্থাৎ, যা পাহাড়ের অনুকরণ বলতে কেবল বাহ্যিক দেহভঙ্গিতে পাহাড় সৃজন করা বোঝায় না, বরং কল্পনা, ভাব, রস এবং বিশ্বাসযোগে পাহাড়ের বিশালত্বকে সৃজন করা এই অর্থে পুনঃসৃজন করাটাই এক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'রূপ' (রূপক), 'দৃশ্যকাব্য', 'নাট্য' বস্তুত একই অর্থব্যঞ্জনায় কেবল 'অনুকরণ' অর্থে নয় বরং সমগ্রের সৃজন বা পুনঃসৃজন অর্থে গ্রহণ করা হয়।

---

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৪৭ K. N. Panikkar, *Sanskrit Theatre Style: Modernity,* Classical Sanskrit Theatre Symposium ; Proceedings, Centre For Asian Theatre, Dhaka, March, 2002, P. 12

৪৮ Richerd Schechner, *Performance Theory :* Routledge, Newyork and London, 1994, P. 85& 91

***

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্যকলার ইতিহাসে বৃহত্তর 'বাঙালি' সংস্কৃতিজাত 'দেশজ নাট্যকলা' এবং বৃটিশকলোনি প্রভাবজাত পাশ্চাত্য নাট্যকলা একটি সমৃদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছে– সম্পাদিত গবেষণা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রচনা এবং প্রয়োগ, প্রদর্শন ও চর্চার ব্যাপকতাদৃষ্টে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের বিশেষ কোনো অবকাশ নেই। সে তুলনায় বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য 'অপর' সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যিক বা পরম্পরাগত নাট্যকলার অবস্থান শহারায়তনিক প্রেক্ষিতে অনেকটাই অনুজ্জ্বল এবং অবহেলিত রয়ে গেছে। তবে শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় 'দেশজ নাট্যকলা' এবং কলোনিয়াল প্রভাবজাত পাশ্চাত্য নাট্যকলার তাত্ত্বিক নির্মিতি এবং প্রায়োগিক কাঠামো ও রূপরেখা ক্রমাগতভাবে সুনির্দিষ্টতা লাভ করলেও অভিনেতার দৈহিক বা মনো-দৈহিক প্রস্তুতির উপায় বা মাধ্যম হিসেবে সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক নাট্যমূলক উপাদান, অনুষঙ্গ ও পরম্পরাগত পারফরম্যান্স জ্ঞান কীভাবে নিত্যকার অনুশীলন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বা চর্চায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এই বিষয়টি বরাবরই দৃষ্টির অগচরে রয়ে গেছে। যদিও স্থানীয় পর্যায়ের কিছু লোক ক্রীড়া থিয়েটার গেমস্ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কোনো কোনো দল বা প্রতিষ্ঠানে। তাছাড়া বিশেষ কোনো পরিবেশনা রীতি/আঙ্গিককে শহরায়তনিক প্রেক্ষাপটে চর্চার অন্তর্গত করার চেষ্টাও দুর্লভ নয়। তবে ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গকে নিত্যকার চর্চায় অন্তর্গত করা এই বিষয়ে বিশেষ কোনো কার্যক্রম/পদক্ষেপ/গবেষণা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা জানা যায় না। তাই স্পষ্টত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই শহরায়তনিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতি-প্রাধান্য নাট্যকলায় 'অপর' সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত ও ঐতিহ্যিক পারফরম্যান্স জ্ঞানের প্রায়োগিক-উপযোগিতা নিরীক্ষা করার বিষয়টিকে এই অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ গবেষণায় একটি পদ্ধতিগত ক্ষেত্র-সমীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণসূত্রে জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনার অন্তর্গত নৃত্য, নাট্য, ক্রীড়া, তান্ত্রিক ধ্যান, দম প্রভৃতি বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ পরবর্তী নির্বাচিত বিশেষ ও মৌলিক কতিপয় বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার (শরীর-ভঙ্গি, শৌর্য, সুর কাঠামো, ছন্দ, ভাব, রস, ধ্যান, ইন্দ্রিয়, ক্রীড়া প্রভৃতি) সাথে শহরায়তনিক অভিনেতার প্রায়োগিক সমঝোতা বা বোঝাপড়া করিয়ে প্রান্তিক সংস্কৃতির উপাদান, অনুষঙ্গের কার্যকারিতা এবং মেলবন্ধনের সম্ভাবনা খুঁজে দেখার কথা বলা হচ্ছে। ফলে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এই গবেষণা অভিনেতা দৈহিক ও মনো-দৈহিক প্রস্তুতি বা অনুশীলনের কৌশল, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া হিসেবে এমন কতিপয় সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গকে মোকাবিলা করার কথা বলছে যা ঐতিহ্যিক ও পরম্পরাগত 'বহু' এবং 'অপর' জাতিসংস্কৃতি থেকে আহরিত। অপরদিকে এই গবেষণা 'বৃহত্তর' ও 'শক্তিশালী' এবং 'ক্ষুদ্র' ও

Dhaka University Institutional Repository

'দুর্বল'– বিভাজিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনাস্থাপূর্ণ সংঘাত-সংস্কৃতির বিপরীতে শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় (অন্তত সীমিত পরিসরে হলেও) সম্প্রীতি, সমঝোতা, গ্রহণ-আত্তীকরণের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করতে পারে।

গবেষণার মৌলিক প্রশ্ন

উপরোক্ত আলোচনাদৃষ্টে অধিপতিশীল 'বাঙালি জাতিয়তাবাদী' বাংলাদেশের শহরায়তনিক সাংস্কৃতিক ও নাট্যকলার বর্তমান প্রেক্ষিতে 'অপর' জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গের প্রায়োগগত অবস্থান, গুরুত্ব, উপযোগিতা ও কার্যকরিতা বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্রেক করে :

> জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা হতে এমন কোনো উপাদান কি অন্বেষণ করা সম্ভব নয়, যা ঐতিহ্যিক এবং পরম্পরাগত চর্চায় কুশীলবের পরিবেশন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মৌল সূত্র হিসেবে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে এবং একই সাথে যা শহরায়তনিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী নাট্যকলায় অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবেও হতে পারে সমভাবে উপযোগী এবং কার্যকর?

প্রশ্নটি দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ– প্রথমত, ৭১-এর স্বাধীনতা পরবর্তী 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' সমর্থক বাংলাদেশের শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় এমন একটি ভিন্ন উপায় বা কৌশল অন্বেষণে উৎসাহিত করে যার মৌলভিত্তিটি একাধারে জাতিসাংস্কৃতিক উপাদান ও অনুষঙ্গ নির্ভর এবং যা 'ওরা', 'আমরা' বা 'বাঙালি', 'আদিবাসী'– এ জাতীয় বিভক্ত তর্কের বিপরীতে দাঁড়াতে সক্রিয় করে তোলে। এবং দ্বিতীয়ত, একজন 'বাঙালি মুসলিম' (জন্মসূত্রে) হিসেবে কোনো প্রকার পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই অজানা, অদেখা অথবা 'বাঙালির' চোখ থেকে দেখা জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির সুবিস্তৃত 'শিল্প-অরণ্যে' ভ্রমণ করা এবং নির্ধারিত কক্ষপথে স্থির থেকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি বিশেষ প্রনোদনা জোগায়।

গবেষণা পদ্ধতি

শহরায়তনিক অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদান অন্বেষণ, নির্বাচন এবং নিরীক্ষণের লক্ষ্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসরত জাতিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নির্বাচিত তিনটি জাতিকে প্রত্যক্ষ 'মাঠ-সমীক্ষায়' অন্তর্ভুক্ত করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার সামগ্রিক পদ্ধতিকে বস্তুগত করার জন্য সময় নির্বাচনে বর্তমান কালকে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গাবেষণার নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ২০১২ থেকে ২০১৬ এই চার বছরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই সময়সীমার মধ্যে– মারমা, মণিপুরী এবং গারো এই তিনটি জাতিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে গ্রহণ করা হয়। জনসংখ্যাগত দিক থেকে প্রথম কাতারের এবং পরিবেশনা বৈচিত্র্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মূল কারণ জাতিতাত্ত্বিক পারফরম্যান্স জ্ঞান, ঐতিহ্যিক এবং পরম্পরাগত পরিবেশন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিশ্লেষণ পরবর্তী

অনুশীলন উপযোগী উপাদান চিহ্নিত করা। আর এই লক্ষ্যে ক. 'ক্ষেত্র সমীক্ষণ পদ্ধতি' এবং খ. 'সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি' অনুসরণ করে প্রাপ্ত তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্তসমূহকে গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে সামগ্রিক বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণের বিষয়ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি গৃহীত পদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রামাণ্যস্বরূপ অডিও, ভিডিও এবং স্থির চিত্র ধারণ করা হয়। বিষয় নির্বাচন এবং তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহের জন্য 'ক্ষেত্র সমীক্ষণ পদ্ধতি' এবং 'সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি'র ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে দেশের শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় ইতঃপূর্বে যে সব গবেষক/সমালোচক গবেষণামূলক কাজ করেছেন, তাদের গ্রন্থ/প্রবন্ধ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও শহরায়তনিক নাট্যকলায় পাশ্চাত্য নির্ভর পারফরম্যান্স জ্ঞানকেন্দ্রিক তত্ত্ব ও প্রায়োগিক ডিসকোর্স এবং তাত্ত্বিক নির্মিতি বা Theoritical Tools সমূহ- যেমন, পরিবেশনা তত্ত্ব Performance Theory, কৃত্য ও কৃত্য-নাট্য Ritual & Ritual Theatre, পরিবেশনা অধ্যয়ন Performance Studies শূন্যায়তন নাট্য Empty space Theatre, নাট্য-নৃতত্ত্ব Theatre anthropology প্রভৃতি ডিসকোর্স নির্বাচিত পরিবেশনা পর্যালোচনার সহায়ক গ্রন্থ/প্রবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফলে সার্বিকভাবে সংগৃহীত পরিবেশনাসমুহের বিশ্লেষণে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত পারফরম্যান্স জ্ঞানতত্ত্বের পাশাপাশি এই বিষয়ে রচিত বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ এবং দেশি-বিদেশি পারফরম্যান্স জ্ঞানকাণ্ডীয় ডিসকোর্সের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ।

***

গবেষণা পরিধি

সময়ের বিবেচনায় এই গবেষণার পরিধিতে বর্তমান কাল অর্থাৎ অভিসন্দর্ভ রচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত/নির্ধারিত সময়কে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসরত জাতিতাত্ত্বিক বা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বৃহত্তর বাঙালি জনদের কাছে পরিচিত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এমন তিনটি জনগোষ্ঠীকে গবেষণা প্রকল্পে পরিধিভুক্ত করা হয়। এই তিনটি জনগোষ্ঠী হচ্ছে- মারমা, মণিপুরী এবং গারো। গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে এই তিনটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় উক্ত, উদ্ধৃত বা আলোচিত হলেও পরিধির বিশদ আলোচনা. বিশ্লেষণ বা নিরীক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বরং এই তিনটি জনগোষ্ঠীর কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতা, উৎসব, নাট্য বা নাট্যমূলক পরিবেশনাসমূহকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, নিরীক্ষণের মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বর্তমান সময়ে নির্বাচিত তিনটি জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত রয়েছে বা চর্চার অন্তর্গত রয়েছে এমন পরিবেশনাসমূহকেই কেবল বক্ষ্যমাণ গবেষণার পরিধিভুক্ত করা হয়েছে।

***

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যেহেতু এই গবেষণা প্রক্রিয়াটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিইচ. ডি. কোর্সের নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তাই সময়ের বন্ধনকেই এক অর্থে একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে এই গবেষণার বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই যে– সংখ্যাগত দিক থেকে মাত্র তিনটি জাতিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এই তিনটি জনগোষ্ঠীর তাবদ পরিবেশনাসমূহকে নিরীক্ষার অন্তর্গত করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যিক এবং পরম্পরাসূত্রে সামাজিক, ধর্মীয় কৃত্য-উৎসব-অনুষ্ঠান-আনুষ্ঠানিকতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে চর্চিত প্রধান, অপ্রধান সকল পরিবেশনা বক্ষ্যমাণ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হলেও দুটি কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

প্রথমত– তিনটি জনগোষ্ঠীরই কৃষি (জুম) বা অরণ্য/প্রকৃতি নির্ভর জীবন-যাপন পদ্ধতিতে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষণীয়, আর এ কারণে কৌম বা গোত্র ভিত্তিক সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানাদি/পরিবেশনার ক্ষেত্রটিও ক্রমাগতভাবে সীমিত এবং দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষা ও মনন এবং চিকিৎসা সেবা ও ব্যবস্থার সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এই সকল জনগোষ্ঠীর জীবনাচারের অন্তর্গত বেশ কিছু সামাজিক পরিবেশনার গুরুত্ব এবং মর্যাদা দুটোই হ্রাস পাচ্ছে। যেমন– গারো সমাজের সিংহভাগ আদি ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় প্রাচীন ধ্যান, দশা, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র নির্ভর নিরাময় করণ (heeling process) বা চিকিৎসা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আজ বিলুপ্তপ্রায়। অপরদিকে মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থায় পূর্বে গুরুগৃহ কেন্দ্রিক নৃত্য-গীত-বাদ্যের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের প্রথাগত ব্যবস্থাটি বর্তমানে 'একাডেমির' তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হওয়ায় প্রথাগতভাবে গুরু-আশ্রিত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত পরিবেশন প্রক্রিয়ার বিষয়টি বর্তমানে প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। মারমা সামাজিক পরিমণ্ডলে (বান্দরবান অঞ্চলে) কৃত্যমূলক *জ্যা* ও *পাঙখং* পালা পরিবেশনার দল এখন হাতে গোনা কয়েকটি অবশিষ্ট রয়েছে এবং যারা অবশিষ্ট রয়েছে তাঁরাও পরম্পরা বা প্রজন্ম সৃষ্টির বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সামাজিক জীবন ব্যবস্থা ও জীবন দর্শনে ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণেই বেশকিছু পরিবেশনা তার গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে এমনটা অনুমান করা হয়তো অমূলক নয়।

দ্বিতীয়ত– তথাপিও এই সকল জনগোষ্ঠীর কৌম/গোত্র ভিত্তিক জীবন-আচার-ব্যবস্থা-পদ্ধতিতে অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে যে সকল পরিবেশনা এখনো প্রচলিত রয়েছে এদের প্রায় সবগুলো পরিবেশনাই বছরের নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ-তিতি বা প্রকৃতির আর্বতন অনুসারে অথবা বিশেষ কোনো ঘটনা– জন্ম/মৃত্যু/বিবাহকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু পরিবেশনা রয়েছে যা কেবল বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়েই

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব অন্য সময়ে নয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গবেষকের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থানপূর্বক অংশগ্রহণসূত্রে পরিবেশন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। যেমন গারোদের মৃত্যু কেন্দ্রিক পরিবেশনা *খাবি* কেবল কোনো গারো সদস্যের (ধোবাউড়া অঞ্চলে প্রচলিত) মৃত্যু হলেই বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে এটি পরিবেশন করা হয়। যেটি গবেষকের পক্ষে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি (যদিও গবেষকের অনুরোধে কৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া অথবা একচ্যুয়াল প্রতিবেশ ছাড়াই দুজন কুশীলবের গীত-সংলাপময় *খাবি* পরিবেশনার সামান্য কিছু নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল)। তাছাড়া বর্তমানে অধিকাংশ গারো জনগণ খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী হওয়ায় পূর্বপুরুষদের প্রথাগত বেশকিছু পরিবেশনা এখন আর চর্চিত/প্রদর্শিত হয় না। যেমন *ওয়াগাল্লা* গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান উৎসব হলেও গবেষকের পর্যবেক্ষণকৃত তিনটি *ওয়ানগাল্লা* উৎসবের দুটি ছিল গারো-খ্রিষ্টান কর্তৃক উদ্‌যাপিত কেবলই ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গের প্রদর্শন মাত্র, কৃষির আর্বতন ও উদ্‌যাপনে কৃত্যমূলক প্রদর্শন নয়। এবং অপরটি আদিধর্ম অনুসারী সাংসারেক (একজন মাত্র) কর্তৃক উদ্‌যাপিত হলেও গারো-খ্রিষ্টানদের ব্যাপক অনপুস্থিতির কারণে একটি আড়ম্বরহীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়। তথাপিও বর্তমানে প্রচলিত এই তিনটি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ পরিবেশনাকে বক্ষ্যমাণ গবেষণার অন্তর্গত করতে না পারার বিষয়টিকে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হিসেবেই দেখা যায়। অপরদিকে বক্ষ্যমাণ গবেষণায় বাংলাদেশে বসবাসকারী অর্ধশতাধিক জাতিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে মাত্র তিনটি জাতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটি অর্জনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিচারে এবং স্বতন্ত্র ও স্বকীয় সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচারে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন– চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, চাক, বম, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে এই গবেষণা-পরিধির বাইরে রেখেই গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে, যাকে এই গবেষণার আর একটি সীমবদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

***

রূপরেখা

গবেষণাপত্রের সমগ্র আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়কে যথাক্রমে ‘মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা’, ’মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা’ এবং ’গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা’ এই তিনটি পৃথক শিরোনামের অধীনে ক্ষেত্র-সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত মোট ৩০টি পরিবেশনা (মারমা ৭টি, মণিপুরী ৮টি এবং গারো ১৫টি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতঃপর পরিবেশনার বিষয় ও রীতি-আঙ্গিকের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নিরিখে এবং গবেষণার প্রেক্ষিত, গুরুত্ব ও সর্বোপরি গবেষণার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় এগুলোর মধ্য থেকে সর্বমোট ১২টি (মারমা ৭টি, মণিপুরী ৩টি এবং গারো ২টি)

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনাকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের অন্তর্গত করা হয়। এই তিনটি অধ্যায়কে অভিন্ন তিনটি অংশে (১. জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়, ২. ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ এবং ৩. পর্যালোচনা) বিভক্ত করে অতঃপর ১২টি পরিবেশনাকে ক. ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন খ. দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ এবং গ. পরিবেশন ও বিশ্লেষণ– এই তিনটি শিরোনামে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদ বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়। এবং এই পর্যায়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশনাসমূহের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি তুলে ধরা হয় এবং কার্যকারিতা ও প্রায়োগিক উপযোগিতা বিবেচনায় বেশ কিছু অনুশীলন উপাদান চিহ্নিত করা হয়। এ পর্যায়ে মারমা পরিবেশনা থেকে ১০টি, মণিপুরী পরিবেশনা থেকে ৫টি এবং গারো পরিবেশনা থেকে ২টি সহ মোট ১৭টি উপাদান চিহ্নিত করে অভিনেতার প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনে এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অতঃপর চতুর্থ অধ্যায়ে– 'পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণ'– এই শিরোনামের অধীনে ১. অনুশীলন উপাদানের পুনঃ আলোচনা, ২. তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং ৩. সম্ভাবনা নিরূপণ– এই তিনটি ভাগে বিশদ পর্যালোচনা করা হয়। গৃহীত ১৭টি উপাদানের মধ্য থেকে চূড়ান্ত বিবেচনায় অতঃপর সর্বমোট ১২টি উপাদানকে কার্যকারিতা এবং প্রায়োগিক উপযোগিতার নিরিখে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় অভিনেতার দৈহিক, মনো-দৈহিক প্রস্তুতির অনুশীলন উপাদান বা অনুশীলনের উৎস বা সূত্র হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। অনুশীলন উপাদানকে সূত্র বা উৎস হিসেবে প্রস্তাব করার মাধ্যমে ১২টি উপাদানকে ১২টি একক হিসেবে না দেখে একাধিক অনুশীলনের উৎস বা সূত্র হিসেবে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সর্বশেষে অর্থাৎ অভিসন্দর্ভের উপসংহার অংশে গবেষণার দীর্ঘ আলোচনার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন, পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনায় গবেষণা প্রশ্নের উত্তর প্রদান, গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণাক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা

প্রথম অধ্যায়

মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা

১.১ জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়

'১৯৭১' সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে, এবং দেশের মোট ভৌগোলিক সীমার 'এক-দশমাংশ'[১] অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিশাল পাহাড়ি জনপদ, যা বৃটিশ উপনিবেশ আমল থেকেই 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' (Chittagong Hill Tracts- CHT)[২] নামে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা লাভ করে। ১৯৯১-এর আদমশুমারি অনুসারে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তার সর্বমোট জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ১ হাজার ১৪৪ জন। এ অঞ্চলের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, পূর্বে মিজোরাম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা দ্বারা বেষ্টিত। পার্বত্য অঞ্চলটি উত্তর অক্ষাংশের ২১°২৫´ থেকে ২৩°৪৫´-এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১°৪৫´ থেকে ৯২°৫০´-এর মধ্যে অবস্থিত। 'অতীতে বার্মা (মায়ানমার) আরাকানসহ এ পার্বত্য অঞ্চলকে কিরাতভূমি নামে অভিহিত করা হতো। প্রাচীন কিরাতভূমির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সংযোগে এবং কিরাত জাতির নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্গমে তিব্বতি-বর্মি পরিবারভুক্ত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাসহ ১১টি জনগোষ্ঠী বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে।'[৩] এই উক্তি পরিষ্কারভাবে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ১১টি জাতিতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর স্ব স্ব অবস্থান, বিচরণ ও বিবর্তনের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রদান করে। তবে এই ১১টি জনগোষ্ঠীর 'আদি' নিবাস হিসেবে এ অঞ্চলে অবস্থান, বিচরণ ও বিবর্তন বিষয়ে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক বয়ানে রয়েছে মতভেদ। তথাপিও এ অঞ্চলের প্রতিটি জাতিসত্তা-ই যে বিশেষ 'সংস্কৃতির' চর্চা, রীতি-নীতি, অভ্যাস-আচরণ, ঐতিহ্যে স্বকীয় এবং সংগঠিত এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। সামগ্রিক জীবনাচারের সাথে

---

১ 'পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল, যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-দশমাংশ'– সুগত চাকমা, ক্ষুদ্র *নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা*, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, জুন ২০১১, পৃ. ১৫

২ The CHT had a different administration system from the rest of Bengal since the colonial period. The CHT Manual promulgated by the British in 1900 laid down detailed rules and regulations for the administration of the CHT. Under Section 18 of the Manual rules and regulation applicable in other parts of Bengal were no longer applicable in the context of CHT. The manual laid down an administrative structure for the CHT. Article 7 of Chapter III placed the CHT under the administration of a Deputy Commissioner (DC). He was empowered with special powers by the Governor of Bengal. These powers were not enjoyed by the DCs of the other districts of Bengal. But parallel to this there existed another administrative structure in the CHT. The Bengal Government had divided the CHT into three Circles on 1 September 1881. The CHT Manual confirmed this division. The three Circles were The Chakma Circle of 1658 sq. mls. (excluding Government Reserve Forests of 763 sq. mls). The Bohmang Circle of 1444 sq. mls (excluding Government Reserve Forests of 620 sq. mls) and the Mong Circles of 653 sq. mls. The Regulation maintained the traditional institutions of the Circles Chief and Headmen. – Dr. Amena Mohsin, "Development Plans, Environment and the Hill Peoples: Chittagong Hill Tracts" (Mesba Kamal, edited, *Reflections on Diversity and Citizenship Bangladesh and Beyond*), Dhaka, Shrabon Prokashani, December 2005, p. 73

৩ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী; ভাষাসংস্কৃতি ও অধিকার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০১৪, পৃ. ৭২

যুক্ত ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিরাজমান স্বকীয় রীতি-নীতি, আচার-বৈশিষ্ট্যের কারণেই সম্ভবত ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ শাসকেরা 'চিটাগাং হিলট্রাকস ম্যানুয়েল– ১৯০০ অ্যাক্ট' প্রবর্তন করে উপজাতি অধ্যুষিত নবগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে এক্সক্লুসিভ এরিয়া বা শাসন বহির্ভূত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯২০ খ্রিঃ এই রেগুলেশন সংশোধন করে চিটাগাং হিলট্রাকস এমেন্ডমেন্ট রেগুলেশন ১৯২০ শাসনবিধি প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে দেশের প্রচলিত আইন বহির্ভূত এলাকা হিসেবে এ জেলায় বহিরাগতদের জমি বর্গা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।'[৪] পাহাড়ি এই জনপদকে পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা-ভূখণ্ডে ৪ এপ্রিল ১৯৮১ সালে বান্দরবান ও রাঙামাটি এবং ৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়িকে তিনটি পৃথক জেলার অধীন করে সমগ্র অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল অধিবাসীর জন্য গৃহীত সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ব্যবস্থাপত্রে প্রদত্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধার প্রায় সম্পূর্ণতই সংখ্যাগরিষ্ঠ 'বাঙালি' বিশেষত 'বাঙালি মুসলমানদের অধিকারকেই সুরক্ষা করেছে। পক্ষান্তরে, সংখ্যালঘু অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জাতিতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, রাষ্ট্র যাদের 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' নামে চিহ্নিত করে, তারা ক্রমান্বয়ে একটি প্রবল ক্ষমতা-বৃত্তের অধীনে শোষণ, বৈষম্য আর বঞ্চনার বাসিন্দায় পরিণত হয়। 'এরা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বহীন, সামরিক শক্তিহীন ও 'সীমান্ত সম্পর্ক সমর্থনহীনও' বটে। এদের শিক্ষার সমস্যা ও সংকট এত ব্যাপক এবং এতই অবনতিশীল বিপর্যস্ত যে তাদের গৌরবান্বিত অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে এ সকল নৃ-গোষ্ঠীর নতুন প্রজন্ম কদাচিৎ জানার সুযোগ পায়। এখন কালের বিবর্তনে সবকিছু মলিন; ধূসর এদের ভবিষ্যৎ।'[৫] স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চনার আগল ভাঙার সংগ্রাম ছিল অনিবার্য-বিস্ফোরণ, 'শান্তিবাহিনী' যার ট্রাজিক পরিণতি। এ সংগ্রাম কেবল ভূমি-অধিকার আদায়ের নয়, এটা জাতিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাথে ভূমির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে গড়ে ওঠা যাপিত জীবনের মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম। কেননা পাহাড়ি এ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য এতই সংকটাপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, এর খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত এদেরকে 'দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্র' বলে উল্লেখ করেছেন–

> Decades of discrimination have trapped the indigenous people into a vicious cycle of impoverisation, thus further reducing their already grim opportunities for empowerment and freedom of life. It is not at all an exaggeration to say that, with very few exceptions, Bangladesh's indigenous peoples are, by and large, the poorest among the poor. It can be denied that they face discrimination in accessing education, health, employment, and civic rights.

৪ জাফার আহমাদ হানাফী, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, মে ১৯৯৩, পৃ. ১

৫ মং ক্য শোয়ে নু, মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, *সাংগু* (উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা), বর্ষঃ ছয়, সংখ্যাঃ এক, বান্দরবান, পৃ. ৭৬

> Decades of infighting between the indigenous-led resistance movement (popularly termed as 'insurgencies') and the government security forces in the Chittagong Hill Tracts resulted in to a deeply ingrained social tensions there which still persist the signing of the CHT Accord (popularly known as "Peace Treaty"; signed between the Government and the Jono Sanghati Samity on 2 December 1997) nearly two decades ago. Even after the singing of the CHT Accord, allegations of serious human and Civil rights abuses against the members of indigenous communities surface every now and then.[৬]

সুদীর্ঘ বছরের পথ-পরিক্রমায় পার্বত্য প্রকৃতিতে বসবাসসূত্রে অভ্যস্ত জীবনব্যবস্থা অতঃপর 'বাংলা অঞ্চলের ভূমি-ব্যবস্থায় ক্রম-পরিবর্তন, কৃষি ও শিল্পের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক কৌম মানবগোষ্ঠীর জীবন-বৃত্তকে এনে দাঁড় করিয়েছে বিপর্যয়ের মুখোমুখি। কৌম সমাজের অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, নৈতিক চেতনা, ধর্মবোধ, উৎসব-অনুষ্ঠান-পার্বণ এবং ওই সমাজের মানুষের গোষ্ঠীগত জীবনের বাস্তব ও বাস্তবতা এ সবকিছু কখনো সামন্তবাদ কখনো পুঁজিবাদের দুষ্ট বিক্ষেপে আক্রান্ত হয়েছে।'[৭] 'কৌম' চেতনায় সমৃদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক এই বিপর্যয়ের মুখে তথাপিও স্বাক্ষরিত হয় 'শান্তিচুক্তি', অতঃপর রোপিত হয় আত্মমর্যাদা সমুন্নত করার নতুন স্বপ্নবীজ। স্বপ্ন আর সংগ্রামের সমান্তরাল বাস্তবতাকে সঙ্গী করেই বর্তমানে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ভাষাভিত্তিক যাপিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আর ভিন্নতার রং নিয়ে পাহাড়ি জনপদের তিনটি জেলায় বাস করছে মোট ১১টি জাতিসত্তা। যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে পার্বত্য তিন জেলায় বসবাসকারী জাতিসত্তা নিয়ে রয়েছে ভিন্নমত। 'বাংলাদেশের আদিবাসী : ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার' গ্রন্থে সৌরভ সিকদার ১১টি জাতিসত্তার উল্লেখ করেন। অন্যদিকে 'উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি' গ্রন্থে জাফার আহমাদ হানাফী উল্লেখ করেন ১২টি জাতিসত্তার কথা। এগুলো হচ্ছে– চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা, ম্র, বম্, উসুই, পাংখো, খুমী, খ্যাং, লুসাই এবং চাক। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী উল্লিখিত জাতিসত্তার মধ্য থেকে বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মের নির্ধারিত পরিধির অন্তর্ভুক্ত মারমা জাতিসত্তা এবং এদের জীবনাচারে অঙ্গীকৃত ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ এবং কৃত্যমূলক পরিবেশনা বিদ্যমান অধ্যায়ের আলোচনায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে, সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিসত্তার মধ্যে, মারমা জনগোষ্ঠীর অবস্থান দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বান্দরবান জেলায় বৃহত্তম বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্তী মায়ানমার (বার্মা) এবং এর অন্তর্ভুক্ত আরাকানের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত

---

৬ Professor Abul Barkat, "Political Economy of Indigenous Peoples in Bangladesh", (Dr. Shima Zaman, Edited, *Surviaal or Extinction? Adivasi Rights in Bangladesh),* National Human Rights Commission (JAMAKON), Dhaka, August 2014, P. 10

৭ সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, বাংলাদেশের ছোটগল্পে আদি নৃ-জীবনের রূপায়ণ, *উলুখাগড়া* (সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক), দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট-২০০৬, পৃ. ২০৮

মারমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, 'মারমা শব্দটি ম্রাইমা শব্দ থেকে উদ্ভূত।'[৮] 'কথিত আছে যে, স্বাধীন আরাকান রাজ্যকে ধ্বংস করে বর্মি সম্রাট বর্মি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সকল অধিবাসীকে 'ম্রাইমা' নামে অভিহিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাগণ বার্মা থেকে আগত বিধায় তারা তাদের 'ম্রাইমা' নামকরণ থেকে নিজেদের মারমা পদবিতে ভূষিত করেন।'[৯] মারমা নামকরণের এমন ধারণার সাথে অবশ্য মারমা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মং ক্য শোয়ে নু-এর ধারণায় বেশ খানিকটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন–

মারমা শব্দটি "মারমাজা" বা "ম্রাইমাচা" নামক বাম থেকে ডান দিকে লেখার রীতি অনুসারী বর্ণমালা উপমহাদেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী হস্তাক্ষর লিপি হতে উদ্ভূত। "মাইমাহ্ সামইং রাজওয়ং" নামক ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী অঞ্চলের লোকেরা বার্মার দক্ষিণ-পূর্বাংশে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। ঐ অঞ্চলের লোকেরা বর্মিদের কাছে "তলইং" নামে পরিচিত এবং এদের রাজ্যের নাম ছিল "হাইসাওয়াদী"। "পেগু" ঐ রাজ্যের রাজধানী বা প্রধান নগর। "সাহ্মালা" এবং "ওয়িমালা" নামক দু'জন তলইং রাজপুত্র তাদের নেতৃত্বে আনুমানিক প্রায় ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ পেগু নগর গড়ে তুলেছিল। ঐ সময়কালে নৌ-যোগে এরাই সর্বপ্রথম ঐ "মারমাজা" বা "ম্রাইমচা" নামক বর্ণমালা বার্মার দক্ষিণ-পূর্বাংশে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।[১০]

তবে মারমাদের ব্যবহৃত 'বর্মি লিপি'[১১] ও 'ভাষা' তিব্বতী-চীন পরিবারভুক্ত লোলো-বার্মিজ শাখার অন্তর্গত। যদিও 'বাংলাদেশে আদিবাসী মারমাদের ভাষা মারমা নামেই পরিচিত। এই ভাষার আদিরূপকে বলা হয় মোন বা মোয়ে। এটি মূলত বর্মি ভাষার কথ্যরূপ এবং এদের ব্যবহৃত লিপি বর্মি বা আরাকানি (রাখাইন) যার উৎস মোন-খেম। আদি বর্মি ভাষায় অন্যান্য ভাষার সংমিশ্রণ এবং অপভ্রংশের ফলে বর্তমান মারমা ভাষার রূপ লাভ করেছে।'[১২] তাই একটি বিষয় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-আচার-ব্যবহারে মারমা জাতিসত্তার আজ যে সামগ্রিক গড়ন লক্ষ করা যায়, তা কৌম বা গোষ্ঠীগত স্বতন্ত্র। একই

---

৮ ক্য শৈ প্রু, মারমা উপজাতি পরিচিতি, *অঙ্কুর* ১ম সংখ্যা, রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১

৯ আজাদ বুলবুল, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপাজাতীয় সংস্কৃতি*, মিজান পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ১৮

১০ মং ক্য শোয়ে নু, মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, *সাংগু* (উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা), বর্ষ: ছয়, সংখ্যা: এক, বান্দরবান, পৃ. ৬৮

১১ বার্মিজ শাখা : রাখাইন ভাষা : পটুয়াখালী, কক্সবাজার, বরগুনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্যচট্টগ্রামের ১৩,২৫৪ জন লোক (আদমশুমারি ২০১১) রাখাইন ভাষায় কথা বলে। পটুয়াখালী কক্সবাজার ছাড়াও মহেশখালীসহ কিছু কিছু পার্বত্য অঞ্চলে (বান্দরবান, রাঙামাটি) ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাখাইনরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ব্যাপারে রক্ষণশীল জাতি। তারা নিজেদেরকে রাখ্যাইন › রাখাইন বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। রাখাইন ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ একটি ভাষা এটি মূলত মারমা ভাষার উপভাষা। জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২৫ সাল হতে রাখাইন রাজা মারায়ু কর্তৃক রাখাইন প্রে বা রাখাইন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রাখাইন ভাষা ছিল ঐ রাজ্যের একমাত্র জাতীয় ভাষা। রাখাইনদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। রাখাইন বর্ণমালায় স্বরবর্ণ বা ছারা হল ১২টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ বা ব্যেঃ মোট ৩৩টি। [...] মারমা এবং রাখাইন উভয় গোত্র একই বর্মি লিপি ব্যবহার করে। পটুয়াখালীর রাখাইনরা বার্মার আরাকান প্রদেশ হতে আগত বলেই নিজেদের রাখাইন পরিচয় দিতে ভালোবাসে। কেননা, আরাকানের অধিবাসীদের রাখাইন বলা হয়ে থাকে। এ কারণে পটুয়াখালীর রাখাইনদের মাতৃভাষাও মারমাদের ভাষা। যা মঙ্গোলীয় স্রোতধারার ভাষা ভোট-বর্মি। এই ভাষা ইন্দো-আর্য বা দ্রাবিড়ীয়-আর্য ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। - সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী; ভাষা- সংস্কৃতি ও অধিকার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১৪, পৃ. ২৯

১২ সৌরভ সিকদার, "বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা", (Dr. Shima Zaman, edited, *Survival or Extinction? Adivasi Rights in Bangladesh*) National Human Rights Commission (JAMAKON), Dhaka, August 2014, P. 140

সাথে বহু 'ভাষা', 'সংস্কৃতি' ও 'রক্তপ্রবাহ' মিশ্রণে গড়ে ওঠা বাঙালি 'সংকর' জাতির সাথে মিলন, বর্জন আত্তীকরণের অতীত যোগাযোগ বা সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বা প্রত্যক্ষ নির্দেশ-নিদর্শনও খুব একটা দেখা যায় না–

> ব্রহ্মদেশ দেশ থেকে এ অঞ্চলে আসা মারমা এবং রাখাইন জাতিগোষ্ঠী এক সময়ে বাঙালিদের কাছে 'মগ' হিসেবে পরিচিত ছিল। সে সময়ে মগদের সাথে জলদস্যুতা বৃত্তির সম্পৃক্ততা ছিল মনে করা হতো বিধায় 'মগ' শব্দটি নিন্দাগূঢ়ক হয়ে ওঠে, পরবর্তীতে মারমা ও রাখাইন উভয়ের কাছেই মগ শব্দটির গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। ইতিহাসসূত্রে বলা হয়ে থাকে যে, সতের শতকে মায়ানমারের শাসকগোষ্ঠী আরাকান দখল করে আরাকানী-সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের ওপর 'বর্মি জাতীয়তাবাদ' চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে শুরু হয় সংঘাতের। এ সংঘাতে পরাস্ত স্বাধীনচেতা আরকান জাতি ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী নানান অঞ্চলে। যার একটি অংশ তৎকালীন পটুয়াখালী, সুন্দরবনে (রাখাইন) এবং আরেকটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে (মারমা) আশ্রয়গ্রহণ করে পুনরায় জাতি-সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে আত্মসন্ধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। উল্লেখ্য, আরাকান থেকে বিতাড়িত সমজাতীয় রক্তধারার এই জনগোষ্ঠীর লেখ্যরীতি বা বর্ণমালা এক হলেও উচ্চারণ ও অর্থের ভিন্নতার কারণে রাখাইন এবং মারমা উভয়ের ভাষা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। 'রাখাইনরা মনে করে তাদের আদিনিবাস যেহেতু আরাকান, সেহেতু তাদের ভাষা আরাকানী বা রাখাইন। অন্যদিকে ভাষা ও বর্ণমালা এক হলেও মারমারা মনে করে তাদের পূর্বসূরিরা যেহেতু বার্মা থেকে আগত সেহেতু তারা বর্মী ভাষার উত্তরাধিকার।'[১৩]

ভাষা-সংস্কৃতি ও শারিরিক গড়নে 'মঙ্গোলীয় জন বা নরগোষ্ঠী' বিবেচনায় পার্বত্য অঞ্চলের মারমা জাতিসত্তার অবস্থান নির্ণয়ে নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কেননা নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মারমা জাতিসত্তায় মঙ্গোলীয় জনের রক্তের উপস্থিতি বিবেচনায় এই জাতির অবস্থানে প্রাচীনত্বের সন্ধান দেয়। অন্যদিকে ইতিহাসের সাক্ষ্য মেনে নিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের অবস্থান মধ্যযুগে অর্থাৎ সতের শতকের কোনো এক সময়ে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আরাকানে বসবাসকারী এ জাতিসত্তা বর্মি সম্রাজ্যের অধীকৃত হলেও চাপিয়ে দেওয়া 'বর্মি জাতিয়তাবাদ' মেনে নেয়নি, করেছে প্রতিরোধ, যদিও হয়েছে ব্যর্থ তথাপিও নিজ জাতীয় চেতনাকে সঙ্গে করে ছেড়ে এসেছে আরাকান। সুতরাং মারমা জাতিসত্তা তার চিন্তা-চেতনা, ভক্তি-বিশ্বাস, রীতি-আচার, কৃত্য, ধ্যান-সাধনা সর্বত্রই কৌম বা গোষ্ঠীগত চেতনাকে উর্ধ্বে রেখে জাতি-সংস্কৃতি বিনির্মাণের ধারাকে রেখেছে স্বকীয় আর বৈচিত্র্যের রঙে রঙিন। যে রঙের সাথে ভিন্ন কোনো জাতিসত্তা তো নয়ই এমনকি বৃহত্তর বাঙালি সংকর জাতির বহু-রঙে রঙিন আর্য-অনার্য অথবা দ্রাবিড়-অস্ট্রেলয়েড প্রভৃতি 'নর', 'জন' বা 'ভাষা'র সাথেও বিশেষ কোনো মিল পাওয়া যায় না।

---

১৩ মুস্তাফা মজিদ, *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ২২১

তাহলে এমন কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মারমা জাতিসত্তার সংস্কৃতি-সামগ্রিকতাকে করেছে স্বতন্ত্র ও স্বকীয়? এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যে সকল বিষয়ের কারণে মারমা 'জাতি' ও 'গোষ্ঠী-চেতনা'র সামগ্রিক জীবনাচার ও আদর্শে লালিত যা কিছু পরিবেশনামূলক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে বিকশিত ও বহমান তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, এর মূলে ধর্ম-চেতনা, দেব-দেবী, তান্ত্রিক, নৈর্ব্যক্তিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তি– ভূত-প্রেত, প্রকৃতি পূজা প্রভৃতি নানাবিধ ভয়-ভীতি-ভক্তি আশ্রিত ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতার (পরিবেশনামূলক) সর্বব্যাপী উপস্থিতি এবং চর্চা মারমা জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের একটি বড় কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। এখানে সামগ্রিক জীবনাচার বলতে জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বসন থেকে ভূমির সাথে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মকে আওতাধীন করা যায়। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে মারমাগণ বৌদ্ধধর্ম অনুসারী। কিন্তু এদের সামগ্রিক জীবন ও ধর্মাচারে 'সর্বপ্রাণবাদ' বা এনিমিজমের গভীর প্রভাবও লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত, যা তর্কাতীত ভাবে স্বীকার করেন সমাজ বিজ্ঞানীগণ– নদীপূজা-খালপূজা (খ্যংসাংমা), শনিপূজা (স্বত্ত্ববী পূজা), গংনাইত, ইংনাইত, চুংমালে নাইত ইত্যাদি পূজায় সর্বপ্রাণবাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ধারায় একাধিক 'যান' ও 'তন্ত্রে'র (হীনযান, মহাযান, তন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি) বিভক্তিমূলক উপস্থিতির কারণেও লৌকিক ও গোষ্ঠীগত বিশ্বাস, রীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি মারমা জাতিতাত্ত্বিক ধর্মায়তনে স্থান লাভ করেছে প্রবলভাবে। ফলে একাধারে বৌদ্ধ দর্শন-তত্ত্ব, অপর দিকে পরম্পরাগত তান্ত্রিক-যোগাচার তার সাথে সর্বপ্রাণবাদের চর্চা এই ত্রি-ধারার সমন্বয় ও সংমিশ্রণে মারমা জাতিসত্তার ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ, চর্চা ও চেতন-জগতের সামগ্রিক কাঠামোটি বর্তমান আক্কার ধারণ করেছে। আর বিবর্তনের ধারায় লব্ধ এই সকল 'যান' ও 'তন্ত্র' আশ্রিত তত্ত্ব বা দর্শন কেবল জাতি-আদর্শকে আবেশায়িত করেছে তা নয়, বরং পুরো জনগোষ্ঠীর আচার, আচরণ, রীতি-নীতি বিশেষত– জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু কেন্দ্রিক উৎসব, তথা যাপিত জীবনের সামগ্রিক আচরণকে করেছে পরিবেশনামূলক বা 'পারফরমেটিভ'।

মারমা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনাচার পারফরমেটিভ হয়ে ওঠার মূলে কৃত্য এবং উৎসব অনুষ্ঠান কীভাবে কার্যকর তা রিচার্ড শেখনারের– 'রিচ্যুয়াল' বা কৃত্যের ব্যাখ্যাসূত্রে দেখা যেতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের সামষ্টিক বা পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক জীবনধারা কৃত্য (রিচ্যুয়াল) ও বিনোদনমূলক উৎসব আচার অনুষ্ঠানের গঠন এবং উদ্‌যাপন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মারমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনে "যদিও বা এরা (মারমা) হীনযান ধারা মতের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তথাপি এদের মধ্যে নানা সংস্কার ও লোক-বিশ্বাস রয়ে গেছে। এটা করা হয়ে থাকে কিছু প্রাচীন সংস্কারে আস্থা, কিংবদন্তির লোকচার ও বিশ্বাসের কারণে। এদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও অপরাপর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় কিছু বৈচিত্র্য ও সংস্কার লক্ষ

করা যায়। এরা আত্মা, প্রেতাত্মা, অতিপ্রাকৃত শক্তি, অতি মানব-দানবের প্রতি বিশ্বাস করে থাকে।”[১৪] উক্তিতে এটা স্পষ্ট যে, মারমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন-বৃত্তের একটি বড় অংশজুড়েই রয়েছে প্রথা বা পরম্পরাগত কৃত্য, উৎসব, অনুষ্ঠান যা পাহাড়ি অধিবাসীদের বিশ্বাসগত, সামাজিক বিধি-বিধান, ন্যায়-নীতি-ঔচিত্যবোধ তথা মৌলিক মানবিক ও পারলৌকিক চাহিদার খোরাক মিটায়, খুঁজে পায় জীবনে বেঁচে থাকার মানে। কেননা কৃত্য এবং বিনোদন সর্বদাই ব্যক্তি বা সমষ্টিকে একটি পরিবর্তিত বাস্তবতার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, কৃত্য এবং বিনোদন মানুষকে দৈনন্দিন জীবন বাস্তবতার অতিরিক্ত ভিন্ন এক বাস্তবতায় নিয়ে যায়। প্রাত্যহিকতা থেকে ভিন্ন এবং পৃথক এই ভিন্ন বাস্তবতায় বিচরণের সূত্রেই মানুষ বিষয়ের গভীরে পৌঁছে রস আস্বাদন/মানবিক চাহিদার খোরাক মেটাতে সক্ষম হয়। রিচার্ড শেখনারের ব্যাখ্যা অনুসারে কৃত্য এবং নাট্যক্রিয়া মানুষকে– স্থায়ী অথবা অ-স্থায়ী, এই দুই ভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম। যেমন, ধর্মীয় এবং সামাজিক কৃত্য, আচার, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্ম, বিবাহ অথবা মৃত্যুর উদ্‌যাপনে তুমুল আয়োজন তো এজন্যই যে, তা মানুষের জীবনাচারে ‘স্থায়ী’ পরিবর্তন সাধন করে– অবিবাহিত ব্যক্তি থেকে বিবাহিত ব্যক্তির স্থায়ী পরিবর্তনকে স্মরণীয় এবং অর্থবহ করে রাখে। অর্থাৎ মৃত্যুই যদি পুনর্জন্মের/ উৎপন্নের পূর্বশর্ত হয়, সেক্ষেত্রে মারমা ঐহিত্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ামূলক কৃত্যানুষ্ঠান– সইং আক্কা নৃত্যে মৃতের আত্মার বিদায়লগ্নে তুমুল/তাণ্ডব উদ্‌যাপন তো নব/পুনঃ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা হয় বলে মনে করা যায়। এই তুমুল পরিবেশনা পরিণামে এক অ-প্রাত্যহিক বাস্তবতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বিনোদনমূলক উৎসব, অনুষ্ঠান যেমন– নাট্যক্রিয়া, দশা বা ভর কেন্দ্রিক কৃত্যানুষ্ঠান (trance), ধ্যান-যোগাচার প্রভৃতি মানুষের জীবনাচারে অ-স্থায়ী পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা/স্বাদ প্রদান করে। কেননা এ ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ কেবল নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য দৈনন্দিন জীবনাচারের অতিরিক্ত বা ভিন্ন একটি বাস্তবতায় বিচরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর পুনরায় সে তার দৈনন্দিন বাস্তবতায় ফিরে আসে। দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে শেখনার বলেছেন “দ্বিতীয় বাস্তবতা” (second reality)। ‘Ritual and play both lead people into a “second reality”, separate from ordinary life. This reality is one where people can become selves other than their daily selves. When they temporarily become or enact another, people perform actions differet from what they do ordinarily. Thus ritual and play transform people, either permanently or temporarily।’[১৫] এটি এমন একটি মুহূর্ত/ সময়/অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট সকলেই দৈনন্দিন জীবন-অতিরিক্ত ‘বিশেষ’, এবং ‘সচরাচর’ নয় এমন কিছু ক্রিয়া (সুর, ছন্দ, ভাবাশ্রিত শারীরিক ও মানসিক তথা মনোদৈহিক

---

১৪ মং ক্য শোয়েনু নেভী, মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, *সাংগু; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, ১৯৯৮, বর্ষ- ছয়, সংখ্যা- এক, বান্দরবান, পৃ.৭২

১৫ Richard Schechner, performance studies: an introduction, Routledge, London, 2002, Page- 45.

অভিব্যক্তি) সম্পাদন করে থাকে। অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানে 'ব্যক্তির' পেশাগত বা সামাজিক পরিচয়– শিক্ষক, কৃষক, দিনমজুর, ম্যানেজার ইত্যাদি গুণ নিমিষেই গৌণ হয়ে 'বিশেষ' বা 'নতুন' আর এক ব্যক্তিত্বের আচরণে– বিয়ে অনুষ্ঠানের 'বর' অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় 'বিধবা'-তে রূপান্তরিত/পরিবর্তিত হয়। রূপান্তর হওয়া বা করার এই প্রক্রিয়াটি সর্বদাই আনুষ্ঠানিক এবং 'পরিবেশনামূলক' যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে *স্থায়ী* বা *অ-স্থায়ী* পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ করে তোলে– 'Performance mark identities, bend time, reshape and adorn the body and tell stories।'[১৬] সুতরাং কৃত্য যদি মানুষের দৈনন্দিন অতিরিক্ত ভিন্ন এক ভাব-জীবনে বিচরণের ক্ষেত্র বা মাধ্যম হয়, তবে এই জীবনের উপভোগ আরও অধিক সার্থক হতে পারে কৃত্যের সুসংহত গঠন-সমৃদ্ধ একটি উপস্থাপনা। আর এই দিক বিবেচনায় নৃত্য, গীত, বাদ্য সহযোগে ভিন্ন রকম শরীর ছন্দ, ভাব-ভঙ্গি, তন্ত্র-মন্ত্র, আবেগ-অনুভূতি-উচ্চারণের সরব উপস্থিতি মারমা জাতি-সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি উপাদান, অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে পরিবেশনামূলক (পারফরমেটিভ)। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মারমা জাতিসত্তায় বৌদ্ধধর্মের সাঙ্গীকরণ কখন বা কীভাবে হয়েছে? অথবা সর্বপ্রাণবাদ ও তান্ত্রিক যোগাচারের সমন্বয়ই বা হলো কীভাবে? এক্ষেত্রে মারমা ও রাখাইন সমাজে এমন একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে–

> হরিনীর গর্ভ থেকে জাত এক পুত্র রাখাইন জাতির জনক আর হরিণীর গর্ভ থেকে জন্ম বলে রাখাইন জাতিদের হরিনীর পুত্র বলে ডাকা হয়। [...] তারা (রাখাইন) ছিল তাদের সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত রক্ষণশীল স্বভাবের। হাজার হাজার বছর আগেকার রাখাইন সংস্কৃতি এখনো অপরিবর্তিত ও অক্ষতভাবে টিকে আছে শুধুমাত্র তাদের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে। আড়াই হাজার বছর আগে রাখাইন সম্রাট 'চন্দ সুরিয়া' (পালি উচ্চারণ: চাইন্দাহ্ সুরিয়াহ) অথবা 'চন্দ্র সূর্য' গৌতম বুদ্ধকে সুদূর ভারত হতে আরাকানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন এবং গৌতম বুদ্ধের উপস্থিতিতে এবং উপদেশ মোতাবেক বুদ্ধের প্রতিকৃতি 'মহামুনি' নির্মাণ করেন। ঐ মূর্তিতে গৌতম বুদ্ধ নিজের হাত স্পর্শ করেন এবং সিদ্ধি প্রদান করেন।[১৭]

রাখাইন জাতির জনকের জন্ম হরিণীর গর্ভ থেকে– এমন কাহিনী ইতিহাসের যুক্তিতে খারিজ হয়ে যাবে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাখাইন সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের যে সাক্ষ্য বহন করে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কেননা আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১৪৬ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কখনও সম্পূর্ণ আবার কখনও আংশিকভাবে প্রায় হাজার বছর আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল।[১৮] অন্যদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয় তার সঠিক সন্ধান জানা

---

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৭ মং সিং ঞো, মারমাদের সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসে ও দেব দেবীর অবস্থান : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, *সাংগু ; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, বান্দরবান, ১৯৯৯, বর্ষ- সাত, সংখ্যা- এক (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃ. ৩৪

১৮ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষা: বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪

না গেলেও পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে মগধদেশ হতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ পূর্বদেশ এসে ধর্ম প্রচার করেন। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর ইসলামাবাদ গ্রন্থে লিখেছেন বৌদ্ধরা এদেশের আদিম অধিবাসী। তারা নিজেদেরকে মগধ বিতাড়িত ক্ষত্রিয় ও রাজবংশী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। শ্রী মং প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির বলেন, মগধদেশ হতে পলায়মান বৌদ্ধগণ ভারতের একপ্রান্তে এসে যে বুদ্ধভূমির অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণপাত শ্রম স্বীকার করেছিলেন- তাদের বংশধর চট্টগ্রামের এই বৌদ্ধগণ।[১৯] সুতরাং এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রসার যে কোনোক্রমেই মধ্যযুগে নয় বরং প্রাচীন কালের কোনো সময় ঘটে থাকবে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

অন্যদিকে ইতিহাসের বিবরণে জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ধারায় পালযুগে এসে মহাযানী ধর্ম দর্শনের সাথে তান্ত্রিকতার সমন্বয় ঘটে এবং বৌদ্ধ মহাজান তন্ত্রযানে রূপান্তরিত হয়। ঠিক কখন বা কীভাবে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রবেশ ঘটে তা নির্ণয় করা না গেলেও এটি প্রতীয়মান যে, তান্ত্রিকতা প্রবেশের ফলে বৌদ্ধ ধ্যান-ধারণায় বিশেষত মহাযান দর্শনে পূজা পদ্ধতি, গূঢ়-তত্ত্ব ও রীতি-নীতির বিস্তার ও গুণগত পরিবর্তন লাভ করেছে। বৌদ্ধধর্মে আত্তীকৃত তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বা তন্ত্রযানের উপস্থিতির মধ্যে শৈবতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান অনেকেই। এমনও বলা হয় যে, 'বর্তমান বার্মিজ ও মারমা সমাজে 'মেদ' নামে যে দেবীর পূজা করা হয়, তিনি মূলত 'প্রজ্ঞা দেবী সরস্বতী'। আর এই দেবীর পূজা করার জন্য ত্রিপিটকের সূত্র পিটকে যে গাথা আছে তার অর্থ হচ্ছে– "ত্রিপিটক সম্পূর্ণ-সর্বসিদ্ধ সুখ-আবহকারিণী সরস্বতি আমার জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে আমাকে ধারণ করুন।"[২০] প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ জাতকে রাম-লক্ষণের কাহিনী কেবল স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, বরং মারমা সাহিত্য ও পরিবেশনামূলক শিল্প 'পাংখুং'-এ 'রামাহ্-লক্ষণাহ্' নামে একটি জনপ্রিয় কাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি আজও বর্তমান। শুধু তাই নয় রামায়ণের অংশবিশেষ মারমা তান্ত্রিক সাধনায় মন্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। 'রামায়ণ অংশের ওপর নির্ভর করে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা বা বিদ্যাকে বলা হয় 'ঋষিহ্ সইসঙ : আক্ষারা' বা আশি হাজার ঋষির অক্ষর বা বিদ্যা। এ ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি একটি গাথা বা মন্ত্র হচ্ছে– 'চাক্ ক্রিঃ তছেহ্ সুঙ বাঃ' বা তেরটি মহাচক্র।'[২১] এটি বনবাসকালে লক্ষ্মণ সীতাকে একাকী কুটিরের ভিতর রেখে, শত্রু বা অশুভ কোনো শক্তি যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য কুটিরটিকে ঘিরে চক্র আঁকার সময়ে যে মন্ত্র পড়েছিলেন সেটি আজও মারমা তান্ত্রিক সাধনায় ব্যবহৃত হয়।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রবেশ সম্পর্কে কারো কারো মত এমন যে, 'মহাসাংঘিকদের ধারণী পিটকে মন্ত্রের বিধি প্রবর্তিত ছিল। আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে উল্লেখ আছে, "শুধু মন্ত্র নয়, ধারণী, মণ্ডল ও মুদ্রা" বিষয়ও ছিল। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে যোগাচার বিজ্ঞানবাদের প্রবক্তা অসঙ্গ সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রবর্তন

---

১৯ রমাবতী রামুর ইতিকথা- বোধিমিত্র বড়ুয়া, চারুলতা ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৯৮

২০ মং সিং ঞ্জো, মারমাদের সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসে ও দেব দেবীর অবস্থান : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, *সাংগু; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, বান্দরবান, ১৯৯৯, বর্ষ- সাত, সংখ্যা- এক (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃ. ৩১

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

করেন। তিনি পাতঞ্জলীর ‘যোগদর্শন’ বৌদ্ধ যোগাচারে সংক্রামিত করে বৌদ্ধ যোগকে তন্ত্রে পরিণত করেন। তাঁরাই অনুমোদনে ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, ডাকিনী, পিশাচ, নানা দেবদেবী, নানা গুহ্যমন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ, গূঢ়াত্মক শব্দ, প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ঠানাদিতে প্রবেশ করে।[২২] তবে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রসার আচার্য অসংগের হাত ধরেই হোক বা শূন্যবাদের প্রবক্তা নাগার্জুনের কারণেই হোক মূলত এ হচ্ছে প্রাচীন ভারতের লৌকিক জীবনে চর্চিত ও প্রচলিত গূঢ় রহস্য, শক্তি বা জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস অথবা উচ্চারিত তন্ত্র-মন্ত্র-বুলি যার প্রতি সাধারণের পূর্ণ আস্থা স্থাপন করাই যে এই রূপান্তরের পেছনে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকবে এমন ধারণা অমূলক নয়। এক্ষেত্রে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সরে এসে বর্তমান সময়ে মারমা জাতিসত্তার ধর্ম সাধনার দিকে দৃষ্টি দিলেও ইতিহাসের ধারণার পিছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। ‘দেব দেবীর অজস্র ব্যবহার, তন্ত্র-মন্ত্র প্রয়োগ, প্রেত সাধনা প্রভৃতির সংমিশ্রণে মারমা সমাজে তান্ত্রিক ভিক্ষুদের অবস্থা এখন তুঙ্গে। তন্ত্র মন্ত্রের শীর্ষভাগে রয়েছেন বিভিন্ন প্রকার বিদ্যাধর (উইজ্জাধো)। বিদ্যাধরদের অনেক ক্ষমতা! তারা বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ। যেমন– পিয়সিদ্ধি (প্রিয়সিদ্ধি), কায়সিদ্ধি, ধনসিদ্ধি, পয়োগ সিদ্ধি (প্রয়োগ সিদ্ধি), মনোময় সিদ্ধি, আক্কাশ সিদ্ধি, আরোগ্য সিদ্ধি, আরো অনেক কিছু। সাধারণ মানুষ বিদ্যাধর হয়ে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করার জন্যেই মারমাদের সামাজিক চিন্তায় মন্ত্রতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে।’[২৩]

সুতরাং মারমাগণের ধর্মীয় সংস্কৃতির বিবর্তনের সাথে বেশকিছু ধর্ম-দর্শন, রীতি-আচার অনুষ্ঠানিকতার ক্রমাগত সংযোগ-সম্পর্ক আর বিরোধ-মিলনের ফলে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে, যা সহজেই অনুমেয়। কেননা পণ্ডিতগণের মতামত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্টপূর্ব শেষ বা খ্রিষ্টীয় শতকের প্রথম দিকের কোনো এক সময় থেকে আরাকানী শাসনামলের (মোটামুটি সতের শতক পর্যন্ত) রাষ্ট্রীয় সীমায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বিস্তার লাভ করে থাকবে। এবং এই বিস্তারের অনতিকাল পরেই বৌদ্ধধর্মের মূল দর্শনে মহাযান ও হীনযান দুটি পৃথক ধারায় বিভক্তি ঘটে। আরও পরবর্তী সময়ে মহাযান দর্শনের সাথে তন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি আরও একাধিক ও স্বতন্ত্র মত-পথের আবির্ভাব ও সংযুক্তি ঘটে বৌদ্ধধর্মায়তনে। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই সকল যান বা পথের বিস্তারে স্থানীয় বা লৌকিক পর্যায়ে চর্চিত তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, সনাতনী হিন্দু তান্ত্রিক স্রোতধারা আর প্রকৃতি পূজারি, সর্বপ্রাণবাদের নানাবিধ রীতি-নীতি আচার ব্যবহারের মিলন-বর্জন-আত্তীকরণ হয়ে থাকবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এবং এর সাথে আত্তীকৃত তন্ত্র-মন্ত্র-পূজা-আচার প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করার উদ্দেশ্য কেবল এই নয় যে, মারমা জাতি-সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশ ও বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা, বরং এই আলোচনা থেকে বিশেষত এটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কীভাবে একটি কৌম

---

২২ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষা: বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫২

২৩ মং সিং ঞো, মারমাদের সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসে ও দেব দেবীর অবস্থান : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, *সাংগু; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, বান্দরবান, ১৯৯৯, বর্ষ- সাত, সংখ্যা- এক (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ. ৩৫

সমাজ ব্যবস্থায় চর্চিত সমগ্র জীবনাচার আনুষ্ঠানিক বা ‘পরিবেশনামূলক’ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন, তান্ত্রিক-যোগাচার এবং সর্বপ্রাণবাদ এই তিনটি মূল স্রোতধারার সুদীর্ঘ বছরের মিলন-আত্তীকরণের মধ্য দিয়েই মূলত মারমা জাতিসত্তার সংস্কৃতি-সামগ্রিকতা (নানান দেব-দেবী, ধর্ম-দর্শন, পূজা-অর্চনা, গল্প-গাথা-কাহিনী অথবা নৃত্য-গীত-কাব্য, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি, প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে ভক্তি-বিশ্বাস-চর্চা, কৃষি ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট কৃত্য আচার উৎসব প্রভৃতি) বিনির্মিত হয়েছে এমন ধারণাই সঙ্গত। সম্ভবত এ কারণেই, জুমচাষ থেকে শুরু করে ঋতু আবর্তনের উৎসব-পার্বণ; ধর্মসংঘের ভিক্ষু থেকে শুরু করে অতিপ্রাকৃত শক্তি তাড়ানিয়া ওঝার মন্ত্র উচ্চারণ অথবা মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আত্মার মুক্তি প্রভৃতি, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, পরিবার অথবা সমাজের সমন্বিত অংশগ্রহণে জীবন উদ্‌যাপনের ভাষা হয়ে ওঠে সুর, ছন্দ, নৃত্য আর কাব্যময়। জীবন চর্চা এবং উদ্‌যাপনে সুর, ছন্দ, নৃত্য আর কাব্যের এই সর্বব্যাপী উপস্থিতির কারণেই বোধকরি বহিরাগত-ভিনদেশী চোখে পাহাড়ি জীবনের কঠিন আর বিরুদ্ধ বাস্তবতার গল্প ঢেকে যায় জুমচাষে পাহাড়ি রমনীর দেহ ভঙ্গিমায় নৃত্যের ছন্দ আবিষ্কারের ‘রোমান্টিক’ ধারণায়।

সুতরাং জাতি-সংস্কৃতির এ আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মারমাগণের যাপিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়– জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ অথবা কৃষিনির্ভর সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে রয়েছে পরিবেশনামূলক স্বতন্ত্র ও স্বকীয় আনুষ্ঠানিকতা। আর এ সবই পরিবেশিত হয়ে আসছে যুগ যুগান্তরের পরিক্রমায়। কখনো আত্তীকৃত ধর্মীয় দর্শন-তত্ত্বের বিশ্বাসে আবার কখনো তন্ত্র-মন্ত্র অথবা সর্বপ্রাণবাদের কৃত্য-আচারের পরম্পরাগত ধারাবাহিকতায়–

> এই জনগোষ্ঠীর স্বভাব-চরিত্র, ধ্যান-ধারণা তথা সংস্কৃতি অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে এই অরণ্য পরিবেশ প্রকৃতিকে ঘিরে। যদিওবা এদের সাংস্কৃতিক জীবন এদেশের অপরাপর জনগোষ্ঠীসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন প্রবাহের কোনো বিভাজ্য ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহ নয়। তথাপি এর প্রকাশ ভঙ্গি, চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্যে পরিসমন্বিত। এ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব নিজ নিজ জাতিগত বিকাশের সামাজিক স্তর ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী। এটা হয়েছে নিজ নিজ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ধর্ম ও প্রথা অনুসারে।[২৪]

অর্থাৎ মারমা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন যাপন বা উদ্‌যাপনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবেই পালন করা হয় এ সকল পূজা, আচার, অনুষ্ঠান। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বর্ষ, ঋতু, কাল অথবা ধর্ম ভিত্তিক উৎসব-অনুষ্ঠান যেমন– বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা (ওয়াগ্যোই), আষাঢ়ী পূর্ণিমা (ওয়াছো লাব্রো), মাঘী পূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান উৎসব, সাংগ্রাইং উৎসব (নববর্ষ উৎসব) প্রভৃতি; ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক পর্যায়ে তথা সামাজিক রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণার সাথে যুক্ত অনুষ্ঠান যেমন– শ্যাংপ্রুহ্ পোয়ে (বিবাহ

---

২৪ মং ক্য শোয়ে নু, মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, *সাংগু; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, বর্ষ: ছয়, সংখ্যা: এক, বান্দরবান, পৃ. ৭১

অনুষ্ঠান), ইং আসইক্ তাক্ পোয়ে (নবগৃহ প্রবেশ), কককসাইক চাহ্ পোয়ে (নবান্ন অনুষ্ঠান), ওয়াটার ফেস্টিভাল বা পানিখেলা উৎসব, রাথা ঙাং পোয়ে (রথ টানা উৎসব), পইংজারা পোয়ে (রাজপুণ্যাহ অনুষ্ঠান), চুং মাং লে (গৃহদেবতা পূজা) প্রভৃতি; প্রকৃতি পূজা, অতিপ্রাকৃত বা অপশক্তির প্রতি বিশ্বাসজাত পূজা-অনুষ্ঠান যেমন– স্বত্তবী পূজা (শনি পূজা), খ্যাংসাংমা (নদী-খাল পূজা), গংনাইত, ইংনাইত, চুংমালে নাইত্ পূজা ইত্যাদি পালন করা হয়ে থাকে।

ঋতু ভিত্তিক বৃত্তাকার জীবনাচার, সামাজিক অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অতিপ্রাকৃত শক্তির সাধনা, পূজা-অর্চনা অথবা সাধারণ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে একদিকে যেমন রয়েছে সুর, ছন্দ, নৃত্য, গীত, কাব্য প্রভৃতি উপাদানের সরব উপস্থিতি– কাপিয়া (কাব্য), সাখ্রারাং (গান), রুদু (গান), ডুং আক্কাহ্, ক্যাহ্ আক্কাহ্ (লোকনৃত্য), সইং আক্কাহ্ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নৃত্য), প্রদীপ নৃত্য, নে সমুই (পরীনৃত্য), মাছধরা নৃত্য, ব্লুকা (মুখোশ নৃত্য), লুবাইংকা (থালা নৃত্য), রাক্ষস নৃত্য, জুম নৃত্য, য়ইং (দোলনা নাচ), সাখ্রাং (রথটানা সংগীত), নাখ্রাং (গীতিকাব্য), লোক্কাহ নীতিহ্, মাঙ্গালা সৌক (নীতিকাব্য), কাপ্যা (গীতি), চেগাহ্থা (প্রবাদ বাক্য) প্রভৃতি। অন্যদিকে বৌদ্ধ জাতকের গল্প, বোধিসত্ত্বের কাহিনী, দেব-দেবী বিষয়ক আখ্যান, উপাখ্যান, কিংবদন্তির চর্চায় রয়েছে পালা, নাট্য বা গীতিকাব্য প্রভৃতি আখ্যানধর্মী পরিবেশনা– 'জ্যা' বা 'জাইত' ও 'পাংখুং (সিদ্দার্থ, সুরিয়াহ গুংমা, পদুমাওয়াদি, আলংবাহ, মা চ ক্যান, সাবাইয়াহ প্রভৃতি পালা বা আখ্যান), 'লুঙংদি' (কাব্য), আইং (নাট্য), ককানু পাঙখুং (নাট্য), থাম্রা পাঙখুং (নাট্য) প্রভৃতি।

মারমা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রচলিত নানা বৈচিত্র্যের পরিবেশনা থেকে মাঠ-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুর, ছন্দ, নৃত্য, গীত, কাব্য সমৃদ্ধ এবং একই সাথে কুশীলবের মনোদৈহিক ও শারীরিক কলা-কৌশলের সাথে বহুমাত্রিক অভিব্যক্তির প্রকাশ নিশ্চিত করে এমন সাতটি পরিবেশনাকে বক্ষ্যমাণ গবেষণার বিশদ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো– *জ্যা নৃত্য, পাংখুং নাট্য, বাঘ নৃত্য, থালা নৃত্য* এবং তিনটি ধ্যান পরিবেশনা– তান্ত্রিক ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতির *দম চর্চা, ইচ্ছা ছায়া ও চক্রামন*।

মারমা জাতি-সংস্কৃতিতে ওঝা, তান্ত্রিক সাধক, ধর্মীয় পুরোহিতদের উপস্থিতি ও প্রভাব বেশ জোরালো। অন্যদের মতো এঁরাও যাপিত সমাজ-বাস্তবতার নানা বিধি-বিধান-অনুষঙ্গের সাথে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-মানত, তান্ত্রিক বা কবিরাজি চিকিৎসা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয় ও চর্চার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চাহিদার খোরাক মিটায়। তন্ত্র-মন্ত্র-কৃত্য সাধনার এই সংযুক্তি যাপিত জীবনের বিশেষ বিশেষ সময়ে এমন সুনির্দিষ্ট অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যা কখনো স্থায়ীভাবে– বয়ঃসন্ধিকাল, বিবাহ, মৃত্যু কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান অথবা অস্থায়ী রূপে–ঋতু ভিত্তিক উৎসব, মানত বা ব্রত, শুভ-অশুভ শক্তির মোকাবিলায় 'দশা' বা 'ভর' কেন্দ্রিক কৃত্যাচারের মাধ্যমে ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে "ভিন্ন" এক জীবন-বাস্তবতার সাথে যুক্ত করে দেয়। তন্ত্র-মন্ত্র-ধ্যান সাধনার মাধ্যমে 'ভিন্ন' এই জীবন-বাস্তবতায় প্রবেশ বা প্রস্থানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 'দম', 'মনোযোগ',

‘কল্পনা’, ‘ভাব-আবেগের’ প্রথা ও পরম্পরাগত সাধনা/চর্চা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কখনো কখনো। কেননা এগুলো চর্চাকারীর মনোদৈহিক অভিব্যক্তিতে, কল্পনায়, পদ্ধতিগত শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। আর এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক ওঝা এবং দুইজন শৌখিন ধ্যান-সাধকের সাধন পদ্ধতি বক্ষ্যমাণ গবেষণার বিশদ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং মারমা জাতি-সংস্কৃতিতে চর্চিত এবং মাঠ পর্যবেক্ষণ থেকে সংগৃহীত মোট সাতটি পরিবেশনা– *জ্যা নৃত্য*, *পাংখুং নাট্য*, *বাঘ নৃত্য*, *থালা নৃত্য* এবং তান্ত্রিক ও ধ্যান সাধনা থেকে *দম*, *ইচ্ছা ছায়া এবং চক্রামন* পরিবেশনা বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভের বিশদ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– মারমা

১.২.১ লংবাই আক্কা (থালা নৃত্য)

ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন

'থালা নৃত্য' মারমা জাতি-সংস্কৃতির একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিনোদনমূলক দলীয় পরিবেশনা। বর্তমানে মারমা সাংস্কৃতিক চর্চায় এই পরিবেশনাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত একটি নৃত্য শৈলী। যদিও মারমা সংস্কৃতি সচেতন ও বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন যে, নৃত্যের এই রীতিটি মারমা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অধুনা আত্তীকৃত একটি ধারা। যার সাথে সর্বপ্রাণবাদ, তান্ত্রিক রীতি-নীতি, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন প্রভৃতি অতীত উৎস থেকে জাত অথবা সংশ্লিষ্ট নৃত্য-গীতধর্মী যে সকল পরিবেশনার পরম্পরাগত-চর্চার ঐতিহ্য রয়েছে 'থালা নৃত্যে'র ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। মারমা সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-পরিচালক মং ক্য শোয়েনু নেভীর মতে, "থালা নৃত্য আমার কাছে একটু কন্ট্রাডিক্টরি বিষয়। আসলে থালা নৃত্য বলে কোনো কিছু নেই... থালা নিয়ে নৃত্য করতে করতে এটি থালা নৃত্য হয়ে গেছে। থালা কেন নাচে তার কোনো কারণ আমার জানা নেই... থালা নৃত্য কায়িক শ্রম মাত্র এবং এর মধ্যে কৌশলটাই (ভারসাম্য) মুখ্য।"[২৫] ইতিহাসের তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, সাধারণত মারমা জাতিতাত্ত্বিক সামাজিক উৎসব বিশেষত সর্দার কিংবা রাজার অভিষেক উপলক্ষে মহা-আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানেই প্রধানত লংবাই আক্কা বা 'থালা নৃত্যে'র পরিবেশন করা হতো। এক্ষেত্রে সর্দার, রাজা বা দর্শকের মনরঞ্জন করাই ছিল এই মহা-আয়োজনের মূল অনুপ্রেরণা। তবে, বর্তমানে এই নৃত্যটি মারমা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নগরকেন্দ্রিক নানাবিধ উৎসব, প্রদর্শনী, অভিষেক অনুষ্ঠান অথবা নগরায়তনে গড়ে ওঠা মারমা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দেশ বা বিদেশে পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠানের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের উপাদান বা আইটেম হিসেবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। 'থালা নৃত্যটি' মারমা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ঠিক কখন থেকে যুক্ত হয়েছে বা এই সাংস্কৃতিক সংযুক্তির মূলে কৃত্য-উৎসব-পার্বণের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা সে সম্পর্কে ইতিহাস নির্ভর পর্যাপ্ত ও বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন গবেষক থালা নৃত্যকে একটি 'লোকনৃত্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন– "মারমা উপজাতীয় সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য হিসেবে 'লংবাই আক্কা' বেশ জনপ্রিয়।"[২৬] এ উক্তির মাধ্যমে থালা নৃত্যকে 'উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য' হিসেবে আখ্যায়িত করে মূলত এই নৃত্যের পরম্পরাগত চর্চার ঐতিহ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন মারমা সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব নেভী, তিনি মনে করেন– "থালা নৃত্য আমার মনে হয় পূর্বদেশীয় থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের একটি জনপ্রিয়

---

২৫ সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

২৬ জাফর আহমাদ হানাফী, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মে-১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ৪৩

সাংস্কৃতিক উপাদান যা পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে প্রচলিত হয় থাকতে পারে। থালা নৃত্যে কৌশল প্রদর্শনটাই মূলকথা। এর সাথে ধর্মীয় কৃত্য বা উৎসবের কোনো সম্পর্ক নেই।"[২৭] থালা নৃত্যের উৎস ও বিবর্তন প্রসঙ্গে নেভীর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এই মন্তব্যে মারমা জাতি-সংস্কৃতিতে প্রচলিত ধর্মীয় উৎসব এবং সামাজিক কৃত্য সংশ্লিষ্ট নৃত্যের সাথে 'থালা নৃত্যের' সংযুক্তি অনুপস্থিত। তবে গবেষক হানাফী এবং মারমা সংস্কৃতি কর্মী নেভী উভয়ে থালা নৃত্যকে ধর্ম ও কৃত্য নিরপেক্ষ একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক নৃত্য (কমিউনিটি ডান্স) হিসেবে অভিহিত করেছেন। মারমা জাতিতাত্ত্বিক নৃত্য 'সংকেতাবদ্ধ' (কোডিফাইড) নয়, তথাপি এর একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে গল্প, আখ্যান অথবা কৃত্য-আচারের বিষয়বস্তুকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সমন্বিত তাল, লয় ও ছন্দের আশ্রয়ে সাধারণ ইঙ্গিতময় অভিব্যক্তিতে অর্থপূর্ণ করে তোলা। যেমন- হস্ত, পদ, কোমর তথা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ ও নির্দিষ্ট ভঙ্গির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে জুম নৃত্যের বীজ বোনা, ফসল কাটা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমগুলো তুলে ধরা হয়। কিন্তু 'থালা নৃত্য' এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, কেননা এই নৃতে হস্তমুদ্রা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। তাছাড়া এ নৃত্যে বিষয়ের সাধারণ অর্থপূর্ণ প্রকাশের চেয়ে থালা ঘূর্ণনের 'নান্দনিক কৌশল' প্রদর্শনই মুখ্য হয়ে ওঠে।

তবে মারমা সংস্কৃতিতে নব্য-আত্তীকৃত 'থালা নৃত্যে'র এই রীতিটির সাথে ধর্মীয় রীতি-নীতি, কৃত্য-আচার-উৎসব ভিত্তিক নানান অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ-যোগ না থাকলেও প্রতিবেশী ও নিকটাবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারী বেশকিছু নৃ-গোষ্ঠীর পরিবেশনায় রয়েছে এই নৃত্যের অতীত ও ঐতিহ্যের সংশ্লিষ্টতা। ফলে প্রতিবেশী ও নিকটাবর্তী দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে চর্চিত থালা নৃত্যের সাথে মারমাদের 'থালা নৃত্যের' একটি যোগসূত্র নির্ণয় করা যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিবেশিত 'থালা নৃত্য' মূলত কৃষি ভিত্তিক উৎসব বা সামাজিক কৃত্য-আচার উদ্‌যাপনের মাধ্যম হিসেবে চর্চিত হচ্ছে বহু বছর ধরে। ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রা অঞ্চলে ফসল কাটার মৌসুমে 'মিয়াংকাবাউ' জাতিগোষ্ঠী তাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে 'টারি পিরিং' বা প্লেট ড্যান্স পরিবেশন করে থাকে। হাতের তালুতে থালা রেখে খালি পায়ের দ্রুতলয়ে সঞ্চালিত এই নৃত্যে দেহের ভাষা ও বিন্যাসে প্রতীকীরূপে মাঠে কর্মরত মানুষেরা কীভাবে বীজ বুনন থেকে ফসল ঘরে তোলে তার পর্যায়ক্রমগুলি প্রদর্শন করা হয়। এবং একই সাথে এই ফসল তাদের বেঁচে থাকার অন্ন জোগান দেয় বলে নৃত্যের ছন্দে প্রকাশ করা হয় গভীর কৃতজ্ঞতা।[২৮] অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার 'ডিমাসা' নৃ-গোষ্ঠী যারা ১৬ শতকে বার্মা-থাইল্যান্ড থেকে 'অহমদের' অভিবাসনের বহু আগে থেকেই এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল– এদের কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতায় 'বাইমাইজাই' বা থালা নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। আবার 'শাদ প্লাঙ' অর্থাৎ শাদ= নৃত্য এবং প্লাঙ= থালা বা থালা নৃত্যের প্রচলন রয়েছে মেঘালয়ের জৈন্তিয়া পাহাড়ে ও আসামের জৈন্তিয়া ট্রাইব

---

২৭ সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

২৮ http://nusantara-cultures.blogspot.com/2011/06/tari-piring-piringplate-dance.html#sthash.B6J0WKXf.dpuf, 08.08.2015

বা নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে। মেঘালয়ের জৈন্তিয়া পাহাড়ে এবং আসামের ডিমা হাসাও জেলায় বসবাসরত একটি বৃহৎ সংখ্যক জৈন্তিয়া নৃ-গোষ্ঠী যারা মূলত 'খাসি' নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারভুক্ত 'পিনার বা সিনটেঙ' গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। অতীতে এই জৈন্তিয়া নৃ-গোষ্ঠীর নিজেদের শাসনাধীন রাজ্য ছিল, যে রাজ্যের আওতায় ছিল মেঘালয়ের জৈন্তিয়া পাহাড় এবং বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল। ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, "১৮৮০ সালে বৃটিশ কলোনীর যুগে এই জৈন্তিয়া নৃ-গোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে সুপারি আবাদের জন্য আসামের জতিঙা অঞ্চলে ডিমা হাসাও জেলায় অভিবাসন করানো হয়।"[২৯] সুতরাং পার্শ্ববর্তী জাতিসত্তায় প্রচলিত এ নৃত্য বিশেষ করে আসাম ও মেঘালয়ে 'থালা নৃত্য' আঙ্গিকের বিস্তার ও ব্যাপকতা বিবর্তনের ধারায় কোনো এক সময়ে মারমা জাতি-সংস্কৃতিতে এই নৃত্য আঙ্গিকটির গ্রহণ, আত্তীকরণ ও প্রদর্শনে প্রভাবিত করে থাকবে এমন অনুমান অমূলক নয়। আর এই অনুমানের পক্ষে যুক্তি হিসেবে নৃত্য আঙ্গিকের বিন্যাস-সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা যেতে পারে। কেননা ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রায় প্রচলিত থালা নৃত্যের দেহের বিন্যাস, শৌর্য, ছন্দ ও গতির প্রয়োগে যে আঙ্গিক বিনির্মিত হয় তা বান্দরবানে প্রচলিত 'থালা নৃত্যে' অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে মেঘালয়ে প্রচলিত 'থালা নৃত্যে'র সাথে মারমাদের প্রদর্শিত 'থালা নৃত্যে'র দেহ-বিন্যাস ও কৌশল প্রদর্শনে বড় ধরনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

২৯https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.159457397446434.36608.120095854715922, 08.08.2015

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

বান্দরবানের ‘ট্রাইবাল কালচারাল ইন্সটিটিউট’ (টিসিআই)–এর কালচারাল অফিসার এবং মারমা সাংস্কৃতিক সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষক চ্য থুই প্রু-এর ব্যবস্থাপনায় ২৬/১০/২০১৪ টিসিআই-এর মহড়া কক্ষে ‘থালা নৃত্য’ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পরিবেশনায় অংশ নেওয়া তিন জন নৃত্য শিল্পী– দাও ওয়াঙ প্রু (২৬) যিনি একাধারে ছাত্র এবং খণ্ডকালীন এনজিও কর্মী, অমি প্রু মারমা (১৮) অধ্যয়নরত একজন ছাত্র এবং আইয়াও ইঙখাই মারমা (২৭) পেশাগতভাবে একজন ব্যবসায়ী। ‘থালা নৃত্য’ পরিবেশনায় এই তিন কুশীলবের রয়েছে দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা– দাও ওয়াঙ প্রু ১৫ বছর, অমি প্রু মারমা ৭ বছর এবং আইয়াও ইঙখাই মারমা ১০ বছর যাবৎ এই নৃত্য পরিবেশন করে আসছেন। এরা সাধারণত টিসিআই পরিচালিত নৃত্য বিভাগের অধীনে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন।

‘থালা নৃত্য’ চর্চার এই ধারাটি শিক্ষক/ওস্তাদ বা গুরুমুখী। মারমা সাংস্কৃতি অঙ্গনে সক্রিয় এক বা একাধিক অভিজ্ঞ নৃত্যপ্রশিক্ষক টিসিআই-এর নৃত্য শাখায় অংশ নেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। এছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অধীনেও শিক্ষার্থীরা ‘থালা নৃত্যে’র তামিল গ্রহণ করে থাকেন। ‘থালা নৃত্যে’র প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটি ‘অনুকরণাত্মক’। অর্থাৎ গুরু/শিক্ষক/ওস্তাদ যে প্রক্রিয়ায় নৃত্যের কৌশল বা পদ্ধতি প্রদর্শন/প্রশিক্ষণ দান করে থাকেন ছাত্র/শিষ্য ঠিক ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই শারীরীকরণের মাধ্যমে নৃত্যটি আয়ত্ত করে থাকেন। প্রশিক্ষণের এই পদ্ধতিতে দেহের ভঙ্গি, বিন্যাস, চলন, তাল, লয়, ছন্দ প্রভৃতি যথাযথ অনুকরণের মাধ্যমে উৎকর্ষ অর্জন করতে পারাই হচ্ছে একজন শিল্পীর দক্ষতা যাচাইয়ের পরিমাপক। তবে টিসিআই-এর নৃত্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে দুটি প্রবণতার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। একদিকে যেমন ‘থালা নৃত্যে’র প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত সকল আঙ্গিক, কৌশল এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ গুরুত্বের সাথে অনুকরণ করা হয়, অন্যদিকে চর্চার প্রচলিত রীতি-আঙ্গিকের সাথে নৃত্যকলার নাগরিক চিন্তা, কৌশল ও শিল্পভাবনাকেও সচেতনভাবে সমন্বিত করা করা হয়। নৃত্যের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা প্রসঙ্গে চ্য থুই প্রু বলেন, “এখানে আমরা আমাদের নৃত্যের (মারমা জাতিতাত্ত্বিক নৃত্যকলা) মৌলকত্ব বজায় রেখে এর সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোরিওগ্রাফি ব্যবহার করে থাকি।”[৩০] উদ্ধৃত উক্তির প্রতিফলন লক্ষ করা যায় চ্য থুই প্রু-এর ব্যবস্থাপনায় পরিবেশিত ‘থালা নৃত্যে’র মঞ্চ এবং দেহের ভাষা ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে, কেননা এ পরিবেশনায় সমসাময়িক কোরিওগ্রাফির প্রয়োগ ভাবনার সমন্বয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ‘থালা নৃত্যের’ আঙ্গিক, কৌশল এবং রীতির প্রদর্শনে জাতিতাত্ত্বিক নৃত্যকলার অন্তর্গত শক্তি– ভক্তি, বিশ্বাস ও কৃত্যানুগ শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও চর্চার বিষয়টি গৌণ হয়ে সমসাময়িক নৃত্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৌশলের প্রতিফলন মুখ্য হয়ে ওঠে। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ বিনোদনের

৩০ চ্য থুই প্রু, সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৬/১০/২০১৪ টিসিআই মহড়া কক্ষ, বান্দরবান

মাধ্যম হিসেবে ‘থালা নৃত্যের’ রসিক ও পৃষ্ঠপোষক প্রধানত মধ্য ও উচ্চবিত্ত নাগরিকজন, সেহেতু ‘থালা নৃত্যে’র প্রশিক্ষণ ও পরিবেশনায় নাগরিক শিল্পকলার চিন্তা ও কৌশলের প্রয়োগ ভাবনার সমন্বয় ঘটে থাকবে সম্ভবত এটাই সঙ্গত।

সাধারণত জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি অথবা এনজিও পরিচালিত উৎসব, অনুষ্ঠান, কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বা নাগরিক পর্যায়ে মারমাদের উদ্‌যাপিত উৎসব, অনুষ্ঠান অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিনোদনমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ‘থালা নৃত্য’ আমন্ত্রিত বা পরিবেশিত হয়ে থাকে। আবার কখনো দল বা সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত নৃত্যানুষ্ঠানের অংশ হিসেবে যুক্ত হয় এবং পেশাদারি অথবা বায়নাসূত্রে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। যেহেতু নৃত্যের এই ধারাটি কৃষিভিত্তিক, সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসব-আনুষ্ঠানিকতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, সেহেতু বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করে বৎসরের নির্দিষ্ট কোনো এক বা একাধিক সময়ে পরিবেশন করার নিয়ম-রীতি রক্ষার বাধ্যবাধকতাও নেই। বলা যায় বছরের যে কোনো সময় এই নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে, যা নির্ভর করে মূলত বায়না বা আমন্ত্রণকারী অথবা সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ওপর। এক্ষেত্রে বায়না বা আমন্ত্রণকারীদের অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক বা নাগরিক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকাংশই সর্বজনীন উৎসব, প্রতিষ্ঠান, সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে বায়না বা আমন্ত্রণ করে থাকেন।

সাধারণত বিশেষ উৎসব, অনুষ্ঠান উপলক্ষে ‘নির্মিত’ মঞ্চেই ‘থালা নৃত্য’ পরিবেশিত হয়ে থাকে। যদিও জাতি-সংস্কৃতির কৃত্যমূলক পরিবেশনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আসর ভাবনা ও পরিকল্পনার বিষয়টি অত্যন্ত নমনীয় হয়ে থাকে। বাড়ির উঠান বা খোলা জায়গার ন্যূনতম পরিসরের সমতল ভূমি, অস্থায়ী অথবা স্থায়ী মঞ্চসহ প্রায় সকল প্রকার আয়তনে স্বাভাবিক ভাবেই এই জাতীয় পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। কিন্তু ‘থালা নৃত্যের’ সাথে মারমা জনগোষ্ঠীর সংযোগ, সম্পর্ক এবং পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরায়তনিক উৎসব/অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক হওয়ায় স্থায়ী মঞ্চ– অডিটোরিয়াম অথবা অস্থায়ীভাবে নির্মিত মঞ্চই হচ্ছে এর জন্য উপযুক্ত আয়তন।

পরিবেশন ও বিশ্লেষণ

মারমা সংস্কৃতিতে থালা নৃত্য 'লংবাই আক্কা' নামে পরিচিত। 'লংবাই' হচ্ছে থালা আর 'আক্কা' মানে নৃত্য। 'থালা নৃত্যে'র মূল আকর্ষণ হচ্ছে দুটি কাঁসার থালা, যা আঙুলের সাহায্য ছাড়াই কেবল হাতের তালুতে আলতো করে রেখে উপরে-নিচে, ডানে-বামে, সামনে-পিছনে বৃত্তাকার অথবা উল্লম্ব প্রভৃতি নানান দিকে সুর-সংগীতের তালে দেহের ছন্দে নৃত্যরূপ-ঘূর্ণন-পারঙ্গমতা প্রদর্শন করে। প্রচলিত নিয়মানুসারে নৃত্যশিল্পীদের সারিবদ্ধ মঞ্চে প্রবেশ, পরিকল্পিত মঞ্চ ও দেহ বিন্যাস অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ অতঃপর নির্দিষ্ট সুর ও তাল অনুসারে নৃত্যের আরম্ভ ও নির্ধারিত বিন্যাস কাঠামো অনুসারে সমাপ্ত হয় এই 'থালা নৃত্য'। মূলত কণ্ঠশিল্পীদের গানের সুর ও তালে অথবা সিডি/ডিভিডি/মোবাইলে ধারণকৃত সুর ও তালে 'থালা নৃত্য' পরিবেশিত হয়ে থাকে, আর এক্ষেত্রে জাতিতাত্ত্বিক জীবন ও প্রকৃতি অথবা রোমান্টিক গানের সুরের ব্যবহার সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সাধারণত একটি মারমা সংগীতের পরিধি ও বিস্তারে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয়, সেটুকু সময়ের পরিধিতেই 'থালা নৃত্যের' নৃত্যরূপ দেহ-বিন্যাস ও থালার ঘূর্ণন-শৈলী সম্পূর্ণ করা হয়ে থাকে। তবে থালার ঘূর্ণন প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগীতের ভাব-অর্থ প্রকাশ করা নয় বরং সংগীতটির তাল ও ছন্দ অনুসরণ করে ঘূর্ণন-শৈলীর নান্দনিক কৌশল প্রদর্শন করাই হচ্ছে এই নৃত্যের মূল উদ্দেশ্য। পরিবেশনার রীতিগত দিক থেকেও এই নৃত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় বা কৃত্যমূলক গল্প-কথন অথবা নির্ধারিত বিষয়ের ভাবগত অর্থ, অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ সীমিত। সাধারণত সংকেতাবদ্ধ নৃত্য বা ধ্রুপদী নৃত্য ব্যতীত ধর্মনিরপেক্ষ লোকনৃত্য অথবা কৃত্যমূলক নৃত্যের ক্ষেত্রে সুর, তাল, লয় ও ছন্দের শরীরে ভর করে নৃত্য শিল্পীগণ হস্ত মুদ্রা/বিক্ষেপ, মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি, কোমর ভঙ্গি এবং পদ সঞ্চালন সহযোগে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের ভাবগত অর্থ অথবা ইঙ্গিতধর্মী অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু 'থালা নৃত্যে' শিল্পীর দুটি হাতের তালুতে সার্বক্ষণিকভাবে কাঁসার থালা স্থাপনের কারণে হস্ত বিক্ষেপের মাধ্যমে বিষয়ের ভাবগত অর্থ বা ইঙ্গিতধর্মী অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ সম্পূর্ণতই সীমিত হয়ে পড়ে। কেবল হাতের ক্ষেত্রেই নয়, 'থালা নৃত্য' শিল্পীর মুখাবয়বের অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিষয়ের অর্থপূর্ণ বৈচিত্র্যের চেয়ে সৌম্যময় নির্লিপ্ত-স্থিরতাই অধিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে দলগত এই নৃত্যে রয়েছে নানান বৈচিত্র্য– কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো কিছুটা হাঁটুভেঙে আবার বসে থেকে থালা হাতে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। হাতের তালুর উপরে রাখা থালার ঘূর্ণন ছন্দের সাথে পায়ের ছন্দবদ্ধ প্রয়োগ নৃত্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। দক্ষ শিল্পীদের কেউ কেউ আবার কলসের উপর দাঁড়িয়েও 'থালা নৃত্য' পরিবেশন করে থাকে বলে জানা যায়। তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নগর বা শহরকেন্দ্রিক নৃত্যশিল্পের সমসাময়িক চিন্তা-ধারা ও প্রায়োগিক ভাবনার প্রভাবে বর্তমানে 'থালা নৃত্যে' যুক্ত হয়েছে নৃত্য শিল্পীদের চলন বিন্যাস বা কোরিওগ্রাফি। কোরিওগ্রাফির ছন্দবদ্ধ প্রয়োগের মধ্যেই

'থালা নৃত্যে'র তিনটি পর্যায়– দাঁড়িয়ে, হাঁটুভেঙে এবং বসে থালা ও নৃত্যের নৈপুণ্য ক্রমানুসারে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। 'থালা নৃত্যে'র এই সার্বিক পর্যবেক্ষণ সূত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, দুই হাতের তালুর ওপর দুটি থালা সার্বক্ষণিক স্থির অবস্থায় রেখেই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিন্যাস ও সুললিত দেহ-ভাষার সমন্বয়ে পর্যায়ক্রমে অথবা যৌথভাবে থালা দুটির সঞ্চালন ও ঘূর্ণন-শৈলী প্রদর্শন করা হয়। থালার নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মূলত বৃত্তাকার-সঞ্চালন কৌশল অধিক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ থালা দুটি নির্দিষ্ট একটি অবস্থান (পজিশন) থেকে শুরু করে বৃত্তাকার সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে পুনরায় শুরুর অবস্থানে ফিরে এসে বৃত্ত সম্পাদন করে, যা এ নৃত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে বা ভঙ্গিতে দুই হাতের তালুর ওপর রাখা দুটি (কনুই ৯০ ডিগ্রি পজিশনে ভেঙে সামনে বাড়িয়ে দেওয়া দুই হাতের তালুর ওপর পেতে রাখা দুটি থালা– এইরূপ অবস্থানে) থালার এক বা একাধিক ঘূর্ণন ও সঞ্চালন অবস্থায় থালাটিকে যথাযথভাবে স্থির রেখে পুনরায় ঐ একই ভঙ্গি বা শুরুর অবস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। যেহেতু সঞ্চালন ও ঘূর্ণন মুহূর্তে থালাটিকে হাতের তালুতে স্থির রাখাটাই হচ্ছে এ নৃত্যের মূল লক্ষ্য, সেহেতু হাত থেকে থালাটি পড়ে যাবে কি যাবে না এই দুই বিপরীতের মাঝে সৃষ্ট সার্বক্ষণিক একটি 'উত্তেজনা' (টেনশন) ক্রিয়াশীল থাকে, যা দর্শকের নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহ তৈরিতে সহায়ক হয়ে ওঠে। ফলে একটি নৃত্য পরিবেশনা উপভোগ করা সত্ত্বেও দর্শক চিত্তে ললিত-বিনোদন অতিরিক্ত এমন একটি অনুভূতি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ নৈপুণ্য প্রদর্শনকালীন শিল্পীর হস্তে-স্থিত থালাটি হাতে ধরে রাখতে পারবে কি পারবে না এমন একটি অনুভূতি অথবা অন্যভাবে বলা যায় দড়াবাজি প্রত্যক্ষণে সফল হওয়া বা না হওয়ার একটা অনুভূতি পরিবেশনাটিকে প্রাণবন্ত করে রাখে।

দ্বিতীয়ত, ঝুঁকিপূর্ণ চলন ও হাতের ঘূর্ণন মুহূর্তে থালা দুটিকে স্থির রেখে নৃত্যের তাল, লয়, ছন্দ এবং আঙ্গিক চলন বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন শরীরের একাধিক ভরকেন্দ্রের সাথে বিভিন্ন অঙ্গ এবং থালাযুক্ত হাতের ভারসাম্যের মধ্যে একটি 'স্থায়ী অ-স্থির স্থিতি'[৩১] অবস্থা তৈরি করা। অর্থাৎ শরীরে একাধিক ভরকেন্দ্রের ক্রমাগত পরিবর্তন বা ভরের একটি কেন্দ্র থেকে আরেকটি কেন্দ্রে ক্রমাগত স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে ভারসাম্যকে সচল তথাপি নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থির রাখা। কেননা থালার ঘুর্ণনের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ পদ-সঞ্চালনের ফলে শরীরের ভরকেন্দ্র কোনো একটি বিন্দুতে স্থির না থেকে কখনো ডান পা, কখনো বাম পা আবার কখনো কোমরে স্থানান্তরিত হয়। এ অবস্থায় নৃত্যের তাল ও ছন্দ অনুসরণ করে হাতের তালুতে রাখা থালা বিভিন্ন দিকে ঘোরানো এবং এর পতন রোধের জন্যই নৃত্য শিল্পীকে সার্বক্ষণিকভাবে 'স্থায়ী অ-স্থির স্থিতি' অর্থাৎ সচল

---

৩১ 'স্থায়ী অ-স্থির স্থিতি' ধারণাটি A Dictionary of Theatre Anthropology গ্রন্থের 'ভারসাম্য' প্রসঙ্গে আলোচিত permanently unstable balance-এর ধারণা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে- Why do all codified performance forms in both the Orient and the Occident contain this constant: the deformation of the daily techniques of walking, moving through space and keeping the body immobile? This deformation of daily body technique, this extra-daily technique, is essentially based on an alteration of balance. Its purpose is to create a condition of **permanently unstable balance**.
Eugenio Barba & Nicola Savarage, *A Dictionary of Theatre Anthropology* , Routledge, London, 1991, পৃ. ৩৮

ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে হয়। সচল ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখার জন্য ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত কব্জি, কনুই, কাঁধ, ঘাড়, মেরুদণ্ড, কোমর ও পদ-যুগলের সাবলীল সমন্বয়ও এই ক্ষেত্রে 'স্থায়ী অ-স্থির স্থিতি' তৈরিতে সহায়তা করে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, শরীরের একাধিক ভরকেন্দ্রের সাথে ভারসাম্যের ক্রমিক পরিবর্তন ও স্থানান্তরের মাধ্যমে চলমান ঘূর্ণন প্রক্রিয়া শিল্পীর নৃত্যরূপ উপস্থিতিকে 'বর্ধনশীল' করে তোলে, প্রাথমিকভাবে যা দর্শকের গভীর মনোযোগ আর্কষণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই 'বর্ধন' কেবল ভৌত-শরীরেই ঘটে তা নয়, এটি আন্তর-শরীর বা 'মনে'র ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়, যা শিল্পীকে এক 'নতুন অভিজ্ঞতার' মুখে দাঁড় করায়। সুর, ছন্দ ও তালের সাথে শরীরের ভরকেন্দ্র ও ভারসাম্যের সমন্বিত প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের ফলে ভৌত-শরীরের সাথে আন্তর-শরীরের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত মিলন ঘটে, সেটা একজন নৃত্য শিল্পীকে একটি 'নতুন অভিজ্ঞতা'র সম্মুখেদাঁড় করাতে পারে। মূলত এই সফল 'অভিজ্ঞতা' শিল্পীর 'প্রকাশ পূর্ব অবস্থা'কে (প্রি এক্সপ্রেসিভ লেভেল) এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও দৃঢ় মানসিক স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম, যা একই সাথে 'দড়াবাজি' তুল্য 'থালা নৃত্যে' শিল্পীর দেহে ভাষায় নৈপুণ্য প্রদর্শনীর সমান্তরালে থালার নান্দনিক ঘূর্ণনকালীন পতন প্রতিরোধ করে সাফল্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

দুই হাতের পর্যায়ক্রমিক এবং সমান্তরাল ঘূর্ণন-শৈলীর প্রদর্শন 'থালা নৃত্যের' একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটি কেবল হাতের তালুতে রাখা থালার ঘূর্ণন নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তা নয় বরং হাতের এই ঘূর্ণন-শৈলী একদিকে যেমন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ– কব্জি, কনুই, ঘাড়, কাঁধ, মেরুদণ্ড, কোমর, হাঁটু এবং পদযুগলসহ শরীরে পেশির বিন্যাসগত উত্তেজনাকে (মাসকিউলার টেনশন) যুক্ত করতে সক্ষম, অন্যদিকে তা আবার নৃত্যের ছন্দে চলমান শরীরের ভারসাম্য সুরক্ষার যাথাযথ অভিজ্ঞতা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং 'থালা নৃত্যের' ঘূর্ণন-শৈলীর সামগ্রিক গুণাগুণ বিচার পরবর্তী এই প্রক্রিয়াটিকে কেবল একটি নান্দনিক 'কৌশল' ও 'চর্চা' হিসেবে না দেখে অভিনেতার শরীর ও মনের সমন্বিত অর্থাৎ মনোদৈহিক প্রস্তুতির উপায় হিসেবেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ 'থালা নৃত্য' চর্চায় 'ভরকেন্দ্র', 'ভারসাম্য' ও 'ঘূর্ণন' এসকল বহুমুখী ও পরস্পর সম্পর্কিত ভৌত-শারীরিক অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন শহরকেন্দ্রিক একজন অভিনেতার বহুমুখী শরীর-সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে, তেমনি এ প্রক্রিয়ার সাথে 'কল্পনা' প্রযুক্ত অনুশীলন বা চর্চার মাধ্যমে মনোদৈহিক অভিজ্ঞতার উন্নয়নেও কার্যকর হতে পারে। কেননা অভিনেতার মঞ্চে অবস্থিত সময়ের সবটুকুই কাল্পনিক একই সাথে তা নতুন জীবনের কথা বলে। এই নতুন জীবনের মঞ্চ-উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত শরীর যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অভিনেতার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের মাধ্যমে অন্তরের 'সত্যমূলক' অনুভূতির প্রকাশ। আর এটিকে যদি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই "আমাদের ভৌত শরীরটি স্বীয় আন্তর স্পন্দন গ্রহণ এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ করে মঞ্চ থেকে দর্শকেদের সামনে উপস্থিত করতে অধিক থেকে অধিকতর অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তাই আমাদের একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক

অনুশীলনী ও শারীরিক অনুশীলনী করতে হবে।"[৩২] এক্ষেত্রে 'থালা নৃত্যে'র বিশ্লেষণলব্ধ 'ভরকেন্দ্র', 'ভারসাম্য' ও 'ঘূর্ণন কৌশল'-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে বা অনুশীলনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে শহরকেন্দ্রিক অভিনেতার মনোদৈহিক অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়– 'থালা নৃত্যে' থালার ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত গুণাগুণ, কৌশল ও বৈশিষ্ট্যকে কেবল দুই হাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ক্রমানুসারে এবং পর্যায়ক্রমে মেরুদণ্ড, কোমর, হাঁটু ও পা'য়ের সাথেও সংযুক্ত করা যেতে পারে। আর এর সমান্তরালে, সম্প্রসারিত শরীরে ঘূর্ণনের সাথে আন্তর স্পন্দন বা নাচনের কাল্পনিক সংযুক্তি ঘটিয়ে নিরবচ্ছিন্ন এবং নতুন কোনো মনোদৈহিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করাও এক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। অর্থাৎ ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কল্পনা এবং ঘূর্ণন সদৃশ কোনো ভাব/ভক্তি/বিশ্বাস/বস্তুর চিত্রকল্পের সাথে শরীরের ঘূর্ণনকে সংযুক্ত করে মনোদৈহিক অভিব্যক্তিকে সক্রিয় ও সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়– অভিনেতা তাঁর শরীরে চলমান দোলা/ঘূর্ণনের গতি ও ধরণ বিবেচনায় অন্তর অনুভূতিতে বিরাজমান দোলা সদৃশ কোনো ভাব বা বস্তুর উপলব্ধি যুক্ত করে শুধু শারীরিক অনুশীলন নয়, বরং শরীর অতিরিক্ত 'ভিন্ন' এক মনোদৈহিক শরীরের ঘূর্ণন-সদৃশ অনুশীলন/চর্চায় যুক্ত হতে পারে। কেননা মঞ্চ-কৃত অভিনেতার কোনো শরীর-ভঙ্গি-ই 'মনো' বিচ্ছিন্ন প্রদর্শন নয়। কারণ "অভিনয়ের প্রতিটি আন্তর-অবস্থা ও চলাফেরার আড়ালে সরল ও প্রকাশময় মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে, যা অভিনয়ের সারও বটে।"[৩৩] ফলে অনুশীলন উপাদান হিসেবে ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার মনোদৈহিক সংযুক্তি অভিনেতাকে এমন কিছু অনুভূতির অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সক্ষম যা ভৌত-শরীরের সাথে ভাব-শরীরের সমন্বয় ঘটিয়ে চিন্তায় দ্রুততা, শরীরে গতিশীলতা, আচরণে চঞ্চলতা, ভাবে শূন্যে-ভাসমান হালকা হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ মানসিক প্রক্রিয়ার শারীরীকরণ বা শরীর ভঙ্গির প্রকাশ ক্ষমতাকে সম্ভব করে তুলতে পারে।

সুতরাং 'থালা নৃত্যে'র 'ঘূর্ণন' বৈশিষ্ট্যটিকে অভিনেতার শরীর ও মন-ছন্দের মেলবন্ধন ঘটানোর নিমিত্তে এবং শরীরকে অধিক নমনীয় ও সংবেদনশীলতায় সক্রিয় করতে অত্যন্ত কার্যকর একটি অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা শরীর ও মনের মধু-মিলনে'র অভিজ্ঞতা অভিনেতাকে একজন শিল্পী হিসেবে নিজের শরীরের প্রতি যেমন শ্রোদ্ধা ও সম্ভাবনায় সীমাহীন করে তুলতে পারে, বিপরীতক্রমে উপলব্ধি করতে পারে সীমবদ্ধতার পরিধিকেও।

---

৩২ শামসুদ্দিন চৌধুরী (অনু:), *মাইকেল চেখভের অভিনয় পদ্ধতি*, পড়ুয়া, ঢাকা, অক্টোবার-২০০৩, পৃ. ৭২
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১.২.২ ক্যায়াহ্ আক্কা (বাঘনৃত্য)

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাচা ইউনিয়নের নওয়াপোতং পাড়ায় 'ক্যায়াহ্ আক্কা' (বাঘনৃত্য) নামে এক ধরনের নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। ক্যায়াহ্ আক্কা মারমা জাতি-সংস্কৃতিতে প্রচলিত জাতকের উপাখ্যান অবলম্বনে 'জ্যা' নাট্যরীতির অন্তর্গত একটি নৃত্য পরিবেশনা। অর্থাৎ পরিবেশনাটি ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান 'জ্যা' নাট্য-আখ্যান অন্তর্গত একটি নৃত্য শৈলী, যা কখনো স্বতন্ত্র নৃত্য-আঙ্গিক– 'ক্যায়াহ্ আক্কা' বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদে যথাক্রমে 'বাঘনৃত্য' এবং 'টাইগার ড্যান্স' নামে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। যন্ত্রী ও কুশীলবের সংখ্যাগত উপস্থিতির দিক বিবেচনায় এটি একটি দলগত পরিবেশনা। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন দুজন কুশীলব আর নৃত্যের যন্ত্রসঙ্গীত বাদনে সহায়তা করেন অপর ৩/৪জন বাদক। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী মারমা বাদ্যযন্ত্রের প্রথাগত এবং প্রচলিত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। তথাপিও মারমা জাতিতাত্ত্বিক অন্যান্য নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনায় সম্মিলিত বা দলগত অংশগ্রহণ যে সকল প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে, সেই বিবেচনায় 'বাঘনৃত্যকে' দলগত পরিবেশনা বলাটা অনেকাংশেই সঙ্গত মনে হয় না। কেননা– এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন মাত্র দুইজন কুশীলব– এদের মধ্যে একজন পুরুষ যিনি 'বাঘ' চরিত্রের নৃত্যে/ছন্দবদ্ধ কসরত প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করেন, মূলত তিনিই এ পরিবেশনার মুখ্য/প্রধান কুশীলব এবং অপরজন 'বাঘের শিকার', যিনি একজন কিশোরী (১৭), তিনি বসা অবস্থায় থেকেই লাস্যময় হস্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে তাঁত বোনার ক্রিয়া প্রদর্শন করেন।

নওয়াপোতং পাড়ার বাঘনৃত্য পর্যবেক্ষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পর্যায়ক্রমে গুরু এবং গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশ শিষ্যের নৃত্য প্রদর্শন। যদিও গুরুর ভাষ্যমতে শিক্ষানবিশ তরুণ শিষ্য তখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বা পেশাগতভাবে কোনো আসরে বাঘনৃত্য পরিবেশন করেনি। একই আসরে ৬২ বছরের প্রবীণ গুরু এবং ২০ বছরের তরুণ শিষ্য এই দুই শিল্পীর প্রদর্শিত বাঘনৃত্যের কাঠামোগত বিন্যাস একই হলেও পরিবেশনায় গতি, ভারসাম্য, শৌর্য, বর্ধন প্রভৃতি কৌশলগত উপাদানের ব্যবহারে তুলনামূলক ভিন্নতাও কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তথাপি এই প্রভেদ সত্ত্বেও, দুই জন শিল্পীর পরিবেশিত বাঘনৃত্যের কাঠামোগত বিন্যাস, বিষয় এবং রীতির কোথাও কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বয়সের পার্থক্যের কারণে শৌর্য, বর্ধন, গতি, ভারসাম্যের কৌশলগত তথা সামগ্রিক নৈপুণ্য প্রদর্শনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুলনামূলক প্রভেদ সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এই প্রভেদ মৌলিক কোনো প্রশ্নের উদ্রেক করে না, কেবল উভয়ের মধ্যে বেশি দক্ষ বা কম দক্ষ অথবা ভালো-মন্দের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে মুখ্য বিবেচ্য করে তোলে। এই সকল দিক বিবেচনায় বক্ষ্যমাণ আলোচনায় কেবল বাঘনৃত্যের প্রধান কুশীলব মংমং মারমা (৬২) প্রদর্শিত নৃত্যটিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মারমা জাতিতাত্ত্বিক অন্যান্য নৃত্যের মতো 'বাঘনৃত্যে'র পরিবেশনায় আসর নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নমনীয়। ১২´- ১০´ ভূমিসমতল আয়তকার আয়তনে বিছানো চাটাইয়ের ওপর এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। এছাড়া বায়না অথবা আমন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই এই সমপরিমাণ ভূমিতে নির্মিত অস্থায়ী আসরসহ অডিটরিয়ামের স্থায়ী মঞ্চ, বৌদ্ধ মন্দিরে নির্মিত স্থায়ী পরিবেশনা-আয়তন অথবা উৎসব উপলক্ষে নির্মিত অস্থায়ী উচ্চ মঞ্চ-আয়তন সব ধরনের আয়তনেই এই নৃত্যের পরিবেশনা সাবলীল হয়ে ওঠে। 'বাঘনৃত্যে' সংশ্লিষ্ট সকল কুশীলব (নৃত্য শিল্পী ও যন্ত্রী) পাহাড়ি কৃষি অর্থাৎ জুম চাষ এবং গৃহস্থালি কর্মের সাথে যুক্ত। সাধারণত বছরের বিভিন্ন সময়ে উদ্‌যাপিত সামাজিক এবং ধর্মীয় উৎসব– কঠিন চীবরদান, সাংগ্রাইসহ বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান উপলক্ষে আবার কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে পারিবারিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে এই বাঘনৃত্য। তবে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে আমন্ত্রিত 'জ্যা' নাট্যের আখ্যানাংশ হিসেবেই মূলত বাঘনৃত্য পরিবেশিত হয়, যা একই সাথে নাট্য-কৃতেরও অংশ হয়ে ওঠে। কেননা জ্যা' এর অংশ হিসেবে বাঘনৃত্যের কুশীলবগণ এসময়ে অন্য কুশীলবদের সাথে পরিবেশনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনার্থে এবং পরিবেশনার প্রারম্ভিক প্রস্তুতিস্বরূপ দিক-বন্দনা, দেব-দেবী-বন্দনাসহ নানান কৃত্য-আচারের সাথে যুক্ত হন। কিন্তু স্বতন্ত্র নৃত্য-আঙ্গিক হিসেবে পরিবেশিত বাঘনৃত্যের মূল লক্ষ্য দর্শক-বিনোদন, সেক্ষেত্রে পরিবেশনার প্রারম্ভে কৃত্যের অংশগ্রহণ বা আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে।

বাঘনৃত্যের দুজন কুশীলবের মধ্যে একজন বাঘ ও অপরজন শিকার আর এরা দুজনেই সম্পূর্ণ কাহিনীটি প্রদর্শন করেন। কাহিনীটি এরকম–

> প্রেমাবদ্ধ এক প্রেমিক যুগল, খুব ঘনিষ্ঠ ছিল যাদের সম্পর্ক। এভাবেই যাচ্ছিল কেটে তাদের উচ্ছল প্রেমময় প্রতিদিন। কিন্তু এই সম্পর্কের বন্ধন বেশি দিন অটুট রইল না। হঠাৎ একদিন মেয়েটি সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য আর একটি ছেলেকে বিবাহ করে চলে যায় দূর পাহাড়ের আরেক গাঁয়ে। এই ঘটনায় নিদারুণ মনো-কষ্ট হয় ছেলেটির, সে মনে মনে ভাবে যে মেয়েটি নিদারুণভাবে তার সাথে ছলনা করেছে, করেছে প্রতারণা। আর তাই ছেলেটি শপথ করে যে, এই পৃথিবীতে নয়, পরের জীবনে আমি অবশ্যই এই ছলনার প্রতিশোধ নিব। এই শপথ মেনে নিয়েই ছেলেটি পৃথিবীতে মেয়েটির বিরুদ্ধে আর কোনো প্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। এভাবেই চলতে থাকে দুজনের বন্ধন-বিচ্ছিন্ন জীবন এবং একসময়ে ছেলেটি এবং মেয়েটি উভয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, পর জন্ম হয় তাদের। পরের জীবনে মেয়েটির জন্ম হয় একটি মানব পরিবারে। আর ছেলেটির জন্ম হয় বাঘ রূপে। তখন ছেলেটি পুনরায় তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে এবং মনে এই ভাবে যে, নিশ্চয়ই মেয়েটির জন্মও এই জগতে কোথাও হয়েছে। কিন্তু আমি তার সন্ধান কীভাবে পাই? এই জগতে বেঁচে

> থাকতে আমাকে মেয়েটির সন্ধান করতেই হবে এবং আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতেই হবে। বাঘটি যথারীতি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধা পেলে শিকার করে খায়, অতঃপর বিশ্রাম আবার ঘুরে বেড়ানো, এই হলো বাঘরূপী ছেলেটির জীবন। একদিন বাঘটি একটি জঙ্গলের ধারে লোকালয়ে আসে খাবারের সন্ধানে, যেখানে ছিল মেয়েটির আবাস। মেয়েটি ততদিনে আঠার বছরের তরুণী, গৃহকর্ম, বুননকর্ম এসবে বেশ সিদ্ধহস্ত তার। সেদিন মেয়েটির বাবা মা আর সকলেই ছিল জুম চাষে ব্যস্ত পাহাড়ের ঢালে আর মেয়েটি তখন একা বাসায় তাঁত বোনায় ব্যস্ত। বাঘরূপী ছেলেটি শিকারের সন্ধানে এসে হঠাৎ মেয়েটিকে দেখে ফেলে আর তখনই তার মনে পৃথিবীতে প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায়। ঘরে মেয়েটি ছিল একা তাই সহজেই তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে যায়। এতদিন পর মেয়েটির সন্ধান পেয়ে প্রতিজ্ঞা পূরণের আনন্দে করে বিচিত্র উল্লাস। অবশেষে আক্রমণ করে মেয়েটির ওপর, নিয়ে চলে যায় গহিন জঙ্গলে নিজ আবাসে।

উল্লেখ্য যে, মংমং মারমা বাঘনৃত্য ছাড়া রাক্ষসনৃত্যও পরিবেশন করে থাকেন। এটিও 'জ্যা' নাট্যের আখ্যানাংশ এবং স্বতন্ত্র নৃত্য-আঙ্গিক উভয় কাঠামোতে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। রাক্ষসনৃত্যের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ না হলেও বাঘনৃত্য বিষয়ে প্রধান কুশীলবের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে উঠে আসা রাক্ষসনৃত্যে কাহিনীর বিষয় ও গঠন-কাঠামো বাঘনৃত্যের বিশ্লেষণেও কার্যকর হয়ে ওঠে। ফলে বাঘনৃত্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রাক্ষস নৃত্যের কাহিনী সংক্ষেপও উদ্ধৃত করা হলো–

> এক রাজ্যের রাজার মনোবেদনা এরকম যে, রানীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সকল সন্তান চুরি হয়ে যায়। রানীর প্রথম পুত্র সন্তান হওয়ার পর, রানী অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে আর এই সুযোগে এক রাক্ষস সন্তানটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। রানী ঘুম ভেঙে উঠে সন্তানকে না পেয়ে বেদনায় মূর্ছা যায় এবং প্রাসাদে থাকা সকল পাইক পেয়াদা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সন্তানটির কোনো হদিস করতে পারে না। এইভাবে রানীর একে একে তিনটি সন্তান চুরি হয়ে যায়। অতঃপর চতুর্থ সন্তান প্রসবকালে রানী অত্যন্ত সতর্ক হয় এবং মনে মনে ঠিক করে যে করেই হোক আমাকে দেখতে হবে যে, কে আমার সন্তান চুরি করে নিয়ে যায়। কথা অনুযায়ী চতুর্থ সন্তান হওয়ার পর রানী পুনরায় অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। তবে এবারে অচেতন হওয়ার ভান করে পড়ে থাকে। হঠাৎ দেখতে পায় একটি রাক্ষস, এবং সেই রাক্ষস তার শিশু সন্তান নিতে এসেছে। রানী রাক্ষস রাক্ষস করে চিৎকার করে উঠলেও সন্তানকে রক্ষা করতে পারেনি। রাক্ষস ততক্ষণে চতুর্থ সন্তানটিকেও নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু চতুর্থ শিশুটি আর দশটা শিশুর মতো ছিল না। এই শিশুটি ছিল অধিকতর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। ফলে রাক্ষস শিশুটিকে খেতে গিয়েও শিশুটির গুণের কারণে মায়ায় পড়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। ধীরে

ধীরে শিশুটি বড় হয়, তবে ক্রমান্বয়ে ছেলেটির মনে একটি প্রশ্ন দানা বাঁধে যে, আমি তো দেখতে আমার পিতা মাতার মতো নই, তাহলে আমি কে? কী করে আমি এই পিতা-মাতার সন্তান হতে পারি! আমি কি রাক্ষসের ছেলে নাকি অন্য কারো ছেলে? এই ভেবে সে উদাস মনে বনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। এদিকে ঐ বনে এক সাধু ঐ ছেলেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, এই তুমি কে? আমি রাক্ষস। সাধু বলে– *কিসের রাক্ষস! তোমাকে তো মানুষের মতো মনে হয়, কিন্তু আচার-আচরণ তো আবার রাক্ষসের মতো।* সাধু মনে মনে ভাবতে থাকে যে, *ছেলেটির মন রাক্ষসের হলেও আচার আচরণ তো মানুষের মতো।* তখন সাধু দিব্য জ্ঞানে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে যে এই ছেলে রাক্ষসের ছেলে নয়। এরপর সাধু তাকে বলে যে, আমি দিব্য জ্ঞানে জেনেছি যে তোমাকে ছোটবেলায় একবার রাক্ষস চুরি করে নিয়ে এসেছে, তাই তোমার মনটা রাক্ষসের মতো হলেও আসলে তুমি মানুষ তুমি রাজার ছেলে। এ কথা শুনে ছেলেটি তার রাক্ষস বাবাকে প্রশ্ন করে যে, বাবা আমি কি তোমার ছেলে নাকি মানুষ রাজার ছেলে? রাক্ষস মিথ্যে বলে– না, তুমি আমারই ছেলে। ছেলেটি তখন উত্তরে বলে– কিন্তু এই বনের সাধু আমাকে বলেছেন যে, আমি মানুষের ছেলে। এবারেও রাক্ষস অস্বীকার করে কিন্তু ছেলেটি মনস্থির করে যেভাবেই হোক এখান থেকে পালিয়ে যাবে সে। কথামতো একদিন পালিয়ে গিয়ে একটি মন্দিরে প্রবেশ করে এবং মন্দিরের ভিক্ষুকে জানায় যে, মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েও আমি মানুষের মতো আচরণ করতে পারি না, কারণ আমার মনটা রাক্ষসের মতো হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন যে, কী করে আমি মানুষ হয়ে আমার বাবা-মার কাছে ফিরে যেতে পারি। ভান্তে তখন মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ছেলেটি রাক্ষস মনটাকে দূর করে মানুষ মনটাকে ফিরিয়ে দেয়।

নওয়াপোতং পাড়ার এই দলটি আনুমানিক ৫০ বছর ধরে বাঘনৃত্য পরিবেশন করে আসছে। দল প্রধান মংমং মারমা তাঁর ছোটবেলায় ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সে বাঘনৃত্য দেখার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাঘনৃত্য শিল্পী হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ছোটবেলার সেই প্রত্যক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি স্ব-উদ্যোগে এই নৃত্যের অনুশীলন/চর্চা/পরিবেশনা আয়ত্ত করেন। তবে বর্তমানে এই বাঘনৃত্যের সামগ্রিক কাঠামোয় যে সকল শারীরিক কৌশল, কসরত ও কম্প্রোজিশান প্রদর্শিত হয় অতীতে তেমনটা ছিল না, বরং ছোটবেলায় তিনি যে বাঘনৃত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেখানে লাস্যময়তার প্রকাশই মুখ্য ছিল বলে দাবি করেন। বাঘনৃত্যের পরম্পরাগত প্রশিক্ষণ ও পরিবেশন প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রধান কুশীলব মংমং মারমার ভাষ্য এমত যে– 'বর্তমানে আমার বয়স ৬২ বছর, যখন আমার বয়স ১২/১৩ বছর তখন প্রথম আমি এই নাচ দেখেছিলাম। আমার জন্মস্থান লরিংপাড়ায় একটি দল ছিল, সেই দলের পরিবেশনা দেখেছিলাম। এটি আমার স্ব-উদ্যোগে প্রশিক্ষিত, আমি নিজেও জানি না যে আজ থেকে ৫০ বছর আগে আমি যাদের নাচ দেখেছি, তারা সেই নাচ

কার কাছ থেকে বা কীভাবে শিখেছেন।'[৩৪] দলপ্রধানের এ উক্তি থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বর্তমানে দলটির বাঘনৃত্যের পরিবেশনা, চর্চা ও অনুশীলন সংশ্লিষ্ট যে 'জ্ঞান' অর্জিত হয়েছে তা গুরু-শিষ্যের পরম্পরাসূত্রে অথবা কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া থেকে লব্ধ নয়। কারণ প্রধান কুশীলব নিজেই তাঁর নৃত্য-আঙ্গিকের সাথে পরম্পরাগত শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ততা খারিজ করে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটিকে ব্যক্তির সহজাত 'অনুকরণ-অভিজ্ঞতা' থেকে অর্জিত 'পারফরম্যান্স-জ্ঞান' (performance knowledge) দ্বারা সঞ্চালিত এমত ধারণা পোষণ করা যেতে পারে। কেননা 'পারফরম্যান্স-জ্ঞান'-এর ধারণাটি মূলত জাতি-সংস্কৃতিতে প্রচলিত নানাবিধ সামাজিক বা কৃত্যমূলক পরিবেশনা-অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল থাকে এবং এই জ্ঞান ঐ জনগোষ্ঠীর মানুষের দ্বারাই লালিত, চর্চিত এবং বিকশিত হয়। তাই 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' অর্জন ও বিকাশ কেবল গুরুশিষ্য পরম্পরায় আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কুশীলব থেকে কুশীলবের মধ্যে সঞ্চালিত (transmited) হবে সেটিই একমাত্র উপায় নয় বরং পরিবেশনার (নৃত্য, নাট্য ইত্যাদি) সাংগঠনিক কার্যক্রমে সামষ্টিকের একজন হিসেবে অংশগ্রহণলব্ধ অভিজ্ঞতা অথবা পরিবেশনা প্রত্যক্ষণ পূর্বক দর্শক-কুশীলব সম্পর্কের বন্ধনে ক্রমাগত অর্জিত/সঞ্চিত যে 'জ্ঞান' তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের শরীরে সঞ্চালিত হতে পারে। এবং 'অনুকরণ-অভিজ্ঞতার' সূত্রেই তা কোনো একজন বিশেষ আগ্রহী বা উৎসুক প্রত্যক্ষকারী-দর্শক/ সমর্থক/ সংগঠক/ পৃষ্ঠপোষক এই জ্ঞান অর্জন করতে পারেন– [...] It is better usually to get the performance knowledge into the body on its own terms, as movement, gesture, tone of voice– whatever the techniques of a particular genre are. By means of imitation, learners acquire through practice an organic mastery of the craft that underlies every art.'[৩৫] সুতরাং জাতি-সংস্কৃতিতে বিরাজমান 'পারফরম্যান্স জ্ঞানের' পরম্পরা যে কেবল প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যেমন– গুরু-শিষ্য পরম্পরাগত প্রশিক্ষণ (দীর্ঘ অথবা স্বল্প মেয়াদি), কর্মশালা, মহড়া প্রভৃতির মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাতে সঞ্চালিত বা প্রবাহিত হবে তাই-ই নয়, বরং অনানুষ্ঠানিক এবং উন্মুক্ত শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হিসেবে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সামষ্টিকের অংশগ্রহণ এবং দর্শক-কুশীলবের প্রত্যক্ষ সম্পর্কসূত্রে অর্জিত দর্শকের 'অনুকরণ-অভিজ্ঞতা'ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' বা পরিবেশনার কৌশল ও সহজাত দক্ষতা অর্জনে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

'পারফরম্যান্স জ্ঞান' হচ্ছে জাতি-সংস্কৃতি নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক (শারীরিক ও মানসিক) আচার-আচরণের বিশেষ দক্ষতা এবং কৌশল বিষয়ক জ্ঞান, যা কৃত্য অথবা নাট্যের পরিবেশনা-পরিমণ্ডলে বা আসরের নানান শৈলীবদ্ধ ক্রিয়ার অভিকরণার্থে চর্চিত হয়। অর্থাৎ কৃত্য অথবা নাট্য পরিবেশনায় কুশীলবের স্ব স্ব সংস্কৃতি প্রযুক্ত শরীর ও

---

৩৪ মংমং মারমা প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩০/১০/২০১৪, নওয়াপোতং পাড়া, তারাচা ইউনিয়ন, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান
৩৫ Richard Schechner, *Performance Studies; An introduction,* routledge, USA, 2002, P. 198

মনের আচার আচরণ সম্পর্কিত চলন, অঙ্গ-ভঙ্গি-অভিব্যক্তি, কণ্ঠ-শ্বাসপ্রশ্বাস, ভাব-আবেগ প্রকাশের দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, কুশীলবকৃত শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় কোনো আচার-আচরণ, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভাব-আবেগের প্রকাশ 'নতুন' বা 'প্রথম' নয় বরং সবকিছুই পূর্বকৃত অথবা পরম্পরাকৃত আচরণের অনুকরণ। শেখনার যাকে 'দ্বি-আচরিত আচরণ' (twice behaved behavior) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছন– "Performance means: never for the first time. It means: for the second to the *n*th time. Performance is "twice beahaved behavior"[৩৬] সুতরাং নির্দিষ্ট জাতি-সংস্কৃতিতে প্রচলিত কৃত্য অথবা নাট্য পরিবেশনার আচরণগত যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম আদতে ঐ সমাজের প্রচলিত অথবা ব্যবহৃত আচরণের (শারীরিক ও মানসিক) প্রতিফলন অর্থাৎ 'দ্বি-আচরিত আচরণ'। আর এখানেই নিহিত রয়েছে 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' অর্জনের রহস্য, যা দুটি প্রক্রিয়ায় অর্জিত হতে পারে– এক. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশনার অনানুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা। অর্থাৎ পরিবেশনার সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে একাগ্র দর্শক/সংগঠক/রশিক/পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্ত থেকে বিশেষ 'অনুকরণ-অভিজ্ঞতার' মাধ্যমে এই 'জ্ঞান' অর্জিত হতে পারে। এবং দুই. আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ পরিবেশনার আগে বা পরে শিক্ষক/ওস্তাদ/গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রথাগত আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মহড়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে এই 'জ্ঞান'। এ পর্যায়ে অর্থাৎ রোয়াংছড়ির 'বাঘনৃত্যে'র প্রধান কুশীলব মংমং মারমা'র ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার প্রথম পন্থা– অনানুষ্ঠানিক 'অনুকরণ-অভিজ্ঞতা'। যিনি গুরুর সান্নিধ্য, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ব্যতিরেকেই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ নৃত্যে'র শৈলী ও কৌশল (পারফরম্যান্স জ্ঞান) আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর কৈশোরে প্রত্যক্ষণকৃত বাঘনৃত্যের 'অভিজ্ঞতা' থেকে সঞ্চালিত 'পারফরম্যান্স জ্ঞানের' স্বতঃস্ফূর্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাঘনৃত্যের প্রধান কুশীলব মংমং মারমা তিনি তাঁর জীবদ্দশাতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে একমাত্র জ্ঞান করে আঁকড়ে থাকেননি। গুরু হিসেবে তাঁর তরুণ শিষ্যকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের সম্পর্কসূত্রেই 'পারফরম্যান্স-জ্ঞান' সম্প্রদান করেছেন। ফলে দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকেই রোয়াংছড়ির নওয়াপোতং পাড়ার বাঘনৃত্যের চর্চা প্রথাগত পরম্পরায় ফিরে আসে। স্বাভাবিক নিয়মেই এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি হয়ে ওঠে 'অনুকরণমূলক'। তবে এই অনুকরণ শারীরিক অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এটি হচ্ছে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের শরীরে সঞ্চালিত 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' বা কৌশল। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই এই অনুকরণমূলক শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি সৃজনশীল (Head learning)

৩৬ Richard Schechner, *Between theatre and Antropology,* University of Pensylvania Press, Philadelphia,1989, p.36

পদ্ধতিকে গৌণ করে ‘শরীর শিক্ষণ’ (Body learning)[৩৭] পদ্ধতিকেই মুখ্য কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ গুরুর প্রদর্শিত নৃত্যের যাবতীয় পদ্ধতিগত কৌশল যথাযথভাবে শারীরে অনুকরণ করাই হচ্ছে এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের ধ্রুপদী বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ‘অনুকরণ’ প্রক্রিয়ায় ‘শরীর শিক্ষণ’ পদ্ধতির চর্চা সর্বাধিক জনপ্রিয়। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষক, প্রশিক্ষক, গুরু, ওস্তাদ যেভাবে এবং যে প্রক্রিয়ায় নৃত্যের কৌশল প্রদর্শন করেন, ছাত্র বা শিষ্যকে ঠিক ঠিক সেভাবেই শরীরে রপ্ত করতে বা শারীরীকরণ করতে হয়, ভাব বা চিন্তাগত সৃজনশীলতার প্রয়োগ এক্ষেত্রে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং নওয়াপোতং পাড়ার বাঘনৃত্যের শিক্ষণ-প্রক্রিয়াতে বৈচিত্র্যের খোরাক বিদ্যমান। কেননা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি এখানে কোনো একটি প্রক্রিয়া বা উপায়ে আবদ্ধ থাকেনি বা অনুসৃত হয়নি। প্রথমে গুরু তাঁর অনানুষ্ঠানিক ‘অনুকরণ অভিজ্ঞতা’ প্রণোদিত হয়ে বাঘনৃত্যের চর্চা করলেও পরবর্তীকালে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের পরম্পরা রক্ষার্থে তাঁর-ই শিষ্যকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় ‘শরীর শিক্ষণ’ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করে তোলেন। যা প্রকারান্তরে পরিবেশনাটির বিবর্তন ও পরম্পরার ধারাকেই সুরক্ষা করে।

পর্যবেক্ষণকৃত ‘বাঘনৃত্যে’র পরিবেশনায় মংমং মারমার পরিবেশনা-পূর্ব প্রস্তুতি ছিল অতি সাধারণ, বিশেষ/সুনির্দিষ্ট/আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ছিল অনুপস্থিত। কুশীলবের নিজের মতও ছিল এমন যে– ‘এই নাচ যখন আলাদাভাবে করা হয় তখন এর জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না বা করা হয় না। কিন্তু গ্রুপে (জ্যা পরিবেশনায়) যখন করা হয় তখন চারদিকের দেব-দেবীদের স্মরণ করা হয়।’[৩৮] অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ধর্ম, ধর্ম-নিরপেক্ষ, সামাজিক অথবা বিনোদনমূলক পরিবেশনায় যে সকল প্রস্তুতিমূলক আচার-আচরণ-ক্রিয়াকর্ম (পূজা, উপোস, মানত করা, ধ্যান, শরীর অনুশীলন, দম-অনুশীলন, স্বল্পভাষী হওয়া বা নিশ্চুপ থাকা প্রভৃতি) করা বা পালন করা হয়ে থাকে, ‘বাঘনৃত্যে’র পরিবেশনায় প্রধান কুশীলব মংমং মারমার ক্ষেত্রে তেমন ‘আনুষ্ঠানিক’ অথবা ‘সুনির্দিষ্ট’ কোনো প্রস্তুতি দেখা যায়নি। পরিবেশনা-পূর্ব অবস্থার প্রস্তুতিমূলক আচার-আচরণ ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠান উভয় রকম পরিবেশনার ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পালনীয়/করণীয় একটি পর্যায়। কেননা এই পর্যায়টির মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট কুশীলবগণ তাদের দৈনন্দিন কর্ম-বাস্তবতা থেকে ভিন্ন অথচ নির্মিত নতুন আর এক বাস্তবতায় প্রবেশের মুহূর্তকে সহজ, সুনির্দিষ্ট ও মনোযোগী করে তুলতে সক্ষম হন। প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, প্রস্তুতিমূলক সকল আচার-আচরণমূলক ক্রিয়া-কর্মকে অংশগ্রহণকারী কুশীলব তাঁর দৈনন্দিন কর্ম-বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে কৃত্য বা নাট্যিক বাস্তবতায় প্রবেশের মধ্যবর্তী অবস্থান বা প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ধর্মীয় অথবা বিনোদনমূলক কৃত্য বা নাট্য পরিবেশন প্রক্রিয়ায় পরিবেশনা-পূর্ব আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি হচ্ছে এমনই এক মধ্যবর্তী অবস্থা যা গৃহে প্রবেশদ্বারের

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩৮ মংমং মারমা প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩০/১০/২০১৪, নওয়াপোতং পাড়া, তারাচা ইউনিয়ন, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান

চৌকাঠের মতো– অর্থাৎ ঘরের বাইরেও নয় আবার ঘরের অভ্যন্তরেও নয়, মাঝামাঝি একটি অবস্থান। স্কটিশ নৃবিজ্ঞানী ভিক্টর টার্নার ধর্মীয় ও সমাজিক স্তরে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিশেষ এই অবস্থানকে ‘Liminality’ বা ‘অবস্থান্তরতার’ পর্যায়ভুক্ত করে ব্যাখ্যা করেছেন- “Liminality entites are neither here nor there; they are betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial.[৩৯] যেমন– বিবাহ অনুষ্ঠানের সকল সামাজিক ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ব্যক্তির ‘অ-বিবাহিত’ এবং ‘বিবাহিত’ এই দুই বিপরীতধর্মী পরিচয়ের মধ্যবর্তী অবস্থান হিসেবে অর্থাৎ পরিচয়ের এক জীবন (অবিবাহিত) থেকে অপর জীবনে (বিবাহিত) স্থায়ী ‘অবস্থান্তরের’ প্রস্তুতিমূলক পর্ব যা ‘বর’ হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়।

৩৯ Victor Turner, *The Ritual Process*, Aldine Publishing Company, Chicago,1969, p. 95

পরিবেশন ও বিশ্লেষণ

মংমং মারমা প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে তাঁর নৃত্য পরিবেশন-পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ আনুষ্ঠানিক কোনো আচার-আচরণ-ক্রিয়াকর্ম প্রদর্শন করেননি, তথাপিও তাঁর নৃত্য পরিবেশন-পূর্ব দৈনন্দিন আচরণ ও কর্মকাণ্ডের নিবিড় পর্যবেক্ষণে একাধিক প্রবণতা চিহ্নিত করা সম্ভব। চিহ্নিত এ সকল প্রবণতাকে 'পরিবেশনা' সম্পাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার (পারফরম্যান্স প্রসেস) অন্তর্গত 'প্রি-ওয়ার্ম-আপ'[৪০] বা অনুশীলন-পূর্ব-ক্রিয়া হিসেবেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পরিবেশনার আগে অর্থাৎ অনুশীলন-পূর্ব-ক্রিয়ার এই পর্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে- "[In other words] every performancne, every entry into the enactment of a known and necessary score, demands a "time before" when the performer can ready herself for putting on the role."[৪১] এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পী মংমং মারমার প্রদর্শন-পূর্ব মুহূর্তের কর্মকাণ্ডগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সচেতনভাবেই তিনি তাঁর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড-অতিরিক্ত এমনকিছু আচরণ করেন যা ক্রমান্বয়ে তাঁর *দৈনন্দিন* ব্যক্তিত্বের ওপর *বিশেষ* ব্যক্তিত্ব বা শিল্পীসত্তাকে অধিক গুরুত্বারোপ করে তোলে। এক্ষেত্রে দুটি স্পষ্ট প্রবণতা পর্যবেক্ষণসূত্রে শিল্পীর পরিবেশনা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক আচরণ হিসেবে চিহ্নিত পূর্বক বিশ্লেষণ করা যায়– প্রথমত, নৃত্য আয়োজনে সাংগঠনিক দায়িত্বপালনে তাঁর অতিরিক্ত সচেতন ও সক্রিয় হয়ে ওঠা। বাঘনৃত্য পরিবেশনার জন্য প্রয়োজনীয় ও যাবতীয় বিষয়াদি– যেমন, পরিবেশনার স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ (সাধারণত চট, মাদুর বা চাটাইয়ের মাধ্যমেই কেবল আয়তনটি নির্দিষ্ট করা হয়), বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থাপনা করা, অন্যান্য শিল্পীর সাথে যোগাযোগ ও পরিবেশন স্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে দেখা যায়। এই দায়িত্ব পালনকালীন তাঁর আচরণে যে পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে তা হলো– কথাবার্তায় মিতব্যয়ী এবং সুনির্দিষ্ট হওয়ার চেষ্টা, ভাষার ব্যবহারে আরও অধিক সচেতন হওয়া, শারীরিক আচরণ ও কর্মে অনেক বেশি স্থির থাকার চেষ্টা করা, চোখ অ-চঞ্চল বা কেন্দ্রস্থিত রাখা, সর্বোপরি ব্যক্তি জীবনের কৃষি ও গৃহস্থালি সাধারণ মানুষটির পেশাজীবনের পরিচয়কে আড়াল করার মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন আচার আচরণের অতিরিক্ত সৌম্য, শান্ত ও স্থির শরীর আচরনের মাধ্যমে শিল্পীসত্তার সচেতন প্রকাশ-প্রবণতা ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে– "The more self-conscious a person is, the more one constructs behavior for those watching and/or listening, the more such behavior is "performing।"[৪২] দ্বিতীয়ত, বাঘনৃত্যের পোশাক পরিধানের সময়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার প্রবণতা। এ পর্যায়ে তাঁর দৈনন্দিন আচরণ থেকে ভিন্ন এক নিঃসঙ্গ-নিশ্চুপতার অবস্থানগ্রহণ ক্রমাগতভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে শিল্পীর কথোপকথন বা ভাষার

---

৪০ Richard Schechner, *performance Studies*, Routhledge, 2002, USA, P. 205
৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

ব্যবহার ও শারীরিক আচরণে আরও অধিক মিতব্যায়ী বা স্বল্পভাষী ও ধ্যানযোগী হওয়ার প্রবণতা তাঁকে ব্যক্তি মানুষ থেকে নৃত্যের কুশীলবে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত স্পষ্ট করে তোলে। সুতরাং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরিবেশনা-পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ ধ্যান, উপোস, দমচর্চা, শরীরচর্চা, পূজা, কৃত্যপালন, বন্দনাগীত গাওয়া প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম না করলেও, নৃত্য পরিবেশনা-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে শরীর ও মনকে দৃঢ় ও স্থির করা তথা দৈনন্দিন-অতিরিক্ত বা বিশেষ সচেতন করার প্রবণতা ক্রমাগতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আর সচেতনতার বিশেষ স্তরে উন্নীত করার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তিনি ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি থেকে চরিত্রে (বাঘ) অস্থায়ী 'অবস্থান্তরের' প্রস্তুতি সম্পাদন করেন, যেটিকে মংমং মারমার পরিবেশন-পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ পালনকৃত ব্যক্তিগত এবং অনানুষ্ঠানিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বাঘনৃত্যের কাঠামোটি সাধারণ। তাঁত বুননরত এক কিশোরীকে একটি বাঘ কীভাবে আক্রমণ করে ধরে নিয়ে যায়, মূলত এটাই হচ্ছে এ নৃত্যের মূল বিষয়। আসরের এক পাশে অবস্থান নেওয়া যন্ত্রবাদক দল বাঁশি, তালযন্ত্র, কাঁসর সমন্বয়ে পরিবেশন করেন মারমাদের নিজস্ব ও প্রথাগত যন্ত্রসঙ্গীত-বাদন। তবে যন্ত্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে দল-প্রধানের দাবি এমন যে, এই নৃত্যে ব্যবহৃত যন্ত্রসঙ্গীত তাদের দলের সদস্যদের দ্বারা বিন্যাস করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, একই রকম যন্ত্রবাদন 'জ্যা' নাট্য পরিবেশনাতেও দেখা যায়। যন্ত্রসঙ্গীতের এই পর্বটিকে সরলভাবে কনসার্ট হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যদিও একটানা একই রকম সুরের বিরতিহীন যন্ত্রবাদনের ধারাবাহিকতায় নৃত্যের শুরু এবং সমাপ্তি হয়ে থাকে। আর তাই শুরুতে যন্ত্রবাদন (কনাসার্ট) কিছু সময় চলমান থাকার পর আসরে প্রবেশ করেন শিকার চরিত্রের অভিনেত্রী এক কিশোরী, যিনি আসরের এক পাশের নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে হস্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে তাঁত বোনার অভিনয়/ক্রিয়া পরিবেশন করেন। আসর সামগ্রী অর্থাৎ তাঁত যন্ত্রের সাজেশন বা প্রতীক হিসেবে এ সময়ে তাঁর সামনে থাকে কাঠ দ্বারা নির্মিত একটি সাধারণ আকৃতির কাঠামো (ভূমিতলে আড়াআড়ি করে রাখা একখণ্ড কাঠের ওপর উল্লম্ব ভাবে আটকে রাখা দুটি কাঠদণ্ড)। এরপর যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে আসরে প্রবেশ করেন প্রধান কুশীলব– বাঘ চরিত্রের নৃত্যশিল্পী মংমং মারমা। বাঘ নৃত্যের এই পরিবেশনা চারটি পর্যাক্রমে সংগঠিত হয়– বাঘের শিকার সন্ধান করা, শিকার স্থির/নির্বাচন করা, শিকার বা আক্রমণ করা এবং শিকার নিয়ে প্রস্থান করা। এই চারটি পর্যায়ের ক্রমানুসারে বাদ্যের তাল ও লয় অনুসরণ করে কুশীলব তাঁর শরীরে বাঘ-অনুরূপ নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গি, ছন্দময় চলন, কসরত প্রভৃতি প্রদর্শন শেষে বাঘ তার শিকারকে ধরে নিয়ে চলে যায় অর্থাৎ আসর থেকে প্রস্থান করেন। এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম চারটির পরিবেশনায় সময়ের ব্যাপ্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রধান কুশীলবের (বাঘ চরিত্রটির) ওপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে কুশীলব মংমং মারমার অনুভূতি এরকম– "আগে আমি একটানা অনেকক্ষণ নাচতে পারতাম, কিন্তু এখন বয়স হয়েছে তো, তাই আগের মতো আর পারি না, এখন অল্প সময়

করতে পারি। আসলে বাঘনৃত্যে শারীরিক কসরতের বিষয় আছে তো– বাঘের মতো লাফ দিতে হয়, ঘুরতে হয়, তাই খুব বেশি সময় একটানা করা সম্ভব হয় না।"[৪৩] অনুভূতি প্রকাশের এই সূত্র ধরে যখন তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করা হয় যে, শরীর নির্ভর এই নৃত্যে ছন্দময় চলন ও কসরতের মধ্য দিয়ে একটি বাঘ চরিত্রের রূপায়ণে ভাবগত সংযুক্তি অথবা ভাবের পরিবর্তন/রূপান্তরের প্রয়োজন বা সুযোগ রয়েছে কিনা, অথবা বাঘ *হওয়ার* মুহূর্তে তার মনের মধ্যে এমন কি কিছু ঘটে বা পরিবর্তন হয়, যা কি না তাঁকে বাঘ *হয়ে ওঠার* প্রণোদনা জোগায়? প্রশ্নের উত্তরটি ছিল এরকম যে- "ধরেন, আমার মনে হয় আমি বাঘ, বাঘ হয়ে গেছি, তাই বাঘের মনটা একটু নলেজে দিতে হয়।'[৪৪] উক্তিটি সরল এবং স্বল্প, তথাপি তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কেননা কুশীলব মংমং মারমার দৈনন্দিন ব্যক্তিত্বের ওপর প্রথম এবং স্পষ্টত পরিবর্তন ঘটে তিনি যখন আপাদমস্তক বাঘের ডোরাকাটা দাগ অঙ্কিত পোশাক এবং মুখোশ পরিহিত অবস্থায় আসরে প্রবেশ করেন। কেননা এ সময় তাঁর শরীরের বাহ্যিক আচরণের সাথে অন্তরস্থ ভাবের মহা-মিলনে তাঁর দৈনন্দিন ব্যক্তিত্ব খারিজ হয়ে 'বাঘ' চরিত্রের পরিবেশক/কুশীলব চরিত্রের ব্যক্তিত্ব উপস্থাপিত হয়। কারণ তিনি 'মনে' করেন– "আমি বাঘ, আমি বাঘ হয়ে গেছি", অর্থাৎ তিনি এখন আর 'মংমং মারমা' নন, তিনি এখন 'বাঘ'। আবার তিনি যে তাঁর সচেতন ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে পুরোপুরি বাঘ হয়ে গেছেন বিষয়টি তাও নয়, কেননা তিনি আরও বলেন– "ধরেন, আমার মনে হয় আমি বাঘ"। এখানে 'ধরেন' এবং 'মনে হয়' শব্দ দুটির মধ্যে যে দোলাচল বিদ্যমান, তা প্রকারান্তরে তাঁর সচেতন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ তিনি যে মংমং মারমা নন– কেবল-ই বাঘ, তা নয়, তিনি মংমং মারমাও বটে। এখানে মানুষ এবং বাঘ এ দুয়ের কোনো এক পক্ষে নিরঙ্কুশ অবস্থান গ্রহণের সুযোগ নেই– তিনি মানুষ (মংমং মারমা) নন, আবার তিনি বাঘও নন, এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো সচেতন অবস্থানে প্রদর্শিত হয় বাঘনৃত্যের বাঘ চরিত্রটি। কেননা বাঘের পোশাক, মুখোশ, আচার-আচরণ, আসরে নির্মিত প্রদত্ত পরিস্থিতির (চাটাই বিছানো নির্দিষ্ট আয়তন, বাদক দলের যন্ত্রসঙ্গীত, সহ-অভিনেতা, চারদিকে দর্শকের অবস্থান প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত পরিস্থিতি) আড়ালে দৈনন্দিন ব্যক্তিত্বের সাধারণ মানুষটি যেমন কেবলই আকর্ষণহীন ও গৌণ হয়ে পড়ে, ঠিক একইভাবে, প্রদত্ত এতসব শর্তের আড়ালে থাকা মানুষটির সচেতন অবস্থানের কারণেই বাঘ চরিত্রের পরিবেশনা আকর্ষণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং এখানে স্পষ্টতই মধ্যবর্তী কোনো স্থানে 'অবস্থান্তর' (liminal) প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ– 'আমি নই, আবার, আমি নই তাও নয়'– এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থানে বিনির্মিত হয় 'বাঘ' নামের চরিত্রটি। এ প্রসঙ্গে 'হরিণনৃত্য' বিশ্লেষণ-সূত্রে রিচার্ড শেখনারের একটি মন্তব্য এই বাঘনৃত্যের ক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য মনে করি– "At the moments when the dancer is "not himself" and yet "not not himself," his own indentity, and that of the deer, is locatable

৪৩ মংমং মারমা প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩০/১০/২০১৪, নওয়াপোতং পাড়া, তারাচা ইউনিয়ন, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান

৪৪ প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকার, তারিখ ৩০/১০/২০১৪, নওয়াপোতং পাড়া, তারাচা ইউনিয়ন, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান

only in the liminal areas of "characterization," "representation," "imitation," "transportation," and "transformation."[৪৫] একই চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় মংমং মারমা পরিবেশিত 'রাক্ষসনৃত্য' প্রসঙ্গে উদ্ধৃত গল্প, চরিত্রের বর্ণনার মধ্যে। ছেলেটির কথা প্রসঙ্গে সাধু যখন বলেন– *কিসের রাক্ষস! তোমাকে তো মানুষের মতো মনে হয়, কিন্তু আচার-আচরণ তো আবার রাক্ষসে মতো।* এরপর, সাধু মনে মনে ভাবতে থাকে যে, *ছেলেটির মন রাক্ষসের হলেও আচার আচরণতো মানুষের মতো।* তখন ব্যক্তি ও চরিত্রের মধ্যবর্তী অবস্থান অর্থাৎ– 'ছেলে নয়– রাক্ষস, আবার ছেলে যে নয় কেবল রাক্ষস, তাও নয়' অবস্থানটি পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মংমং মারমার প্রদত্ত উক্তির শেষ অংশ– 'তাই বাঘের মনটা একটু নলেজে দিতে হয়', কথাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এখানে 'বাঘের মন' এবং 'নলেজে দেওয়া' বিষয় দুটি 'পারফরম্যান্স জ্ঞান'-এর সাথে সম্পর্কিত। কেননা এটি অতি সাধারণ একটি পদ্ধতি যে– একটি বাঘের আচার, আচরণ দেখে 'ধারণা' করা যায় যে, বাঘের মন এখন কী বলছে, অর্থাৎ– বাঘটি এখন শান্ত, ক্ষুব্ধ নাকি ক্ষুধার্ত ইত্যাদি কতকগুলো ক্রিয়াবাচক সাধারণ মনো-ভঙ্গি চিহ্নিত করা সম্ভব। এই 'ধারণা'টিকে বলা যায় 'বাঘ' বিষয়ক 'জ্ঞান' যা দুটি উপায়ে অর্জন করা সম্ভব। একটি হচ্ছে বিজ্ঞানসিদ্ধ পথ, কিন্তু অপরটি পরম্পরাগত জ্ঞান যা নির্ধারিত জাতি-সংস্কৃতির ধর্মীয় বা সামাজিক কৃত্য, আচার-আচরণ, গল্প-কথন নানান মাধ্যমে প্রকাশিত/চিহ্নিত/পরিবেশিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই দ্বিতীয় পন্থা-ই হচ্ছে জাতি-সংস্কৃতিতে চর্চিত বা আচরিত 'বাঘ' নামক প্রাণীটির ধারণাগত 'জ্ঞান' যা মংমং মারমা কৌশলগত 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' থেকে অর্জন করেছেন এবং এর সাথে প্রচলিত সুর, সঙ্গীত, নৃত্যের সমন্বয়ে নির্মাণ করেছেন নৃত্য আঙ্গিক, যা তাঁর ভাষায় 'স্ব-উদ্যেগে' প্রশিক্ষিত ও বিন্যাসকৃত বাঘনৃত্য।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, স্বতন্ত্র আঙ্গিক হিসেবে 'বাঘনৃত্যে'র এই কাঠামোটি অতি সাধারণ ও সরল। অর্থাৎ একটি বাঘের লোকালয়ে আগমন এবং গৃহে কর্মরত এক নারীকে আক্রমণ পরবর্তী তাকে নিয়ে চলে যাওয়া। কিন্তু 'জ্যা' নাট্য-আখ্যানের অংশ হিসেবে বাঘ এবং শিকার উভয়ে নাট্য-আখ্যানের এক একটি চরিত্র হয়ে ওঠে এবং গল্পের ধারাবাহিকতায় উভয়ের পরিণতিও হয় স্পষ্ট। 'জ্যা' নাট্যরীতির সাথে বাঘনৃত্যের সম্পর্ক বিষয়ে প্রধান কুশীলব মনে করেন– "জ্য পরিবেশনার ইতিহাস ও পরম্পরার বিষয়ে কিছু জানা গেলেও, এর (জ্যা) মধ্যে বিশেষ কিছু উপাদান যেমন, *বাঘ নৃত্য*, *রাক্ষস নৃত্য* এগুলো কীভাবে যুক্ত হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে যেহেতু এটি জ্য-এর অংশ তাই একে বিচ্ছিন্ন একটি পরিবেশনা হিসেবেও দেখা চলে না।"[৪৬] বিভিন্ন অনুষ্ঠানে *বাঘনৃত্য* ও *রাক্ষসনৃত্যের* প্রদর্শন প্রচলিত থাকলেও 'জ্যা' নাট্যের অংশ হিসেবে তা কেবল-ই

---

৪৫ Richard Schechner, *Between theatre and Antropology,* University of Pensylvania Press, Philadelphia,1989, p.4

৪৬ মংমং মারমা প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩০/১০/২০১৪, নওয়াপোতং পাড়া, তারাচা ইউনিয়ন, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান

বিনোদনের জন্য নয় বরং গল্পের ধারাবাহিকতা এবং পরিবেশনামূলক কৃত্যনাট্যের সামগ্রিকতারও একটি অংশ হয়ে ওঠে। তথাপি, জাতিতাত্ত্বিক অন্যান্য দলগত নৃত্য হতে বাঘনৃত্যের বিন্যাস-বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা রয়েছে। এটি দল বা গ্রুপভিত্তিক পরিবেশনা হলেও মূল নৃত্যটিকে দলগত হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হয়, এখানে দুজন কুশীলব যুগপৎ নৃত্য করলেও দুজনের নৃত্যের ভঙ্গি ও বিন্যাস দুই রকম। এদের মধ্যে যিনি 'শিকার' তিনি কেবল তাঁত বুননের দোলাকে হস্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই ভঙ্গি অব্যহত রাখেন। অন্যদিকে যিনি 'বাঘ' চরিত্রে নৃত্য করেন তিনি প্রচলিত নৃত্য প্রদর্শনের বিপরীতে যন্ত্রীদের তাল, লয় ও ছন্দের ঝোঁক এবং গতির সাথে শরীরে বাঘের আচরণ ও ভঙ্গিগত শৈলী প্রদর্শন করেন, আর এই ছন্দবদ্ধ-শারীরিক কসরত ও বিন্যাসের সূত্রেই গল্পের পর্যায়ক্রমগুলো তুলে ধরেন। ফলে বাঘনৃত্যের শরীর-ভাষায় ভারসাম্য, বর্ধন (dilation) ও শৌর্যের (energy) সমন্বিত বহুমাত্রিক-গতি ও ছন্দের প্রয়োগে শরীরে যে 'নমনীয়তার গুণ' (plasticity)[৪৭] প্রদর্শিত হয়, অভিনেতার অর্জিত এই বিশেষ গুণাবলিকে 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, রাশিয়ান নির্দেশক, অভিনেতা মায়ারহোল্ডের দৃষ্টিতে যা অভিনেতার 'ড্যান্সিং কোয়ালিটি'। অর্জিত এই সক্ষমতা প্রচলিত নৃত্যের ধারণার বিপরীতে বাঘের আচরণ ও ভঙ্গিসমূহকে অ্যাক্রোবেটিক শৈলী-সমতুল্যে উপভোগ করতে সহায়তা করে।

অভিনেতার শরীরে অর্জিত 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' হচ্ছে এমন বিশেষ ধরনের গুণাবলি, যা অন্তরের গভীর সত্য ও সত্যমূলক উপলব্ধি, অনুভূতির দৈনন্দিন-অতিরিক্ত শরীরী-ভাষায় বিন্যাস ও প্রদর্শনে অত্যন্ত কার্যকর একটি উপায়। 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' বলতে এক্ষেত্রে অনুশীলন-পূর্বক নৃত্যের দক্ষতা অথবা প্রদর্শনের নৈপুণ্য অর্জনের কথা বলা হচ্ছে না বরং অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরে এমন নমনীয় (Flexible) গুণবাচক সক্ষমতা অর্জনের কথা বলা হচ্ছে যা অভিনেতার আন্তরসত্যের উদ্ঘাটন, উন্মোচন অথবা প্রদর্শনে একজন অভিনেতা হয়ে উঠতে পারে তাৎক্ষণিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়ন্ত্রিত। কেননা অভিনেতার দায়িত্ব হচ্ছে অন্তর জগতে ক্রিয়াশীল ভাব-আবেগ, অনুভূতি-উপলব্ধিকে নিপুণ দক্ষতায় শারীরিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা বা শরীর-ক্যানভাসে চিত্রায়িত করা। আর এই ক্ষেত্রে শরীর এবং মন উভয়ের পারস্পরিক আস্থা ও মিলনের সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি। কারণ উভয়ের সম্ভবনা যেমন সীমাহীন বিপরীতক্রমে সীমাবদ্ধতাও অসীম। অন্তরে ডানা মেলে নীল আক্কাশে ঘুরে বেড়ানো অথবা অন্তরের রক্তক্ষরণে হৃদয় পুড়ে যেতেই পারে, আর প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাতে ব্যক্তির মনোজগতে কিছু পরিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির এই সকল আন্তর-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দর্শক-আকর্ষণে সামান্যতম অভিঘাত সৃষ্টিতেও ব্যর্থ হয়, যদি না তা নির্দিষ্ট এবং নিপুণ দক্ষতায় শারীরিক

---

৪৭ For Meyerhold, plasticity –a key word – is the dynamic which characterizes both immobility and movement. To make the spectator become perspicacious, a pattern of scenic movements in necessary.
Eugenio Barba & Nicola Savarese, *A dictionary of Theatre Anthropology; The Secret Art of the Performer*, Routledge, London, 1999, P.154

অভিব্যক্তিতে যুক্ত হতে বা করতে সক্ষম হয়। তাই নাট্যক্রিয়ায় শরীর ও মনের অদ্বৈত সম্পর্কের বন্ধন ঠিক যেন একতারার স্পন্দন, মনো-তারের স্পন্দনে বিষম হয় দেহ-রূপ লাউয়ের খোলসে সুরের নাচন– [the] entire effort of acting should be toward the dual projects of managing and monitoring the performing body to optimize the creation of emotion *inthe audience*.[৪৮]

উদ্ধৃতিটির 'পারফরমিং বডি' বা *প্রদর্শিত শরীরের* গুরুত্ব বিবেচনায় মংমং মারমার শরীরের ভাষা বিশ্লেষণে দেখা যায়– এক. বাঘনৃত্যে প্রদর্শিত শরীর বা 'পারফরমিং বডি'তে রয়েছে 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা'র স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, যা তিনি 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' দ্বারা আলোড়িত হয়ে মনো-দৈহিক অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। যদিও তাঁর প্রদর্শিত নমনীয় শরীর পোশাক ও মুখোশের অন্তরালে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ/অন্তরীণ। অর্থাৎ দর্শকের পক্ষে কুশীলবের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত অভিব্যক্তিজাত আবেগ-অনুভূতি দ্বারা আলোড়িত বা আকর্ষিত হওয়ার সুযোগ সম্পূর্ণভাবেই মুখোশ দ্বারা অবরুদ্ধ। তথাপি এটা কুশীলবের জন্য সীমাবদ্ধতা হয়ে দেখা দেয়নি বরং আরও অধিক বর্ধিত শরীর ও শৌর্যের প্রদর্শন ঘটে মুখোশ ও পোশাকে আবদ্ধ কুশীলবের 'পারফরমিং বডি'তে, যা বাঘের শরীর ও মনোগত আচরণ ও ভঙ্গির রূপায়ণে কুশীলবকে সর্বাধিক নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে এই কুশীলব তাঁর দুই হাতের বাহু এবং পায়ের রানের মাংসপেশির ওপর সর্বাধিক জোর বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাথা, ঘাড়, পিঠ ও কোমরের নির্দিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত এমন কিছু ভঙ্গি প্রদর্শন করেন যা বাঘ চরিত্রের মনো-দৈহিক অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলে। আর এইভাবে, বাঘনৃত্যের সামগ্রিক পরিবেশনায় মংমং মারমাকে এমন কিছু পূর্বনির্ধারিত, নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত শরীর (বাঘরূপী) আচরণের প্রদর্শন করতে দেখা যায়, যা একজন কুশীলবের সাধারণ নৃত্য-গুণের অধিক 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা'র ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

দুই. ব্যক্তি/কুশীলবের এই শারীরীকরণের মধ্য দিয়েই মূলত বাঘ চরিত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি দৃশ্যমান হয়। তবে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটি অ-স্থায়ী। স্থায়ী নয়, কারণ এই প্রক্রিয়াটি বিবাহ, মৃত্যু, বয়োসন্ধিকাল প্রভৃতি সামাজিক কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতার মতো ব্যক্তির জীবনে নতুন এবং স্থায়ী পরিচয় আরোপ করে না। বরং কুশীলব এক্ষেত্রে বাঘ চরিত্রের প্রদর্শন শেষে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক কর্ম-আচরণে ফিরে আসেন। রূপান্তরের এই পর্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, এই অবস্থায় ব্যক্তি (কুশীলব) নিজেই নিজের দ্বারা আরোপিত অপর ব্যক্তিত্ব– 'বাঘ'-এর আচরণ ও ভঙ্গিগত শারীরীকরণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি ও পরিচালনার সুযোগ পান– সুসানা ব্লোচে'র ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'managing and monitoring the performing body'। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মংমং মারমা'র 'পারফরমিং বডি' বা প্রদর্শিত শরীরের নির্দিষ্ট ও

---

৪৮ Susana Bloch, *ALBA EMOTING: A Psychophysiological Technique to Help Actors Create and Control Real Emotions,* Theatre Topics, Septernber 1993, Volume 3 - Number 2, ISSN 1054-8378

নিয়ন্ত্রিত সাংকেতিক বিন্যাস ব্যক্তি ও চরিত্রের মধ্যবর্তী অবস্থান– 'আমি নই, আবার আমি নই তাও নয়' এই মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান্তরকে সহজ ও অর্থপূর্ণ করে তোলে।

সুতরাং এতক্ষণের সার্বিক বিশ্লেষণসূত্রে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' এবং মনো-দৈহিক শরীরের নমনীয়তা অর্জনে 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' অর্জন– এই দুটি বিষয়কে 'বাঘ নৃত্য' পরিবেশনায় কুশীলবের আদর্শ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা এই দুটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাঘনৃত্য থেকে নির্বাচিত বিশেষ ও একাধিক শরীর আচরণ/ভঙ্গি এবং এই নৃত্য প্রশিক্ষণের মূলগত আদর্শ 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' এই দুয়ের সমন্বয়ে এমন কিছু অনুশীলন পদ্ধতি অনুসন্ধান করা সম্ভব যা অভিনেতার শরীর ও মনের অভিন্ন চেতন-প্রক্রিয়াকে অধিক কার্যকর ও সাবলীল করে তুলতে পারে। একই সাথে মংমং মারমার 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' এবং 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' বৈশিষ্ট্য দুটির সাথে 'managing and monitoring the performing body' ধারণার সমন্বয় করে শরীর-ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে বিচিত্র সব সুরেলা ভঙ্গি– মনো-দৈহিক ভঙ্গি।

১.২.৩ কৃত্যনাট্য পাঙখুং

ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী মারমা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে *পাঙখুং* বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় একটি পরিবেশনা। এ পর্যন্ত মারমা সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শিল্পকলা বিষয়ক আলোচনাতে *পাঙংখুং*-কে সাধারণত 'নাট্য' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। পার্বত্য প্রকৃতি ও জীবনবৃত্তের জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের ধারণা, ধর্ম ও দর্শন অনুসৃত কৃত্যমূলক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবের একটি বিশেষ অনুষঙ্গ হিসেবে চর্চিত এবং পরিবেশিত হয় এই *পাঙখুং* নাট্য। বিষয় ও আঙ্গিক বিচারেও *পাঙখুং*-এ রয়েছে স্বতন্ত্র রীতি ও বৈশিষ্ট্যের অবস্থান। বিষয়গত দিক থেকে এই পরিবেশনায় বুদ্ধের জীবনী ভিত্তিক নানান গল্প-গাথা, কিংবদন্তি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রদর্শিত হয়। মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠানে এই নাট্যের পরিবেশনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ফলে সামাজিক সংযুক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতাই হচ্ছে *পাঙখুং* চর্চার মূল শক্তি– "পাঙখুং সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, গ্রাম/পাড়ার লোকদের সাথে আলোচনাপূর্বক উৎসাহীদের নিয়ে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। [.......] পাঙখুং দলের সবাই স্বেচ্ছাশ্রমে উৎসাহিত হয়ে মঞ্চায়নের উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকে এবং এটা বহুলাংশে ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকেই তাঁরা এ কাজে অংশ নেন।"[৪৯] রীতির বিচারেও এই পরিবেশনাকে নানা জন নানাভাবে অভিহিত করেছেন যেমন- *গীতিনাট্য*, *গীতিকাব্য*, *পালানাটক*, *কৃত্যনাটক*, *নৃগোষ্ঠী নাট্যাপালা*, *নৃত্যনাট্য* প্রভৃতি নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পাঙখুং শব্দের অর্থ পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পিঁপড়া বা মাকড়সা। মাকড়সা তার শিকার ধরার জন্য যেরূপ বিস্তৃত ও জটিল জাল তৈরি করে *পাঙখুং মনরি মাংৎসুমুই*-এর আখ্যানটিও সেরূপ বিস্তৃত এবং জটিলতায় বিন্যস্ত। অপরদিকে, মাকড়সা তার জাল বুননকালে যেরূপ চলন ভঙ্গি তৈরি করে, সেরূপ ভঙ্গির অনুকরণমূলক ছন্দ থেকেই উদ্ভব হয়েছে *পাঙখুং* 'নৃত্যছন্দের'– "সম্ভবত কীটদের সারিবদ্ধ চলন এবং বয়নকালে মাকড়সার ভঙ্গি থেকে এ ধরনের নৃত্যছন্দের উদ্ভব।"[৫০] নামকরণ প্রসঙ্গে এভাবেও বলা হয়ে থাকে যে–

> মারমা ভাষায় পাঙখুং-এর শব্দগত অর্থ মাকড়সা। মাকড়সা তার জীবন-জীবিকার জন্য নিজস্ব ভঙ্গিতে জাল রচনা করে। তার জালের বয়ন-ভঙ্গি বৃত্তাকার, ছোট বিন্দু থেকে তার প্রয়োজনানুসারে পরিধি বাড়িয়ে নেয় এবং এ কাজটি সম্পন্ন হয় নৃত্যছন্দের ভিত্তিতে। পাঙখুং-এর গীতিনাট্যও জীবন ও

---

৪৯ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

৫০ সেলিম আলদীন, *গবেষণাগার নাট্য: একটি মারমা রূপকথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৫, পৃ. ১০

জীবিকাভিত্তিক মাকড়সা বয়নের ন্যায় কাব্য, ছন্দবদ্ধ উপস্থাপন, ধীর লয়ে সুর বা গীত ও নৃত্য দর্শক ও শ্রোতাকে দ্রুত আকৃষ্ট ও মোহনীয় করে বলে এর নামকরণ পাঙখুং হওয়ার অভিমত রয়েছে।[৫১]

চিংলামং চৌধুরী *পাঙখুং*-এর শাব্দিক অর্থ প্রসঙ্গে আরো বলেন– "[অন্যদিকে] মারমা পাঙখুং শব্দকে ভাঙলে অর্থ দাঁড়ায়– পাঙ অর্থ সংঘবদ্ধ এবং খুং– অর্থ লাফ দেওয়া বা উল্লাস প্রকাশ করা। অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে উল্লাস প্রকাশ করার নৃত্যকলার নাম পাঙখুং।"[৫২] তবে, জনাব চৌধুরীর এই মত গ্রহণ করা যায় না, কারণ *পাঙখুং* প্রসঙ্গে অভিমত পোষণকারী প্রায় সকলেই *পাঙখুং*-কে ধীরলয়ের ছন্দবদ্ধ পরিবেশনা বলে অভিহিত করেছেন (আলোচনার পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে), যার সাথে চিংলামং চৌধুরী নিজেও ঐকমত্য পোষণ করেন। অপরদিকে *পাঙখুং*কে উল্লাস নৃত্য বলা হলে তা নৃত্যের তাল, লয় ও ভাবের দ্রুত গতির ছন্দের প্রকাশকেই নির্দেশ করে, যা এই পরিবেশনার রীতি ও আঙ্গিকের সাথে আদৌ সামঞ্জস্য নয়।

পাংখুং-এর কাহিনীতে ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবন ও কর্মের নানান দিক বিশেষ গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাতেই সূচনা হয়েছিল *পাঙখুং*-এর প্রচলন। তদুপরি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এবং গৃহস্থালি আনুষ্ঠানিকতাসহ প্রায় সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতায় রয়েছে *পাঙখুং* নাট্যের অংশগ্রহণ। সামাজিক ও ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানের সাথে *পাঙখুং*-এর এই সক্রিয় সংযুক্তির কারণেই সম্ভবত বিজ্ঞজনেরা *পাঙখুং*-কে অবসর বিনোদনের পরিবেশনা হিসেবে না দেখে কৃত্যমূলক পরিবেশনায় বিবেচনা করেছেন। বর্তমানে যদিও *পাঙখুং* মারমা জাতি-সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তথাপিও এর উদ্ভব ও বিকাশে রয়েছে নানান মত। ড. আফসার আহমদ মনে করেন- "আনুমানিক একশত বছর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা সমাজে এই পাঙখুং গীতিনাট্যর উদ্ভব হয়।"[৫৩] আবার কারো কারো মত এরকম যে–

> উপমহাদেশের জমিদারীর আমলের সমসাময়িক কালে পাঙখুং'র সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমেয়। কারণ নবাবী আমলের পূর্বে জমিদারদের চাপরাশি নামক এক পদবিধারী লোকের আবির্ভাব দেখা যায়। তাদের দায়িত্ব জমিদারদের পক্ষে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা অপর জমিদার বা তদনুযায়ী ব্যক্তির নিকট পেশ করা। পাঙখুর কাহিনীর রাজাগণের মধ্যে চাইপ্রাসিং নামক এক ধরনের দূত পরিলক্ষিত হয় যা জমিদারদের চাপরাশির অনুরূপ। সেই অনুসারে বৃহৎ পরিসরে গবেষণার পূর্বে সপ্তদশ

---

৫১ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

৫২ প্রাগুক্ত

৫৩ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ. ৩০৫

শতাব্দীর গোড়ার দিকেই পাঙখুং'র সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেন প্রবান্ধিক অংসুই মারমা ও চাইসুইহ্লা মারমা।[৫৪]

তবে *পাঙখুং* নাট্যরীতির উদ্ভবে কালগত প্রভেদ থাকলেও তা বিস্তর নয়, সকল মত-পার্থক্য বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনামলের কোনো এক সময়ে এই রীতির প্রচলন হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই উদ্ভব জাতি-সংস্কৃতির মূল থেকে নাকি বাইরের সংস্কৃতি থেকে? *পাঙখুং* নাট্যে ব্যবহৃত ভাষা রীতি এবং ধর্মীয় বিষয়ের সংযুক্তি এ দুটি বিষয় বিবেচনায় নিলে এটিকে মারমা জাতি-সংস্কৃতির ভিতর থেকে সৃষ্ট একটি পরিবেশনারীতি বলতে হয়। কেননা *পাঙখুং*-এ যে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত মারমাদের স্থানীয় ভাষার সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে, অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের নানাবিধ বিষয়ের উপস্থাপনা এই রীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাছাড়া *পাঙখুং* পরিবেশনায় সুর ও ছন্দের ব্যবহারে যে পুনরাবৃত্তিমূলক উপস্থাপনা (এ বিষয়ে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আালোচনা করা হয়েছে) পরিলক্ষিত হয়, সেটিও মারমা জাতি-সংস্কৃতির একান্ত নিজস্ব একটি রীতি। কেননা এই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক সুর ও ছন্দের ব্যবহার বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতির বর্ণনাত্মক, সংলাপাত্মক, নাটগীত অথবা মিশ্ররীতিতে দুর্লভ। একমাত্র পুঁথিপাঠে সুর ও ছন্দের পুনরাবৃত্তি দেখা গেলেও তা হচ্ছে এক ধরনের সাত্ত্বিক অভিনয়ভিত্তিক সুরেলা পাঠ বা পঠন, যাতে আঙ্গিক অভিনয়ের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এ সকল যুক্তি সত্ত্বেও পরিবেশনার আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য বিচারে *পাঙখুং*-এর উদ্ভব মূলে পুরোপুরিভাবে মারমা জাতি-সংস্কৃতিতে বিরাজমান 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' বা শিল্প-চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল এমনটা দাবি করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে যখন মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন এবং মারমা সাংস্কৃতিক সংগঠক মং ক্য শোয়েনু নেভী *পাঙখুং* প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেন–

> আসলে আমি খুঁজে পাই না যে, কেন পাংখুং আমাদের সংস্কৃতিতে আসলো। এটা পুরোপুরি আমাদের সংস্কৃতির বাইরের একটি পরিবেশনা। যদিও পাংখুং-এ পরিবেশিত ঘটমান ঘটনাগুলো আমাদের সাথে মিলে, ভাষাটাও সম্পূর্ণ আমাদের এবং তা আদি ও পিওর কিন্তু পাংখুং-এর চরিত্রের পোশাকে শাড়ির ব্যবহার এবং মণিমুক্তা খচিত বিশেষ পোশাক যা সম্পূর্ণ মারমা জাতি সংস্কৃতির বাইরে থেকে আসা, বাদ্যযন্ত্রে কঙ্গো, ড্রাম, হারমোনিয়াম, কর্নেট, কি-বোর্ড প্রভৃতির ব্যবহার, পরিবেশনা-রীতি প্রায় সবকিছুতেই বাংলা যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। কেননা আমাদের সমাজে তো হারমোনিয়াম,

৫৪ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

কর্নেট, কঙ্গোর ব্যবহার নেই। সম্ভবত এটা বৃটিশ সময় অথবা বৃটিশ পরবর্তী সময় থেকেই মগধ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসেছে।[৫৫]

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের আলোকে *অং জাইং* পাড়ায় প্রদর্শিত *পাঙখুং*-এর তুলনামূলক বিচারে জনাব নেভীর করা মন্তব্যই প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ এ পরিবেশনায় বাংলার যাত্রার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রবেশ-প্রস্থান রীতি বা প্রথা অনুসরণ করে কুশীলবগণের নৃত্যে অংশগ্রহণ এবং চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চ-ক্রিয়া সম্পাদন করা *পাঙখুং*-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে সব মুখ্য বা প্রধান চরিত্রে অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের পোশাকের ব্যবহার বাংলায় প্রচলিত যাত্রার হুবহু অনুকরণ বলা যায়। বাদ্যযন্ত্রের ধরন ও ব্যবহারে রয়েছে বাংলা যাত্রার প্রভাব। তাছাড়া অভিনয়রীতিতেও রয়েছে যাত্রা-সুলভ ভাব-ভঙ্গির প্রকাশ। কেবল নৃত্যে অংশগ্রহণকারীর মেয়েদের পোশাক এবং নৃত্যের ভঙ্গিমায় মারমা সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন ঘটে। সুর ও ছন্দের ব্যবহার বৈচিত্র্যহীন ও পুনরাবৃত্তিমূলক হলেও বিশেষ অথবা উচ্চকোটি চরিত্রের (রাজা, উজির ইত্যাদি) প্রবেশ-প্রস্থানকে মহিমান্বিত বা গুরুত্বপূর্ণ করার জন্য কর্নেটের বিশেষ সুর ব্যবহার করা হয়, যেটিও বাংলা যাত্রা পরিবেশনার একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় *পাঙখুং*-কে সম্পূর্ণত মারমা জাতি-সংস্কৃতি থেকে জাত একটি পরিবেশনা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা পাঙখুং-এর আখ্যান, ভাষা, বিষয়বস্তু, বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের-কিংবদন্তি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ-সম্পর্ক একদিকে যেমন মারমা সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, পক্ষান্তরে এর আঙ্গিক বিন্যাসে বিশেষত– পোশাক, বাদ্যযন্ত্র এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিনয়ের রীতি বা ধরন প্রভৃতি বিবেচনায় তা বাইরের সংস্কৃতির প্রভাবকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

তবে পূর্বেই উল্লেখ করেছি *পাঙখুং* আখ্যানের ঘটনা এবং চরিত্রের বিন্যাসে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বলিষ্ঠ উপস্থিতি বিদ্যমান। *পাঙখুং*-এর মূল চরিত্র সবক্ষেত্রে রাজপুত্র বা রাজকন্যাই হবে বিষয়টা এমন নয়। এখানে দেব-দেবী, পশু-পাখি, রাজা, উজির থেকে সাধারণ প্রজা যেকোনো চরিত্রই এর মূল চরিত্র/নায়ক বা নায়িকা চরিত্র হতে পারে। তাই *পাঙখুং*-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'চরিত্রের রূপান্তর' হওয়া, অর্থাৎ মানুষ থেকে পশু বা পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে কাহিনীর গতি-পথ পরিবর্তন অথবা কাহিনীতে প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রাখে, প্রকারান্তরে যা *পাঙখুং* পরিবেশনায় বৌদ্ধদর্শনের জন্মান্তরবাদের ধারণা প্রচার বা চর্চার বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাছাড়া আখ্যানের গভীর সংকটাপূর্ণ অবস্থায় অথবা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বয়ং বুদ্ধের কৃপাধন্য হওয়ার বিষয়টিও *পাঙখুং* আখ্যানের আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। *মনরি মাংৎসুমুই* আখ্যানে তাই দেখা যায়, *মনরি* ও *সাথানু*– প্রধান দুই চরিত্র, উভয়ে পূর্বজন্মে ছিলেন কপোত-কপোতী, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাদের মানুষ হয়ে মর্ত্যে আগমন, মর্ত্য থেকে স্বর্গে গমন এবং পুনরায় মর্ত্যে আগমনের মধ্য দিয়ে চরিত্রদ্বয় একটি পূর্ণ-

৫৫ মং ক্য শোয়েনু নেভী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

জীবনচক্র সম্পাদন করে। আবার স্বর্গ হতে *মনরি*কে নিয়ে মর্ত্যে আগমন এবং ফেলে যাওয়া কোলের শিশু সন্তানটিকে শতবর্ষীয় বৃদ্ধ সন্তান হিসেবে পাওয়ার এই অস্বাভাবিক অবস্থাটি গৌতম বুদ্ধের কৃপাধন্যে স্বাভাবিক হয়ে যায়, অর্থাৎ তারা উভয়ে অতীতের সেই প্রণয়পূর্ণ যৌবন কাল এবং সেই সময়ে জন্ম নেওয়া ফুটফুটে পুত্রসন্তানকে ফিরে পায়। *মনরি মাংৎসুমুই* এবং *সাথানু* বুদ্ধের কৃপাধন্য চরিত্র হওয়ায় প্রকারান্তরে তারা দর্শক-চিত্তেও অতি শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র চরিত্র হিসেবে স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়। *পাঙখুং* বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত মারমা সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তাই বিনোদন-অতিরিক্ত একটি ধর্মীয় কৃত্যমূলক পরিবেশনা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই হয়তো, পার্বত্য জনপদের মারমা জাতি-সংস্কৃতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচলিত নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য এবং গ্রহণযোগ্য অনুষঙ্গ হিসেবে *পাঙখুং* পরিবেশনার রেওয়াজ নিয়মিত হয়ে উঠেছে। যদিও বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর নাগরিক সংস্কৃতির উন্নয়নে দুর্গম-বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভেঙে পড়ছে ক্রমশ এবং জাতি-সংস্কৃতিজাত পরিবেশনার আবেদন ক্রমাগতভাবে দুর্বল, বিবর্ণ হয়ে পড়ছে।

বক্ষ্যমাণ আলোচনায় *পাঙখুং* নাট্য-দেহে সাঙ্গিকৃত নৃত্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য অনুসারে *পাঙখুং* পরিবেশনায় রীতি ও আঙ্গিকের বিশ্লেষণসূত্রে কুশীলবের শরীর-ভাষা, ছন্দ, নৃত্য এবং মনো-দৈহিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে এর থেকে অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান অন্বেষণে দৃষ্টি আবদ্ধ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে *পাঙখুং*-এর নৃত্য ও ছন্দের বিন্যাসে, কুশীলবের মনোদৈহিক উপস্থিতিতে এবং আখ্যান পরিবেশনায় দেহের বর্ণানাত্মক গুণাবলি বা সক্ষমতা এবং কৌশলগত দিক প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার দুর্গম পার্বত্য জনপদ অং জাইং পাড়ায় প্রচলিত রয়েছে মারমা জাতি-সংস্কৃতি ঐতিহ্যে লালিত কৃত্যমূলক পরিবেশনা 'পাঙখুং নাট্য'। অনুক মারমা পরিচালিত এই দলের সদস্য সংখ্যা ৩০ অধিক (যদিও পর্যবেক্ষণকৃত নাট্যের কুশীলব সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন)। দলীয় নৃত্যে নারী কুশীলবদের অংশগ্রহণে সংখ্যাগত কম বা বেশি হওয়া, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে সংখ্যার তারতম্য হওয়া অথবা একজন কুশীলবের একাধিক চরিত্রে অংশগ্রহণের কৌশল অবলম্বন করা প্রভৃতি কারণে এই পরিবেশনায় সম্পৃক্ত মোট কুশীলব সংখ্যা ৩০-এর অধিক বা কম হয়ে থাকে। আখ্যান পরিবেশনায় কুশীলবদের অংশগ্রহণে সংখ্যাগত তারতম্যের কারণে এবং দলে কুশীলব/সদস্যদের কম বা বেশি সংখ্যায় যুক্ত হওয়া বা না হওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ, শিথিল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকায় প্রকারান্তরে *পাঙখুং* পরিবেশনার রীতি ও কাঠামোগত নমনীয়তার ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা *পাঙখুং*-এ যতখানি ব্যক্তি বা দলের অধিকার, ততখানি অধিকার সমষ্টির বা সর্বজনের। এজন্যে *পাঙখুং* পরিবেশনার সাথে সমষ্টির বা গোত্র-সদস্যদের (কুশীলব/ সংগঠক/ পৃষ্ঠপোষক/ দর্শক/ ভক্ত/ বিশ্বাসী) অংশগ্রহণ-অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই কম বা বেশি হয়ে থাকবে এটাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কেননা সামাজিক সংযুক্তিই *পাঙখুং* পরিবেশনার মূল ভিত্তি– "পাঙখুং সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি গ্রাম/পাড়ার লোকদের সাথে আলোচনা পূর্বক উৎসাহীদের নিয়ে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। [.......] পাঙখুং দলের সবাই স্বেচ্ছাশ্রমে উৎসাহিত হয়ে মঞ্চায়নের উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকে এবং এটা বহুলাংশে ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকেই তাঁরা এ কাজে অংশ নেন।"[৫৬] তাছাড়া পরিবেশনার জন্য গড়ে ওঠা দলটিও কেবল ব্যক্তির বা দলের সদস্যদের অধিকারের বিপরীতে সামষ্টিক অধিকার বা গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে, যেমন– অং জাইং পাড়ার পাঙখুং দল, মেওয়া পাড়ার পাঙখুং দল ইত্যাদি। তাছাড়া *পাঙখুং*-এ আখ্যান ও রীতির কাঠামোগত নমনীয়তা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে পরিবেশনাতে অংশগ্রহণকারী সদস্যের সংখ্যা কম বা বেশি হয়ে থাকে।

অনুক মারমা পরিচালিত রোয়াংছড়ি, অং জাইং পাড়ার *পাঙখুং* দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন– চ তা মং (হারমোনিয়াম), উ চি মং (ঢোল), কেওঅং (জুরি), মওফু শিং মারমা (কর্নেট), নৃত্য এবং চরিত্র অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা হলেন– গ ওম বা, অং চ সুয়ে, চুয়ে সা মং, উ সুয়ে চিং, চ মে চাং, উ নু মিং, নো মি সিং, খ মি সিং, ক্রা মো চিং, মুই নুং চিং, চিন ওয়াং প্রু এবং চেইয়াং প্রু। দলের সকল সদস্য একই পাড়ার প্রতিবেশী বাসিন্দা, পেশাগত দিক থেকে প্রত্যেকেই কৃষি/ জুমচাষের ওপর নির্ভরশীল, তবে এর সাথে ছোট

৫৬ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

আক্কারের চা/মুদি দোকান/প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা প্রভৃতি পেশায়ও যুক্ত আছেন কেউ কেউ। *পাঙখুং* পরিবেশনায় দলের ব্যয় বাবদ ও কুশীলবদের সম্মানী বাবদ কিছু আর্থিক বিনিময় হয় এবং স্থানিক দূরত্ব ও উৎসবের ধরন বিবেচনায় অর্থের পরিমাণ কিছুটা কম বা বেশি হয় ঠিকই, তথাপিও *পাঙখুং* পরিবেশনাকে পরিপূর্ণভাবে একটি পেশাগত কর্মের বিপরীতে প্রথা, রীতি, কৃত্য-কর্ম হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এই দলের সকল কুশীলব।

বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার দুর্গম পার্বত্য জনপদ অং জাইং পাড়ায় প্রচলিত *পাঙখুং* নাট্যের প্রশিক্ষণ বা শিক্ষণ পদ্ধতিটি পরম্পরাগত অনুকরণমূলক। তবে অনুকরণের প্রক্রিয়াটি দুটি উপায়ে কার্যকর হয়– আনুষ্ঠানিক অনুকরণ প্রক্রিয়া এবং অনানুষ্ঠানিক অনুকরণ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ একদিকে যেমন আগ্রহী ব্যক্তি/ সদস্যগণ গুরু/ মাস্টার/ পরিচালকের নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুকরণের মাধ্যমে নৃত্য এবং অভিনয়ের কৌশলগত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। অপরদিকে পরিবেশনার ভক্ত/দর্শক/পৃষ্ঠপোষক/সংগঠক হিসেবে দীর্ঘ সময়ের সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতাসূত্রে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াতেও এই দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। এমনকি কখনো কখনো দর্শক উপস্থিতিতে সরাসরি পরিবেশনার মাধ্যমেও শিখে নেওয়া হয় বলে দলসূত্রে জানানো হয়। অর্থাৎ পৃথকভাবে মহড়া বা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বা প্রদান এক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা *পাঙখুং*–এর সাথে যুক্ত রয়েছে এমন নবীন সদস্যদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায় যে, তারা ছোটবেলা থেকেই এলাকায় অনুষ্ঠিত *পাঙখুং* দেখে দেখে বড় হয়েছে। এলাকায় *পাঙখুং* অনুষ্ঠিত হলে আগ্রহী সবাই অনুষ্ঠান-আয়োজনে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মের সাথে কমবেশি যুক্ত হয়ে থাকে। তদুপরি নৃত্য ও গীতের দক্ষতা শৈশব থেকে অন্য সকল ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের করণীয় অনুষঙ্গ হিসেবে স্বাভাবিক নিয়মেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তরটি দীর্ঘ সময় ধরে অনানুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। আর এ কারণেই *পাঙখুং*-এর একজন কুশীলব হিসেবে যুক্ত হতে খুব বেশিকিছু আনুষ্ঠানিক মহড়া/প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না অং জাইং পাড়ার *পাঙখুং*-এর কুশীলবগণ। বিশেষ কিছু সমস্যা বা প্রয়োজন হলে পরিচালক/অভিজ্ঞ প্রবীণ/গুরু প্রভৃতি ব্যক্তির পরামর্শ অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'শিখিয়ে দেওয়া'র কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হয় *পাঙ্খুং*–এর শিক্ষণ প্রক্রিয়া।

সুতরাং অং জাইং পাড়ার *পাঙখুং*–এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক অনুকরণের উপস্থিতি থাকলেও এটি অনেকটাই উন্মুক্ত ও অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুকরণাত্মক, যা গোষ্ঠীর আগ্রহী সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত পর্যবেক্ষণ এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অনানুষ্ঠানিক এই অনুকরণ পদ্ধতিতে ধ্রুপদী নৃত্য অথবা সংকেতাবদ্ধ নৃত্য/নাট্যের ন্যায় পরম্পরাগত দীর্ঘ ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণসূত্রে শরীর থেকে শরীরে 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' সঞ্চালন (Transmission) প্রক্রিয়াটি এখানে কার্যকর নয়। বরং এই প্রশিক্ষণ প্রদ্ধতিটি পরম্পরাগতভাবে

ধারাবাহিক কিন্তু তা অনানুষ্ঠানিক, যা মূলত স্থান, কাল ও পাত্রের ক্রমাগত সম্পর্কসূত্রে মানিয়ে নেওয়া/দক্ষ/যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হওয়া বা না হওয়াটাই এখানে বিবেচ্য– গ্রেডেশন, ডিভিশন, সার্টিফিকেট এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন এই প্রক্রিয়ায় অচল ও অর্থহীন। সময়ের দীর্ঘ ব্যাপ্তির কারণে তা কায়িক শ্রমসাধ্যও নয় বরং সহজ, সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, অনুকরণ ও শারীরীকরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে *পাঙখুং* নাট্যের পরম্পরাগত 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' অর্জনের কার্যকরিতা। মূলত এটা হচ্ছে জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতিতে পরিবেশনা পরম্পরার অন্যতম একটি বিবর্তন প্রক্রিয়া–

> Before writing in the alphabetic sense, performances were ways of enacting, reliving, remembering, and passing beliefs and knowledge through time. The transmitting of performance knowledge was body-to-body learning and which was part of a larger, inclusive process that include training, performing, remembering, and starting the process over again.[৫৭]

বাংলা লোকনাট্যের ন্যায় *পাঙখুং*-এর পালা বা আখ্যান পরিবেশনাতেও রয়েছে আনুষ্ঠানিক আখ্যানপূর্ব পরিবেশনা। সাধারণত কনসার্ট বা বাদ্যযন্ত্রের সমন্বিত বাদন, বন্দনা, দলীয় নৃত্য এবং পালা প্রারম্ভে প্রাক-কথন প্রভৃতি কয়েকটি পর্যায়ক্রম পরিবেশিত হয় আখ্যান-পূর্ব পরিবেশনাতে। সমন্বিত যন্ত্রবাদন শেষে একদল কিশোরীর দেব-দেবী, প্রকৃতি এবং অশুভ শক্তির উদ্দেশ্যে গীত ও বৃত্তাকার নৃত্যের ছন্দে পরিবেশিত হয় বন্দনা। কুশীলবদের প্রস্তুতি এবং আসরের সার্বিক মঙ্গল কামনা, দর্শক-আয়োজক-উদ্যোক্তা-সংগঠক সকলের কল্যাণ কামনা করা, আমন্ত্রণ বা বায়নাকারীর বিশেষ মনোবাঞ্ছা, আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং পালা বা আখ্যানের নির্বিঘ্নতা কামনার উদ্দেশ্যে পরিবেশিত বন্দনার মাধ্যমে স্মরণ করা হয় দেব-দেবীসহ অতি-প্রাকৃত শক্তিদের। বন্দনা শেষে পরিবেশিত হয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত মারমা কিশোরীদের *পাঙখুং* সুরের দলীনৃত্য। আখ্যান বা পালার পূর্বে নৃত্যের প্রচলন বাংলা লোকনাট্যেও দুর্লভ নয়। আখ্যান-পূর্ব দলীয়নৃত্য একদিকে যেমন আখ্যানের সাথে দর্শককে একাত্ম হওয়ার পথ সুগম করে দেয়, তেমনি আবার কুশীলবদের নৃত্য ও গীতাভিনয়ের শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কুশীলবের মনোযোগ আখ্যান-কেন্দ্রিক করতেও সাহায্য করে। সর্বশেষে রয়েছে প্রাক-কথন বা পালার প্রাসঙ্গিক কথন। এই পর্যায়ে একজন কুশীলব দর্শক অভিমুখী হয়ে পালা শুরুর ঘোষণা এবং শান্তিপূর্ণভাবে পালা দর্শনের আহ্বান জানান। এরপর শুরু হয় মূল পালা বা *পাঙখুং* আখ্যান *মনরি মাংৎসুমুই*।

---

৫৭ Richard Schechner, *performance Studies*, Routhledge, 2002, USA, P. 190

পরিবেশন ও বিশ্লেষণ

অং জাইং পাড়ায় পরিবেশিত *পাঙখুং*-এর কাহিনীটি ছিল এরকম– স্বর্গ রাজার ছিল সাত কন্যা। প্রত্যেকেই ছিল অপরূপ সুন্দর এবং রূপে আর গুণে এতই সমৃদ্ধ যে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যে কারো জন্যই অতি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। সাত কন্যাদের অতি আকাঙ্ক্ষার একটি বিষয় ছিল, যদি কোনো একদিন সুযোগ পায় তারা অবশ্যই মর্ত্য ভ্রমণে যাবে এবং সেখানে মনোরম সরোবরের স্বচ্ছ জলে স্নান সেরে পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসবে। একদিন সাত কন্যা তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা বাবাকে জানিয়ে মর্ত্যে ভ্রমণের অনুমতি চায়। কিন্তু রাজা ইতোমধ্যেই জেনে যায় সাত কন্যার মনোবাসনা এবং একদিন স্বপ্নে দেখতে পায় যে, মর্ত্য ভ্রমণে কন্যারা রাক্ষসের আক্রমণের মুখে পড়বে আর তার এক কন্যার সমূহ বিপদ হবে। তাই রাজা যেকোনো মূল্যে কন্যাদের মর্ত্য ভ্রমণের অনুমতি প্রদান না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কিন্তু অতি আদরের সাত কন্যা যখন মিনতি জানিয়ে মর্ত্যে গমনের অনুমতি চাইলো রাজা তখন না করতে পারলো না। অনুমতি পেয়ে সাত কন্যা এরপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় মর্ত্যে আসে এবং একটি সরোবরের নীল স্বচ্ছ জলে মহানন্দে সাঁতার কেটে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যায়। এভাবেই চলতে থাকে তাদের মর্ত্যে আগমন আর সরোবরের অবগাহন ক্রীড়া।

কিন্তু মর্ত্যের শিকারি নাগরাজ একদিন দেখতে পায় যে, স্বর্গ রাজ্যের সাত অপরূপ পরী উড়ে এসে সরোবরে স্নান করছে। পরীদের দেখে নাগরাজের মনে দুষ্ট বুদ্ধি খেলে যায়, সে স্বর্গের পরীদের আটকে রাখার ফন্দি করে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন সন্ধ্যায় নাগরাজ বিষের জাল দিয়ে পরীদের আটকে ফেলে। বুদ্ধি করে অন্য পরীরা ঐ বিষের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও ছোট পরী– *মনরি মাংৎসুমুই* আটকে যায় সেই জালে। এরপর শিকারি নাগরাজ মনরিকে নিয়ে চলে যায় এবং পরিচয় করিয়ে দেয় সে দেশের রাজপুত্র সাথানুর সাথে। সাথানু প্রথম দর্শনেই মনরির প্রেমে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে, মনরির মনটাও নরম হয় সাথানুর আন্তরিক ব্যবহার আর বন্ধুসুলভ আচরণের কারণে উভয় উভয়ের প্রেমে পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মনরি সাথানুকে বিয়ে করতেও সম্মত হয়।

এদিকে মারমা রাজ্যে যুদ্ধ শুরু হলে রাজপুত্র সাথানু দেশের রক্ষায় যুদ্ধে চলে যায়। এই সুযোগে রাজপ্রাসাদের ব্রাহ্মণগণ গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। কারণ তারা রাজকুমারের স্ত্রী হিসেবে একজন বৌদ্ধকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। অধিকন্তু বহুগুণের অধিকারী মনরি তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছে, যা ক্রমেই প্রাসাদ-ব্রাহ্মণদের চক্ষুশূল হয়ে উঠছিল। এদিকে রাজা একদিন একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে এই বলে স্বপ্নে ব্যাখ্যা প্রদান করে যে, রাজপুত্র সাথানু যুদ্ধক্ষেত্রে মহা-বিপদের মুখে আছে, তার কল্যাণের জন্য স্ত্রী মনরিকে মন্দিরে বলি দিতে হবে। মনরি বুঝতে পারে যে কী নিদারুণ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছে সে। মনরির কোলে ততদিনে একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানও এসেছে, তাই

নিজের ও পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থেই পুত্রকে ফেলে স্বর্গে পিত্রালয়ে উড়ে চলে যায়। কিন্তু তার স্বামী এতসব ষড়যন্ত্রের কিছুই জানে না, তাই যাতে কোনো এক দিন এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে এবং জানতে পারে যে তার স্ত্রী কোথায় আছে, সেজন্য উড়ে যাওয়ার পথে গভীর জঙ্গলে বাস করা এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে বিস্তারিত কাহিনী বলে হাতের আংটিটি চিহ্ন স্বরূপ তার কাছে রেখে যায়।

এদিকে যুদ্ধ থেকে ফিরে সাথানু যথারীতি বিভ্রান্ত হয় এই জেনে যে, স্ত্রী মনরি গৃহে নেই এবং কেউ কিছু বলছেও না। এতে সে তীব্র মনোবেদনা নিয়ে গৃহত্যাগী হয় এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় যদি কোনোদিন স্ত্রী মনরির দেখা মেলে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন গভীর জঙ্গলের সেই সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায় এবং কথোপকথন প্রসঙ্গে জানতে পারে মনরি বেঁচে আছে, শুধু তাই নয় মনরির রেখে যাওয়া আংটি দেখে সাথানু আরও অস্থির হয়ে ওঠে, কীভাবে স্বর্গরাজ্যে মনরি কাছে যেতে পারে তা জানতে চায় সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী তাকে স্বর্গ গমনের সব পথ বলে দেয় এবং সাথানু রওনা হয় স্বর্গে মনরির সাক্ষাতে। কিন্তু স্বর্গে গমনের পথ এত সহজ নয়, তাই সাথানুকে নানান উপায়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে স্বর্গে পৌঁছাতে হয়। মনরির সাক্ষাৎ পাওয়া ক্রমশই যেমন কঠিন তেমনি বিপদের হয়ে দাঁড়ায়, অবশেষে কৌশলে হাতের আংটিটি মনরির কাছে পৌঁছে দিয়ে তার আগমনের খবরটি নিশ্চিত করতে পারে। মনরিও তার স্বামীর সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে, কেননা স্বর্গের রাজা জানতে পারে সাথানুর আগমন। স্বর্গরাজ্যের কেউ আর সাথানুকে মেনে নিতে রাজি নয়, কিন্তু মনরির অনুরোধে অবশেষে বিশেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় সাথানুকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই মিলবে মনরির সাক্ষাৎ। যথারীতি কঠিন সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ঘটে সাথানু আর মনরির সাক্ষাৎ এবং পুনরায় বিবাহের মাধ্যমে তাদের মিলন হয়। অবশেষে তারা ফিরে আসে মর্ত্যলোকে, কিন্তু ততদিনে শতবর্ষের ব্যবধান ঘটে গেছে। প্রাসাদে ফেলে যাওয়া সেই ছোট্ট শিশুটি শতবর্ষের অধিক এক বৃদ্ধ। অবশেষে ভগবান বুদ্ধের কৃপায় তারা অতীত সময় ফিরে পায়, ফলে ফিরে পায় রাজপ্রাসাদের সুখকর সেই দিনগুলো। এদিকে শিকারি নাগরাজ জানতে পারে যে, পূর্বজন্মে সে ছিল সাথানু আর মনরির দাস এবং সাথানু এবং মনরিও পূর্বজন্মে ছিল একজোড়া কপোত-কপোতী। এক ভয়াল অগ্নিকাণ্ডে তাদের শিশুটি গাছ থেকে পড়ে পুড়ে গেলে সেই শোকে কপোত-কপোতীও আত্মাহুতি দেয় এবং পরের জন্মে *সাথানু* আর *মনরি মাংৎসুমুই* নামে জন্মগ্রহণ করে।

সংক্ষিপ্ত আক্কারে উপস্থাপিত এই আখ্যানটির সম্পূর্ণ পরিবেশনায় প্রয়োজন হয় দুই রাত। প্রধান দুই চরিত্র *মনরি মাংৎসুমুই* এবং *সাথানু*কে কেন্দ্র করে আখ্যানের সকল ঘটনাক্রম বিন্যস্ত (প্লট) হলেও ঘটনার মূল ধারাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে বিন্যস্ত হয়েছে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনা বা সাব-প্লট যা সমস্ত আখ্যান

জুড়ে জালের মতো বিস্তার করে আসে। জালের মতো বিস্তার লাভ করা আখ্যানের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে *পাঙখুং*-এর পরিবেশনারীতি এবং এর নামকরণের সাথে সাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন অনেকে।

পাঙখুং মারমা জাতি-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলেও এর 'পরিবেশনারীতি' বিষয়ে রয়েছে নানান মত-পার্থক্য। *পাঙখুং* পরিবেশনায় অভিনয় উপাদানের (নৃত্য, গীত– বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক) ব্যবহারে নমনীয়তার কারণে বিশেষত, আখ্যান পরিবেশনায় নৃত্য ও গীতের অভিন্ন উপস্থিতি সত্ত্বেও এদের প্রায়োগিক গুরুত্ব ও কৌশলগত ব্যাখ্যায় একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়, ফলে গবেষকগণের মতামতের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন– আখ্যানোক্ত বিষয়ের সাথে গীতাভিনয়ের সম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব বিবেচনায় *পাঙখুং*কে এক প্রকার ধর্মবিষয়ক গান বলে আখ্যায়িত করে সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন-"এটি মারমাদের গীতিনাট্য। সাধারণত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মবিষয়ক গান। এই পাংখুং গান সুরে গাওয়া হয়।"[৫৮] এখানে সুর বিন্যাসে (কম্পোজিশান) বিশিষ্টতা বিদ্যমান। বস্তুত সুর-বিন্যাসে যে বিশিষ্ট ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তা মারমা জাতি-সংস্কৃতির অন্যান্য পরিবেশনায় বহুল প্রচলিত নয়। সম্ভবত কাহিনীর সাথে সুর-বিন্যাসের সম্পর্ক বিবেচনায় পাঙখুংকে *গীতিনাট্য* বলে অভিহিত করে থাকবেন এমনটা ধারণা করা যায়। তাছাড়া এই সুরের সাথে যখন যুক্ত হয় ধর্মীয় বিষয়-আশয় তখন *পাঙখুং* সুরকে ধর্মীয় বা ধর্মবিষয়ক গান তো বলাই যায়। আবার আখ্যানোক্ত বিষয়ের সাথে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন প্রসারের ইঙ্গিত, দর্শক ও কুশীলবের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মভিত্তিক নানান উৎসব ও পার্বণে এই আখ্যান পরিবেশনের দিকটি বিবেচনায় এনে নাট্যকার ও গবেষক ড. সেলিম আল দীন *পাঙখুং*-কে 'কৃত্যনাটক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি পাঙখুং-এর প্রসিদ্ধ 'মনরি মাংৎসুমুই'র আখ্যান প্রসঙ্গে বলেন– "মনরি পালা একটি কৃত্যনাটক, মারমাদের শ্রমণ, প্রব্রজ্যা ও বিবাহ উপলক্ষে পরপর দু'রাত ধরে পরিবেশিত হয়। সমতলে একপাশে বাদ্যযন্ত্র অন্যপাশে ঘেরদেওয়া সাজসজ্জা গ্রহণের আড়াল তৈরি করে এই পালা পরিবেশিত হয়। আধুনিককালে সাজানো মঞ্চেও এর পরিবেশনা চলে।"[৫৯] সেলিম আল দীন এখানে আখ্যানের সাথে মারমা শ্রমণ, প্রব্রজ্যার সম্পৃক্ততার নিরিখে কৃত্যকে মুখ্য বিবেচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, মনরি'র আখ্যানেও বুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি রয়েছে। কেউ আবার আখ্যান উপস্থাপনায় নৃত্যের কৌশলগত উপস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ অভিনয়-উপাদান বিবেচনায় পাঙখুং-কে নৃত্যনাট্যের পরিবারভুক্ত করেছেন– "পার্বত্য অঞ্চলের মারমা উপজাতিরা তাদের বিখ্যাত রূপকথা 'মনরী মাসুমি' অবলম্বনে সুন্দর 'নৃত্যনাট্য' পরিবেশন করে থাকে– যার মধ্যে অতোবেশী নাটকীয়তার পরিবর্তে রূপকথার কিছু চিত্রকল্পকে নৃত্যের মাধ্যমে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছে। রূপকাহিনীটি নেপথ্যে সংক্ষিপ্ত ধারাবর্ণনায়

---

৫৮ সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ. ৬৮

৫৯ সেলিম আল দীন, *গবেষণাগার নাট্য: একটি মারমা রূপকথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৫, পৃ. ১০

পরিবেশিত হতে থাকে।"[৬০] এই মতের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মারমা লেখক ও গবেষক মি. ক্যশৈপ্রুও পাঙখুং নাট্যকে 'নৃত্যনাট্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতি নির্ভর এই আখ্যান প্রকারান্তরে মারমাদের জীবনাচারেরই প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে– 'পৌরাণিক উপাখ্যান বা কাহিনীসূত্র থেকে জনজীবন তার চলার উপায় বা দিকনির্দেশনা খুঁজে নেয়'– এমন একটি ধারণা থেকে মারমা জাতিসংস্কৃতির বিপুল সাহিত্য উপাদান সমৃদ্ধ *পাঙখুং* পরিবেশনাকে আখ্যান সমৃদ্ধ 'পালাগান' হিসেবে আখ্যায়িত করে হাফিজ রশিদ খান বলেন– 'মনহরি-সাথানু পৌরাণিক উপাখ্যানটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ লোকপ্রচলিত গাথা।'[৬১] অন্যদিকে *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য* গ্রন্থে আফসার আহমদ এবং 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা'[৬২] বিষয়ক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধে চিংলামং চৌধুরী উভয়ে *পাঙখুং*-এর গীত ও গীতাভিনয়কে অধিক গুরুত্ব বিবেচনায় একে 'গীতিনাট্য' হিসেবে উল্লেখ করেন। মারমা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মং ক্য শোয়েনু নেভী পাঙখুং-এর নৃত্যকেই প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে একে মারমা সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ একটি নৃত্যকলা হিসেবে বিবেচনা করেছেন :

> "মারমা জনসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্য হলো "পাংখুং আক্কাহ্"। পাংখুং শব্দের অর্থ কীট, পিঁপড়া, বা মাকড়সা। সম্ভবত, কীট-পতঙ্গের সারিবদ্ধ চলন কালে মাকড়সার ভঙ্গি থেকে এ ধরনের নৃত্য ছন্দের উদ্ভব। পাংখুং আক্কাহ্ এক ধরনের ধীরলয়ের ছন্দবৃত্ত সারিবদ্ধ নৃত্য। এ নৃত্যে কাঁধ, নিতম্ব, পা বসা অবস্থায় কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় হাঁটু ও হাতের সাধারণ সঞ্চালন দেখানো হয়। এ নৃত্যে খুবই সীমিত কতগুলো নাচের মুদ্রা ও ভঙ্গি দিয়ে এর মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।"[৬৩]

বিজ্ঞজনদের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি 'রীতি' নিরূপণে *পাঙখুং*-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে জটিল করে তুললেও মূলত এ সকল মতামত যে বৈচিত্র্যের খোরাক জোগায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা একটি পরিবেশনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বা সংজ্ঞায়িত করার সক্ষমতা প্রকারান্তরে ঐ পরিবেশনারীতির নমনীয়তা ও সহজ-গ্রহণযোগ্যতার গুণকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সকল মতামতের মাধ্যমে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে যা বিশদ ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ নয়, কেবল পরিবেশনার গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের নামকরণ করা হয়েছে মাত্র। তাছাড়া প্রদত্ত সকল ব্যাখ্যার মূলে জাতিতাত্ত্বিক সংবেদশীলতা ক্রিয়াশীল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে ড. সেলিম আল দীন জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা *পাঙখুং*-এর রীতি-বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ কোনো বিশেষ জাতি-সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে নারাজ

---

৬০ জাফর আহমাদ হানাফী, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪৪

৬১ হাফিজ রশিদ খান, *আদিবাসী জীবন, আদিবাসী সংস্কৃতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, মার্চ ২০০৯, পৃ. ৫৪

৬২ বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত হয় এই প্রবন্ধটি।

৬৩ মং ক্য শোয়েনু নেভী, মারমা নৃত্যের বৈশিষ্ট্য, উ চ নু (সম্পা:), *সাংগু; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, বর্ষ ছয়, সংখ্যা এক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান, পৃ. ৫৪

বরং রীতির বিচারে *পাঙখুং*-কে লোকনাট্যের সর্বভারতীয় পরিবেশনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন– "বাংলা থিয়েটারের বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সঙ্গে 'মনরি মাংৎসুমুই'র সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ এ হচ্ছে গীত-নৃত্য-অভিনয়ের ত্রি সঙ্গমজাত নাট্য। এ ধারাটা সর্বভারতীয় লোকনাট্যেরও বটে। মারমাদের পরিবেশনা তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়।"[৬৪] মারমা লেখক ও গবেষক মি. ক্যশৈপ্রু-এর মন্তব্যেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়– "শিল্পকলার চয়ন, বয়ন, উপস্থাপন ও পরিবেশনকে ভিত্তি করে পাঙখুং-কে ত্রি সঙ্গমজাত নাট্য বলাটাই যথার্থ।"[৬৫] প্রশ্ন হচ্ছে পাঙখুং-কে নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য অথবা কৃত্যনাট্য প্রভৃতি কোনো একটি রীতির পর্যায়ভুক্ত করা কি সম্ভব? অথবা এ নাট্যের এমন কোনো এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যকে কি আদর্শকে গ্রহণ করা সম্ভব যা নাগরিক নাট্য-কুশীলবের চর্চাকেও সমৃদ্ধ করতে সক্ষম?

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে প্রথম প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন ড. সেলিম আল দীন *একটি মারমা রূপকথা* প্রসঙ্গে বলেন– "মূলে এই পালাটি (মনরি মাংৎসুমুই), আগেই বলা হয়েছে, দুরাত্রিব্যাপী পরিবেশিত হয়। প্রথম রাত্রি মনরির স্বর্গগমন দ্বিতীয় রাত্রে অপরার্ধ। যে রীতিতে এ পালা পরিবেশিত হয় তাকে বলে পাঙ্খু। পাঙ্খু মূলত ধীর ছন্দের সারিবদ্ধ নাচ।"[৬৬] এই উদ্ধৃতিটির মাধ্যমে তিনি নাচ'কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে পরিবেশনাটিকে নৃত্যকলার একটি আঙ্গিক হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী মতের সাথে সাংঘর্ষিক– যেখানে তিনি *পাঙখুং*কে বাংলা থিয়েটারের বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সাথে তুলনা করে একে নৃত্য, গীত এবং অভিনয়ের ত্রি সঙ্গমজাত নাট্য বলেছেন। তাছাড়া এই উদ্ধৃতিটি সম্পূর্ণতই *পাঙখুং* প্রসঙ্গে মারমা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক জনাব মং ক্য শোয়েনু নেভীর মতকেই সমর্থন করে অথবা বিপরীতক্রমে বলা যায় যে, নেভী'র মন্তব্যে সেলিম আল দীনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিধ্বনিত হয়েছে– যিনি পাঙখুং-কে মারমা সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ একটি নৃত্যকলা হিসেবে আখ্যায়িত করে নৃত্যের আঙ্গিক-বিন্যাস বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন পাঙখুং এক ধরনের ধীরলয়ের ছন্দবৃত্ত সারিবদ্ধ নৃত্য।

কৃত্যমূলক উৎসব-অনুষ্ঠানে 'দুরাত্রিব্যাপী ধীর ছন্দে সারিবদ্ধ নৃত্যে'র পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সেলিম আল দীন-এর ভাষায় *কৃত্যনাটক* সম্পাদিত হলে সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। কিন্তু একদিকে বাংলা লোকনাট্যে প্রচলিত বর্ণনাত্মকরীতির সমান্তরালে *নৃত্য*, *গীত* এবং *অভিনয়* এ তিনটি মৌলিক উপাদানের উপস্থিতি ও প্রয়োগ বিবেচনায় *পাঙখুং* নাট্যকে *ত্রি-সঙ্গমজাত নাট্যের* অভিধায় চিহ্নিত করা, অপরদিকে অভিনয় উপাদান হিসেবে কেবল *নৃত্য*'কেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে *ত্রি সঙ্গমজাত নাট্যের* অপর

---

৬৪ সেলিম আল দীন, *গবেষণাগার নাট্য: একটি মারমা রূপকথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৫, পৃ. ১০

৬৫ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

৬৬ সেলিম আল দীন, *গবেষণাগার নাট্য: একটি মারমা রূপকথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৫, পৃ. ১৩

দুটি উপাদান *গীত* এবং *অভিনয়*কে গৌণ করা, এ দুই ভিন্ন অবস্থান গ্রহণের ফলে পাঙখুং পরিবেশনারীতির প্রশ্নটি জটিলতর হয়ে ওঠে। কেননা *পাঙখুং*-কে *নাচ* বা নৃত্যকলার আঙ্গিক হিসেবে আখ্যায়িত করে *নৃত্য* ও *গীতের* সাথে *অভিনয়কেও* যখন আখ্যান পরিবেশনার একটি পৃথক উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, *অভিনয়কে* এখানে নৃত্য ও গীত থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় এবং সংলাপাত্মক গীতাভিনয় থেকে পৃথক একটি উপাদান হিসেবে দেখা বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা লীলা কীর্তন বা রামায়ণ গানে যখন গীতাভিনয়ের আশ্রয়ে আখ্যান বর্ণিত হয় অথবা অষ্টকগান অথবা মণিপুরী রাসনৃত্যে যখন সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রের আক্কা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংকট প্রকাশ পায় তখন *গীত* এবং *অভিনয়* অদ্বৈত অবস্থানে অভিনীত হয় অর্থাৎ *গীতাভিনয়* (বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় অথবা সংলাপাত্মক গীতাভিনয়) হয়ে ওঠে। সুতরাং আলাদা করে *অভিনয়* বলার মধ্যে বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে *অভিনয়* বলতে মূলত প্রথম পুরুষে চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে নৃত্য ও গীতবিচ্ছিন্ন কেবল সংলাপাত্মক গদ্যাভিনয়কেই নির্দেশ করা হয়ে থাকবে এমনটাই ধারণা করা যায়। অথচ রোয়াংছড়ির অং জাইং পাড়ায় পর্যবেক্ষণকৃত *পাঙখুং* পরিবেশনাদৃষ্টে দেখা যায়, আখ্যানোক্ত সকল চরিত্র ও ঘটনা গীতাভিনয়ের মাধ্যমে (বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক উভয় ক্ষেত্রে) উপস্থাপিত হয়– অর্থাৎ সংলাপাত্মক গদ্য *অভিনয়* এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কারণ "পাঙখুং-এ সব সময়ে সুর থাকতে হবে– ছন্দ, তাল, লয়, নৃত্য থাকতে হবে, বডিল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে হবে। এখানে সুর, ছন্দ আর সংগীতের আশ্রয়ে কাহিনীর বর্ণনা বা চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়। সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ে কুশীলবদের আঙ্গিকাভিনয় যা মূলত উচ্চারিত শব্দের ফিজিক্যাল ট্রান্সলেশন হয়ে থাকে।"[৬৭] এই উদ্ধৃতিতে *পাঙখুং* পরিবেশনায় নৃত্যযুক্ত বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় এবং সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ের পর্যায়ক্রমিক অথবা সমান্তরাল উপস্থাপনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা একই ভাবে অং জাইং পাড়ার *মনরি মাাংৎসুমুই* পরিবেশনাতেও পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ এই পরিবেশনাতে কুশীলবের স্ব স্ব চরিত্রের সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ সমান্তরালভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ফলে পাঙখুং নাট্যকে কেবল *বর্ণনাত্মকরীতির* পরিবেশনা হিসেবে দেখার বিষয়টিকে যথার্থই প্রশ্নবিদ্ধ করে। পাশাপাশি পাঙখুং-এর *মনরি মাাংৎসুমুই* পালাটির পরিবেশনায় গায়েন বা কথকের প্রথাগত অংশগ্রহণও ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অর্থাৎ কাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বা অগ্রগতিতে একাধিক চরিত্রের বর্ণনাত্মক অথবা সংলাপাত্মক অভিনয়ে গায়েন/কথকের প্রথাগত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং বাংলার প্রচলিত যাত্রা অভিনয়ের ধারায় *প্রম্পটার*-এর উপস্থিতিতে প্রবেশ-প্রস্থান প্রথা অনুসরণ করে অভিনেতার নির্ধারিত চরিত্রের বর্ণনাত্মক গীত এবং সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। অধিকন্তু, পাঙখুং পালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রধান চরিত্র– "রাজা-রানি,

৬৭ মং ক্য শোয়েনু নেভী পদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

রাজপুত্র-রাজকন্যা, সেনাপতিদের পোশাক-পরিচ্ছদ বঙ্গীয় যাত্রা দলের অনুরূপ”[৬৮] হতে দেখা গেছে এবং যাত্রাভিনয়ের প্রবেশ-প্রস্থানের প্রথা অনুরূপ এই সকল চরিত্র প্রথম পুরুষে সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

সুতরাং আখ্যান বা কাহিনীতে নৃত্য ও গীতের প্রায়োগিক কৌশল, রীতি-পদ্ধতি বিবেচনায় পাঙখুং নাট্যকে বর্ণনাত্মকরীতির পর্যায়ভুক্ত করা হলে তা মেনে নেওয়া যায় না। বিশ্লেষণের নানা সূত্রে স্পষ্ট হয় যে, এটি হচ্ছে বর্ণনা এবং সংলাপের যুগপৎ অংশগ্রহণে একটি মিশ্র পরিবেশনা। নৃত্য হচ্ছে এখানে ঘটনার বর্ণনাত্মক অভিব্যক্তি এবং গীত হচ্ছে পরিবেশনার সেই উপাদান যা শুরু থেকে শেষাবধি আখ্যানের বর্ণনাত্মক নৃত্য, বর্ণনাত্মক গীত এবং সংলাপাত্মক গীত অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে রাখে। পাঙখুং পরিবেশনার এই সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এটিকে ‘মিশ্ররীতির’ (Supra-Narrative)[৬৯] পরিবেশনা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যে রীতির আখ্যান পরিবেশনায় বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক অভিনয় উপাদানের (গীত, গদ্য এবং কাব্যে) প্রয়োগ মুখ্য বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই ধরনের পরিবেশনাকে ‘মিশ্ররীতি’র পরিবেশনা বলা যায়– “*The Suppra-narrative type :* those genres in which the elements of narrative performance transcend into those of the dialogic elements; as a result, both the narrative and the dialogic coexist.”[৭০] এই বিবেচনায় *মনরি মাংৎসুমুই* উপস্থাপনায় বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক গীতাভিনয়কে সমান্তরাল ভাবেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

অন্যদিকে, নৃত্যের ব্যাপক উপস্থিতি ও প্রয়োগের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে একে ‘নাটগীত’ রীতির পর্যায়েও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। *পাঙখুং*-এর নৃত্য কেবল আখ্যানের বর্ণনাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে, চরিত্রের দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা-আকাঙ্ক্ষা তথা সংলাপাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশে নয়– “পাঙখুংনর্তকীর হাতের রুমাল কখনও আকাশে ওড়া, কখনও কলস থেকে পানি গড়ানো কিংবা কখনও হ্রদে অবগাহনের ইঙ্গিত রচনা করে। বস্তুজগতের ক্রিয়াকলাপ কিংবা প্রসঙ্গ অবলীলাক্রমে নাট্যভাষা হয়ে ওঠে। এ দেখে অবাক হতে হয়। একটি সাধারণ ইঙ্গিত মাত্র হাত-রুমালে কেমন করে চোখে ভাসায় প্রকৃত জগত।”[৭১] দেহের ছন্দে তৈরি যে নাট্যভাষা চোখে (দর্শকের) ভাসায় প্রকৃত জগৎ তা তো সুস্পষ্টতই কুশীলবের দেহের ভঙ্গিমায় বর্ণনাত্মক ছন্দ বা নৃত্যেরই অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অথবা এটাই হয়তো নৃত্যে বর্ণনাধর্মিতার চিরায়ত অভিব্যক্তি। অর্থাৎ পালা কীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের মান-অভিমান, প্রেম-বিরহ নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সংকট সমাধানে নৃত্য ও গীতের অভিন্ন

---

৬৮ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত ‘বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা’ শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

৬৯ Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity; Indigenous Theatre of Bangladesh,* UPL, 2000, Dhaka, P. 341

৭০ প্রাগুক্ত

৭১ সেলিম আলদীন, *গবেষণাগার নাট্য: একটি মারমা রূপকথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৫, পৃ. ১৩-১৪

ব্যবহার যেভাবে দুটি চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশের মুখ্য বাহন হয়ে ওঠেছে, *পাঙখুং*-এর ক্ষেত্রে ঠিক সেটা হয়নি। অথবা, বাংলা লোকনাট্যে পরিবেশিত নৃত্য, ভরত মুনির মতে যাকে 'নৃত্তে'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, অধিকাংশক্ষেত্রে যা কেবলই তাল, লয় ও ছন্দ অনুসৃত দেহের বিভিন্ন অঙ্গের চলন বা ভঙ্গিযুক্ত একপ্রকার ভাবোদ্দীপক নৃত্য, পাঙখুং-এর ক্ষেত্রে সেটিও ঘটেনি। *নাট্যশাস্ত্র* মতে "নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্য– এই তিনটি পদের তাৎপর্য পৃথক, যদিও এগুলি একই নৃৎ ধাতু নিষ্পন্ন। নৃত্ত শব্দে বোঝায় নাচ (dance); এটি তাললয়াশ্রিত। নৃত্য শব্দে বোঝায় অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গি (mime); এটি ভাবাশ্রয় শেষোক্ত দুইটি গীত ও সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাট্যের সৃষ্টি করে। নাট্য রসাশ্রিত, এখানেই নৃত্ত ও নৃত্য অপেক্ষা এর স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ।"[৭২] সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, 'নৃত্ত' দেহের সাধারণ অঙ্গভঙ্গি বা চলন দ্বারা চরিত্র বা ঘটনার সংকেতধর্মী অথবা অর্থপূর্ণ বর্ণনা রচনা করে না, বরং তা ভাবের সাধারণীকরণ করে। শৈলীবদ্ধ শরীর-ছন্দ ও ভঙ্গির চলনে সৃষ্ট ভাবের প্রকাশ বা ভাবের সাধারণীকরণের বিষয়টি বাংলার স্থানীয় নাট্যকলায় মোটেই দুর্লভ নয়। বাংলার গ্রামীণ জনপদের কোনো এক বা একাধিক অঞ্চলের একাধিক দেশজ পরিবেশনায় একই ধরনের অঙ্গভঙ্গি ও চলনযুক্ত ভাবোদ্দীপক নৃত্যের (নৃত্ত) প্রয়োগ অতি প্রচলিত ও সাধারণ একটি বিষয়। যেমন, বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের আলকাপ গানের ছুকরির নৃত্য এবং একই অঞ্চলের মাদারপীরের গানের ছুকরির নৃত্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। উভয় ক্ষেত্রে ছুকরিদের নাচ চরিত্র বা ঘটনার সংকেতাবদ্ধ অথবা বর্ণনাত্মক প্রকাশ নয় বরং বিষয়-সংশ্লিষ্ট ভাবের নৃত্যরূপ প্রকাশকেই মুখ্য হিসেবে পরিবেশন করা হয়। যদিও একাধিক নাট্যরীতি বা পরিবেশনায় একই আঙ্গিকের নৃত্য শৈলীর ব্যবহার সত্ত্বেও তা আরোপিত বা প্রক্ষিপ্ত মনে হয় না বরং পরিবেশনায় রীতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের সাধারণ নৃত্যই আখ্যান-প্রদত্ত ভাবের গভীরে পৌঁছে বিষয়ের রস-আস্বাদনে সহায়তা করে থাকে।

পাঙখুং নৃত্যের ক্ষেত্রে আখ্যানোক্ত চরিত্র বা ঘটনার প্রকাশে ভাবের সাধারণীকরণ করার পরিবর্তে বর্ণনাত্মক অভিব্যক্তির প্রকাশ মুখ্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। *ভাবোদ্দীপক নৃত্যের* সাথে *বর্ণনাত্মক* নৃত্যের মৌলিক পার্থক্য এই যে, প্রথমটি ভাবের প্রকাশে হয় উপভোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট হয় দেহের ভাষায় সৃষ্ট বর্ণনাধর্মিতায়। অর্থাৎ *বর্ণনাত্মক নৃত্য* দেহের ইঙ্গিতময় এবং অর্থপূর্ণ বর্ণনাত্মক ভঙ্গি বা ভাষার উপর ভর করে ভাবের গভীরে পৌঁছায়। তবে এই ইঙ্গিতধর্মিতা ভরত যাকে অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গি (mime) বলেছেন তার সমার্থক নয়। কেননা ভরত অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গি বলতে বিষয় বা আখ্যানের বিশুদ্ধ সংকেতাবদ্ধ (codified) প্রকাশ বা পরিবেশনাকে বুঝিয়েছেন। যেমন, সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ সংকেতের (মুদ্রা) মাধ্যমে কৃষ্ণ রাধাকে প্রেম নিবেদন করছে অথবা মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে। কিন্তু *বর্ণনাত্মক নৃত্যে* ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়, যেমন– পাহাড়ি জনপদে ফসল বোনা বা ফসল কাটা অথবা জুম চাষের পর্যায়ক্রমগুলি শরীরের

৭২ ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, নবপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২২

ভাষায় নৃত্যের ছন্দে বর্ণনা করা হয়, যা কেবলই তালাশ্রিত শরীরের চলন বা ভঙ্গিযুক্ত ভাবের প্রকাশমাত্র নয়। এ কারণেই হয়তো সেলিম আল দীনের বিস্মিত মনের উচ্চারণ হয় এমন যে– 'একটি সাধারণ ইঙ্গিত মাত্র হাত-রুমালে কেমন করে চোখে ভাসায় প্রকৃত জগৎ।' সুতরাং নৃত্যের এই সাধারণ বৈসাদৃশ্য বিবেচনায় লোকনাট্যের সাধারণ *ভাবোদ্দীপক নৃত্যের* বিপরীতে মারমা জাতিতাত্ত্বিক পাঙখুং নৃত্যকে *বর্ণনাত্মক নৃত্য* হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা এই নৃত্য কেবল ভাবের উদ্দীপনাকেই সহায়তা করে তা নয় বরং তা বিষয়, চরিত্র ও ঘটনার ইঙ্গিতপূর্ণ শারীরিক বর্ণনাকেও সুনির্দিষ্ট করে তোলে। যেমন– পরীদের আকাশে উড়ে যাওয়া, ঝরনার বহমান জলধারা ইত্যাদি।

পাঙখুং নাট্যে ব্যবহৃত নৃত্যের বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, আখ্যানের পূর্বনির্ধারিত অংশগুলোতেই কেবল নৃত্যশিল্পীদের মঞ্চ-প্রবেশ এবং ঘটনা বা পরিস্থিতির বর্ণনাত্মক নৃত্য ও গীত শেষে প্রস্থান করে পরবর্তী প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মঞ্চে নৃত্যশিল্পীগণ পাশাপাশি সারিবদ্ধ অথবা বৃত্তাকার অবস্থানে ঘুরে ঘুরে সীমিত সংখ্যক হস্ত, পদ, কোমর এবং হাঁটুর সঞ্চালন ভঙ্গির মাধ্যমে ধীর লয়ে আখ্যানের বর্ণনামূলক নৃত্য সম্পাদন করেন, যেমন– *মনরি মাাংৎসুমুই* তার অন্য ছয় বোনের সাথে কীভাবে স্বর্গ হতে মর্ত্যে গমন করছে সেটা ধীর লয়ে অতি সাধারণভাবে দেহের ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়। পক্ষান্তরে, চরিত্রাভিনয়ে অংশ নেওয়া সকল কুশীলব গীতের সুর ও তালের সাথে শরীরকে সচল, সতেজ এবং ছন্দ-অনুবর্তী রাখার নিমিত্তেই কেবল সার্বক্ষণিকভাবে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের পদ/পা সঞ্চালন-ভঙ্গি অব্যহত রাখেন, যাকে ঠিক নৃত্য না বলে গীতাভিনয়কালীন (বর্ণনাত্মক অথবা সংলাপাত্মক) শরীর-ছন্দে সুর, তাল ও লয় সুরক্ষার কৌশল বলাই শ্রেয়। সুতরাং নৃত্য এবং নৃত্তের বৈসাদৃশ্য বিবেচনায় বর্ণনাত্মক গীতের ভাব অর্থ অনুবর্তী শারীর-অঙ্গের সাবলীল-ছন্দময় চলন এবং বিন্যাসকে *বর্ণনাত্মক নৃত্যের* (Physical translation) পর্যায়ভুক্ত করা যায়। যা প্রকারান্তরে 'পাঙখুং নৃত্যে'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। *বর্ণনাত্মক নৃত্য* কেবল উচ্চারিত শব্দমালার ভাব, অর্থ, ঘটনা অথবা দৃশ্যকল্পেরই বর্ণনা করে তা নয়, বরং তা কুশীলবের আন্তর উপলব্ধি ও সত্যকে দেহের বর্ণনাত্মক অভিব্যক্তির সুললিত ছন্দে বিনির্মাণ করতেও সক্ষম। তাই এই সকল গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় *বর্ণনাত্মক নৃত্যকে* পাঙখুং নাট্যের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করে অভিনেতার প্রস্তুতি বা অনুশীলন উপাদান অন্বেষণের পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

নৃত্য ব্যতীত আরও একটি উপাদান সমগ্র *মনরি মাাংৎসুমুই* পালা জুড়ে সর্বব্যাপী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পায়, সেটি হচ্ছে– সুর ও তালের সমন্বয়ে সৃষ্ট বিশেষ একটি ভঙ্গি বা আবর্তনের পুনঃপুন গঠন ও এর ব্যবহার। বিশেষ একটি আবর্তনের পুনঃপুন গঠন ও ক্রমাগত সম্পাদনে সৃষ্ট বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তির কারণে পাঙখুং-এর সামগ্রিক পরিবেশনা-ছন্দে (performance rhythm) যে পুনঃপুন গতিময় অবস্থার সৃষ্টি হয় রিচার্ড

শেখনারের ব্যাখ্যানুসারে একে Accumulation-repetition[৭৩] বা '*পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন* প্রক্রিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শেখনার এটি গ্রহণ করেছেন মার্কিন নৃত্যশিল্পী ত্রিশা ব্রাউনের বিখ্যাত কর্ম "Accumulations"[৭৪] থেকে। ব্রাউনের এই Accumulations প্রক্রিয়া সময়কে শরীরের একাধিক ভঙ্গি দ্বারা বিশেষ প্যাটার্নে সংযুক্ত এবং পুনঃ-সম্পাদনে সমন্বিত করে, যার গতি অনুভূমিক, আরোহণ বা শীর্ষমুখী নয়। পাঙখুং নাট্যের পর্যবেক্ষণে বিশেষত গীত ও নৃত্যের পরিবেশনায় Accumulation-repetition বা *পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন* প্রক্রিয়াটিকে বিশেষভাবে কার্যকর হতে দেখা যায়, যাকে একই সাথে পাঙখুং নাট্যের বিশেষ ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। *পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন* প্রক্রিয়া মূলত শরীর ছন্দ বা নৃত্যের বিশেষ একটি সঞ্চালন ভঙ্গি অথবা সুর, ছন্দ বা তালের সম্মিলিত ও নির্দিষ্ট একটি আবর্তন, যা ক্রমাগত বা পুনঃপুনভাবে গঠিত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট তাল বা ছন্দ অথবা সুরের নির্দিষ্ট একটি ভঙ্গি অথবা ভঙ্গির আবর্তন যখন চলমান থাকে তখন সেই চলন-আবর্তন ক্রমাগত ঘনীভূত হয়ে ব্যক্তির মস্তিষ্কে ও কল্পনায় এক পরমানন্দীয় আবেশের ঘোর বা দশাগত (trance like) অবস্থার সৃষ্টি করে ভিন্ন এক স্তরে উত্তীর্ণ করে। আর তখন, পরিবর্তিত সেই নতুন অবস্থা বা পরমানন্দীয় আবেশের নতুন জগৎ দর্শক ও কুশীলব উভয়কে মঞ্চে/ মন্দিরে/ আসরে/ প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশিত অতীন্দ্রিয় বিষয় ও ভাবের গভীরে একাত্ম হয়ে রস আস্বাদনে নিমগ্ন করে তোলে। যেমন, একটি নির্দিষ্ট তাল ও ছান্দিক সুরে পরিবেশিত 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, রাম, রাম, হরে, হরে' অথবা একটি নির্দিষ্ট ছন্দে মাথার দুলনিতে দমে দমে আল্লাহু, আল্লাহু বলে জিকির তোলা অথবা তুর্কি দরবেশ নৃত্যে নির্দিষ্ট ছন্দের বিশেষ ভঙ্গিতে শরীরের ক্রমাগত ঘূর্ণন বা সময়ের আবর্তনকে পুনঃপুন গঠন এবং সম্পাদন প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কুশীলব/ভক্ত বিশ্বাসীগণ ক্রমান্বয়ে এক পরম আনন্দীয় আবেশে নিমগ্ন হয়ে দৈনন্দিন বা জাগতিক ভাব বা বিষয়কে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়জাত ভাব বা বিষয়ের (কৃষ্ণ বা আল্লাহ্) সাথে একাত্ম হয়ে অতি-জাগতিক চাহিদার খোরাক বা রস আস্বাদনে সক্ষম হয়।

সুবিশাল পরিসরে বিস্তৃত পাঙখুং-এর আখ্যান বা পালা পরিবেশনাতেও *পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন প্রক্রিয়াটি* কার্যকর হতে দেখা যায়। কেননা অং জাইং পাড়ার পাঙখুং-এর আখ্যানটি নির্দিষ্ট একটিমাত্র সুরের আবর্তনে নির্দিষ্ট ছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ– "পাংখুং- সুর ও ছন্দে রিপিটেশন বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। এখানে নির্দিষ্ট দু-

---

৭৩ Richard Schechner, *Between Theatre and Anthropology,* UPP- Philadelphia, 1989, USA, P. 11

৭৪ The whirling Dervishes of Turkey, or the whirling postmordern dances of Laura Dean, or the excruciatingly slow movements, extruded over a period of hours, of Robert Wilson's *Deafman Glance* or *Einstein on the Beach* each develop patterns of accumulating, if not accelerating, intensities. In fact dancer Trisha Brown calls some of her most powerful works "accumulations". "The accumulation is an additive procedure where movement 1 is presented; start over. Movement 1; 2 is added and start over. 1;2;3 is added and start over, etc., until the dance ends"- Trisha Brown, 1975, "Three Pieces." *Drama Review* 19, 1: 26-32, quoted from Richard Schechner, *Between Theatre and Anthropology,* UPP-Philadelphia, 1989, USA, P. 11

চারটি সুর ও ছন্দই সমগ্র আখ্যান বা কাহিনীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"[৭৫] সুর ও তালের যৌথ বন্ধনে সৃষ্ট একটিমাত্র বিশেষ ছান্দিক ভঙ্গি বা আবর্তন বিরামহীন অথচ পুনঃপুন প্রয়োগ করে, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিমূলক গঠন-সম্পাদন করে কুশীলব এবং দর্শক উভয়ে ক্রমান্বয়ে এক পরমানন্দীয় আবেশের দুনিয়ায় বা দশাগ্রস্ত অবস্থায় উন্নীত হয়, যেখানে সেলিম আল দীনের ভাষায়– "[খুবই] সীমিত কতকগুলো ভঙ্গি মাত্র অথচ সুরে-তালে এই নাচ এক অপরিচিত শিল্পশস্যের সন্ধান দেয়।"[৭৬] কেননা নির্দিষ্ট একটি ছন্দ, ভঙ্গি, সুরের একটি সম্পূর্ণ আবর্তনের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হওয়া বা প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট সময়ের বৃত্তাকার বিস্তার ব্যক্তিকে তার দৈনন্দিন ভাব-আবেগপূর্ণ জাগতিক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে পরম আনন্দের ঘোর বা দশাগত অবস্থায় স্থানান্তরিত করে, যা প্রকারান্তরে ব্যক্তির (কুশীলব/দর্শক/ভক্ত/বিশ্বাসী) জাগতিক বাস্তবতার বাইরে ভিন্ন আরেক বাস্তবতা– শিল্প-দুনিয়ায় প্রবেশের দুয়ার অতিক্রমে সহায়তা করে, অন্যভাবে বলা যায় 'অপরিচিত শিল্পশস্যের' স্বাদ আস্বাদনে সক্রিয় করে তোলে। রিচার্ড শেখনার কুশীলব/ভক্ত/রসিক/দর্শকের পরমানন্দীয় আবেশের এই বিশেষ অবস্থাকে ecstatic trance বা *পরমানন্দীয় দশা* নামে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ একটাই তাল লয় ও সুরের বন্ধনে কৃষ্ণ বা আল্লা নাম যপ করতে করতে দর্শক/রসিক/ভক্ত/বিশ্বাসী/কুশীলবের মাঝে যে মোহনীয় দশাগত অবস্থার সৃষ্টি হয় শেখনার মূলত এই অবস্থাকে ecstatic trance বলেছেন। আর মোহনীয় বা পরমানন্দীয় এই আবে তৈরিতেই মূলত পুনঃপুন গঠন বা আবর্তনমূলক সম্পাদন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়ে ওঠে, যা তিনি তুর্কি দরবেশ নৃত্য প্রসঙ্গে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

> Performances like [Dean's, Brown's and the] dervishes' do not rise to a climax; the accumulation-repetition lifts performers, and often spectators too, into ecstatic trance. In an accumulation as in repetitious music [such as Philip Glass's], the spectator's mind tunes in to subtle variations that would not be detectable in a structure where attention is directed to narrative or melodic development.[৭৭]

সেলিম আল দীনের 'অপরিচিত শিল্পশস্যের সন্ধান', অন্যভাবে বলা যায় যে, জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির আপাত অপর বা ভিন্ন রকম শিল্পরস আস্বাদনের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান মিলতে পারে সম্ভবত এই *পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন প্রক্রিয়ায়* সৃষ্ট *সুর*, ছন্দ ও তালের মোহনীয় পুনরাবৃত্তিমূলক সময়ের বিস্তারের মধ্যে– "পাঙখুংর সুরের বৈশিষ্ট্য হলো ওয়ে-ওয়ে-ওয়ে-ওয়ে-ওয়ে-ওয়ে। এ একই সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত পালা কনকনে শীতে সারারাতব্যাপী

---

৭৫ মং ক্য শোয়েনু নেভী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

৭৬ সেলিম আলদীন, *গবেষণাগার নাট্য: একটি মারমা রূপকথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৫, পৃ. ১৩

৭৭ Richard Schechner, *Between Theatre and Anthropology,* UPP- Philadelphia, 1989, USA, P. 11

দর্শকগণ পিনপতন নীরবতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করে।"[৭৮] এই উক্তি থেকে বিষয়টিকে আরও একবার নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দু'রাতব্যাপী *পাঙখুং* দর্শনে পালার অন্তরে থাকা ধর্মীয় বিশ্বাস, জন্মান্তর ধারণা, সামাজিক মূল্যবোধ, বিধি-বিধান তথা মৌলিক মানবিক চাহিদার খোরাক জোগাতে একটি সুর ও ছন্দের একঘেয়ে অথচ *পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন প্রক্রিয়া* কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তো করেই না, বরং কনকনে হিমেল হাওয়ায় আচ্ছন্ন প্রতিকূল জাগতিক বাস্তবতার চৌ-কাঠ পেরিয়ে পরমানন্দীয় শিল্প-রস (মৌলিক মানবিক চাহিদা) আস্বাদনে নিমগ্ন করে তোলে।

এছাড়াও *পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন প্রক্রিয়াটি* জাতিতাত্ত্বিক গল্প বা আখ্যানের গঠন কাঠামোকে নমনীয় করা এবং পরিবেশনাকে সামাজিকীকরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ লোক-ঐতিহ্যে অথবা বা জাতি-সংস্কৃতি ঐতিহ্যে পরিবেশিত আখ্যান সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট নয় বরং উন্মুক্ত এবং অশেষ, যা সংযোজন-বিয়োজনের ধারায় ক্রমাগতভাবে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ কাঠামোগত নমনীয়তার কারণেই একটি নির্ঘুম আসরে একজন কথকের বলা গল্পের যেখানে সমাপ্তি, অন্যকোনো আসরে অন্যকোনো কথকের পরিবেশনায় সেই একই গল্পের সমাপ্তিতে যুক্ত হতে পারে নতুন কোনো বাঁক– নতুন কোনো সমাপ্তির দিশা। এই যুক্ত-বিযুক্তির কাঠামোগত নমনীয়তার পেছনে *পুনঃপুন গঠন-সম্পাদন প্রক্রিয়া* কৌশলগতভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা একটি আখ্যানের পুনঃপুন উচ্চারিত ধুয়া অথবা অক্ষরবৃত্ত পয়ার বা স্বরবৃত্ত ছন্দের পুনরাবৃত্তি বা পুনঃপুন আবর্তনমূলক পরিবেশনা প্রকারান্তরে আগ্রহী রসিকদের (দর্শক/কুশীলব) গল্পের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হতে আকর্ষণ করে বা আমন্ত্রণ জানায় সক্রিয় অংশগ্রহণে, উৎসাহিত করে গল্পের ধারায় নতুন নতুন বাঁক বিনির্মাণে। এভাবেই বিবর্তনের ধারায় জাতি-সংস্কৃতিতে চর্চিত একটি আখ্যান ক্রমান্বয়ে ব্যষ্টিক থেকে সামষ্টিক তথা সামাজিক সম্পদ হয়ে ওঠে– A Folk/tribal story can never be said to be finished and final in form; at the next delivery a new turn or twist may be given to the narration. The Refrain or repetition of word or phrase or even incident is an invitation to the others to collaborate in the composition.[৭৯]

পাঙখুং নাট্যের এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য– *বর্ণনাধর্মী নৃত্য* এবং *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়ার* ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা যায়। কেননা অভিনেতার মনো-দৈহিক চর্চায় নৃত্যের বর্ণনাত্মক গুণাবলি আরোপ করে কীভাবে দেহের নৃত্যগুণ সক্ষমতা (ডান্সিং কোয়ালিটি) বৃদ্ধি করা যায়, তার সম্ভাবনা অন্বেষণে *বর্ণনাধর্মী নৃত্যকে* অনুশীলন-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। মঞ্চই (যেকোনো ত্রিমাত্রিক আয়তন)

---

৭৮ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত

৭৯ K. Ayyappa Paniker, *Indian Narratology*, Indira Gandhi National Centre for Arts, Delhi, p. 123

যখন অভিনেতার শৈলী প্রকাশের একমাত্র পবিত্র স্থান, এবং যেখানে ব্যক্তির সম্পূর্ণ মনোদৈহিক উপস্থিতির বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না, তখন অভিনেতার মঞ্চ-উপস্থিতিকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে কেবল অনুশীলন-সিদ্ধ বহুমাত্রিক এবং সংবেদনশীল একটি নমনীয় শরীর। এডওয়ার্ড ব্রাউনের *Meyerhold : A revolution in theatre* গ্রন্থে, প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক মায়ারহোল্ডের ব্যাখ্যা সূত্রে, অভিনেতার শরীর ও মনের সর্বোচ্চ নমনীয়তা অর্জনের কৌশল অন্বেষণে স্বভাবতই প্রশ্নের উদ্রেক করে– "Where does the human body possessing the flexibility of expression demanded by the stage attain its highest development? মায়ারহোল্ড তাঁর নিজের করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেন– *In the dance.* Because the dance is the movement of the human body in the sphere of rhythm. The dance is to the body what music is to thought: form artificially yet instinctively created."[৮০] এ উক্তি স্পষ্টতই নৃত্য সম্পর্কে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধারণার সমান্তরালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাকে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ নৃত্যকে এখানে কেবলই তাল-লয়-ছন্দের সংজ্ঞায় আবদ্ধ না রেখে বিশ্ব প্রকৃতির শাশ্বত ছন্দের সাথে দেহ-ছন্দের মিলনের কথা বলা হয়েছে, দেহের নাচনকে অন্তর-নাচনের অনুবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা মনের গহিনের সুর, ছন্দকে দেহের সুর ও ছন্দে রূপান্তর করা বা দেহের ভাষায় বর্ণনা করতে পারার সক্ষমতা অর্জনই প্রকারান্তরে কুশীলব/ অভিনেতার নৃত্যগুণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতে পারে। অপরদিকে অভিনেতার মনোদৈহিক অনুশীলনের কার্যকর একটি উপাদান হিসেবে *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া*টিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কৃত্য (রিচ্যুয়াল) এবং নাট্যের (থিয়েটার) মধ্যে দুটি মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে– এক. কৃত্য ও নাট্য উভয়ে দর্শক এবং অভিনেতাদের দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিকতার বাইরে ভিন্ন কোনো স্থান/অবস্থানে স্থানান্তর (transportation/transformation) করায় এবং এই স্থানান্তরের কারণে প্রদত্ত নতুন/ভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় কুশীলব/অভিনেতা/পূজারি/বিশ্বাসীকে এমন সব আচার-আচরণ, ক্রিয়া-কর্ম করতে হয় যা দৈনন্দিন-অতিরিক্ত, ভিন্ন এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। দুই. কৃত্য ও নাট্য উভয়ে উভয়ের নির্ধারিত কার্য (ক্রিয়া) সম্পাদন করে ঘটমান বর্তমানে অর্থাৎ 'এখানে এবং এখন'-এর ভিত্তিতে, অতীত বা ভবিষ্যৎ সময়ে ক্রিয়া সম্পাদনের কোনো সুযোগ নেই। কৃত্য ও নাট্যের এই সাদৃশ্য বিবেচনায় মারমা কৃত্যনাট্য *পাঙখুং*-এর চিহ্নিত উপাদান *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া*টিকে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধের একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কেননা পূর্বেই লক্ষ করেছি কৃত্যনাট্য *পাঙখুং*-এর দর্শক/অভিনেতা পরমানন্দীয় আবেশে (ecstatic trance) আচ্ছন্ন হয়ে 'শিল্পশস্যের' রস আস্বাদনে হারিয়ে যায় অতীন্দ্রিয়ের কোনো দূর রাজ্যে। আর এ জন্য পূর্ব-নির্ধারিত কিছু সুর-ছন্দ ও শরীরভঙ্গিমার ক্রমাগত 'আবর্তন' বিষয়ের গভীরে নিমগ্ন হয়ে রস আস্বাদনের প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও কার্যকর করে তোলে। কার্যকারিতার এই দিকটি বিবেচনায় এনে

---

৮০ Edward Braun, *Meyerhold : A revolution in theatre,* Methuen Drama, 1995, p. 87

পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়াকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা কেবল জাতিসংস্কৃতির কৃত্যমূলক নাট্যের ক্ষেত্রেই নয় বরং শহরকেন্দ্রিক বিনোদনমূলক নাট্যের অভিনেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ অভিনেতাকে দৈনন্দিন সাধারণ বাস্তবতা থেকে পরমানন্দনীয় শিল্প-বাস্তবতায় স্থানান্তর করা এবং এই স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শিল্পীর মনোদৈহিক উপস্থিতিকে অধিক নিবিষ্টকরণের ক্ষেত্রে *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া* হতে পারে একটি কার্যকর অনুশীলন উপাদান। একই সাথে এই অনুশীলন উপাদানটি অভিনেতার শরীর ও মনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে জার্জি গ্রোটোস্কি বর্ণিত 'পবিত্র অভিনেতার' চর্চায়ও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। গ্রোটোস্কির মতে প্রকৃত অভিনেতা সেই হতে পারে যে মঞ্চ 'ক্রিয়ায়' নিজেকে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত– মূলত একজন আত্মোৎসর্গকারী অভিনেতার পক্ষেই 'পরিপূর্ণ ক্রিয়া'য় (টোটাল অ্যাক্ট) নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব। 'পবিত্র অভিনেতা' তৈরি প্রসঙ্গে *ভায়া নেগেটিভার* ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রোটোস্কি বলেন- "[Ours then is a] *via-negativ* – not a collection of skills but an eradication of blocks."[৮১] অর্থাৎ অভিনেতাকে শরীর ও মনের সকল সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস ও ঝুঁকি নেওয়ার পূর্ণ-সক্ষমতা অর্জন করাই হতে পারে 'পবিত্র অভিনেতা' হওয়ার পথের প্রাথমিক অগ্রগতি বা অর্জন। 'পরমানন্দীয় আবেশ' (ecstatic trance) অভিজ্ঞতা অভিনেতাকে তার প্রাত্যহিক দেহ-মনের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধতার আগল ভেঙে পৌঁছে দিতে পারে কোনো 'ভিন্ন'/'নতুন' বাস্তবতায়। কেননা অভিনেতার জন্য ট্রান্স– দশা বা ভর হচ্ছে সেই নিবিষ্ট সক্ষমতা যা তাকে নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় মনোযোগী হতে সহায়তা করে। আর এই নিবিষ্ট হওয়ার সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে *পাঙখুং* নাট্যের কৃত্যানুগ বৈশিষ্ট্য– *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়াকে* একটি কার্যকর অনুঘটক বা অনুশীলন-উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং *পাঙখুং* নাট্যের বিশদ এই আলোচনা থেকে অনুশীলন-উপাদানের মৌল ভিত্তি হিসেবে দুটি বিষয়– *বর্ণনাত্মক নৃত্য* এবং *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়াকে* পরবর্তী আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হলো।

৮১ Jarzy Grotowski, *Towards a Poor Theatre,* Eugenio Barba (edited), Methuen London Ltd, London, 1986, P. 17

১.২.৪ মারমা জ্যা ও জ্যা-নৃত্য

ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন

বিস্তীর্ণ পার্বত্যভূমির প্রকৃতি নির্ভর মারমা জনপদের যাপিত-জীবন উদ্‌যাপনে যুক্ত রয়েছে বহু ও বিচিত্র সব সাংস্কৃতিক উপাদান। নৃত্য, নাট্য, গীত, কাব্য, গল্প-কথন, সাহিত্য, কিংবদন্তি, তন্ত্র-মন্ত্র, ধ্যান-সাধনা, খেলাধুলা, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপাদান ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে পরম্পরাগত চর্চার মাধ্যমে মারমা জনগোষ্ঠীর জীবন ও কর্মের উদ্‌যাপনে পরিবেশিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এরই ধারাবাহিকতায় মারমাদের জাতিগত সামষ্টিক-সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে- কাপ্যা, লুংদিনাচ, বিয়াছা, ডুমনাচ, ছাইংগ্যানৃত্য, প্রদীপনৃত্য, সাখ্রারাং (গান), রুদু (গান), ক্রাকখ্রী থো খেলা, গুডু খেলা, প্রদীপ নৃত্য, সইং/আক্কা (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া), নে সমুই (পরীনৃত্য), ব্লুকা (মুখোশ নৃত্য), লংবাই আক্কা (থালা নৃত্য), আইং (নাট্য), জ্যা এবং পাঙখুং (নাট্য) প্রভৃতি পরিবেশনা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাব এবং আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান-উন্নয়নের ধারায় যুক্ত হওয়া মারমা জনগোষ্ঠীর শহরকেন্দ্রিক জীবন ও কর্মের জটিল ব্যবস্থার সাথে প্রথা ও পরম্পরাগত পারফরম্যান্স-জ্ঞানের দূরত্ব যেন প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরকেন্দ্রিক পরিমণ্ডলের সাংস্কৃতিক চর্চা ও পরিবেশন প্রক্রিয়ায় দেখা দিচ্ছে গুণগত পরিবর্তন। যার একটি লক্ষণ হচ্ছে প্রথা ও পরম্পরাগত পরিবেশনা শিল্পকলার কিছু কিছু উপাদান আত্তীকৃত হচ্ছে বিনোদনমূলক চর্চার উপাদানে। অবশ্য এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ক্রমবিকাশমান পুঁজিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ের সর্বগ্রাসী প্রভাব। কেননা নাগরিক-জ্ঞানভিত্তিক প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবন, বিশ্বাস ও কর্মের উদ্দীপক অনুষঙ্গ হিসেবে কৃত্যমূলক প্রথা ও পরম্পরাগত পরিবেশনা শিল্পকলা ক্রমশই যেন তার আস্থা আর কার্যকারিতা হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। সম্ভবত এ কারণেই মাঠ পর্যবেক্ষণে গৃহীত একাধিক সাক্ষাৎকারে নগর আঙিনাতে প্রথা ও পরম্পরাগত পরিবেশনা শিল্পকলার চর্চা প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় উচ্চারিত হয়– 'এসব কিছু আগে হতো/ এখন আর হয় না/ সেই লোকগুলিই-তো এখন আর নেই/ কেউ তো আর নতুন করে শিখছে না তাই এগুলো করার মতো মানুষও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।' মাঠ পর্যবেক্ষণ থেকে লব্ধ এই সকল সরল এবং সাধারণ মন্তব্য থেকে নগরের পুঁজিনির্ভর সংস্কৃতি ও পারফরম্যান্স-জ্ঞানের সাথে প্রথা ও পরম্পরাগত পারফরম্যান্স-জ্ঞানের দূরত্ব ও সংঘাতের বিষয়টিই যেন ফুটে ওঠে বারবার।

এই প্রেক্ষিতে শহরকেন্দ্রিক পরিমণ্ডলে *জ্যা*-এর চর্চা ও পরিবেশনার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। *জ্যা* মারমা পরিবেশনা-শিল্পকলার বহুল প্রচলিত একটি রীতি, তা সত্ত্বেও বর্তমানে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নগর আঙিনায় এর চর্চার পরিধি ক্রমশই সীমিত হয়ে পড়ছে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় *জ্যা*

প্রসঙ্গের অভিজ্ঞতা এমনই যে, ধর্মীয় উৎসব/অনুষ্ঠান উপলক্ষে বছরে দু/একবার আমন্ত্রিত হওয়া ব্যতীত বান্দরবান জেলা সদরের পৌর-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জ্যা-এর চর্চা মূলত অনুপস্থিত। এমনকি *জ্যা* পরিবেশনায় সক্ষম এমন পূর্ণাঙ্গ দল বর্তমানে বান্দরবান জেলা সদর বা পৌর-সীমানায় আর অবশিষ্ট নেই। পরম্পরাগত সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙে পড়া এবং নগর পরিমণ্ডলে জীবিকা নির্বাহের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে *জ্যা*-এর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়া এর কারণ বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়। যদিও *জ্যা*-এর চর্চা ও পরিবেশন প্রক্রিয়ার সাথে পেশাদারি কোনো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার তুলনা চলে না, তথাপিও *জ্যা*-এর সাংগঠনিক কর্মে যুক্ত সকল সদস্যগণ শেষাবধি ভক্ত/বিশ্বাসী/অনুরাগী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত অর্থ ও মর্যাদার আনুকূল্যেই বেঁচে থাকে, হয় বিকশিত। নগর আঙিনায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠন পর্যায়ে *জ্যা*-এর চর্চা ও পরিবেশনায় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের বিষয়টিই কেবল নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও *জ্যা* বিষয়ক মুদ্রিত নিদর্শন (পুস্তক, প্রবন্ধের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বিবরণ) এবং সংরক্ষিত নিদর্শনেরও (ভিডিও/অডিও রেকর্ড) যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। এই সামগ্রিক অবস্থা প্রকারান্তরে নাগরিক দৃষ্টিতে *জ্যা*-এর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করা এবং পৃষ্ঠপোষকহীনতার চিত্রকেই তুলে ধরে। বান্দরবানের টিসিআই (ট্রাইবাল কালচারাল ইন্সটিটিউট, বান্দরবান)-এর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা শিল্পকলার নৃত্য, গীত, বাদ্যযন্ত্র এবং দড়াবাজি প্রভৃতির চর্চা ও প্রদর্শন যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও আখ্যান বা পালাভিত্তিক পরিবেশনা যেমন- *পাঙখুং*, *জ্যা*-এর নিয়মিত চর্চা ও সংরক্ষণ বিশেষভাবে সীমিত। তাই তত্ত্বগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যদিও বা মারমা *জ্যা* গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষত নগরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য কোনো স্থান দখলে সক্ষম হয়েছে এমন দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

কিন্তু নিরাশার সকল উক্তিই শেষ কথা নয় বরং এই অবস্থাকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি সর্বজনীন রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ সকল যুগেই পরিবেশনা শিল্পকলার আঙিনায় ‘নগর’ ও ‘গ্রামে’র টানাপড়েন, যোগ-বিয়োগের সম্পর্ক ছিল, থাকবে আগামীতেও। এটি সমস্যা নয় বরং এটিই শক্তি। এখানে এই বিষয়টিকে ‘উন্নত’ এবং ‘অনুন্নত’, ‘ঋদ্ধ’ বা ‘স্থূল’ এই বিভাজনের দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কেননা প্রথা ও পরম্পরাগত পারফরম্যান্স-জ্ঞান এবং নগরকেন্দ্রিক পারফরম্যান্স-জ্ঞান তাদের নিজ নিজ আঙিনায় আবদ্ধ থাকেনি কখনোই বরং বিবর্তনের ধারায় মিলেছে আবার কখনো মিলিয়েছে। এভাবেই উভয়ে উভয়ের অস্তিত্বকে রেখেছে বহমান। এ প্রসঙ্গে ড. কপিলা বাৎস্যায়নের ‘লোক’ এবং ‘ধ্রুপদী’ শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য–

> For a fuller comprehension, all the approaches, besides the purely cultural and artistic, have to be adopted. The terms *folk* and *classic* thus are not simple

> categories representing non-development and development, rural and urban, pre-industrialized and industrialized social order, or a capturing of moments of antiquity in a fossilized state on two levels. The terms, though inadequate, signify many complex cultural processes. The folk forms are constantly changing i.e, tribal and rural and transforming themselves. They are therefore, not mere vestiges of primitive societies, of groups, of underdeveloped minorities, subsisting in a large urban civilization, as in the west.[৮২]

সুতরাং কেবল বর্জন নয়, গ্রহণ এবং আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার কারণেও 'লোক'/'ট্রাইব' এবং 'নগর'-এর পরিবেশনা শিল্পকলার বিবর্তনের ধারা রয়েছে সচল ও সক্রিয়। তবে মারমাদের শহরকেন্দ্রিক পরিবেশনা শিল্পকলার চর্চায় পরিবর্তনের এই যে ধারা, এটি একটি বাস্তবতা সন্দেহ নেই, তবে তা সামগ্রিক এবং ব্যাপক নয়, কেবলই নগরকেন্দ্রিক ও খণ্ডিত। বরং বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা অধ্যুষিত জনপদে চর্চিত কৃত্য ও প্রথাগত নানাবিধ পরিবেশনা যা অদ্যাবধি মারমাদের জীবন, বিশ্বাস, ও কর্মের উদ্দীপক অনুষঙ্গ হিসেবে ক্রিয়াশীল এবং সামগ্রিক জীবন উদ্‌যাপনকে করেছে অর্থপূর্ণ, জনগোষ্ঠীকে করেছে ঐক্যবদ্ধ– *জ্যা/জাইত* সে সকল অনুষঙ্গের মধ্যে অন্যতম। কেননা মারমা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে রয়েছে *জ্যা*-এর অবাধ বিচরণ– "পাড়াগাঁয়ে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বা হেডম্যান বা কারবারির রোয়াজা, বিশিষ্ট ব্যক্তির পারিবারিক অনুষ্ঠান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অভিষেক অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠান প্রভৃতি কারণে জ্যা পরিবেশিত হয়ে থাকে।"[৮৩]

তবে উল্লেখ্য যে, মারমা সমাজে *জ্যা* বা *জাইত* দুটি ধারায় পরিবেশিত হয়। প্রথমটি *জ্যা-নাট্যের* ধারা, যা সম্পূর্ণ আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা। অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বর্ণনা আর সংলাপের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ-কাহিনীর পরিবেশনা। দ্বিতীয় ধারাটি *জাইত-আক্কা* বা *জ্যা-নৃত্যের* ধারা, যেখানে নৃত্যগীত মূল উপজীব্য কখনো এর সাথে যুক্ত হয় দড়াবাজি বা অ্যাক্রোবেট। শেষোক্ত ধারার চর্চা সাম্প্রতিক সময়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছে। কেননা মারমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে 'মারমা আক্কা' বা মারমা নৃত্য বিশেষ দৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে বরাবর। আর এই নৃত্যের আওতায় সামাজিক নৃত্য *জাইত আক্কা* বা *জ্যা নৃত্যের*ও রয়েছে সমান কদর। *জ্যা-নৃত্য* মূলত আখ্যান প্রধান *জ্যা*-নাট্য দেহেরই অঙ্গ বা নৃত্যাংশ, যা মারমা জাতিতাত্ত্বিক নৃত্য শৈলীর একটি রীতি হিসেবে প্রদর্শিত হয়–

---

৮২ Kapila Vatsyayan, *Traditions of Indian Folk Dance*, India Library, 1976, p. 3

৮৩ মং ক্য শোয়েনু নেভী পদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

> সামাজিক নৃত্যের মধ্যে 'জাইত আক্কাহ্' হলো অধিকতর লীলা চঞ্চলা নৃত্য ও অনেকটা আধুনিকও। এ নৃত্যে ছন্দের আবয়িক ও অন্তরূপের পরিবর্তন যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। নতুন সামাজিক পরিবেশে জীবন চর্চার অঙ্গরূপে মধুর, বলিষ্ঠ ও সবল ভঙ্গি বিদ্যমান। এ নৃত্যে জাইত নর্তকী অনেকটা আধুনিক ও উত্তম পোশাক, নানা, ধরনের অলংকার পরিধান করে। মাথায় ফুল, রংবেরং-এর ফিতা, চিরুনী, ক্লিপ্স, ফলস্চুল গুঁজে থাকে। জাইত নৃত্যে 'বুং', 'পাইত', 'হ্নেহ্', 'পাইতাল্লাহ্', 'লাং খোওয়ক্' নামক নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। নৃত্যগীতের বিষয় ভেদে হাত-পা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ মুদ্রায়ও ভিন্নতা দেখা যায়। কোন কোন জাইত নৃত্যের নাম "মাংসাহ্-মাংসুৎমুই আক্কা" (রাজকুমার ও কুমারী নাচ), "যুংতৈ-হ্লেইপাই সোওয়াহ্ আক্কা" (দ্বৈত নাচ), লুপ্যাক আক্কা, পুজোখাইং আক্কা" (বন্দনা নাচ) "ক্রকৈ-ওয়াইংনেহ্ খাইং আক্কাহ্" (ব্যথা-বেদনাপূর্ণ ক্রন্দনের নাচ) ইত্যাদি জাইত্ নৃত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।[৮৪]

বক্ষ্যমাণ আলোচনায় *জ্যা-নাট্য* এবং *জ্যা-নৃত্য*'কে যুগপৎ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাবে *জ্যা* নাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে কেবল মারমা *জাইত আক্কা* বা *জ্যা নৃত্য*কে বিশদ বিশ্লেষণের পরিধিভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক আফসার আহমদ *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য* শিরোনামে দীর্ঘ কলেবরে গবেষণা সম্পাদন করেছেন– যার মধ্যে *নৃগোষ্ঠী নাট্য : মারমা জ্যা* প্রসঙ্গেও রয়েছে বিস্তৃত বিশ্লেষণ। বলা যায় *জ্যা* নাট্যরীতি প্রসঙ্গে এটিই প্রথম কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তিনি *জ্যা* পরিবেশনারীতি, আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আলোচনার পাশাপাশি *জ্যা* আখ্যান *আলংনাবাহ, মা চ ক্যান* ও *সাবায়াহ্*-এর বিশদ বিশ্লেষণসূত্রে বাংলা লোকনাট্যের আখ্যান এবং যাত্রা পরিবেশনারীতির সাথে *জ্যা*-এর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় তিনি মারমাদের ধর্ম ও সামাজিক কৃত্যের সাথে *জ্যা*-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। সুতরাং বিশদ বিশ্লেষণের এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বক্ষ্যমাণ আলোচনায় *জ্যা-নাট্যে*'র রীতি, আঙ্গিক, বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরবর্তী *জ্যা* নৃত্য ও নাট্যের যুগপৎ আলোচনার সূত্রে *জ্যা-নৃত্য* বা *জাইত আক্কা*র বিশ্লেষণে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জ্যা/জাইত্/জাই শব্দটি পার্শ্ববর্তী দেশের বার্মিজ শব্দ 'জ্যা' থেকে লব্ধ, যার অর্থ 'Story of a stage play, film, drama.'[৮৫] অর্থাৎ নাটক বা চলচিত্রের জন্য বিন্যস্ত একটি পরিপূর্ণ 'আখ্যান' বা 'কাহিনী' হচ্ছে *জ্যা*-এর উপজীব্য। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– ভগবান বুদ্ধের জীবন ও কর্মের নানান দিক নিয়ে রচিত

---

৮৪ মং ক্য শোয়ে নু নেভী, মারমা নৃত্যের বৈশিষ্ট্য, উ চ নু (সম্পা), *সাংগু; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, বর্ষ- ছয়, সংখ্যা-এক, টিসিআই, এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃ. ৫৪

৮৫ *Mayanmar-English Dictionary,* Department of the Myanmar Language Commission, P. 152

আখ্যান– *জাতক* এবং এর সাথে *জ্যা*-এর বিষয় ও আঙ্গিকগত সাদৃশ্য বিবেচনায় *জাতক* ও *জ্যা* অভিন্ন অর্থে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বুদ্ধচরিত, জাতকের গল্প কিংবা আবৃত্তিকেও বার্মিজ অভিধানে *জ্যা* নামে অভিহিত করা হয়। মারমা সংস্কৃতিতে *জ্যা* অবসর বিনোদনের পরিবেশনা নয় বরং *জ্যা*-এর সাথে ধর্ম ও কৃত্যের গভীর অর্থবহ যোগের ফলে তা একটি কৃত্যমূলক পরিবেশনাও বটে। জাতকের নানা কাহিনী, বৌদ্ধের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন ঘটনা *জ্যা* পরিবেশনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই *জ্যা, জাইত্, জাই, জাতক* একই বা সম-অর্থ ব্যঞ্জনায় গ্রহণ করা হয়েছে–

> যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান, গৃহস্থালি আনুষ্ঠানিকতায় জ্যা, পাঙখুংগুলো পরিবেশিত হয়ে থাকে। জাতক থেকে আসছে জ্যা। জাতকের অর্থ হচ্ছে জাত। এক এক জন্মের, এক এক জীবনের বিভিন্ন অংশের কাহিনী (লিভিং)গুলো করা হয় এতে। এটাকেই বলে জ্যা। অর্থাৎ এইটা এই জাতের ঐটা ঐ জাতের। জ্যা অর্থ জাত বা জাতক। এতে যে কেবল বৌদ্ধ জাতকের গল্প থাকবে বিষয়টি তা নয়, মানুষের জীবনের ঘটমান ঘটনাও ছিল এই জ্যা-এর অংশ। কেননা তখন তো বুদ্ধ ছিলেন না। বুদ্ধ না হওয়ার আগে ওনার জীবনের ঘটমান ঘটনা এটার সাথে উনি পশু-পাখি হয়েছিলেন, বাঘ হয়েছিলেন, হরিণ হয়েছিলেন, এই বিভিন্ন জীবনেরই এক একটি অংশ হচ্ছে জাত বা জাতক। শুধু মানুষ নয় বা পশু-পাখি নয় অন্য জীবনেরও অংশ হচ্ছে এই জাত বা জাতক। মূলত জাতি– জাত ওখান থেকেই জাতকের সৃষ্টি। অর্থাৎ জাতক হচ্ছে কোনো একটি জাতের বর্ণনা।[৮৬]

জ্যা প্রসঙ্গে প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং উদ্ধৃতি দৃষ্টে একটি বিষয় সহজেই অনুমান করা যায় যে, মহামতি বুদ্ধের জীবন ও কর্মের নানান ঘটনাকে জনগণ মাঝে প্রচারের নিমিত্তে সেকালের স্থানীয় জনপদে প্রচলিত ও জনপ্রিয় কোনো একটি নাট্য-আঙ্গিকের ওপর ভর করে ছিল, যা ক্রমান্বয়ে *জ্য-নাট্য* নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেননা সর্বকালেই স্থানীয় বা দেশজ পরিবেশনা শিল্পকলার বিভিন্ন রীতি, বিষয় ও আঙ্গিক পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল সচল। আদান প্রদানের এই সম্পর্ক কেবল স্থানীয় পরিবেশনা শিল্পকলার মধ্যেই আবদ্ধ নয় বরং গ্রাম ও শহরের পরিবেশনা শিল্পকলার মধ্যে দেয়া-নেয়া, গ্রহণ-বর্জনের যে সম্পর্ক সেও তো সর্বকালের- "[Also] tribal dances in some regions have incorporated and assimilated the so-called 'great tradition' without a change in its format; in other cases the highly stylized forms show a distinct correlation with those which have been termed folk or tribal dances of the 'little tradition."[৮৭] তাছাড়া, নাট্যকলার ইতিহাসে বিশেষ কোনো ধর্ম-দর্শনকে

---

৮৬ মং ক্য শোয়েনু নেভী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

৮৭ Kapila Vatsyayan, *Traditions of Indian Folk Dance,* India Library, 1976, p. 7

সাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করা এবং ভাবের আদান-প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ-বিদ্যুৎস্পর্শী একই সাথে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে নাট্য আঙ্গিক ব্যবহারের ঘটনাও নতুন নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহামতি যিশুর বাণী প্রচারের লক্ষ্যে রোমান পরবর্তী গির্জাকেন্দ্রিক থিয়েটার চর্চার বিষয়টিকে উল্লেখ করা যায়। সুতরাং এ সকল বিবেচনায়, সেই কালে বৌদ্ধ জাতকের বিষয় অবলম্বনে পরিবেশিত *জ্যা-নাট্য* একাধারে নৈতিক, পারলৌকিক, বিনোদনাত্মক ও শিক্ষামূলক হয়ে উঠবে এবং তা ক্রমাগত চর্চা, সাধন ও পালনের মাধ্যমে জনগণের কৃত্যমূলক নাট্যে চর্চিত হবে, সেটা তো সহজেই অনুমেয়।

জ্যা-নাট্যের বিষয়বস্তুতে কেবল বৌদ্ধ জাতক বা জীবনের গল্প-কাহিনীরই প্রাধান্য রয়েছে তা নয় বরং এতে রয়েছে বৈচিত্র্যের সমাহার, যা এই নাট্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। *জ্যা*-এর আখ্যান-দেহে "হিন্দু ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রাম-লক্ষ্মণ-সীতার গল্প যেমন ঠাঁই পেয়েছে, তেমনি ঠাঁই পেয়েছে ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তি থেকে নেওয়া গল্প ও কাহিনী। অর্থাৎ *জ্যা*-এর পরিবেশিত গল্প নানান কিছু হতে পারে, "হতে পারে সামাজিক, রাজা-বাদশা ছাড়াও পশু-পাখি, সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনী হতে পারে।"[৮৮] জ্যা আখ্যানের ভাষা এবং রচনাশৈলীতে পার্শ্ববর্তী বার্মা (মায়ানমার) সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। *পাঙখুং* নাট্যের আখ্যান ও পরিবেশনায় মারমাদের স্থানীয় ভাষা-রীতির ব্যবহার দেখা গেলেও *জ্যা*-এর রচনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। *জ্যা*-এর আখ্যান-রচনায় সম্পূর্ণতই বার্মিজ কাব্য ভাষা ও রীতি অনুসরণ করা হয়েছে–

> পার্বত্য জনপদে মারমাদের আরেক জনপ্রিয় গীতিনাট্য জাইত্ পালা। বিশেষ করে বান্দরবান মারমাদের নিকট অধিক জনপ্রিয়। জাইত্ পালা পাঙখুং-এর চেয়ে অধিক প্রাচীন। পরিবেশন রীতিতে পাঙখুং ও জাইত্ পালার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। জাইত্ পালার সংলাপ বর্মি লেখ্য ভাষায় রচিত, ইয়াঙ্গুন-মান্দালয় রীতি ভিত্তিক। পোশাক ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে ইরাবতী অববাহিকায় বর্মি কৃষ্টির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিকভাবে এ যোগসূত্র থাকাটা স্বাভাবিক।[৮৯]

---

৮৮ মং ক্য শোয়েনু নেভী পদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা),বান্দরবান

৮৯ চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং*, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

রোয়াংছড়ি, বান্দবানের কিমি মারমা'র (৩০) নেতৃত্বে সংগঠিত একটি 'জাই নাচের দল' (জ্যা নৃত্য) অত্র এলাকা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। দলটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ/বায়না সূত্রে *জাইত্ আক্কা* পরিবেশন করে থাকে। সাধারণত ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব যেমন– বিবাহ অথবা জুম উদ্‌যাপনসহ পারিবারিক অথবা ব্যক্তি উদ্যোগে সংগঠিত অনুষ্ঠানে *জাইত আক্কা* পরিবেশিত হয়ে থাকে। 'জাই নাচের দলে'র প্রসিদ্ধ এবং সর্বাধিক পরিবেশিত নৃত্যের নাম 'মাংসাহ্-মাংসুৎমুই আক্কা' অর্থাৎ রাজকুমার ও রাজকুমারী নাচ। বায়না বা আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের ধরন, প্রকৃতি, দূরত্ব এবং আয়োজক প্রভৃতি বিবেচনায় দল ও কুশীলবদের পারিশ্রমিক ধার্য করা হয়। সাধারণত দূরবর্তী স্থানের কোনো অনুষ্ঠানে একরাতের পরিবেশনায় দলটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং নিকটবর্তী অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা বায়না গ্রহণ করা হয় বলে দলপ্রধান সূত্রে জানানো হয়।

জাই নাচের দলের সদস্য সংখ্যা সাধারণত ১৫ থেকে ২০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে দল সূত্রে জানানো হয়। তবে প্রদর্শিত নৃত্যের সদস্য সংখ্যা ছিল যন্ত্রবাদক এবং নৃত্যশিল্পীসহ মোট ১৪ জন। এরা হলেন– কিমি মারমা (দলপ্রধান), চা চি ওং মারমা, কে ছা থুয়ে মারমা, ন শে থুয়ে মারমা, এ বা মারমা, চিং ছা থুয়ে মারমা, মও নং মারমা, মার খুই অং মারমা, নু মে সুয়ে মারমা, হা থিং ছি মারমা, মে নো চিং মারমা, মায় মে চিং মারমা, ইয়া শ্রুয়ে উ মারমা এবং মিয়া নুং মারমা। দলীয় নৃত্য এবং যন্ত্রবাদনে সদস্যদের সংখ্যাগত অংশগ্রহণ বিবেচনায় দলের সদস্য সংখ্যা কম-বেশি হয়ে থাকে, যা প্রকারান্তরে সাংগঠনিক নমনীয়তার ধারণাকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ সাংগঠনিক বিষয়টি এমন যে, আখ্যানের উপস্থাপন করাই এক্ষেত্রে মুখ্য বিবেচ্য, আখ্যান বর্ণিত চরিত্রের সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কুশীলবের অংশগ্রহণ এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা মুখ্য নয়। ফলে স্বল্প সংখ্যক কুশীলব দ্বারা আখ্যানের অধিক সংখ্যক চরিত্রের উপস্থাপন করা যেমন সম্ভব, তেমনি আবার নির্ধারিত সংখ্যক কুশীলব দ্বারা স্ব স্ব চরিত্রের উপস্থাপন করাও সম্ভব। বিভিন্ন উৎসব এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণসূত্রেই মূলত এ দলটির চর্চা পরিচালিত হয়ে থাকে। কিমি মারমার এই দলটি নারী ও পুরুষ সমন্বয়ে গঠিত এবং এদের প্রত্যেকেই পেশাগত-ভাবে কৃষিজীবী। তবে দলপ্রধান উপজেলা সদরে হস্ত ও তাঁতশিল্প এবং পোশাক সেলাইকর্মের একটি দোকান পরিচালনা করে থাকেন।

মাংসাহ্-মাংসুৎমুই আক্কা পরিবেশনার আয়তন বা মঞ্চ নমনীয় নয়, নির্ধারিত। ন্যূনতম ১৫x২০ অনুভূমিক অস্থায়ী মঞ্চ অথবা প্রেক্ষাগৃহের স্থায়ী আয়তনে *জাইত্ আক্কা* পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত। মঞ্চের পিছনে (আপ স্টেজ) বা ডান অথবা বাম যে কোনো একপাশে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে যন্ত্রীদল। সাধারণত মারমাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র যেমন– 'বুং', 'পাইত', 'হ্নেহ্', 'পাইতাল্লাহ্', 'লাং খোওয়ক' প্রভৃতি চর্মযন্ত্র,

বাঁশি, ঝাঁঝর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূলত একটি শূন্য আয়তনেই পরিবেশিত হয়ে থাকে *জাইত্ আক্কা*। সামগ্রিকভাবে *জ্যাইত্ আক্কার* ন্যায় *জ্যা নাট্যও* একটি অনারম্ভর পরিবেশনা, যেখানে দর্শক চারদিকে বা তিন দিকে আসন গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিস্থাপিত দুটি চেয়ার ব্যতীত অন্যকোনো উপকরণের ব্যবহার নেই। পোশাক ও মেকাপের ব্যবহারে মারমা ঐতিহ্য অনুসৃত হলেও অতিরিক্ত ব্যবহার্য কোনো সামগ্রী বা দ্রব্যের ব্যবহারও অনুপস্থিত। সম্ভবত এ কারণেই *জ্যা* পরিবেশনাকে 'মিনিমাম থিয়েটার' নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

> মারমা জ্যা কে 'মিনিমাম থিয়েটার' পর্যায়ে ফেলা যায়। বাঙলা যাত্রার মতোই মঞ্চোপকরণের তেমন কোন বাহুল্য পরিলক্ষিত হয় না। একটি মাত্র চেয়ারেই প্রতীকায়িত হয় রাজার সিংহাসন এবং উক্ত চেয়ারের আরও বহুবিধ ব্যবহার জ্যা কে অনাবশ্যক মঞ্চোপকরণের বাহুল্য থেকে রক্ষা করে। বাঙলা যাত্রার মতোই মারমা জ্যা উপকরণ প্রধান নয়, কাহিনী প্রধান। [৯০]

জাতিতাত্ত্বিক অন্যান্য পরিবেশনার ন্যায় *জ্যা-নাট্য এবং জ্যাইত্ আক্কা* উভয়ে প্রথাগত ভাবে কিছু কৃত্যাচার পালনের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। শুরুতে পরিবেশনার স্থান বা আয়তন নির্ধারণ এবং যন্ত্রীদের উপবেশন, দর্শক অভিমুখী মঞ্চের সামনে (ডাউন স্টেজ) ঠিক মাঝখানে বিশেষ শক্তির প্রতীক 'ওক'– পূজার নৈবেদ্য দ্বারা সজ্জিত একটি পাত্র প্রতিস্থাপন করা হয়। কখনো আবার বুদ্ধের প্রতীক স্বরূপ কল্পতরু (বৃক্ষ) সাজানো হয়ে থাকে। আসর বা মঞ্চের সম্মুখে বিশেষ কোনো শক্তি বা অলৌকিক ক্ষমতার প্রতীক স্বরূপ দণ্ড/পাত্র/ঘট/বৃক্ষ/আক্কা প্রভৃতি প্রতিস্থাপন করার এই রীতিটি অতি-অবশ্য পালনীয় একটি কৃত্য, যা আদি কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শুরু করে ট্রাইবাল জাতিতাত্ত্বিক সমাজের নানান পরিবেশনায় প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রোক্ত নাট্যশালায় জর্জর দণ্ড স্থাপনের মাধ্যমে জর্জর অনুষ্ঠানের যে রীতি সম্পর্কে জানা যায়, মূলত তদ্রূপ কৃত্যানুষ্ঠান হিসেবে বাঁশ বা খুঁটি পোঁতার রেওয়াজ আরও আদি কাল থেকেই পালনীয় একটি আচার হিসেবে জানা যায়–

> [এই] খুঁটি পোঁতা অনুষ্ঠানের একটি ইতিহাস আছে যা এমনকি নাট্যশাস্ত্রেরও আগেকার সময়ের ব্যাপার। এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বেদে, বিশেষতঃ বেদের 'অগ্নিচয়ন' যজ্ঞ এবং 'যুপ' প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক শ্লোকগুলিতে। একই বিষয়ে অথর্ববেদে আরও অনেকগুলি গোটা স্তোত্রের সন্ধান মেলে। অনুষ্ঠানটির 'জুম চাষের কৃষি-আচারের সঙ্গেও যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বাঁশের খুঁটি পোঁতার কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানটিকে নানা আনুষঙ্গিক আয়োজনের দ্বারা মণ্ডিত করে তোলা হয়, তারপর খুঁটিটিকে একটি বিগ্রহরূপে পূজা করা হয়। ছৌয়ের অনুষঙ্গে দণ্ডটিকে শিবের প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়।

৯০ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-২০০৮, পৃ: ৪০১

ভবাইয়ের বেলায় অবশ্য দণ্ড নয়, 'গর্‌বা' বা 'গর্‌বি' নামের মৃন্ময়পাত্র এবং 'মাণ্ডভি' নামের বাঁশের কিংবা কাঠের কাঠামো অম্বা দেবীর নামে পূজা পায়। সংস্কৃত নাটকের 'পূর্বরঙ্গ' আচার বলতে যা বোঝায়, এইসব প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানগুলিতে তার সবই মেলে।[৯১]

বর্তমান সময়ে মনসামঙ্গল পরিবেশনায় মনসার ঘট স্থাপন, গাজীরগানে গাজীর আশা স্থাপন এবং গারো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য 'ওয়ানগাল্লা' উদ্‌যাপনে দেবতার প্রতীকরূপে নক্সাখচিত বাঁশের খুঁটি স্থাপন করে তার গায়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দেবতাকে উৎসর্গ করা মুরগির রক্ত মাখানো আর পালক লাগিয়ে রাখার আচার ইত্যাদি আদি যুগের কৃত্যানুষ্ঠানে বাঁশের খুঁটি পোঁতা ঐতিহ্যের ধারাবহিকতা হিসেবেই মনে করা যায়। মারমা সমাজের এই আনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ত্রেয়াবোয়ে' বা 'ত্রেয়াবোয়ে' প্রদান অনুষ্ঠান, যা বিশেষ ভক্তি সহকারে পালন করা হয়–

কোনো একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই জ্যা বলেন এই পাংখুং বলেন, শুরুতেই ঐ যে ত্রেয়াবোয়ে, ত্রেয়াবোয়ে বলে আরকি– বোয়ে মানে অনুষ্ঠান আর ত্রেয়া মানে আইনগত, প্রথাগত অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ কারো কাছে গেলে সম্মান সূচক এই ত্রেয়াবোয়ে দিতে হয়। এটা একটা পাত্র যা মারমাদের থাকতেই হয়। এটা তিন স্তর বিশিষ্ট একটা পাত্র– একটা পাত্র বা হাঁড়ির ওপর আর একটা এইভাবে তিনটা রাখা হয়। এক সময় এর উপরে ঢাকনা পর্যন্ত থাকতো। এইটার নামই হচ্ছে 'ওক'– যার মানে ঢাকনা বিশিষ্ট পাত্র। একটা প্রতীকী দিয়ে শুরু করতে হয়। ত্রেয়াবোয়ে বলে এটাকে– মানত করার একটা ওক, একটা পাত্রের মধ্যে কলা থাকবে, নারকেল থাকবে, চাল থাকবে, কচি পাতা, কচি ডাল থাকতে হবে, প্রতীকী স্বরূপ এতে কাগজের তৈরি ধ্বজা বা পতাকার মতো থাকবে। পতাকার রং লাল হতে পারে অথবা সাদা হতে পারে তবে কখনোই কালো হবে না, এটাকে ওক বলে। এগুলো দিয়ে (মহিলারা) বুদ্ধের কাছে যাওয়ার সময়ে, মন্দিরে যাওয়ার সময়ে বা কোনো প্রথাগত অনুষ্ঠানস্থলে এগুলো সাথে নিয়ে যাওয়া হয়। মূলত এই ওক দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করবে, সাথে প্রদীপ মানে মোমবাতি জ্বালানো হয়। এই ওক নিয়ে চারদিক এবং উপর, নিচ সকল দিক স্মরণ করে মঙ্গল কামনা করা হয়। এই প্রথাগত কৃত্যটি অনুষ্ঠানের শুরুতে করতেই হবে। কিন্তু বর্তমানে কালচারাল ইন্সটিটিউটের পরিবেশিত অনুষ্ঠানে এসব করা হয় না।[৯২]

সমন্বিত যন্ত্রসংগীত বাদন এবং পর্যায়ক্রমে বন্দনা (পুইউ) এবং বন্দনা শেষে *মাংসাহ্‌-মাংসুৎমুই* নৃত্য এবং দড়াবাজি (অ্যাক্রোবেট) প্রদর্শন মোটামুটি এ হচ্ছে *জাই নাচের দলে'র* প্রদর্শন-ক্রম। বন্দনাংশে দিক-বন্দনা, বুদ্ধ-বন্দনা, দর্শক-অভ্যর্থনা প্রভৃতি পর্ব উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বুদ্ধ বন্দনা এবং অভ্যর্থনা পর্ব দুটি দলগত

---

৯১ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য ঐতিহ্য*, অনুঃ নারায়ণ চৌধুরী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৫, পৃ. ২১৮

৯২ মং ক্য শোয়েনু নেভী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্‌ (বিটা), বান্দরবান

নৃত্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। দিক-বন্দনা অংশে চাল, সুপারি, নারকেল, কলা, কল্পতরু আকৃতির বৃক্ষে ঝোলানো টাকা, মোমবাতি প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা সাজানো একটি গামলা অথবা নৈবেদ্য সাজানো একটি পাত্র দুই হাতে বুকের কাছে নিয়ে একজন কুশীলব চারদিক নির্দেশ করে ঘুরে ঘুরে গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকেন।

বন্দনা শেষে শুরু হয় রাজপুত্র ও রাজকন্যার নৃত্য। পরিবেশনাটি নৃত্য প্রধান হলেও রাজপুত্র ও রাজকন্যার মনের ভাব প্রকাশে নৃত্যের সাথে কোনো কোনো অংশে গীত পরিবেশন করা হয়। যদিও "মারমা জ্যা বান্দরবানের মারমা নৃগোষ্ঠীর একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হিসেবে পরিচিত। চাকমা গেংখুলী গীদের মতো বর্ণনাত্মক নয়, সংলাপাত্মক এর নাট্যকাহিনী। চরিত্রানুগ সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী হয়েছে পরিণামমুখী।"[৯৩] কিন্তু রোয়াংছড়ির *জাই নাচের দলের* পরিবেশনায় বর্ণনাত্মক গীত পর্যবেক্ষণ করা গেলেও সংলাপাত্মক পরিবেশনা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নৃত্যকেই এই পরিবেশনায় অর্থাৎ *জাইত আক্কায়* মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে, আখ্যান এবং আখ্যানোক্ত চরিত্রের উপস্থাপনাকে এক্ষেত্রে গুরুত্বপ্রদান করা হয়নি।

দড়াবাজি (অ্যাক্রোবেট) প্রদর্শন আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা এই নৃত্যের অংশ হিসেবেই পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে অগ্নি-চক্র ভেদ বা জ্বলন্ত অগ্নি চক্রের (লৌহ নির্মিত একটি রিং) ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে এ পাশ থেকে ওপাশে চলে যাওয়ার উৎকর্ষময় দক্ষতা প্রদর্শন করা এই পর্বের মূল আকর্ষণ। দল প্রধানের বক্তব্য অনুসারে *মাংসাহ্-মাংসুৎমুই আক্কার* দর্শক চাহিদা বেশি, ফলে নৃত্যে চূড়ান্ত উৎকর্ষ অর্জন করাই দলগত এই পরিবেশনার মূল উদ্দেশ্য। তবে কেবল নৃত্যের প্রদর্শন নয়, রোয়াংছড়ির এই *জাই নাচের দলটি* কখনো আবার পালা বা কাহিনী ভিত্তিক *জ্যা* নাট্যও পরিবেশন করে থাকে।

জ্যা নাট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো ল্যাব্যা/লুবিয়া বা জোকার পর্ব। কারো মতে এটি বন্দনার পর মূল আখ্যানের পূর্বে পরিবেশিত হয় আবার কারো মতে এটি মূল আখ্যানেরই একটি অংশ। তাই *জ্যা* নাট্যের ল্যাব্যা বা লুবিয়া পরিবেশনা প্রসঙ্গে রয়েছে একাধিক ব্যাখ্যা। ড. আফসার আহমদ 'ল্যাব্যাঃ আখাইং বা জোকার পর্বটিকে পালা (মা চ ক্যান) উপস্থাপনে পৃথক ছয়টি স্তর বা পর্বের মধ্যে পাঁচ নম্বরের আখ্যান-পূর্ব একটি পর্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন–

> মা চ ক্যান পালাটির উপাস্থাপনাকে কয়েকটি স্তর বা পর্বে ভাগ করা যায়। পর্বগুলো ক্রমানুসারে নিম্নরূপঃ ১. পেয়উমা বা বন্দনা পর্ব, ২. ন্যাগডমা অভ্যর্থনা পর্ব, ৩. শোয়ে বুং ডং য়ইং বা বুদ্ধ বন্দনা, ৪. কঃ উইলাঃ পাইছোয়া পুং য়ইং বা রাজকন্যার ফুল তোলার নৃত্য দৃশ্য, ৫. ল্যাব্যাঃ

৯৩ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, জুন-২০০৮, ঢাকা, পৃঃ ৩৯৬

আখাইং বা জোকার পর্ব এবং ৬. মূলকাহিনীর পরিবেশনা। [...] জোকার পর্বের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকদের পরবর্তী কাহিনী দেখার জন্য আগ্রহ সৃজন। এই পর্বে জোকারদের হাস্যরসাত্মক নৃত্য গীতই মূল আকর্ষণ। জোকার পর্বের পরেই মূল জ্যা পালা *মা চ ক্যান*-এর কাহিনী পরিবেশিত হয় সংলাপ নির্ভর অভিনয়রীতিতে।"[৯৪]

এই বিশ্লেষণে লুবিয়া বা জোকার পর্বকে মূল আখ্যান বা কাহিনী উপস্থাপনের পূর্বের একটি পরিবেশনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মারমা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মং ক্য শোয়েনুর বিশ্লেষণে এই পর্বটিকে মূল আখ্যান-পূর্ব হিসেবে নয় বরং মূল আখ্যানের অংশ হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

> জ্যা পরিবেশনার আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে 'লুবিয়া' অর্থাৎ জোকার থাকতে হবে। পাংখুং-এ প্রোম্পটার থাকলেও জ্যা-তে কোনো প্রোম্পটার থাকে না। লুবিয়া কাহিনীর পরিবেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চরিত্রটি ব্যঙ্গ, কৌতুক, হাস্যরস এবং ভাবের প্রয়োগ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কাহিনী চলমানতায় পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চরিত্রটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক আচরণ করলেও নায়ক-নায়িকার প্রতি রয়েছে তার অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।[৯৫]

এই মন্তব্য অনুসারে লুবিয়া বা জোকার কাহিনীর পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ মূল আখ্যানের অংশ হিসেবেই জোকারকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে উভয়ের ব্যাখ্যায় লুবিয়া একটি হাস্যরসাত্মক চরিত্র, যে মূলত আখ্যানের সাথে দর্শকের যোগাযোগ নির্মাণে কার্যকর এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

জ্যা নাট্যে কুশীলবের চরিত্রানুগ সংলাপাত্মক অংশগ্রহণ হলেও মূলত এ হচ্ছে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান নাট্য, রীতির বিচারে একে *গীতিনৃত্য নাট্য* হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে– "মারমাদের এই প্রযোজনাটিকে (মা চ ক্যান) বলা যায় গীতিনৃত্য নাট্য অর্থাৎ গীত-নৃত্য ও অভিনয় ত্রিসঙ্গমজাত নাট্য। মুখাবয়বে অভিব্যক্তিহীন আঙ্গিক অভিনয়রীতি তাদের অভিনয় বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবেই মারমা কথ্যভাষা গীতল। সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান নাট্য-আঙ্গিক জ্যা-তে অভিনেতারা সংলাপ প্রক্ষেপণ করেছে সুরে সুরে।"[৯৬] *জ্যা* পরিবেশনায় অভিনয় উপাদানের সমন্বিত প্রয়োগের উপরোক্ত দৃষ্টান্ত বিবেচনায় একে *নাটগীত* রীতির পর্যায়ভুক্ত করেও বিশ্লেষণ করা যায়। কেননা রীতি হিসেবে *নাটগীত* সম্পূর্ণতই নৃত্য ও গীত-সংলাপ প্রধান পরিবেশনা, চরিত্রানুগ মঞ্চ উপস্থিতি এবং সংলাপ প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রেও রয়েছে সুর বা গীতের ব্যবহার– "নাটগীত রীতির পরিবেশনায় একাধিক অভিনেতা / অভিনেত্রী নৃত্য, গীতি সংলাপ এবং কিছু কিছু গদ্য সংলাপের সাহায্যে কাহিনীর

---

৯৪ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, জুন-২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৪০৫-৬

৯৫ মং ক্য শোয়েনু নেভী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

৯৬ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, জুন- ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৪০৬

চরিত্রসমূহকে রূপদান করেন।"[৯৭] তবে রীতি, আঙ্গিকের বিচারে *জ্যা-নাট্য'*কে যে বিশেষণেই চিহ্নিত করা হোক না কেন নৃত্য, গীত, কাব্য এই তিনের কোমল-মিলন এর প্রাণশক্তি তাতে সন্দেহ নেই। *জ্যা-নাট্যের* পরিবেশনার সামগ্রিক আঙ্গিক, রীতি, বৈশিষ্ট্য এবং কুশীলবের প্রথাগত অংশগ্রহণ এবং নমনীয়তা দৃষ্টে *জ্যা*কে আবার বাংলা যাত্রার সাথেও সাদৃশ্য রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। "চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলেও আধুনিক নাটকের মত জ্যা পালার মঞ্চায়ন পরিদৃষ্ট নয়। বরং বাঙলা যাত্রাপালার অভিনয় ও মঞ্চরীতির সঙ্গে এর পরিবেশনার সাদৃশ্য বিদ্যমান। ধ্বনিগত সাম্য, আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির দিক থেকে বাঙলা যাত্রা ও মারমা জ্যা পালার মধ্যে মিল পরিলক্ষিত হয়।"[৯৮]

সম্প্রতি *প্রা-জ্যা* নামে এক ধরনের আধুনিক নাটক *জ্যা নাট্য* কাঠামোতে প্রক্ষিপ্তভাবে যুক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। এটি *জ্যা-নাট্য* আখ্যান প্রদর্শনের পূর্বের একটি বিশেষ পরিবেশনা যার উদ্দেশ্য জ্যা আখ্যানের প্রতি দর্শকের আগ্রহ তৈরি করা। এটি *জ্যা নাট্যের* যাবতীয় কৃত্য ও প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা বিবর্জিত এবং সংক্ষিপ্ত বিনোদনমূলক একটি পরিবেশনা। এই সকল বৈসাদৃশ্য বিবেচনায় *জ্যা*কে দুই প্রকার বা রূপে– *জ্যা* এবং *প্রা-জ্যা* রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

> জ্যা এখন মূলত দু ভাবে হয়ে গেছে। এক প্রকার জ্যা পরিবেশনায় সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা বা কৃত্যের ব্যবহারসহ আখ্যান পরিবেশনা পূর্ব যাবতীয় সকল পর্যায়ক্রমগুলো অনুসরণ করা হয়। এবং অন্যপ্রকারে এ সকল আনুষ্ঠানিকতা, কৃত্য, বা বন্দনার প্রয়োজন হয় না। 'আধুনিক নাটক' যেটা, এটা স্টেজে হতে পারে, খোলা-মেলা জায়গায় হতে পারে। এটা আধুনিক নাটক তাই এটাকে জ্যা না বলে প্রা-জ্যা বলা হয়। প্রা-জ্যা... প্রা-জ্যা মানে দেখানো জাত। প্রা অর্থ দেখানো, আর জ্যা হচ্ছে জাত বা জাতীয়। অর্থ প্রা-জ্যা মানে বিশেষ জাতের প্রদর্শন বা দেখানো। জ্যা পরিবেশনার পূর্বে লোকদের আগ্রহ কিন্তু প্রা-জ্যা-এর উপর বেশি থাকে। প্রা-জ্যা মানে আধুনিক নাটকের ওপর লোকদের আগ্রহ বেশি থাকে। তাই মূল জ্যা শুরুর পূর্বে প্রা-জ্যা দিয়ে শুরু করা হয়। এবং এরপর জ্যা-এর পর্যাক্রমগুলো অনুসরণ করে পরিবেশন করা হয়। জ্যা আখ্যানের নির্ধারিত কিছু অংশ– বিশেষত শেষ অংশ অবশ্যই পরিবেশন করতে হবে। আখ্যানের মধ্যখণ্ডের বা একটি পর্ব থেকে অপর পর্বের বিস্তারিত প্রদর্শন ছাড়া বা সংক্ষিপ্ত করে অথবা কিছু অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও পরিবেশন করা যেতে পারে কিন্তু শেষ অংশ অবশ্যই পরিবেশন করতে হবে। অর্থাৎ শেষ অংশের পরিবেশনা সম্পূর্ণকরণ করার ক্ষেত্রে দর্শক ও কুশীলব উভয়ের ক্ষেত্রে লোক-বিশ্বাসজাত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা এই অংশ সম্পূর্ণ করা না হলে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে কোনো না কোনোভাবে ক্ষতির কারণ হবে এমন

---

৯৭ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫, পৃ. ১৬
৯৮ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, জুন- ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৩০৩

একটি বিশ্বাস যুক্ত রয়েছে জ্যা পরিবেশনার সাথে। অর্থাৎ এই অংশটির পরিবেশন না করা অশুভ লক্ষণ।”[৯৯]

জাই নাচের দল-এর প্রধান কিমি মারমা'র বক্তব্য অনুসারে দলের মহড়া এবং সদস্যদের নৃত্য প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত তিনি এবং দলের অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠরাই পালন করে থাকেন। দলের মহড়া কার্যক্রম-প্রত্যক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে এটি প্রতীয়মান হয়– *জ্যা-নৃত্যে*র শিক্ষণ পদ্ধতিটি আনুষ্ঠানিক-অনুকরণাত্মক এবং শরীর থেকে শরীরে পারফরম্যান্স জ্ঞান সঞ্চালনমূলক শিক্ষণ (Body to body learning process) পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে তত্ত্ব এবং কৌশলগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিপরীতে দেখিয়ে দেখিয়ে শেখানোর বিষয়টি মুখ্য, যা পরম্পরাগতভাবে এখনো সচল রয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের ফলাফল বা দক্ষতা অর্জনের মানদণ্ড একটাই– দলগত অংশগ্রহণে সকলের সাথে সম-দক্ষতায় প্রদর্শন করতে পারা। কিন্তু প্রশিক্ষণের এই প্রক্রিয়াটি স্বল্প মেয়াদি নয়, ক্রমান্বয়ে ও দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই অর্জন করতে হয় *জ্যা* পরিবেশনায় কুশীলবের দক্ষতা। তবে প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশনা এই দুই পর্যায়ের মাঝে যে বিষয়গুলো উদ্যোগ-উৎসাহের অনুঘটক হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে, কৃত্য এবং জীবিকা রয়েছে এর মূলে। কেননা “দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে [*আলংনাবাহ পালার*] শিল্পীরা যেভাবে নৃত্য কৌশলসমূহ আত্মস্থ করে তাতে মনে হয়, শুধু জ্যা অভিনয়েই নয়, তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ, কৃত্য ও জীবিকার পরিপূরক হিসাবেও এই নৃত্যের অনুশীলন করে থাকে।”[১০০] তবে *জ্যা*-এর আখ্যান বা কাহিনী শিক্ষণের প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক, অর্থাৎ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিকরীতিতে সম্পাদিত হয়, এক্ষেত্রে “অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ মুখে মুখে কাহিনী শেখে দলপতির কাছে।”[১০১]

মারমা জাতিতাত্ত্বিক অন্যান্য নৃত্যের ন্যায় *জ্যাইত আক্কা* একটি দলগত নৃত্য। তবে *জ্যা*-এর আখ্যান অনুসারে *মাংছা ও মাংছামুয়ি* বা রাজপুত্র ও রাজকন্য হচ্ছে প্রধান দুই চরিত্র যাদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সম্পূর্ণ পরিবেশনাটি। তাই *জ্যা-নৃত্য* দলগত পরিবেশনা হলেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে রাজপুত্র ও রাজকন্যার নৃত্য। মূলত এটি-ই হচ্ছে *জাইত আক্কার* প্রধান অঙ্গ। সে কারণে পরম্পরাগত ভাবেই *জ্যা* এর নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে থাকতে হয় বিশেষ পারদর্শিতা। নায়ক-নায়িকার ‘বিশেষ পারদর্শিতার’ প্রয়োজন এই জন্য যে, “তাদের অভিনয় কৌশল ও নৃত্য ভঙ্গিমার মুহূর্তে যে মুদ্রা ও ভঙ্গি দৃষ্ট হয় তা তাৎক্ষণিক নয়, দীর্ঘকালের মানুষের ‘বিহেভিয়ার প্যাটার্ন’ অনুকরণের

---

৯৯ প্রাগুক্ত
১০০ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ২০০৮, পৃ. ৪০১
১০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

ফল।"[১০২] অর্থাৎ মুদ্রা এবং ভঙ্গি বিষয়ে যে 'বিহেভিয়ার প্যাটার্ন' অনুকরণের কথা বলা হচ্ছে, তা মূলত পরম্পরাগতভাবে অনুশীলিত নির্দিষ্ট কিছু শরীর ছন্দ ও ভাষার ইঙ্গিতময় প্রকাশ। তবে *জ্যা-নৃত্যে* প্রয়োগকৃত এসকল 'বিহেভিয়ার প্যাটার্ন'কে সুর-তাল-লয় অনুবর্তী কেবলই ভাবোদ্দীপনামূলক নৃত্য বা ভঙ্গির প্রদর্শন বলার সুযোগ নেই আবার তাকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ন্যায় 'সংকেতাবদ্ধ'ও (codified) বলা যায় না, বরং অনেকাংশেই তা *বর্ণনাত্মক নৃত্যের* পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কেননা শরীরের নানাবিধ ভঙ্গি ও মুদ্রার মাধ্যমে বিষয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনাতেই নৃত্য-আখ্যানের ঘটনা বা পরিস্থিতি হয়ে ওঠে অর্থবহ। এ জাতীয় নৃত্যের মুদ্রায় রয়েছে "দীর্ঘকালের আচরিত ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত মুদ্রার সহজাত প্রয়োগ।"[১০৩]

তবে *জ্য*-এর রাজপুত্র ও রাজকন্যার নৃত্য পরিবেশনায় রয়েছে কিছু গুণগত ভিন্নতা, যা সুদীর্ঘ অতীতের ইঙ্গিত বহন করে। এটি *বর্ণনাত্মক নৃত্য* হলেও এর মুদ্রা ও ভঙ্গিমার সামগ্রিক আদলটি অনেক ক্ষেত্রেই আদিকালের গুহাচিত্র বা পাথরে খোদাইকৃত নৃত্য ভঙ্গির অনুরূপতা তৈরি করে। ফলে নৃত্যের সামগ্রিক প্যাটার্নটি শাস্ত্রীয় না হয়েও এর নিকটাবর্তী উপলব্ধির সীমায় নিয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে কুশীলবের শরীরাঙ্গের সমন্বিত অথবা স্বতন্ত্র প্রয়োগ মুহূর্তে কতিপয় বিশেষ ভঙ্গিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিশেষ এই ভঙ্গিগুলো কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে বিকশিত দেশজ বা লোকজ নৃত্য/নাট্যকলার সুর-তাল-ছন্দ সমৃদ্ধ *ভাবোদ্দীপক* নৃত্য-আঙ্গিকেও প্রচলিত নয়। এক্ষেত্রে *জ্যা-নৃত্যের* পর্যবেক্ষণ সূত্রে নৃত্যশিল্পীর শরীর-অঙ্গের দুটি বিশেষ সঞ্চালন-ভঙ্গি বা মুভমেন্টের ওপর গুরুত্বারোপ করা যায়– একটি হচ্ছে কুশীলবের প্রধান অঙ্গ 'টরসো' (torso) এবং অপরটি 'হালকা বক্র হাঁটুর' (light knee bent position) বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার। *জ্যা-নৃত্যের* আঙ্গিক অথবা দেহের ভাষা ও বিন্যাসে যা কিছু ভিন্নতা রয়েছে, বলা যায় তা ঐ দুটি অঙ্গের স্বতন্ত্র বা সমন্বিত এবং বিশেষ শৈলীবদ্ধ প্রদর্শনের কারণেই হয়ে থাকবে। আর এই দুই অঙ্গের শৈলীবদ্ধ বিন্যাসকে অধিকতর বিশিষ্টতা প্রদান করে শরীরস্থ কোমল শৌর্য (soft energy) 'লাস্যের' উপস্থিতি। ফলে *জ্যা* নৃত্যের সামগ্রিকতায়– 'টরসো' এবং 'হালকা বক্র হাঁটু'-এর সঞ্চালন বা মুভমেন্ট-এর সাথে কোমল শৌর্য 'লাস্যের' ব্যবহার পরবর্তী নৃত্যের সামগ্রিকতায় যে বিশিষ্টরূপ লাভ করে তা জাতিতাত্ত্বিক কতিপয় নৃত্য শৈলীতে প্রত্যক্ষ করা গেলেও বাংলা-ভাষা ভিত্তিক সংস্কৃতির দেশজ নাট্যকলায় তা প্রচলিত নয়। সম্ভবত এ তিনটি বিষয়ের সমন্বিত প্রয়োগের কারণেই *জ্যা-নৃত্যের পর্যবেক্ষণ/দর্শন* শাস্ত্রীয়নৃত্যের নিকটাবর্তী উপলব্ধিতে সহায়তা করে থাকবে, এমনটাই ধারণা করা যায়। এই সকল দিক বিবেচনায় *জ্যা নৃত্য* বিষয়ক এ আলোচনায় 'টরসো', 'হালকা বক্র হাঁটু' এবং 'লাস্য' এই তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হলো।

১০২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৩
১০৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৯

টরসো (torso) বলতে বুঝায় মাথা, ঘাড়, হাত ব্যতীত এবং কোমর থেকে উপরে শরীরের মূল অংশ, যাকে ট্রাংকও বলা হয় অথবা এ অঙ্গটিকে একটি আয়তকার আকৃতির বক্স হিসেবেও কল্পনা করা যায়। ধ্রুপদী নৃত্য থেকে নিরীক্ষাধর্মী অথবা সমসাময়িক বিভিন্ন নাচে দেহের ভাষা ও শৈলী প্রকাশের নিমিত্তে টরসো'কে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে মারমা *জ্যা-নৃত্যে* তাল, লয়, ছন্দ অনুবর্তী *টরসোর* সাথে *বক্র হাঁটু* এবং হস্তভঙ্গি/মুদ্রার সমন্বিত সঞ্চালন/মুভমেন্ট যে শৈলী রূপায়িত করে তা প্রত্যক্ষণে ধ্রুপদী নৃত্যের নিকটাবর্তী অনুভূতি জাগ্রত করে। সাধারণত পদ-যুগলের ব্যবহারকে গৌণ করে শরীরের উল্লম্ব রেখাকে (head to toe vertical line) ভেঙে বা রেখা থেকে বাইরে বের হয়ে এসে বিশেষ কোনো মুভমেন্ট অথবা শৈলী প্রদর্শন করতে হলে স্বাভাবিক ভাবে *টরসোর* উপরই সর্বাধিক নির্ভরশীল হতে হয়। *জ্যা-নৃত্যের* কতিপয় শৈলী প্রদর্শনে পরিষ্কারভাবে *টরসোর* এ জাতীয় ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কেবল *টরসো* নয় বরং হস্ত, পদ ও কোমরের সাথে *টরসোর* সমন্বিত কোমল সঞ্চালন শৈলীর প্রয়োগ মারমা জাতিতাত্ত্বিক অন্যান্য নৃত্য-শৈলী থেকে *জ্যা-নৃত্যের* স্বকীয়তাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। মং ক্য শুয়েনু নেভী সম্ভবত একেই 'লীলা চঞ্চলা নৃত্য' বলেছেন, যার সাথে মণিপুরী রাসনৃত্য আঙ্গিকের সাদৃশ্য রচনায় রসিকদের আগ্রহী করে তুলতে পারে অনায়াসে। তরুণ নৃত্য শিল্পী অমিত চৌধুরী রোয়াংছড়ির *জ্যা-নৃত্যে* টরসোর ব্যবহার এবং *জ্যা নৃত্যের* সামগ্রিক শরীরাঙ্গের বিন্যাস বিশ্লেষণে বলেন–

> টরসো ভারতীয় নৃত্য ওডিসিতে বেশি ব্যবহৃত হয়, মণিপুরীতেও টরসোর ব্যবহার রয়েছে। বিশেষভাবে এই নাচের (জ্যা-নৃত্য) ক্ষেত্রে বলা যায় যে, পা ব্যতীত যদি আমি আমার শরীর-রেখা বা বডি লাইনের বাইরে যেতে চাই তাহলে আমার টরসো ব্যবহার করতেই হবে, যা এই নাচের অন্তর্গত একটি বৈশিষ্ট্য। কেননা এখানে পা 'তুলে' করা পদ-সঞ্চালন ও বিন্যাস সীমিত। *জ্যা-নৃত্যের* হ্যান্ড মুভমেন্ট (হস্ত মুদ্রা) শিল্পী তাঁর মতো করে করছেন। তবে এক্ষেত্রে মণিপুরী নাচে হাতের ভঙ্গির সাথে মিল রয়েছে। যে মাপে মণিপুরী নাচে হাতে মুদ্রা থাকার কথা এই শিল্পী ঠিক সেই মাপেই হাত রাখছেন। কিন্তু মণিপুরী অনেক পরিশীলিতভাবে রাখে...সাংদ্রাংসা মুদ্রা বলে একে, কিন্তু জ্যা নাচে তিনি কোনো মুদ্রাতেই যাচ্ছেন না তিনি লিটারেরি পতাকা হস্তেই সব কিছু সম্পাদন করছেন। এছাড়া তিনি কখনোই একটি হাত মাথার ওপর তুলেছেন এমনটা দেখা যায় নি, যেটা মণিপুরীদেরও একটি বিশেষ রীতি।[১০৪]

জ্যা-নৃত্য, যদিও এটি গোষ্ঠীবদ্ধ কৃত্যমূলক নৃত্য এবং একে কোনো বিশ্লেষণেই *সংকেতাবদ্ধ* অথবা *ধ্রুপদী* নৃত্যের পর্যায়ে সাদৃশ্য বিবেচনা করা চলে না, তথাপিও এই নৃত্য আঙ্গিকটি মণিপুরীদের পরিশীলিত নৃত্যের

---

১০৪ অমিত চৌধুরী, সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২/৭/২০১৫, নাটমণ্ডল, থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কিছু ভঙ্গির সাথে সাদৃশ্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, আবার ধ্রুপদী নৃত্যের নিকটাবর্তী হতেও উৎসাহিত করে। এজন্য 'টরসো'র সাথে 'বক্র হাঁটু' ও হস্তের সমন্বিত শৈলীবদ্ধ সঞ্চালনকে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সমন্বিত এই সঞ্চালন গতি ও ছন্দে 'চঞ্চলা', তবে তা যেন নিবেদনের নিমিত্তে কোমল বা 'লাস্য' (soft) শৌর্যের (energy) নৃত্যাঞ্জলির প্রদর্শন। নিবেদনের নিমিত্তে কোমলাঙ্গের নৃত্যাঞ্জলি অতীত যুগের মন্দিরকেন্দ্রিক নৃত্যেরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফলে বিশেষ এই দেহ-শৈলীর মূলে পূর্বযুগের মন্দিরকেন্দ্রিক অথবা দেবতার উদ্দেশে প্রদর্শিত নৃত্যের দেয়ালচিত্রে অথবা গুহাচিত্রে অঙ্কিত টরসো ব্যবহারের ভঙ্গির সাথে *জ্যা নৃত্যে* ব্যবহৃত টরসোর সাদৃশ্য বিবেচনায় এর প্রাচীনত্বের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায়। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *জ্যা* নাট্যের অনেকাংশ জুড়েই রয়েছে ভগবান বুদ্ধের সন্তুষ্টি কামনার্থে ধর্মীয় বিষয়ের প্রাধান্য– "বার্মিজ সংস্কৃতিপুষ্ট বান্দরবানের মারমা নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ জ্যা পালা বুদ্ধ জাতকের গল্প বা কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বুদ্ধজাতকের বাইরেও জ্যা পালার কাহিনী কল্পিত হয়ে থাকে। তবে তার মধ্যে বুদ্ধের কৃপাধন্য চরিত্র কিংবা বুদ্ধজীবনাদর্শের প্রাধান্যই সমধিক।"[১০৫] অন্যদিকে ড. কপিলা বাৎসায়ন বহু বিচিত্র ভারতীয় নৃত্যকলার রীতি ও আঙ্গিকের উৎস অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন ইতিহাসের দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রে আর ভাস্কর্য-দেহের প্রতিটি ভাঁজ ও ভঙ্গিমায়। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব দুইশত বছর থেকে দুইশত খ্রিষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে বুদ্ধের মহা-নিদর্শন অমরাবতী 'স্তূপ'-এ প্রাপ্ত ভাস্কর্য ও চিত্রে অঙ্কিত নৃত্য-দেহের ভঙ্গি ও ভাষা বিশ্লেষণ সূত্রে অনুমান করেন যে, সেখানে একটি বৃহৎ সংখ্যক শিল্পী-সংঘ সম্মিলিত বা দলীয় নৃত্য প্রদর্শন করতেন। ভগবান বুদ্ধের প্রতি নিবেদিত ঐ সকল ভক্তিমূলক দলীয় নৃত্যে শিল্পীদের দেহের ভাষায় উদ্ভাসিত হতো *হালকা বক্র হাঁটু*, বর্ধিত পদ সঞ্চালন এবং *টরসোর* কোমল ব্যবহার–

> Partically every sculptural school and painting style reverberates with the sound of music and the rhythm of dance. The *Nati* Pataliputra of Mauryan sculputure is a petite, young dancer, the apsaras and the court dancers of Bharhut and Sanchi are professional artistes. Their poses are stylized and their dance is highly patterned. Alongside are scenes of collective dancing, particularly on the western gateway of Sanchi where a group of persons in boots is seen singing and dancing. The tradition continues in Sunga and Kushan art but finds its finest flowering in the sculptural schools of Amaravati and Nagarjunkonda. Here we have many more scenes of solo and collective dances. There is a beautiful plaque in the Amaravati stupa, where (in the context of the adoration of the Buddha's relics), a large number of men are

১০৫ আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ২০০৮, পৃ. ৩০৩

> shown dancing. This is obviously a devotional dance of men alone; the bent knees, the extended legs, and soft movement of the torso speak eloquently of single-minded dedication.[১০৬]

সুতরাং একদিকে *জ্যা-নৃত্যে* দেহের শৈলী রচনায় *টরসোর* ও *বক্র হাঁটুর* সমন্বিত ব্যবহার, অপরদিকে *জ্যা* আখ্যানে বুদ্ধের ভক্তিমূলক উপস্থিতি আর ইতিহাসের গহিনে পাওয়া ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে বুদ্ধের প্রতি নিবেদিত ভক্তিমূলক নৃত্যে *টরসোর* সাথে *বক্র হাঁটুর* শৈলীবদ্ধ চিত্রের আবিষ্কার, প্রভৃতি উপসর্গের বিচারে মারমা জাতিতাত্ত্বিক *জ্যা-নৃত্যে* প্রাচীনত্বের সূত্র অনুমান করা অসঙ্গত নয় বলে মনে করি।

'আকস্মিকতা' (Suddenness) তৈরি করা এই নাচের আরেকটি আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য। *জ্যা* নাচের প্রতিটি একক অংশের (দলগত এবং দ্বৈত উভয় নাচের ক্ষেত্রে) শুরু হয় নির্দিষ্ট একটি লয়ে (tempo) এবং এই লয়ের সাথেই ঘটতে থাকে নাচের স্বাভাবিক অগ্রগতি। নৃত্যের এই স্বাভাবিক ধারায় বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় লয় ও ছন্দে সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়ে, পরিবর্তিত দ্রুত লয়ের সাথে শরীর ছন্দে ভিন্ন কিছু শৈলী/ভঙ্গি বা মুভমেন্ট যুক্ত করে তৈরি করা হয় এই 'আকস্মিকতা'। এক্ষেত্রে শরীর ছন্দে দুটি ভঙ্গির সর্বাধিক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। একটি হচ্ছে 'ঘূর্ণন', *বক্র হাঁটুকে* শরীরের অন্যান্য অংশ– হস্ত, পদ ও *টরসোর* সাথে সমন্বয় করে সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে আনা হয়। তবে এই ঘূর্ণন দ্রুতগতিতে ক্রমাগত বা একটানা নয়, নাচের প্রচলিত ভাষায় যাকে 'চক্কর' বলা হয় সেটি নয়। এই ঘূর্ণন তালের মাত্রা বা বিট অনুসরণ করে পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে ক্রমানুসারে সম্পাদিত হয়। এবং অপরটি হচ্ছে নৃত্যে *হালকা বক্র হাঁটুতে* দাঁড়ানো অবস্থান থেকে দুই পায়ের পাতার ওপর দ্রুত 'পতন' (বসে পড়া) এবং দ্রুতই আবার বিশেষ ভঙ্গিতে উঠে আসার ভঙ্গি। উঠে আসার সময়ে এক পায়ের *হালকা বক্র হাঁটুর* ওপর শরীরের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রেখেই অপর পা শূন্যে স্থির অবস্থায় একটি আবর্তন শেষ করা হয় এবং পর পর কয়েকবার বসা/পতন এবং ওঠার মাধ্যমে ভঙ্গিটি সম্পাদন করা হয়। দ্রুত 'পতনের' ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে পায়ের পাতার সম্মুখ অংশ 'টো'এর ব্যবহার না করে হাঁটুভেঙে দুই পায়ের পাতা ব্যবহার করা হয়। এভাবে 'লীলা চঞ্চলা' কোমল নৃত্যের চলমানতায় বিশেষ ভঙ্গি সহযোগে 'আকস্মিকতা' তৈরি করা হয়। আর এজন্য একটি নির্দিষ্ট লয়ে (ধীর বা মধ্যম) কোমল ছন্দের মনোহর গতি-সঞ্চালন মাঝে বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় লয়ের 'আকস্মিক' পরিবর্তন অনুবর্তী 'ঘূর্ণন' অথবা দ্রুত 'পতন' ভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে এই 'আকস্মিকতা' সম্পাদন করা হয়।

নৃত্যে দাঁড়ানো অবস্থান থেকে বসা (সিটিং), অর্ধ-বসা (হাফ সিটিং) প্রভৃতি মুভমেন্ট সাধারণত 'টো' অথবা পায়ের পাতার উপর ভর করে সম্পাদিত হয়ে থাকে। যদিও এই কৌশলটির ব্যবহার নতুন কিছু নয়, ধ্রুপদী

---

১০৬ Kapila Vatsyayan, *Traditions of Indian Folk Dance,* Clarion Books, New Delhi, 1976, P. 8

নৃত্য বিশেষত ভরতনাট্যমে *আরামান্ডির* ব্যবহার, শরীর চর্চা বা অনুশীলনে High & low squatting position-এর ব্যবহার, তাছাড়া দেশজ নাট্যের কোনো কোনো রীতির বিশেষ করে কুষ্টিয়ার *পদ্মারনাচন*-এর নৃত্যাংশেও তাল-ছন্দের গতিতে উল্লম্ফনের সাথে দ্রুত বসে পড়ার ভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ‘টো’ এর ব্যবহারটাই সর্বাধিক প্রচলিত। কেননা ‘টো’ ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই শরীরের ভারসাম্য এবং ভরকেন্দ্রের সুস্থিতি নিশ্চিত করে দেহের ভাষা ও বিন্যাসে নানান সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও প্রসারিত করা সম্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পায়ের পাতার উপর দ্রুত বসে পড়া এবং উঠে আসার কৌশলটি এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত নয় এবং তা অধিক ঝুঁকিপূর্ণও বটে। উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ ‘টো’ অথবা ‘পায়ের পাতার’ সাথে হাঁটু এবং হাঁটুর উপরের অংশ রানের পেশির দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রিত সমন্বয়ের কারণে শরীরের ভারসাম্য সুরক্ষা করা সম্ভব হয়। তবে এই দুটি পন্থার মধ্যে *জ্যা-নৃত্যে* দ্রুত ‘পতন’ এবং ওঠার কৌশল সম্পাদনে দুই হাঁটু ভেঙে সম্পূর্ণ পাতার ওপর ভর রেখে বসে করতে হয় বিধায় তা ভারসাম্যকে অধিকতর চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়, ফলে পুরো শরীরের ভারসাম্যের সুরক্ষাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ একটি নির্দিষ্ট গতিতে শরীরকে দুই পায়ের পাতার ওপর বসিয়ে পুনরায় উঠিয়ে আনার সময়ে মাথা, হাত এবং টরসো যদি চলমান গতি এবং ভরকেন্দ্রের মধ্যে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হয়, তবে ভরকেন্দ্রটি তার মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে কিছুটা পিছনের দিকে হেলে গিয়ে পুরো শরীরকেই ভূমিতে ফেলে দিতে পারে। অধিকন্তু দ্রুত পতন থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে শরীরকে স্থির রাখার বিষয়টি আরও ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা এ সময়ে শিল্পীকে এক পায়ের *হালকা বক্র হাঁটুর* ওপর দাঁড়িয়ে অপর পা শূন্য অবস্থানে স্থির রেখেই পর্যায়ক্রমে পায়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও কয়েকবার এই ‘পতন’ ভঙ্গিটি সম্পাদন করতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ‘হালকা বক্র হাঁটুর ব্যবহার *জ্যা-নৃত্যের* একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এটি মণিপুরী নাচের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। মূলত *জ্যা* নাচের শিল্পী দুই হাঁটু সার্বক্ষণিকভাবে কিছুটা বাঁকা (bent) অবস্থানে স্থির রেখেই নৃত্যের নানান ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে থাকে। উপরন্তু ‘বক্র হাঁটুতে’ স্থির থেকে শরীর সঞ্চালন করা যেকোনো প্রকার নৃত্য অথবা শরীর অনুশীলনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর একটি কৌশল। কেননা তা পায়ের সাথে শরীরের সমন্বিত সঞ্চালন সক্ষমতা এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। তবে *জ্যা-নৃত্যের* ‘হালকা বক্র হাঁটু’র ব্যবহারকে শুধুমাত্র কৌশল হিসেবে না দেখে বরং ভূমির সাথে জাতিগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কসূত্রেও দেখতে চেয়েছেন কেউ কেউ। নৃত্যশিল্পী অমিত চৌধুরী ‘হালকা বক্র হাঁটু’ ব্যবহারের এই বিষয়টিকে তাই কেবল একটি কৌশল হিসেবে দেখতে চান না, তাঁর ব্যাখ্যায়– “বেন্ড’ (knee bent) হওয়া বা থাকার একটি ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে এরকম যে, শিল্পীর সাথে ভূমির সম্পর্ক নির্মাণ করা। অর্থাৎ ‘শিল্পী যে মাটির সাথে আঁকড়ে আছে এটা অনেক গভীরভাবে দর্শক উপলব্ধি করতে পারে বা বুঝতে পারে। ‘বেন্ড’ শরীরের মুভমেন্ট এবং গতির পরিধি ও সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়, শিল্পী

আরও অধিক কেন্দ্রস্থিত এবং মনোযোগী হতে পারে যা একই সাথে দর্শকের মনস্থির রাখতেও সহায়তা করে।"[১০৭]

সুতরাং 'বক্র হাঁটু' এমন একটি পজিশন যা ভরকেন্দ্রের সাথে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ (কোমর থেকে উপরে) এবং ভূমিস্থিত নিম্নাঙ্গের (কোমর থেকে নিচে) মধ্যে বিশেষ সমন্বয়–সম্পর্ক তৈরি করে, পরিণামে যা শরীরকে ভূমির সাথে সুদৃঢ়-স্থিত করে রাখে। তাছাড়া সামান্য বা হালকা 'বক্র হাঁটু'র পজিশনটি দেহের মেরুদণ্ডকে উল্লম্ব সরলরেখায় প্রতিস্থাপনেও সহায়তা করে। হাঁটু সামান্য ভাঙার ফলে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ এবং নিম্নাঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত স্বাভাবিক ভরকেন্দ্রটি অস্থির (unstable) হয়ে ওঠে, ফলে তা শরীরের ভারসাম্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। ভারসাম্যের এই অস্থির অবস্থাকে মোকাবিলার প্রথম কাজটিই হলো 'হিপ' বা কোমরের পিছনের নিম্নাংশকে সামনের দিকে অর্থাৎ পিছন থেকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ভরকেন্দ্রকে স্থির করা। এটি ভরকেন্দ্রকে স্থির করার পাশাপাশি মেরুদণ্ডের দৈনন্দিন বা স্বাভাবিক বক্র আকৃতির অবস্থান থেকে উল্লম্ব ও সরলরৈখিক পজিশনে প্রতিস্থাপনেও সহায়তা করে।

'হালকা বক্র হাঁটু' এবং 'টরসোর' সাথে হস্তমুদ্রার সমন্বিত সঞ্চালন/মুভমেন্ট-এর ফলে সৃষ্ট নৃত্যের সামগ্রিক আঙ্গিক বা শরীরটিকে যদি *জ্যা*-এর স্বকীয়তা বিবেচনা করা হয়, তবে কোমল শৌর্য বা 'লাস্য' হচ্ছে এই নাচের অন্তর বা প্রাণ। কেননা *জাইত আক্কা* শক্তিতে সমর্পণ বা শক্তিকে ভজনার জন্য নয়, বরং বিপরীতক্রমে, মং ক্য শুয়োনু নেভীর ভাষায় এ হচ্ছে 'লীলা চঞ্চলা' নৃত্য, যা মূলত 'ভক্তি' নিবেদনার্থে প্রদর্শিত হয়। আলোচনার শুরুতেই লক্ষ করা গেছে যে, বৌদ্ধ জাতক অথবা বুদ্ধের জীবন, কর্ম ও দর্শনের নানান দিক হচ্ছে *জ্যা*-এর প্রধান উপজীব্য। সে কারণে, *জ্যা* পরিবেশনার সার্বিক অভিব্যক্তির বিষয়টি সমর্পণ, নিবেদন অথবা ভক্তিমূলক হওয়াটাই সঙ্গত– 'লীলা চঞ্চলা' এ নৃত্যে 'মধুর, বলিষ্ঠ ও সবল' প্রভৃতি ভঙ্গি যার প্রকাশ এবং 'লাস্য' যার অন্তর্নিহিত শক্তি।

ভারতীয় উপমহাদেশের নৃত্য ও নাট্য ঐতিহ্যে কুশীলবের মনো-দৈহিক উপস্থিতি এবং সকল প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন এবং ভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে দুই ধরনের শক্তি/শৌর্য (energy) প্রয়োগের কথা বলা হয়– তাণ্ডব (vigorous) এবং লাস্য (soft)।[১০৮] এরা এক দেহে শক্তির দুইরূপ– *তাণ্ডব* ও *লাস্য*, এরা লিঙ্গ-ভেদ বর্জিত, এক দেহে (নারী বা পুরুষ) *লাস্য* ও *তাণ্ডব* রূপে সক্রিয় এবং সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। দেহে শৌর্যের অবস্থান

১০৭ অমিত চৌধুরী, সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২/৭/২০১৫, নাটমণ্ডল, থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০৮ In the Indian tradition as well, one works on energy within the energy polarity and not in relation to the correspondence between the character and the performer's sex, Indian dance styles are in fact divided into two major categories, *lasya* (soft) and *tandava* (vigorous), based on the way these styles are executed in movements, irrespective of whether the performer is male or female.
Eugenio Barba & Nicola Savarese, *A Dictionary of Theatre Anthropology: The secret art of the performer,* Routledge, London, 1991 p.84

যেন এক প্রবহমান প্রমত্ত নদীর দুই তীরের মতো– যার এক তীর জলের প্রবল স্রোতে ভাঙ্গনের *তাণ্ডবে* উত্তাল আর অপর তীর জলোস্রোতের *কোমল* (লাস্য) ধারায় চঞ্চল। এ দুই-রূপ শক্তিতো ভাব ও শক্তির সাধনা এবং তন্ত্রেরও তাপস্য বিষয়– একই দেহে পুরুষ-প্রকৃতি, রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও রূপকল্পনা, শিবের 'অর্দ্ধনারীশ্বর' রূপের প্রকাশ প্রকারান্তরে 'নারী ও পুরুষের সহাবস্থানেরই প্রকাশ। 'অর্দ্ধনারীশ্বর' শিবের এক দেহে শক্তির দুই-রূপের (তাণ্ডব এবং লাস্যে) বাহ্যিক অবয়ব বর্ণনাতে বিষয়টি এভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে–

> একদিকে সোনার শাড়ী ঝলমল করিতেছে, কর্ণে মণিকুণ্ডল দুলিতেছে, বেণীবদ্ধ কেশের লহরী স্বর্ণসূত্র ও চম্পকদাম সজ্জিত, গলে সপ্ত লহরীতে মুক্তার হার দুলিতেছে, শিবের একার্দ্ধে মণিখচিত মুকুট ; অপরার্দ্ধে পরণে বাঘছাল, অঙ্গ ভস্মমাখা, কণ্ঠে নর-কপালের মালা, কর্ণে বিষাক্ত ধুস্তূর পুষ্প, শিরে জটাজূট ঘিরিয়া সর্প ফোঁস ফোঁস করিতেছে এবং ভয়ঙ্করী গঙ্গার গর্জ্জন জটার লহরে লহরে শোনা যাইতেছে। এই অর্দ্ধগৃহস্থ, অর্দ্ধতাপস মূর্ত্তির নাম অর্দ্ধনারীশ্বর। অর্দ্ধ নর, অর্দ্ধ নারী, গার্হস্থ্যপ্রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে তান্ত্রিক তাপসের অঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।[১০৯]

এক্ষেত্রে অভিনেতা/কুশীলব/শিল্পী বস্তুত যা করেন, তা হলো সুপ্ত অবস্থায় থাকা এই শৌর্যকে (তাণ্ডব ও লাস্য) রূপান্তরিত করেন নানা ভঙ্গিমায় নানা অবয়বে, অথবা *এ ডিক্‌শনারি অব থিয়েটার অ্যানথ্রোপোলজি*র ব্যাখ্যা অনুসারে বলা যায় যে– we model our energy।[১১০] ফলে ব্যক্তির লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্যজাত শরীরকে নানান ভঙ্গিমায় চরিত্রায়ণে বা প্রতীকীকায়নের জন্য ব্যক্তির শৌর্য/এনার্জি/শক্তির দুই রূপ– *তাণ্ডব* এবং *লাস্য-ই* হচ্ছে সেই অন্তর্নিহিত শৌর্যের দুই উৎস-ধারা, যা অভিনেতা/কুশীলব সু-দক্ষতায় বিন্যাস করে নির্মাণ করে মঞ্চ/আসরের দেহ-অঙ্গের পটচিত্র।

জ্যা নৃত্যে 'হালকা বক্র হাঁটু', 'টরসো' এবং হস্তমুদ্রার সমন্বিত সঞ্চালনে সৃষ্ট যে 'লীলা চঞ্চলা' মধুর, কোমল ও বলিষ্ঠ দেহশৈলী প্রদর্শিত হয় অথবা সার্বিকভাবে নৃত্যের যে আঙ্গিক বা অবয়বটি নির্মিত হয়– যার পর্যবেক্ষণে ধ্রুপদী নৃত্যের নিকটাবর্তী অনুভূতি জাগ্রত করে– এর অন্তর্নিহিত শক্তির স্রোত হচ্ছে *লাস্য* শৌর্যের সক্রিয় ও ক্রমাগত প্রবহমানতা। যদিও এই নৃত্যে 'সবল' ও 'বলিষ্ঠ' দেহভঙ্গির উপস্থিতি বিদ্যমান, তথাপিও তা *তাণ্ডব* শৌর্যের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং একে বলা যায় 'লাস্যময়-তাণ্ডব'। কেননা *রাজকুমারী* এবং *রাজকুমারের* এই নৃত্যে দুটি পৃথক লিঙ্গ– 'পুরুষ' এবং 'নারী' চরিত্রের পৃথক উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও উভয়ের নৃত্যশৈলীতে বা দেহ-ক্যানভাসে চরিত্রের স্ব স্ব লিঙ্গানুগ বৈশিষ্ট্য (পুরুষত্ব এবং নারীত্ব) চরিত্রায়ণ/প্রতীকায়নের

---

১০৯ দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ৫৬৯

১১০ Peformer's energy is a readily identifiable quality: it is the performers nervous and muscular power, the mere fact that this power exists is not particularly interesting, since it exists, by definition, in any living body. What is interesting is the way this powr is moulded in a very special context: the theatre. At each moment of our lives, consciously or otherwise, we model our energy. প্রাগুক্ত, Eugenio Barba & Nicola Savarese, *A Dictionary of Theatre Anthropology* , পৃ. ৭৪

বিপরীতে বিশেষ একটি ভাব-শরীর নির্মাণের প্রবণতা সক্রিয় থাকে– যা সদাই নিবেদনমূলক এবং ভক্তিতে কোমল। ফলে এই নৃত্যে রাজকুমার– 'পুরুষ' এবং রাজকুমারী– 'নারী' কেউ-ই তাদের পারস্পরিক অথবা পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের রূপায়ণে *তাণ্ডবে* উন্মত্ত হয় না, বরং যা কিছু 'সবল' ও 'বলিষ্ঠ' দেহভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় তাও *লাস্যের* কোমলতায় 'চঞ্চলা' হয়ে ওঠে। *জ্যা নৃত্যে লাস্যের* এইরূপ প্রয়োগ-বিন্যাস বিবেচনায় রেখে একে *লাস্যময়-তাণ্ডব* নামে আখ্যায়িত করা যায় (মণিপুরী নৃত্যে শৌর্যের এরূপ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। অভিনেতার মনোদৈহিক ছান্দিক ও গতিময় সক্ষমতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা অর্জনে *লাস্যময়-তাণ্ডব* বিশেষ কার্যকর একটি অনুশীলন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা এখানে পরস্পর বিপরীত দুটি শক্তি– *লাস্য* ও *তাণ্ডব*-এর সমন্বিত স্রোত দেহের নানাবিধ ভঙ্গি ও শৈলীর সঞ্চালনে সক্রিয় হয়ে ওঠে, একইসাথে শক্তির প্রবহমান স্রোতের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণে বহু-বিচিত্র বিন্যাসের চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। তাছাড়া, *লাস্যময়-তাণ্ডবের* শৌর্য-প্রবাহ দেহ-মনে বিশেষ ভাব, ভক্তি বা নিবেদনের অভিজ্ঞতা প্রদানেও কার্যকর হতে সক্ষম বলে মনে করি।

জ্যা নৃত্যের বিশদ এই বিশ্লেষণসূত্রে অতঃপর– 'হালাকা বক্র হাঁটু' ও 'টরসো' এবং 'লাস্যময়-তাণ্ডব' এই তিনটি বৈশিষ্ট্যর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। কেননা এই তিনটি বৈশিষ্ট্য অভিনেতার মনোদৈহিক প্রস্তুতিতে বিশেষ ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম বলে মনে করি। 'হালকা বক্র হাঁটুর' ব্যবহারের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি কুশীলব/অভিনেতার সাথে ভূমির শিকড় প্রোথিত সম্পর্ক স্থাপন এবং মেরুদণ্ডের সরলরৈখিক দৃঢ়তার অভিজ্ঞতা প্রদানের অত্যন্ত কার্যকর একটি চর্চা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া এই প্রক্রিয়াটি অভিনেতা/কুশীলবের মঞ্চ উপস্থিতিকে শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় করে তুলতেও সক্ষম। যদিও নৃত্য ও নাট্যের দুনিয়ায় 'বক্র হাঁটুর' ব্যবহার নতুন নয় বরং তা বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। চাইনিজ অপেরা, জাপানি নো, কাবুকি থিয়েটারসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির নৃত্য ও নাট্যে এই কৌশলটির ব্যবহার দেখা যায়। তথাপিও *জ্যা-নৃত্যের* বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতায় এটিকে অভিনেতার অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'হালকা বক্র হাঁটু' পজিশনটিকে গ্রহণ করার আরও একটি কারণ হতে পারে এই যে, বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক গ্রুপ থিয়েটার/শৌখিন/পেশাদারি নাট্যচর্চায় অভিনেতার প্রস্তুতিতে এই পদ্ধটির ব্যবহার বহুল প্রচলিত নয়। অথচ ভূমি/আসর/মঞ্চের সাথে কুশীলবের প্রথম সম্পর্কটিই হচ্ছে 'দাঁড়ানো', অধিক নির্দিষ্ট করে বলা যায় 'মনো-দৈহিক' সমগ্রতায় সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে 'দাঁড়ানো'। এই অভিজ্ঞতা অর্জনে 'হালকা বক্র হাঁটু' ব্যবহারের কৌশলকে অভিনেতার শারীরিক প্রস্তুতির একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে 'হালকা বক্র হাঁটু', 'টরসো' এবং 'লাস্যময়-তাণ্ডব' এই তিনটিকে পৃথক বা স্বতন্ত্র অনুশীলন উপাদান হিসেবে না দেখে সমন্বিত চর্চায় গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা দেহের *টরসো* অঙ্গের সাথে *হালকা বক্র হাঁটুর* অনুবর্তী অথবা বৈপরীত্যমূলক সঞ্চালনের সাথে *লাস্য* এবং *লাস্যময়-তাণ্ডব*

শৌর্যের বিচিত্র ব্যবহার অভিনেতার মনোদৈহিক অনুশীলন অভিজ্ঞতায় দেহরূপ শিল্প-ভাণ্ডারের অনেক অজানাকে জানার সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হবে বলে মনে করি। বিশ্লেষণের এই সকল দিক বিবেচনায় *জ্যা* নৃত্যে ব্যবহৃত *লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডব* শৌর্যের প্রণোদনায় *হালকা বক্র হাঁটু* ও *টরসো* অঙ্গের সমন্বিত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে অভিনেতা প্রস্তুতির কার্যকর অনুশীল উপাদান অন্বেষণে পরবর্তী ৪র্থ অধ্যায়ের আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরা হলো।

১.২.৫ মারমা তান্ত্রিক ধ্যান : পরিবেশনা ও বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন

বিশ্লেষণের শুরুতে আলোচ্য শিরোনামের 'ধ্যান' শব্দটির নির্বাচন প্রসঙ্গ এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন মনে করি। বর্তমান আলোচনায় 'ধ্যান' শব্দটিকে absorbing religious meditation অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। প্রায় সকল সমাজেই 'ধ্যান' শব্দটি আভিধানিক অর্থের পাশাপাশি প্রচলিত, অ-প্রচলিত নানান অর্থ-ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হয়। পরিবেশনা অর্থে 'ধ্যান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, এমনকি দৈনন্দিন বিশেষ কোনো কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনে 'কর্মে ধ্যানস্থ' হওয়া অর্থেও 'ধ্যান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই বর্তমান এ আলোচনায় 'ধ্যানের' যে অর্থ-ব্যঞ্জনা কেবল 'কর্ম'– বিশেষ কোনো লক্ষ্য সম্পাাদনে গভীর ও নিবিষ্ট মনোযোগকে নির্দেশ করে, সেই অর্থে শব্দটি নির্বাচন করা হয়েছে। এজন্যে বক্ষ্যমাণ আলোচনায় 'ধ্যান' শব্দটিকে পরিবেশনার একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই 'ধ্যান' বস্তুত নৈর্ব্যক্তিক কোনো শক্তি/ক্ষমতা/দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয়ে 'সম্পাদন' করা হয়। এটি পরিবেশনামূলক, কেননা বর্তমান আলোচনায় 'ধ্যানকে' দেখা হচ্ছে করণীয় কৃত্য হিসেবে, যে কৃত্যের মাধ্যমে জাদু/বাণ/বশ করা অথবা সম্মোহনী ক্ষমতাবলে অথবা অজানা কোনো শক্তি– ভূত/প্রেত/দুষ্ট আত্মার হাত থেকে ব্যক্তি বা সমষ্টি নিজেকে/দের শান্ত করা, প্রশমন বা রক্ষা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং পুরো বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে 'সম্পাদিত' বা 'পরিবেশিত', আর এই উদ্দেশ্য সাধনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হচ্ছে 'নিবিষ্ট বা গভীর মনোযোগের সাথে সাধনা করা। তাই এ আলোচনায় 'ধ্যান' শব্দটিকে *পরিবেশনার* একটি উপায় বা পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদনুসারে এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের *জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়* শিরোনামের গূঢ়না আলোচনাতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মারমা জাতি-সংস্কৃতির সামগ্রিক গড়নের যে রূপটি আজ অবধি বহমান তার মূলে রয়েছে জীবন ও প্রকৃতির মাঝে অভিন্ন শক্তির আবিষ্কার অথবা এর অস্তিত্বকে বন্দনা করা অথবা সর্বপ্রাণবাদী ধর্মবিশ্বাস, তান্ত্রিক আচার-আচরণ এবং বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের নানান মত ও পথের এক অপূর্ব সমন্বয়। এক্ষেত্রে মারমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্যের সামগ্রিক আচরণের অধিকাংশই পরিবেশনাধর্মী (নাট্যমূলক) হওয়ার তত্ত্ব বা বীজটিও সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন তত্ত্বে নির্দেশিত রয়েছে, যা পরে তান্ত্রিক আচরণের সংস্পর্শে এসে আনুষ্ঠানিক ও পরিবেশনাধর্মী হয়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে। অপরদিকে যখন কোনো *জন* বা *গোষ্ঠী* শরীর ও মনন কৃত্যের সামগ্রিকতায় যুক্ত হয়, এর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন সেই *জন/গোষ্ঠী*র ভালো থাকা বা না থাকা, সমর্পণ বা প্রত্যাখ্যান, প্রতিরোধ বা প্রতিযোগে কৃত্যের পালনীয় এবং করণীয় আচার কিছু না কিছু তো

মানে তৈরি করেই। কিন্তু কী সেই মানে? এ প্রশ্নের একটি সাধারণ উত্তর হতে পারে ব্যক্তি বা সমাজের 'আরোগ্যকরণ' অথবা 'প্রশান্তকরণ'। উল্লেখ্য যে, এই লক্ষণটিও কৃত্যাচারের সামগ্রিক রীতি-নীতি, পদ্ধতি-প্রক্রিয়াকে পরিবেশনামূলক (নাট্যমূলক) করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। কেন আরোগ্যকরণ! কারণ প্রাচীনযুগ থেকে তান্ত্রিক আচার, কৃত্য অথবা কৃত্যনাট্যের সামগ্রিক প্রক্রিয়া একদিকে যেমন মানুষ এবং অতিলৌকিক শক্তি– দেব/দেবী অথবা অন্য কোনো অপার্থিব শক্তি বা ক্ষমতার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে, অপরদিকে তা আবার মানব জীবনের গূঢ় ও মৌলিক সকল বিষয়কেও জড়িয়ে রেখেছে এর আষ্টেপৃষ্ঠে–

> Primitive peoples evolved rituals to express the fundamentals of human life, following the cycles that are intrinsic within life forms, in order to bring about resolution and thus healing – this may be a healing of the tribe, healing of a family healing of a disease or resolving of threats to the tribe's survival.[১১১]

ফলে তান্ত্রিক কৃত্যাচারের বন্ধনে আবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠীতে সচল 'আরোগ্যকরণ' ধারণা থেকে 'আধ্যাত্মিকতাকে' বিচ্ছিন্ন করা বস্তুত অসম্ভব– "In tribal societies there is no distinction between healing (medicine) and spirituality. All healing is spiritual healing because of the recognition of the mind/body/spirit connection, therefore healing in the spirit effects healing in the body."[১১২] সুতরাং কৃত্যের সামগ্রিকতায় আবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠীর তাবৎ সাধন প্রক্রিয়াটি 'শরীর', 'মন' ও 'আধ্যাত্মিক' চিন্তা ও বিশ্বাসের মেলবন্ধনে আরও অধিক পরিবেশনামূলক হয়ে উঠবে এটাই তো স্বাভাবিক।

এইরূপ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় *তান্ত্রিক ওঝা ও ধ্যান পরিবেশনা* শীর্ষক এ আলোচনায় 'তান্ত্রিক চিকিৎসা' এবং 'ধ্যান' পরিবেশনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ-পূর্বে মারমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্য সর্বব্যাপী আনুষ্ঠানিক ও পরিবেশনাধর্মী হয়ে ওঠার গূঢ় রহস্য অন্বেষণ করা যেতে পারে। এই অন্বেষণের সূত্রেই খুঁজে দেখা যেতে পারে যে, কী কী নাট্যিক গুণ মারমা জাতিতাত্ত্বিক তান্ত্রিক ধ্যান পরিবেশনায় (মাঠ পর্যবেক্ষণকৃত) নিহিত রয়েছে যা অভিনেতা প্রস্তুতির উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

ধর্মের বিচারে মারমাগণ বৌদ্ধধর্ম অনুসারী, কিন্তু তান্ত্রিক বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন এদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক্ষেত্রে তান্ত্রিকতার সাথে বৌদ্ধ ধর্মের গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টিকে

---

১১১ Claire Schrader (edited by), James Roose-Evans (foreword by), *Ritual Theatre; The Power of Dramatic Ritual in Personal Development Groups and Clinical Practice,* Jessica Kingsley Publishers, London, 2012, P. 33

১১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

বিশেষভাবে আলোকপাত করা যায়। এমনও বলা হয় যে, “[এই] তান্ত্রিকতাই বৌদ্ধধর্মের অন্তিম অবস্থা।”[১১৩] তবে তান্ত্রিকতার সাথে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র থাকলেও এর অনুপ্রবেশ/চর্চা কোনো বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা অথবা বিশেষ সময়ে ঘটেছে এমনটা বলা যাবে না কিছুতেই। কেননা “তন্ত্র বস্তুত কোনো দর্শন নয়, কতকগুলি আচারের সমষ্টি। সেই তন্ত্রাচার আদিতে হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো ধর্মের সঙ্গেই যুক্ত ছিল না, হিন্দু-বৌদ্ধাদি ধর্মের সঙ্গে তার যোগ পরবর্তীকালের।”[১১৪] প্রকৃতির দান বা আঘাতের মূলে থাকা অজানা রহস্যের প্রতি অথবা অতিপ্রাকৃত শক্তির নিয়ন্ত্রণে “মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস, গুহ্যশক্তিকে জাগরিত করার কোনো বিশেষ শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারণ ভারতীয় সভ্যতার সাথে অতীত কাল থেকেই মিশে আছে এবং সে বিশ্বাসের প্রতিফলনই হলো তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম।”[১১৫] সুতরাং বিষয়টিকে এভাবে বলা যায়– মারমা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের স্বকীয় জীবন-চর্যায় তান্ত্রিক আচারের যে সকল আনুষ্ঠানিকতা আজও বর্তমান তা কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম বা শাস্ত্রীয় ধর্ম, দর্শন অথবা ব্যক্তির উদ্ভাবিত নয়–

> Tantricism is neither Buddhist nor Hindu in origin: it seems to be a religious under current, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India. With these practices and Yogic processes, which characterize tantricism as a whole, different philosophical, or rather, theological systems got closely associated in defferent times, and the association of the practices with the fundamental ideas of Mahayana Buddhism will explain the origin and development of Tantric Buddhism.[১১৬]

অপরদিকে তান্ত্রিকতায় প্রভাবিত হলেও বৌদ্ধ ধর্মায়তন মূলে প্রজ্ঞা/সংজ্ঞা/জ্ঞান-সাধনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। বৌদ্ধ দর্শন মতে বুদ্ধত্ব লাভ করে ‘পরিপূর্ণতা’ অর্জনেই মানুষ পেতে পারে ‘মহাসুখ’ বা ‘পরম মুক্তি’। মানুষই মানুষের মুক্তিদাতা, অর্থাৎ মানুষকে নিজেই নিজের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যদিও মুক্তি অর্জনের এই পথ (যান/বাহন) একটি নয়, আছে আরও অনেক, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সকল পথই স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে মানুষ তার দেহ/মন/আত্মাকে কেন্দ্র করে খুঁজেছে মহামুক্তি/নির্বাণের পথ। সম্ভবত দেহ-মন-আত্মার স্বরূপ ও কর্ম নির্ণয়ার্থে অথবা এর গহিন রহস্য উদ্ঘাটনের কোনো সুড়ঙ্গ পথ ধরেই তান্ত্রিক আচারের সাথে বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান-সাধনার মেলবন্ধন ঘটে থাকবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা তান্ত্রিকদের মতে

---

১১৩ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষা: বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩

১১৪ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাঃ), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৮৭ সন, পৃ. ১৫

১১৫ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষা: বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩

১১৬ S. B. Dasgupta, *Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature,* Calcutta 1946, p. 27

“সত্য বিরাজিত [আমাদের] দেহের অভ্যন্তরে। এই দেহ যেন বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি। বাইরের জগতের চন্দ্র-সূর্য, সুমেরু-কুমেরু, গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি তত্ত্ব তান্ত্রিকরা দেহের মধ্যে দেখতে পান। দেহ তাদের কাছে ব্রহ্মাণ্ড।”[১১৭] তান্ত্রিকদের মূল কথাটিই হচ্ছে–

> এই দেহই সত্যের মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন। ইহাকেই যন্ত্র করিয়া ইহার ভিরতেরই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ইহার ভিতরেই শিব-শক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। নিজের ভিতরে এই শিব শক্তির মিলনের দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়াও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সাধককে তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে দেহভাণ্ডে, ইহাই তান্ত্রিক সাধানার প্রথম অঙ্গ।[১১৮]

কেবল তান্ত্রিকদের কথায় নয়, এরূপ ধারণা বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন-তত্ত্বেও প্রতিধ্বনিত হয় যোগাচারগণের ভাষ্যে- “মনেই কামনা বাসনার জন্ম এবং মনেই তাদের লয়, মন স্বর্গগামীও হতে পারে অথবা নরকগামীও হতে পারে। [...] এটা সর্বদা আলয় অর্থাৎ স্রোতের ন্যায় পরিবর্তিত হচ্ছে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সাথে স্রোতের ধারাটি স্থির হয়ে যায়।”[১১৯] বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সর্বদা চঞ্চল, পরিবর্তনশীল, দুরন্ত স্রোতধারাকে (মন) নিবিষ্ট সাধনায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে স্থির করা সম্ভব। অর্থাৎ এখানে মনকে নিয়ন্ত্রণ বা স্থির করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবার, সহজযানের সহজ-সাধকগণের বিশ্বাস তো আরো দৃঢ় যে, বহির্জগৎ অথবা অন্য কোথাও নয়, ‘বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে’। তাছাড়া দেহের মধ্যে ‘আত্মার’ অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা অথবা ‘আত্মা’ চিরকালের চিরন্তন নাকি ক্ষণিক চৈতন্যের আলোক স্ফুলিঙ্গ এই তর্কতো বহুকালের। আর এই তর্কের ধারাবাহিকতায় বৌদ্ধ দর্শনে ‘আত্মা’র চিরন্তন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এর বিপরীতে এমন ‘সত্তার’ কথা বলা হয়েছে, যার অভ্যন্তরে কোনো চিরন্তনের অস্তিত্ব নয়, রয়েছে ‘অবিরাম এক চেতনার প্রবাহ’–

> বুদ্ধ সত্তার অভ্যন্তরে অবিরাম চেতনা প্রবাহ লক্ষ করেছেন। মানুষের মধ্যে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নানা রকমের অনুভূতি চিন্তা ও ইচ্ছা অহরহ আসা-যাওয়া করছে। সুতরাং প্রাণীর অভ্যন্তরে যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখা যায়– তা একটির পরে একটি অবিরাম গতিতে প্রাবহিত যা ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী। চেতনার এই অবিরাম প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব নেই। তবে বহমান নদীর

---

১১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১১৮ শশীভূষণ দাসগুপ্ত, *ভারতীয় সাধনার ঐক্য*, কলিকাতা, ১৩৫৮ সন, পৃ. ২০
১১৯ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০১, পৃ. ১১৪

স্রোতধারার ন্যায় অথবা অগ্নিশিখার ন্যায়, প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিক প্রবাহকে যদি কেউ 'আত্মা' বলতে চায়– তবে বলতে পারে।[১২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন বা তত্ত্ব এবং তান্ত্রিক আচারের মধ্যে গভীর আত্মীয়তার মূলে রয়েছে একটিই বিষয় সেটি হলো– 'দেহ' বা মানুষরূপী দেহ, মন/আত্মা/সত্তা প্রভৃতি– "[As with all] Tantric cults the body is the microcosm of the universe. The elements and features that make up the universe as well as the cycle of the life and death are represented in the body. The cycle of life and death is represented in the theory of the sun and the moon."[১২১] বলা যায় শক্তির সাধনা আর তন্ত্রের এই সাদৃশ্যতামূলক অভিজ্ঞতাই বৌদ্ধ দর্শন এবং তান্ত্রিকতার মেলবন্ধকে সম্পূর্ণ করে থাকবে। তবে বৌদ্ধ দর্শন মতে, 'সত্তা'/'আত্মার' অনিত্য-নিত্যের ধারাবাহিক খেলায় চেতনা প্রবাহের যে অস্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে তা পরিবর্তনশীল, প্রকৃতির নিয়মানুসারে এই প্রবহমানতাই চিরকালের অর্থাৎ দৃশ্যমান শাশ্বত- [that] everything in the universe is in a state of flux– constantly becoming– Buddhism, with its continuous transformation resulting from the instability of differernce and consequent emergence of innumerable schools, is an attempt to work out a way to *nirvana* by *ceasing* the process of becoming.[১২২] অর্থাৎ দেহ অভ্যন্তরে ক্ষণস্থায়ী মানসিক প্রক্রিয়াগুলো ক্রমাগত 'হওয়া' বা আবির্ভাব (জন্ম) এবং তিরোধানের (মৃত্যু) ধারাবাহিকতায় অথবা ক্রম-রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রবহমান। মূলত এখানেই নিহিত রয়েছে 'জন্মান্তরবাদ' তত্ত্বের রহস্য। কেননা 'জন্মান্তরবাদ' কেবল সরল অর্থে একটি নশ্বরদেহের মৃত্যু পরবর্তী নতুন আরেকটি দেহে আত্মার পুনর্জন্মকে নির্দেশ করে না। বরং তা প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়ার একটি অবস্থা থেকে নতুন আরেকটি মানসিক অবস্থায় আবির্ভাব বা জন্মের কথা বলা হয়েছে– "জন্মান্তর হলো এক চেতনা থেকে আর এক চেতনার সৃষ্টি, এক মানসিক প্রক্রিয়া থেকে অন্য এক মানসিক প্রক্রিয়ার জন্ম; এক জীবনের শেষে অন্য এক জীবনের উদ্ভব। বুদ্ধের মতে এ জগতের প্রতিটি জিনিস কার্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ।"[১২৩]

সুতরাং এক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, জগৎ পরিবর্তনশীল আর এই ধারায় কোনো 'বস্তু' নিরেট বা চিরন্তন নয় বরং সকল বস্তুই 'রূপান্তর' (transforms) প্রক্রিয়ার অধীনে এক একটি রূপ ধারণ করে মাত্র। তাই বস্তু

---

১২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১২১ David G. Cashin, *Nathist Folklore and Sufism in Bengal,* Editor, Firoz Mahmud, *Folklore in Context ; Essays in Honor of Shamsuzzamn Khan,* UPL, Dhaka, 2010, P. 99

১২২ Syed Jamil Ahmed, *Reading Against the Orientalist Grain: Performance and Politics Entwined with a Buddhist Strain,* Anderson, November, 2008, India, P. 293

১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

যেমন নিত্য নয়, তেমনি শ্বাশত নয় প্রাণীর অন্তঃশরীর/মন বা সত্তার অস্তিত্ব বরং এখানে– "আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ, পরিবর্তন ও রূপান্তর"[১২৪]

> In a world of flux where matter is without stable form, a world conceived as "a monster of energy, without beginning, without end; a firm, iron magnitude of force that does not grow bigger or smaller, that does not expand itself but only transforms itself (Nietzsche 1969:550)" [১২৫]

এক্ষণে বৌদ্ধ দর্শন মতে আত্মা/সত্তার অস্তিত্বের প্রশ্নে মানসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক 'রূপান্তর' প্রক্রিয়ার সাথে কৃত্য বা কৃত্যনাট্যের 'পরিবর্তন' বা transformations and transportations[১২৬] প্রক্রিয়ার গুণগত সম্পর্ক রচনা করা যেতে পারে এবং সাদৃশ্যমূলক বিশ্লেষণের সূত্র ধরে অতঃপর তান্ত্রিক ওঝা অং ক্য চিং মারমার চিকিৎসা পদ্ধতিতে 'দম' এর ব্যবহার, মং ক্য শোয়েনু নেভীর ব্যবহৃত 'চক্রামন' এবং বাবুল চৌধুরীর 'ইচ্ছা ছায়া'– ধ্যান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হলো।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'রূপান্তর' যদি একটি প্রবহমান (গতিশীল) প্রক্রিয়া, তবে এই প্রবহমানতার মূলে এক 'মহাশক্তির' (a monster of energy) অস্তিত্বকে মেনে নিতেই হয়। সেক্ষেত্রে এই 'মহাশক্তি' হতে পারে বুদ্ধের 'চেতনা প্রবাহ', তান্ত্রিক আচারের 'শিব-শক্তি', অথবা ওঝা অং ক্য চিং মারমার দৃষ্টিতে 'বুদ্ধ শক্তি' প্রভৃতি– নিবিষ্ট সাধনায় কেবল যে 'শক্তি'র সন্ধান করা সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে এই 'শক্তি'ই কি তবে শক্তি-রূপ 'সত্তা/মন/আত্মা'? উপনিষদে এর আক্কার বা স্বরূপ বর্ণনায় যেমনটা বলা হয়েছে– অগ্নিশিখা, শ্বেতপদ্ম, বিদ্যুত ঝিলিক, ধোঁয়াহীন আলো প্রভৃতি নাম-রূপের কোনো আলোর স্ফুলিঙ্গ; সুফী-সাধনায় যাকে বলা হয় "দর্শন" অর্থাৎ পলকের দেখা (the glance) অথবা সুফী পীর ভিলায়েতের ব্যাখ্যায় যাকে বলা হচ্ছে– "the angelic sphere of light"।[১২৭] অপরদিকে মনোবিজ্ঞানী রবার্টো অ্যাসাজাইওলির ব্যাখ্যায় যাকে বলা হয়েছে 'the seed of divine consciousness' অর্থাৎ এ হচ্ছে এক মহত্তর *চেতনা বীজ* যা মনের বিশেষ স্তর (the higher self) স্পর্শ করার শর্তে আধ্যাত্মিক স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে–

> *The higher Self.*This small radiating sphere represents an individual spark of our numinous source, the seed of divine consciousness which many wisdom teachings assert lies within each of us. It is our transpersonal reservoir of

---

১২৪ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০১, পৃ. ৮

১২৫ [Quoted from] Syed Jamil Ahmed, *Reading Against the Orientalist Grain: Performance and Politics Entwined with a Buddhist Strain*, Anderson, November, 2008, India, P. 292

১২৬ Richard Schechner, *performance studies; An Introduction,* Routledge, 2003, USA, P. 63

১২৭ Claire Schrader (edited by), James Roose-Evans (foreword by), *Ritual Theatre; The Power of Dramatic Ritual in Personal Development Groups and Clinical Practice,* Jessica Kingsley Publishers, London, 2012, P. 308

> spiritual potential and that point of consciousness which transcends the "contents" of the psyche yet permeats them, standing as detached observer of the personal ego. In some traditions, this is called soul. It is a source of wisdom and inspiration, and in regards to ritual […].[১২৮]

অতএব রূপান্তর-ই হচ্ছে একমাত্র প্রক্রিয়া যা আদতে বৌদ্ধ দর্শন, তান্ত্রিক সাধনা, কৃত্য এবং কৃত্যনাট্যের মূল বা ভিত্তি। কেননা এটি এমন এক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমষ্টিকে দৈনন্দিন বা যাপিত জীবন-বাস্তবতার বাইরে ভিন্ন আর এক স্বর্গীয়/পবিত্র বাস্তবতায় উত্তীর্ণ করে। পরিবর্তিত এই বাস্তবতায় অতঃপর, ব্যক্তি তার জাগতিক বা দৈনন্দিন মানসিক প্রক্রিয়ার (সুখ, দুঃখ, আনন্দ চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি) দুরন্ত স্রোতধারাকে (মন) স্থির/নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মহাজাগতিক/আধ্যাত্মিক জ্ঞান অথবা ভাব-চেতনার সাথে যুক্ত হতে সক্ষম হয়। রিচার্ড শেখ্নার জাগতিক-অতিরিক্ত এই বাস্তবতাকেই বলেছেন 'দ্বিতীয় বাস্তবতা' (second reality)–

> Ritual and play both lead people into a "second" reality separate from ordinary life. This reality is one where people can become selves other than their daily selves. When people temporarily become or enact another, they perform actions different from what they do ordinarily. Thus, Ritual and Play transform people, either permanently or temporarily.[১২৯]

'দ্বিতীয় বাস্তবতা' ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, এই স্তরে উন্নীত/উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তি তাঁর দৈনন্দিন, সামাজিক সত্তা/ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিলুপ্ত/গৌণ করে বিশেষ বা পবিত্র অর্থে 'অন্য' পরিচয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ ব্যক্তি এ সময়ে তার উপর এমন এক অভীষ্ট ব্যক্তিত্ব/সত্তা আরোপ করে যা প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন নয়– "persons are inscrived with their new identities and initiated into their new power."[১৩০] মূলত এই হচ্ছে ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যক্তিত্ব বা সত্তা থেকে অভীষ্ট সত্তায় 'রূপান্তরের/হয়ে ওঠার/নতুন পরিচয়ে– চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব আরোপ করার রহস্য। এক্ষেত্রে "the angelic sphere of light" 'শিব-শক্তি' 'বুদ্ধ-শক্তি' হচ্ছে সেই প্রেষণা/তাড়না যা সত্তার রূপান্তরে 'চেতনা প্রবাহকে' গতিশীল করে আর কৃত্যের সার্বিক আনুষ্ঠানিকতা এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে পবিত্র, মহত্তর আধ্যাত্মিকতার আবেষ্টনে করে তোলে পরিবেশনামূলক বা নাট্যমূলক।

সুতরাং আলোচনার শুরুতে মারমা জাতি-সংস্কৃতির অধিকাংশ ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্যাচার কেন অধিক পরিবেশনাধর্মী হয়ে ওঠে? এমন একটি প্রশ্নবোধক প্রসঙ্গ থেকে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছিল।

১২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
১২৯ Richard Schechner, *performance studies; An Introduction,* Routledge, 2003, USA, P. 45
১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

পরিশেষে আলোচনার সার্বিক বিশ্লেষণপূর্বক এমন ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনের 'রূপান্তর' তত্ত্বের সাথে তন্ত্র এবং কৃত্যের 'পরিবর্তন' (transformations and transportations) প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে মারমা জাতি-সংস্কৃতির সার্বিক সাংস্কৃতিক-আচরণ অধিক আনুষ্ঠানিক বা পরিবেশনাধর্মী অথবা নাট্যমূলক হয়ে উঠেছে। সুতরাং সত্তার রূপান্তর/পরিবর্তন প্রক্রিয়ার এই আলোচনা সূত্রে মারমা তান্ত্রিক ওঝা অং ক্য চিং মারমার চিকিৎসা পদ্ধতির 'দম', মং ক্য শোয়েনু নেভীর 'চক্রামন ধ্যান' এবং বাবুল চৌধুরীর 'ইচ্ছা ছায়া' পরিবেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হলো।

ধ্যান বিশ্লেষণ–১

বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার রেইছা ইউনিয়নের দুংক্ষি বৈদ্যপাড়ায় বাস করছেন অং ক্য চিং মারমা নামে একজন তান্ত্রিক ওঝা (কবিরাজ এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসক)। ২৫.৯.২০১৪ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার অনুসারে তাঁর বয়স– সত্তর বছর। তাঁর মূল পেশা কৃষিকাজ তবে কৃষিকাজের পাশাপাশি কবিরাজি ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা এবং ঝাড়ফুঁক করে তাঁর নিজ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের সেবা করে চলেছেন দীর্ঘ বছর ধরে, আর এটিকে তিনি ঐচ্ছিক কর্ম বা পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর বয়স যখন ১৫ বছর তখন থেকেই তিনি এই কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং সে সময়ে এক বার্মিজ ভান্তের কাছ থেকে তিনি এই সাধন-জ্ঞান অর্জন করেন। কৈশোরে লব্ধ যা কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান সেটুকুই তাঁর মূল অর্জন, পরে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে আজও তাঁর তন্ত্র-সাধনার চর্চা করছেন সমান দক্ষতায়। তাঁর কাজের সফলতাই মূলত তাকে এই কর্ম পরিচালনায় উদ্দীপ্ত করে। তবে তাঁর অর্জিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান/শিক্ষা তিনি কখনোই খারাপ বা মন্দ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন না। ভাল বা সৎ উদ্দেশ্যেই তিনি এই চিকিৎসা করে থাকেন। পেশাগত কর্মে তাঁর অর্জিত খ্যাতির কারণে দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্ম, শ্রেণি-পেশার মানুষ সেবা গ্রহণ করতে আসে বা বিশেষ প্রয়োজনে তিনিও রোগীদের কাছে যান। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাধারণত তিনি দুই ধরনের সেবা প্রদান করে থাকেন। একদিকে তিনি শারীরিক অসুস্থতাজনিত সমস্যার সমাধান করেন যেমন, গ্যাস্ট্রিক, জন্ডিস, বাতের সমস্যা, সাপের কামড়, ভাঙা-কাটা-পোড়াসহ নানাবিধ চিকিৎসা করে থাকেন। অপরদিকে তিনি মানুষের সাথে মানুষের অথবা মানুষের সাথে অতি-প্রাকৃত, অতিলৌকিক শক্তির সম্পর্কজনিত নানাবিধ সমস্যার সমাধান করেন যেমন, বানকাটা, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, ভূত-অপদেবতার আছর থেকে মুক্তি, পাগল সুস্থ করা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি চিকিৎসা করে থাকেন।

অং ক্য চিং মারমা নিরামিষভোজী, তাঁর খাদ্য তালিকায় থাকে– শাক-সবজি, লতা-পাতা ইত্যাদি, তবে কেবল সমুদ্রের মাছ খেতে তিনি পছন্দ করেন। সর্বদাই কিছু নিয়মে আবদ্ধ থেকে আহার গ্রহণ করেন– সকাল এবং দুপুর (১২টার পূর্বে) এই দুই বেলা আহার গ্রহণ করেন এবং রাতে শুধু তরল জাতীয় খাবার বিশেষ করে চা

খেতে পছন্দ করেন। দুবেলা আহার যেমন তাঁর শরীরে শক্তি জোগায়, তেমনি প্রাত্যহিক ধ্যান তাঁর মনের শক্তির খোরাক জোগায়, আর এ লক্ষ্যে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই ঘণ্টা ধ্যান করেন যা তাকে বিপুল শক্তির সঞ্চার করে। তিনি মনে করেন, বুদ্ধকে প্রার্থনা করলেই সব পাওয়া যায়। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর অন্তর কেমন হবে। এমনও নজির রয়েছে যে, একটানা সাতদিন বিরামহীন ধ্যানের মাধ্যমে তিনি একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ পাঠ করতে সক্ষম হন। ফলে তিনি ব্যক্তির মনোজগৎ ও কর্মের সফলতা, ব্যর্থতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে সক্ষম হন– "মনই বলে দেয় কোনটা উচিত বা উচিত নয়, ঠিক অথবা ঠিক নয়, কোনটা করবো বা করবো না, অন্তরই আমাকে সঠিক পথের ইশারা প্রদান করে। বুদ্ধই যেন আমাকে এই *ইশারা* প্রদান করেন।"[১৩১] অং ক্য চিং মারমা প্রদত্ত এই ভাষ্য থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধ-আরাধনায় তাঁর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মনে বিশেষ শক্তি বা *বুদ্ধ-শক্তির* সঞ্চারের মাধ্যমে *ইশারা* লাভ করার ক্ষমতা অর্জন করা। কেননা এই *ইশারা* লাভ করার মাধ্যমেই তিনি 'একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ পাঠ করতে সক্ষম হন' অথবা 'ব্যক্তির অপেক্ষমাণ দিনগুলির সফলতা, ব্যর্থতা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন'। এক্ষেত্রে তিনি যখন মনে *ইশারা* লাভ করার কথা বলেন অথবা তিনি যখন বলেন 'মনই তাকে সঠিক পথের ইশারা প্রদান করে' তখন প্রকারান্তরে তিনি নিবিষ্ট ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে মনের এক স্তর থেকে অন্য/বিশেষ এক স্তরে বা অবস্থায় উন্নীত/উত্তীর্ণ হওয়ার কথাই বলেন। উন্নীত হওয়া এই বিশেষ মানসিক স্তরটি হচ্ছে সেই উচ্চতর সত্তা (higher Self) যেখানে একজন সাধক/তান্ত্রিক বিশেষ আধ্যাত্মিক চেতনার (divine consciousness) বিদ্যুৎ ঝিলিক (the angelic sphere of light) উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এতক্ষণের স্বল্প পরিসরে ওঝা অং ক্য চিং মারমার তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির যে পরিচয় পাওয়া গেল, তার সাথে ধ্যান-ভাবনা 'চিত্তপ্রজ্ঞা' ও 'ঋদ্ধিপাদ'-এর সাথে বিশেষ সান্নিধ্য রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। কেননা 'এই বিদ্যা চর্চার মাধ্যমে মনশক্তি বাড়তে থাকে এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি ও জ্ঞানের অতিরিক্ত অলৌকিক এবং অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে সক্ষম হয়।'[১৩২]

যদিও অং ক্য চিং মারমা ধ্যান করেই *বুদ্ধ-শক্তি* অর্জন করেন, কিন্তু এই শক্তির অর্জন আনুষ্ঠানিক ধর্মশাস্ত্র বা দর্শনের বিধি-বিধান পাঠ ও পালনের মাধ্যমে নয়, বরং প্রবহমান স্রোতের ন্যায় পরিবর্তনশীল মনকে *দমের* নিবিষ্ট অনুশীলনে স্থির করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে *বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি* বা *বুদ্ধ-শক্তি* অর্জনের গূঢ় রহস্য। অর্থাৎ অং ক্য চিং মারমা এই শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে *দম* বা শ্বাসপ্রশ্বাসের কৌশলপূর্ণ অনুশীলন/ব্যবহারকেই সাধন-পথের প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন–

---

১৩১ সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, তান্ত্রিক ওঝা: অং ক্য চিং মারমা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৫.৯.২০১৪, দুংক্ষি বৈদ্যপাড়া, রেইছা, বান্দরবান

১৩২ মং সিং ঞো, *মারমাদের সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাসে ও দেব দেবীর অবস্থান: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, সাংগু*, বর্ষ: সাত, সংখ্যা: এক (ষষ্ঠ খণ্ড) ১৯৯৯, পৃ. ৩৫

যখন কোন রোগীর চিকিৎসা শুরু করি, তখন শুরুর আগে আমি *দমের* মাধ্যমে সকল *অপদেবতাদের* দূর করে শান্ত হয়ে বসি। কিছু সময় পর আমি 'শরীরে হালকা ও মনে শান্ত ভাব' অনুভব করি এবং বুদ্ধের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। মনের এই বিশেষ অবস্থায় বুদ্ধের শক্তি আমার ভিতর সঞ্চারিত হয় এবং আমি উজ্জীবিত হই। সেই মুহূর্তে আমি অপদেবতার শক্তি ও বুদ্ধের শক্তিকে দেখতে পাই এবং আমি বুদ্ধের হয়ে সেই লড়াইয়ে যোগ দেই। বুদ্ধের শক্তির মাধমে আমি তখন রোগীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।[১৩৩]

উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণে *দম*-এর কৌশলপূর্ণ ব্যবহার পরবর্তী দেহ অভ্যন্তরে সচল দুটি মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এটি এমন এক প্রক্রিয়া যা *বুদ্ধ-শক্তি* অর্জনের লক্ষ্যে *দমের* কৌশলপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা মনকে কেন্দ্রস্থিত বা নিবিষ্ট করার হয়। দ্বিতীয়ত, এই *বুদ্ধ-শক্তি* লাভের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে 'অপদেবতা'। 'অপদেবতা' বলতে এখানে দেহের অভ্যন্তরে অবিরাম গতিতে ছুটে চলা ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী মানসিক প্রক্রিয়ার (দৈনন্দিন সুখ, দুঃখ, আনন্দ অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি) সাথে যাপিত জীবনের বস্তুগত সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়েছে, যা মনের নিবিষ্টতায় 'শরীরে হালকা ও মনে শান্ত ভাব' বা 'পবিত্র স্থিরতা' সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সুতরাং তান্ত্রিক সাধকের *দম* নির্ভর সাধন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা মূলত এখানেই যে, এটি মনকে স্থির করে বা মনের *পবিত্র স্থিরতা* তৈরি করে। আর এই স্থিরতার অবস্থায় পৌঁছানোর কৌশল/মাধ্যম হিসেবেই *দম*-এর অনুশীলন/ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বস্তুত বিশেষ এই ধ্যান প্রক্রিয়ায় অনুশীলিত *দম* আধ্যাত্মিক শক্তি ও চেতনা লাভের *যান* বা *বাহন* হিসেবে কাজ করে। আবার এই বিষয়টিকে a threshold of consciousness (a passageway between places rather than a place in itself) বা বিশেষ *চৈতন্যের ঘরে* ঢোকার প্রবেশদ্বার হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা 'কৃত্য' হচ্ছে এমনই এক 'মধ্যবর্তী আনুষ্ঠানিকতা' যা ব্যক্তি বা সমষ্টির সাথে অপর কোনো অতি-প্রাকৃত এক বা একাধিক শক্তির (দেব, দেবী, ঈশ্বর, খোদা..) মধ্যে সম্পর্কের সেতু বন্ধন রচনা করে। এই সেতুবন্ধের মাধ্যমেই ব্যক্তি বা সমষ্টি তার আরাধ্য শক্তি/দেব-দেবী/ঈশ্বর/আল্লার সাথে সম্পর্ক নির্মাণ করে আকাঙ্ক্ষিত চেতনা লাভ করে থাকে–

Ritual is a doorway through which we move from the ordinary world into another dimension…ritural, then, is a threshold of consciousness… The ritual circle defines a protected area that people create with their bodies and their consciousness in order to safely experience altered state of being. The circle

১৩৩ সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, তান্ত্রিক ওঝা: অং ক্য চিং মারমা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৫.৯.২০১৪, দুংক্ষি বৈদ্যপাড়া, রেইছা, বান্দরবান

becomes a temple into which we invite the divine…in the ritual circle ….we learn how to enter into and depart from expanded levels of consciousness by an act of will.[১৩৪]

অং ক্য চিং মারমার তান্ত্রিক সাধন-সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়া বা আনুষ্ঠানিকতা এককভাবে পরিচালিত। নিজ ঘরের নির্ধারিত একটি কক্ষ হচ্ছে তাঁর পূজা গৃহ। সেখানে গৃহের নির্দিষ্ট কক্ষের দেয়ালের সাথে ৫ ফুট উপরে নির্মিত একটি পাটাতনের ওপর ফ্রেমে বাঁধাই করা রয়েছে পাশাপাশি স্থাপন করা বুদ্ধের ৩টি ছবি। এই বুদ্ধমূর্তিগুলোর দুই পাশে দুটি সিলভার রঙের পাত্রে (ঘট) রয়েছে নানা রকমর পাতা ও ফুল। সাধন প্রক্রিয়ার শুরুতে এই পাটাতনে মূর্তি তিনটির সামনে পর পর পাঁচটি মোমবাতি জ্বালিয়ে এবং মূর্তির সামনে রাখা গ্লাসের 'পবিত্র' পানি দিয়ে নিজেকে এবং কক্ষটিকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আরাধনার জন্য নির্ধারিত কক্ষটি গৃহস্থালি কাজেও ব্যবহৃত হয়। এ জন্যে পাটাতনের ওপরে বুদ্ধমূর্তির ঠিক সম্মুখবর্তী নিচে একটি পরিষ্কার মাদুর বিছিয়ে ধ্যান-আসনের জায়গা নির্ধারণ করে নেন। মাদুর দ্বারা সীমায়িত ধ্যান-আসন এবং আসনটির সামনে দুই পাশে রাখা নানা রকম তান্ত্রিক/ধর্মীয় গ্রন্থাদি, রুদ্রাক্ষরের মালা এবং অন্যান্য নৈবেদ্য সামগ্রীর সমন্বয়ে অবশেষে প্রাত্যহিক ব্যবহৃত কক্ষের একটি অংশ সম্পূর্ণতই কৃত্য সম্পাদনে পবিত্র 'স্থান' ও 'সময়' দ্বারা সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। কৃত্য সম্পাদনের নিমিত্তে প্রস্তুতিমূলক এই পর্যায়টি বস্তুত দৈনন্দিন-অতিরিক্ত 'পৃথক' (separation)[১৩৫] বা ভিন্ন কোনো 'সময়' ও 'স্থানে'র ধারণায় আবদ্ধ করে। অর্থাৎ কৃত্য সম্পাদনে নির্ধারিত বিশেষ 'সময়' এবং 'স্থান' ব্যক্তির (অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক/ভক্ত) দৈনন্দিন ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণের ওপর ভিন্ন এক ব্যক্তিত্বের আচরণ (তান্ত্রিক ওঝা) আরোপ করে। যেমন, অং ক্য চিং মারমা তাঁর সাধনার উদ্দেশ্যে তৈরি আসনে প্রবেশ পূর্বে পবিত্র পানি দিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে অতঃপর দৈনন্দিন পোশাক লুঙ্গির সাথে একটি শুভ্র সাদা রঙের গেঞ্জি ও চাদর জড়িয়ে রুদ্রাক্ষরের মালা হাতে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, নিজের ওপর ভিন্ন ব্যক্তিত্ব/চরিত্র (তান্ত্রিক সাধক) আরোপ করেন। বস্তুত কৃত্য সম্পাদনে 'সময়' ও 'স্থানে'র 'পৃথকীকরণ' পর্যায়টি এক্ষেত্রে অং ক্য চিং মারমার প্রাত্যহিক ব্যক্তিত্ব (কৃষিজীবী, পারিবারের কর্তা) থেকে ভিন্ন/অপর ব্যক্তিত্ব 'ওঝায়' রূপান্তর (ট্রান্সফরম /ট্রান্সপোর্ট) প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তরে উন্নীত করে। অতঃপর তান্ত্রিক ওঝা, তাঁর দুই হাঁটু ভেঙে (নামাজে বসার ভঙ্গি অনুরূপ) বসে,

---

১৩৪ Paul Rebillot and Kay, M. *The call to Adventure Bringing the Hero's Journey to Daily life.* San Frncisco, CA: Harper Collins, 1993, P. 16

১৩৫ Turner distinguished three aspects of liminality- First, it must continue to communicate the space-time as demarcated by the process of *Separation*. This is achieved by continuing to use the same *sacra*, or 'extraordinary tokens' (such as masks and puppetry, song/chanting and dance, and local or mythical legends/parables) that are already identifiable to the audience as elements of ritual due to their codified and non-imitative performances that continue to make possible the demarcation of ritualised space-time.
www.vosleska.tumblr.com, JOE BOYLAN, a theatre blog, *The Ritual roots of plastic performance*,September 2, 2013

এক হাতে মালাটি স্থির রেখে অত্যন্ত স্বাভাবিক (রিলাক্সড্) অবস্থায় *দম* বা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ছাড়ার কৌশলপূর্ণ অনুশীলন/চর্চা/সাধনা শুরু করেন (পরবর্তী আলোচনায় ওঝার *দম* অনুশীলন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে)। এভাবে ক্রমাগতভাবে *দম* সাধনার মাধ্যমে মনকে সু-স্থির করে বিদ্যুৎ ঝিলিক (the angelic sphere of light) দর্শন করেন, অতঃপর, তিনি তাঁর কার্য (চিকিৎসা) সম্পাদনে নিবিষ্ট হন।

অভিনয় কর্মে অভিনেতার শরীর শিথিলায়ন (*relaxation*) এবং কণ্ঠ উচ্চারিত সুর, সংলাপ প্রক্ষেপণ, যোগাসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি অনুশীলন প্রক্রিয়াকে সাবলীল এবং আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে দম-এর ব্যবহারে বেশকিছু রীতি-পদ্ধতি বহুল প্রচলিত রয়েছে। তবে সম্প্রতি অভিনেতার 'আবেগ'-এর (emotion) স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে তিনটি কৌশলগত স্তরের কথা বলা হচ্ছে, যার মধ্যে *দমের* পুনরুৎপাদনে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার বিধিকে বিশেষ গুরুত্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে–

> […] the emotional arousal was accompanied by an ensemble of specific respiratory, postural and facial modifications that were characteristic for each emotion. In other words, [we found that] *specific emotional feelings were linked to specific patterns of breathing, facial expression, degree of muscular tension, and postural attitudes.*"[১৩৬]

আবেগের প্রকাশ, শরীর শিথিলায়ন, যোগাসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্ষেত্রে *দম*-এর এই সকল বিশেষ ও প্রচলিত ব্যবহার এবং এর কার্যকারিতা বিবেচনায় রেখে ওঝা অং ক্য চিং মারমা'র তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে *দম*-এর বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়। যেটি এই প্রক্রিয়ায় কুশীলবের আবেগের উৎপাদনের জন্য নয় অথবা এই প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শরীরের শিথিলায়নের কার্যকর হলেও তা শিথিলায়নের নিমিত্তে ব্যবহৃত নয় বরং *দম* ব্যবহারের বিশেষ এই প্রক্রিয়াটি দৈনন্দিন বাস্তবতা এবং আধ্যাত্মিক বাস্তবতার মধ্যে গভীর সেতুবন্ধ রচনা করে ব্যক্তিকে রূপান্তর/পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় করে। ফলে তান্ত্রিক ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতিতে *দম*-এর ব্যবহার ব্যক্তির রূপান্তর/পরিবর্তনে সহায়তা করে, এই বিবেচনায় এটিকে এই প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া এই প্রক্রিয়াটি একদিকে যেমন– ভাব এবং বস্তুজগতের পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতা (অপদেবতা) মোকাবিলায় কার্যকর, অপরদিকে এ প্রক্রিয়াটি প্রবহমান/অস্থির/বিক্ষিপ্ত মানসিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি সজীব মানসিক স্তরে (চেতনা প্রবাহ) কেন্দ্রস্থিত হতে সহায়তা করে। সুতরাং ব্যক্তির রূপান্তর/পরিবর্তন প্রক্রিয়ায়,

---

১৩৬ Susana Bloch, ALBA EMOTING: A Psychophysiological Technique to Help Actors Create and Control Real Emotions, *Theatre Topics*, Septernber 1993 Volume 3 Number 2. P. 1

নিবিষ্ট মনোসংযোগে এবং কল্পনা শক্তির বৃদ্ধিতে কার্যকর বিবেচনায় অভিনেতা প্রস্তুতির অনুশীলন উপাদান হিসেবে *দম* ব্যবহারের এই প্রক্রিয়াটিকে গ্রহণ করে পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

ধ্যান বিশ্লেষণ–২

মারমা জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতির মানস চরিত্রের সামগ্রিক গড়নে তন্ত্র-মন্ত্র অথবা ধ্যান-ভাবনা বিশেষ স্থান দখল করে আছে যার পরিচয় ইতিপূর্বেই লাভ করা গেছে। ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচারের সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ধ্যান-সাধন চর্চার নানান রীতি-পদ্ধতি। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্জনের লক্ষ্যে যেমন রয়েছে ধ্যান-সাধনার নানান পদ্ধতি তেমনি ব্যক্তির মনোদৈহিক চেতনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ ও 'পবিত্র স্থিরতার' জন্যও রয়েছে নানান ধ্যান পদ্ধতি। এ পর্যায়ে ব্যক্তির মনোদৈহিক চেতনা প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এমন একটি ধ্যানের পরিবেশন-প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

মারমা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মং ক্য শোয়েনু নেভী (৫৭) প্রাত্যহিক জীবনাচারের অসম, অসঙ্গতিপূর্ণ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং সম্পর্কের বহুপক্ষীয় জটিলতার টানাপোড়েন মোকাবিলা করে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে (বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি ডিরেক্টর) নিজের চিন্তা ও কর্মে একনিষ্ঠতা বজায় রাখার লক্ষ্যে 'চক্রামন' নামে ভিন্নধর্মী একটি ধ্যান চর্চা করে থাকেন। ভিন্ন বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এটি মারমা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রচলিত 'আসন' ভিত্তিক ধ্যানের বিপরীতে 'চলন' (মুভমেন্ট) ভিত্তিক একটি ধ্যান প্রক্রিয়া। এই ধ্যানের প্রক্রিয়ায় "আপনার মনকে নানাবিধ জাগতিক চিন্তা ও তাড়না মুক্ত হয়ে মনকে স্থির ও নিবিষ্ট করতে সহায়তা করবে। চক্রামন/চক্রন বা হাঁটার মাধ্যমে আপনি এই সাধনা করতে পারেন।"[১৩৭] নিম্নে চক্রামন নামের এই ধ্যানটির পর্যালোচনাপূর্বক অভিনেতা প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান অন্বেষণের প্রতি আলোকপাত করা হলো।

দুটি পর্যায়ে বিভক্ত এই 'চক্রামন' ধ্যানের শুরুতে 'আসন' ধ্যানের মাধ্যমে বিশেষ নিয়মানুসারে দম নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়ায় মনকে স্থির করে নেওয়া হয়। অতঃপর ধ্যানটির নিয়মানুসারে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক কদম বা পদক্ষেপে পৌঁছানোর লক্ষ্য স্থির করে প্রতিটি কদম বা পদক্ষেপকে তিনটি পৃথক ভাগে বিভক্ত করে বিশেষ পদ্ধতিতে হেঁটে নির্ধারিত দূরত্বে পৌঁছে পুনরায় একই পন্থায় শুরুর স্থানে ফিরে আসতে হয়ে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় সাধক প্রতিটি পদক্ষেপকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন– 'পা তোলা, পা সম্মুখে প্রসারিত করা এবং পা মাটিতে ফেলা এইভাবে তিনটি সুস্পষ্ট বিভাজনে এগিয়ে চলা এবং পদক্ষেপের প্রতিটি বিভাজন

১৩৭ মং ক্য শোয়েনু নেভী পদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

মনে মনে উচ্চারণ করা, যেমন– আমি পা তুলছি, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আমি পা ফেলছি এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো এবং ফিরে আসা সম্পাদন করতে হয়। 'চক্রামন' বা হেঁটে হেঁটে করা এই ধ্যানটির পর্যালোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যায়। প্রথমত, অন্যান্য ধ্যানের মতো এই ধ্যানটিও 'জাগতিক চিন্তা ও তাড়না মুক্ত' একটি স্থির ও নিবিষ্ট মন তৈরির পরিস্থিতিকে নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই ধ্যানটি একটি নির্দিষ্ট 'লক্ষ্য' নির্ধারণ করে এবং সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অটল থেকে নিবিষ্ট মনে প্রক্রিয়াটি *সম্পাদন করতে* হয় (বিশেষ পদ্ধতিতে পূর্ব-নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে পুনরায় শুরুর নির্দিষ্ট গন্তব্যে ফিরে আসা)। এখানে নিবিষ্ট মনোযোগের সাথে পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যে অটল থেকে কোনো *ক্রিয়া সম্পাদন করার* (বিশেষ পদ্ধতিতে হাঁটা) এই বিষয়টির সাথে অভিনেতার *ক্রিয়ায়* মনোযোগী থেকে চরিত্রের *চূড়ান্ত লক্ষ্যে* পৌঁছানোর পথে অবিচল থাকার বিষয়টির মধ্যে প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়া সম্পাদনে *নিবিষ্ট মনোযোগ স্থাপন* এবং *লক্ষ্যে অবিচল/অটল থাকা* এই বিষয় দুটির সাথে প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। ফলে 'চক্রামন ধ্যান' প্রকারান্তরে অভিনেতার নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় একাত্ম থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে অটল থাকার অনুশীলনী অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম বিবেচনায় অভিনেতা প্রস্তুতির অনুশীলন উপাদান হিসেবে পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরা হলো।

ধ্যান বিশ্লেষণ–৩

মারমা তান্ত্রিক ঐতিহ্যের গুরুমুখী সাধনায় 'ইচ্ছা ছায়া' নামে প্রচলিত রয়েছে এক ধরনের ধ্যান পদ্ধতি। 'ইচ্ছা' বলতে মনের চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা বা ইংরেজিতে will অর্থে বোঝানো হয় এবং 'ছায়া' হচ্ছে ভালো লাগা, শান্তি লাভ করা অথবা প্রশান্ত বা প্রশমিত হওয়া/করা। অর্থাৎ 'ইচ্ছা ছায়া' বলতে এখানে মনের দৃঢ় ইচ্ছা অনুযায়ী শান্তি লাভ বা প্রশমিত (healing) করা বা হওয়াকে বোঝায়। এটি মূলত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যা অর্জন করতে হলে কঠিন বিধি বিধান অনুসরণ করতে হয়। 'ইচ্ছা ছায়ার' গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের পূর্বশর্তই হলো জাগতিক সকল প্রকার লোভ-লালসা, আক্কা-আক্কাঙ্খা, অন্যায়-অসততা সর্বোপরি বস্তুগত যাবতীয় চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে কেবলই নির্মোহ থাকা। এটি একটি গুরুমুখী সাধন পদ্ধতি যা কেবল গুরুর নিকট থেকেই অর্জন করা যায়। এজন্য শিষ্যকে প্রাত্যহিক জীবনে নির্মোহ থাকতে অভ্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত গাথা (শ্লোক) পাঠ করা, তসবিহ জপ (ফলের বিচি দ্বারা তৈরি মালা) করা প্রভৃতি নিয়ম পালন করতে হয়। গুরুমুখী এই শিক্ষাটি দীর্ঘ বছরের সাধনায় তিনটি ধাপে শিখতে হয় এবং পূর্ণজ্ঞান অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ শরীরে ট্যাটু এঁকে দেওয়া হয়।

এই সাধন পদ্ধতিটিও আসন কেন্দ্রিক, আসনে বসার পূর্বে শিষ্যকে গুরুর শপথ বাক্য পাঠ করতে হয় যে, সে এই শিক্ষা খারাপ কাজে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে না, বা কারো ক্ষতি সাধনের জন্য করবে না ইত্যাদি। ‘ইচ্ছা ছায়া’র আসনটি বিশেষ ডেকরেটিভ বা আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো হয়ে থাকে। নানারকম ফুল-পাতা, ফল-ফলাদি, প্রদীপ, আগর প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়, তবে সুগন্ধির ব্যবহার সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ধ্যানের শুরু হয় সুরে সুরে গাথা বা শ্লোক গাওয়া মাধ্যমে। যাবতীয় সকল আনুষ্ঠানিকতার পর অবশেষে ‘ইচ্ছা ছায়ার’ একজন তান্ত্রিক সাধক ‘মানব সেবা’ (চিকিৎসা) শুরু করতে পারেন। সমাজে বিশেষ এই ধ্যান-সাধনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত ‘বৈদ্য’ নামে পরিচিতি পেয়ে থাকে। বান্দরবান জেলা সদরের বাসিন্দা বাবুল চৌধুরী (৫৫) ‘ইচ্ছা ছায়া’র সর্বোচ্চ ধাপ অতিক্রম করে সার্টিফিকেট বা সনদ স্বরূপ ট্যাটু লাভ করেন। যদিও অতি সম্প্রতি তিনি আর এই সাধনার সাথে যুক্ত নেই, কেননা এই সাধন পদ্ধতির কঠিন নিয়ম এবং বিধি বিধান অনুসরণ করে তাঁর পক্ষে জীবন বাস্তবতায় যাপন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তিনি একজন ব্যবসায়ী ফলে ব্যবসার নীতি-ধর্ম অনুসরণ করে কঠিন তান্ত্রিক বিধি বিধানে অবিচল থাকা তাঁর পক্ষে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে বিধায় তিনি ‘ইচ্ছা ছায়া’ তান্ত্রিক সাধনা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে নিজের মনো-দৈহিক সুস্থিরতা বজায়ের লক্ষ্যে এবং শৌখিন পর্যায়ে এই ধ্যান চর্চাটি অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকার সূত্রে ‘ইচ্ছা ছায়ার’ সাধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায় এবং এক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই ধ্যান প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করা হলো।

‘ইচ্ছা ছায়া’ এমন এক তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে রোগীকে বৈদ্যের (চিকিৎসক) নিকট সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ বা সমর্পণ করতে হয়, অন্যদিকে যিনি তান্ত্রিক চিকিৎসক তাকেও সোপর্দ করতে হয়, তবে তা আধ্যাত্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে গুরুর কাছে সোপর্দ করতে হয়। দুটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে ‘ইচ্ছা ছায়ার’ চিকিৎসা পদ্ধতি বা এর আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত-১

চিকিৎসক : আচ্ছা আপনার তো ব্যথা হচ্ছে, তাই না?

রোগী : হ্যাঁ খুব মাথা ব্যথা হচ্ছে!

চিকিৎসক : আমি যদি আপনার সব ব্যথা নিয়ে নিতে পারি, আপনার ব্যথা ভাল করে দিতে পারি, আপনি কি রাজি, আপনি কি আপনার সব মাথা ব্যথা আমাকে দিবেন?

রোগী : হ্যাঁ আমি রাজি।

চিকিৎসক : আপনি কি আমার বলা সবকিছু মানতে রাজি আছেন?

রোগী : হ্যাঁ, আমি সব কিছু মানতে রাজি আছি।

চিকিৎসক : আমাকে আপনার সব কিছু দিয়ে দিতে হবে। আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে, আমার কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করতে হবে। আমাকে ভালোবাসতে হবে। পারবেন?

রোগী : হ্যাঁ, আমি আমার সবকিছু আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি।

চিকিৎসক : (এরপর গুরুকে মনে মনে স্মরণ করে) গুরু এই মানুষটি আমার কাছে সেবা পেতে চায়, তিনি সব কিছু মেনে নিতে রাজি হয়েছেন, সব কিছু স্বীকার করে নিজেকে আমার কাছে সোপর্দ করেছে। গুরু, আমি তোমার কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। তোমার ঐ শক্তির বলে তার ভিতরের সকল যন্ত্রণা আমি আমার হাতে মুঠোয় নিয়ে নিলাম। (এভাবে ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে মাথা ব্যথার উপশম করা হয়)

দৃষ্টান্ত-২

কম দামের সিগারেট (স্টার) খায় এমন এক ব্যক্তিকে তান্ত্রিক সাধক বললেন যে, আপনি তো কম/সস্তা দামের সিগারেট খান, কিন্তু আমার ইচ্ছে যে, আপনাকে আমি একটা দামি সিগারেট (বেনসন) প্রদান করি, আপনি কি তা গ্রহণ করবেন? এরপর ব্যক্তিটি রাজি হলে সাধক তাঁকে যথারীতি একটি স্টার সিগারেটই প্রদান করেন। এবং সাধকের তান্ত্রিক ক্ষমতার জোরে ব্যক্তিটি তখন কম দামের স্টার সিগারেটের ধূম্রপান থেকেই উন্নত ও দামি বেনসন সিগারেটের স্বাদ নিতে পারেন।

তান্ত্রিক এই ক্ষমতার মূলে রয়েছে “একটিমাত্র শক্তি– ‘ইচ্ছা’ মানে সাধকের মনের আক্কাঙ্ক্ষা/ ইচ্ছা। সাধকের ইচ্ছা মানে গুরুর ইচ্ছা, গুরুর ইচ্ছা মানে গুরুর যিনি গুরু তাঁর ইচ্ছা। এভাবে ক্ষমতাটি একদম কেন্দ্র থেকে উৎসারিত, একদম কেন্দ্র থেকে এই শক্তি আসছে এটা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা।”[১৩৮] উল্লেখ্য যে, ‘ইচ্ছা ছায়ার’ এই ক্ষমতা কোনো বস্তুর রূপ বা আক্কার পরিবর্তনে প্রযোজ্য হবে না। কেবল বস্তুর গুণগত প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়ের প্রতি উভয়ের সম্পূর্ণ সমর্পণ বা সোপর্দ করা এবং “উভয়ের ইচ্ছাশক্তির মিলনই হচ্ছে এই সাধনার মূল শক্তি।”[১৩৯]

‘ইচ্ছা ছায়া’, তান্ত্রিক এই সাধনাটি রোগীর রোগ নিরাময়ে (ইচ্ছা অনুযায়ী প্রশমিত হওয়া বা করা) কতখানি সফল বা ব্যর্থ তা বিচার করা বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। তবে ‘ইচ্ছা ছায়ার’ সামগ্রিক প্রক্রিয়ায়

১৩৮ বাবুল চৌধুরী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

১৩৯ প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকার

নিহিত পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, যোগাযোগ এবং ইচ্ছাশক্তির মহত্তর ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনার দাবি রাখে। কেননা এই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে দুটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যায়। প্রথমত, এই প্রক্রিয়াটি দুটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও গভীর বোঝাপড়া বা যোগাযোগের সেতুবন্ধ রচনা করে। কৃত্যাচারের *প্রদত্ত পরিস্থিতিতে* বিশেষ এই তন্ত্র-সাধনার আয়তনে নিঃশঙ্কচিত্তে, নির্দ্বিধায় একজন অপরজনের কাছে সোপর্দ/সমর্পণ করতে সক্ষম হন। ফলে একের সাথে অপরের যোগাযোগের বিষয়টি কেবল বাহ্যিক আচরণে সীমিত না থেকে বহুমাত্রিক গভীরতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা তৈরি করে। আর সম্ভাবনার এই পথ ধরেই অতঃপর, ‘ইচ্ছা’ নামক ‘শক্তি’-কে কাজে লাগিয়ে উভয়ে উভয়ের মনের গহিনে বিচরণ করতে সক্ষম হন। ফলে একে অপরকে বোঝাপড়ার বিষয়টি হয়ে ওঠে পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ। দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় একজন অপরজনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থায় (সোপর্দ) একাত্ম হয়ে ‘ইচ্ছা শক্তির’ জোরে বহুবিধ মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গুণগত পরিবতর্নকে সত্যমূলক বিশ্বাসে মেনে নেওয়া বা বিশ্বাস করার বিষয়টিকে সক্রিয় করে তোলে– অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরেই রোগীর মনো-দৈহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনকে (আমার মাথা ব্যথা ভালো হয়ে গেছে) মেনে নিতে সক্ষম হয় (প্রবল ইচ্ছা শক্তি অথবা প্রাণশক্তি দৈহিক সমস্যা– মাথা ব্যথার ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকতেও পারে)। ফলে প্রবল ‘ইচ্ছা শক্তি’ দ্বারা পরিচালিত গভীর বিশ্বাসে মেনে নেওয়ার এই প্রক্রিয়াটি বস্তুর রং/রূপ/আকার/আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে না ঠিক, তবে মানসিক প্রক্রিয়ায় গুণগত অথবা ভাবগত পরিবর্তন বা রূপান্তরে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে, একথা বলাই যেতে পারে– কেননা কৃত্যের আসরে বিশ্বাসেই তো মিলায় সকল বস্তু।

‘ইচ্ছা ছায়ার’ সাধন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ নির্দিষ্টভাবে কিছু বিষয়কে আলোকপাত করে, যেমন– পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন, পারস্পরিক অন্তঃগভীরতায় যোগাযোগ তৈরি এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সত্যমূলক রূপান্তর বা সত্য বিশ্বাসে মেনে নেওয়া। সার্বিকভাবে এই সাধন প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলতে সহায়ক হিসেবে কার্যকর হয় নির্মিত তান্ত্রিক আসর *বা প্রদত্ত পরিস্থিতি*– যেখানে ফুল, পাতা, ধূপ, সুগন্ধির আবেশ এবং তান্ত্রিক সুর-ধ্বনি সমৃদ্ধ একটি পরিস্থিতি। সুতরাং বিশ্লেষিত এই সকল বিষয় বিবেচনায় অভিনেতার মনো-দৈহিক অনুশীলনের উপাদান হিসেবে ‘ইচ্ছা ছায়াকে’ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই গ্রহণ ‘তান্ত্রিক সাধক’ হিসেবে নয় বরং সত্যমূলক মানসিক প্রক্রিয়া এবং আচরণের দ্বারা উজ্জীবিত একজন তান্ত্রিক/পবিত্র অভিনেতার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

১.৩ পর্যালোচনা

'মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা' শীর্ষক বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের 'ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– মারমা' শিরোনামে মারমা জাতি-সংস্কৃতির সাতটি (৭) পরিবেশনাকে বিশদ বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশ্লেষিত সাতটি পরিবেশনার মধ্যে তিনটি মারমা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রচলিত তান্ত্রিক ধ্যান পরিবেশনা– 'ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতি', 'চক্রামন' এবং 'ইচ্ছা ছায়া' ধ্যান পরিবেশনা ; একটি কৃত্যনাট্য– 'পাঙখুং' পরিবেশনা এবং তিনটি নৃত্য– 'থালা নৃত্য', 'বাঘ নৃত্য' এবং 'জ্যা নৃত্য'। বস্তুত *জ্যা* কৃত্যনাট্যের পর্যায়ভুক্ত হলেও বিশ্লেষণ সূত্রে দেখা গেছে যে, মারমা সংস্কৃতিতে *জাইত্ আক্কা* নামে স্বতন্ত্র একটি পরিবেশনারীতির প্রচলন রয়েছে, যা আদতে *জ্যা* নাট্যেরই নৃত্যাংশ। ক্ষেত্র সমীক্ষায় *জাইত্ আক্কা* পর্যবেক্ষণ করা হলেও এর বিশ্লেষণে নানা তথ্য সূত্রের আশ্রয়ে *জ্যা নাট্যকে* আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে উভয় পরিবেশনারীতির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে প্রতিটি স্বতন্ত্র পরিবেশনার উৎস, বিবর্তন, দল ও সাংগঠনিক কাঠামো, সমাজিক ও ধর্মীয় কৃত্যের সাথে এর সম্পর্ক, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, পেশাগত অবস্থান প্রভৃতি ব্যাখ্যা, বিবরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মূলত যে বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেটি হলো 'পরিবেশন প্রক্রিয়া' এবং এই প্রক্রিয়ায় কুশীলব/দের শরীর ও মন তথা মনো-দৈহিক উপস্থিতি। এছাড়া আরও যে বিষয়সমূহ এই পর্যবেক্ষণে গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো, কৃত্যের অথবা প্রদত্ত আনুষ্ঠানিকতায় কুশীলব/গণের দৈনন্দিন ব্যক্তিত্ব থেকে আরোপিত/অভীষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন/রূপান্তরের প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় একদিকে কৃত্যের নানাবিধ বিধি-বিধান, আচার-আচরণ; পরিবেশনার সুর-লয়-ছন্দ, বিষয়, রীতি, আখ্যান, তন্ত্র-মন্ত্র প্রভৃতি, অপরদিকে কুশীলবের দেহের ভারসাম্য, ভরকেন্দ্র, বর্ধন, শৌর্যের সমন্বিত উপস্থিতি কতটুকু ও কীভাবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে সেটিও পর্যবেক্ষণ করা হয় গুরুত্বের সাথে। বিশদ এই বিশ্লেষণসূত্রে বস্তুত প্রতিটি পরিবেশনা হতে এমন কিছু উপাদানের অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয় যা পরবর্তী আলোচনায় অভিনেতার মনোদৈহিক প্রস্তুতির নিমিত্তে অন্বেষণকৃত অনুশীলন উপাদানের উৎস, ভিত্তি এবং প্রেরণা হিসেবে ক্রিয়াশীল হতে পারে। পরিশেষে সংগৃহীত পরিবেশনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্য পূরণে সক্ষম এমন সম্ভাবনাময় *প্রক্রিয়া, কৌশল, পদ্ধতি* এবং *বৈশিষ্ট্য* চিহ্নিত করে অভিনেতার প্রস্তুতি উপযোগী অনুশীলন উপাদান অন্বেষণের জন্য ৪র্থ অধ্যায়ের আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে– 'ইচ্ছা ছায়া', 'চক্রামন', 'দম', 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া', 'টরসো', 'বক্র হাঁটু', 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব', 'পুনঃপুন

গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া', 'বর্ণনাত্মক নৃত্য', 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' এবং 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা'। নিম্নে চিহ্নিত এসব প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্যের ওপর তুলনামূলক আলোকপাত করা হলো।

'চক্রামন' ধ্যান পরিবেশনা বিশ্লেষণে দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করা হয়। প্রথমত, 'চক্রামন' নামের এই ধ্যানটি চলমান অর্থাৎ হেঁটে হেঁটে সম্পাদন করতে হয়। এটি নির্দিষ্ট একটি 'লক্ষ্য' (দূরত্ব) নির্ধারণ করে দেয় অতঃপর নিবিষ্ট মনে অটল থেকে বিশেষ ভঙ্গিতে চলন বা হাঁটার মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণ করে (গন্তব্যে পৌঁছে) পুনরায় শুরুর নির্দিষ্ট গন্তব্যে ফিরে আসতে হয়। ফলে এই ধ্যান ব্যক্তি/সাধককে স্থিরচিত্তে, নিবিষ্ট মনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের বা *ক্রিয়া সম্পাদনের* অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই বিষয়টি অভিনয়ে *ক্রিয়ায় একাত্ম* হয়ে চরিত্রের নির্ধারিত লক্ষ্য বা *চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণ* করার অভিজ্ঞতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি অন্য সকল ধ্যানের মতোই সাধারণ, কেননা তা 'জাগতিক চিন্তা ও তাড়না মুক্ত' একটি স্থির ও নিবিষ্ট মনের প্রবহমান পরিস্থিতি নিশ্চিত করে। কিন্তু এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত ক্রিয়াশীলতায় নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত কোনো কর্ম (ক্রিয়া সম্পাদন অর্থে) করার অভিজ্ঞতা বা তদ্রূপ অনুশীলনী অভিজ্ঞতা অভিনেতাকে সাবলীল ও সুনির্দিষ্ট করে তুলতে সক্ষম।

'ইচ্ছা ছায়া' ধ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমেও দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়– প্রথমত, এই ধ্যান সাধনা সাধক এবং সেবা গ্রহণকারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, গভীর যোগাযোগ এবং বোঝাপড়ার পবিত্র সম্পর্ক তৈরি করে, যার কারণে নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায় একজন অপরজনের কাছে সোপর্দ/সমর্পণ করতে সমর্থ হয়। সেবা গ্রহণকারী কতটুকু সফলভাবে সেবা পেল অথবা সাধক কতখানি সফলভাবে সেবা প্রদানে সক্ষম হলেন তার বিচার অথবা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো গভীর বিশ্বাস ও আস্থার ভূমিতে দাঁড়িয়ে একের প্রতি অন্যের 'সোপর্দ করা বা সমর্পণ করা'। ফলে একে অপরের বোঝাপড়া বা যোগাযোগের বিষয়টি কেবলমাত্র ফরমায়েশি বাহ্যিক আচরণে সীমিত না থেকে বরং বিষয়টি হয়ে ওঠে পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক চেতনা প্রণোদিত, যা বহুমাত্রিক অন্তঃগভীরতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা তৈরি করে। এবং দ্বিতীয়ত, উভয়ের প্রতি গভীর আস্থা স্থাপনের কারণে মানসিক অথবা ভাবগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গুণগত পরিবতর্নকে 'সত্যমূলক' বিশ্বাসে মেনে নেওয়ার বিষয়টিকে সক্রিয় করে তোলে– অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরেই রোগীর মনোদৈহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনকে (মাথা ব্যথা ভালো হয়ে গেছে) মেনে নিতে সক্ষম হয়।

ওঝা অং ক্য চিং মারমা'র তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি 'দম' বিশ্লেষণ পরবর্তী একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়। সাধন পদ্ধতির এই পরিবেশনায় 'দম'-এর প্রচলিত ব্যবহার ভিন্ন আরো এক ধরনের গুণবাচক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 'দম'-এর প্রচলিত ব্যবহারে আবেগের প্রকাশ, শরীর শিথিলায়ন, প্রাণায়াম প্রভৃতি

ক্ষেত্র গুরুত্ব পেলেও, তান্ত্রিক চিকিৎসার এই পরিবেশন প্রক্রিয়ায় 'দম' দৈনন্দিন বাস্তবতা এবং আধ্যাত্মিক বাস্তবতার মধ্যে গভীর সেতুবন্ধ রচনা করে ব্যক্তিকে রূপান্তর/পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় করে। ফলে তান্ত্রিক ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতিতে 'দম'-এর ব্যবহার ব্যক্তির রূপান্তর/পরিবর্তনের সোপান হয়ে ওঠে। তাছাড়া 'দম' অনুশীলনের এই প্রক্রিয়াটি একদিকে যেমন– ভাব এবং বস্তুজগতের পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতা (অপদেবতা) মোকাবিলায় কার্যকর, অপরদিকে এ প্রক্রিয়াটি প্রবহমান/অস্থির/বিক্ষিপ্ত মানসিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি সজীব মানসিক স্তরে (চেতনা প্রবাহ) কেন্দ্রস্থিত হতে সহায়তা করে।

বিশ্লেষিত তিনটি ধ্যান-পরিবেশনা থেকে চিহ্নিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত গুণাগুণ অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতির উপাদান হিসেবে আরোপ বা প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন– এক. 'চক্রামন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ অথবা পূর্ব-নির্ধারিত ক্রিয়া সম্পাদনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব এবং দুই. প্রাত্যহিক চিন্তা ও জটিলতা থেকে মুক্ত একটি স্থির ও নিবিষ্ট মনের প্রবহমান পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব। তিন. 'ইচ্ছা ছায়া'র কৃত্যমূলক আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, গভীর যোগাযোগ, বোঝাপড়া প্রভৃতি পবিত্র সম্পর্কের ভিত্তিতে একজনের প্রতি অপরজনের সমর্পণ করা সম্ভব। চার. মনের জোরালো বিশ্বাস এবং আস্থার কারণে ভাবগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট যেকোনো গুণগত পরিবর্তনকে সত্যমূলক বিশ্বাসে মেনে নেওয়া সম্ভব। এবং পাঁচ. ওঝার তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত 'দম' চর্চার মাধ্যমে 'পবিত্র স্থিরতায়' উন্নীত হয়ে দৈনন্দিন ব্যক্তিত্ব/অবস্থান থেকে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব/অবস্থানে রূপান্তর/পরিবর্তন অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

মারমা জাতিতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবে এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আরও চারটি পরিবেশনা– *কৃত্যনাট্য পাঙখুং, থালা নৃত্য, বাঘ নৃত্য* এবং *জ্য নৃত্য* পরিবেশনা। এ সকল পরিবেশনার বিশদ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ পরবর্তী বেশ কিছু *প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বা বৈশিষ্ট্য*কে চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়। যথাক্রমে এগুলো হচ্ছে– পাঙখুং কৃত্যনাট্যের 'পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া' ও 'বর্ণনাত্মক নৃত্য'; থালা নৃত্যের 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া'; বাঘ নৃত্যের প্রশিক্ষণ ও পরিবেশন প্রক্রিয়ায় 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' ও 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা'; জ্য নৃত্যের 'টরসো', 'বক্র হাঁটুর,' ও 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' ব্যবহার প্রক্রিয়াকে বিশেষ প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

কৃত্যনাট্য পাঙখুং বিশ্লেষণ সূত্রে দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়– *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া* এবং *বর্ণনাত্মক নৃত্য*। বিশ্লেষণে দেখা গেছে কৃত্যনাট্য পাঙখুং-এর নির্দিষ্ট কিছু সুর-ছন্দ ও শরীরভঙ্গিমার পুনঃপুন 'সম্পাদন' বা 'আর্বতন' দর্শক/কুশীলব উভয়কে এক 'পরমানন্দীয় আবেশে' (ecstatic trance) আচ্ছন্ন করে পবিত্র কৃত্য/নাট্য/শিল্পের রস আস্বাদনে সহায়তা করে। 'পরমানন্দীয় আবেশ' (ecstatic

trance) হচ্ছে এমন এক ভাব-জগতের অভিজ্ঞতা যা ব্যক্তি/কুশীলব/অভিনেতাকে তার প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন মনোদৈহিক সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে দিতে পারে 'ভিন্ন'/'নতুন' কোনো মনোদৈহিক বাস্তবতায়। কেননা ট্রান্স–দশা বা ভর হচ্ছে সেই নিবিষ্ট সক্ষমতা যা একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় একাত্ম হতে সহায়তা করে। অপরদিকে পাঙখুং-এর *বর্ণনাত্মক নৃত্য* কেবল ভাবের উদ্দীপনা জাগরণে সহায়তা করে তা নয় বরং তা বিষয়, চরিত্র ও ঘটনার ইঙ্গিতপূর্ণ দেহের ভাষায় বর্ণনাকে নিশ্চিত ও সম্ভব করে তোলে। ফলে *বর্ণনাত্মক নৃত্যের* এই অভিজ্ঞতা অভিনেতার সুরেলা ছন্দময় শরীর সক্ষমতার উন্নয়নে কার্যকর ও সহায়ক হতে পারে।

থালা নৃত্যের 'ঘূর্ণণ প্রক্রিয়া' কেবল হাতের তালুতে রাখা থালার ঘূর্ণন নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তা নয়, বরং হাতের এই ঘূর্ণন-শৈলী একদিকে যেমন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ– কব্জি, কনুই, ঘাড়, কাঁধ, মেরুদণ্ড, কোমর, হাঁটু এবং পদযুগলসহ শরীরে পেশির বিন্যাসগত উত্তেজনাকে (মাসকিউলার টেনশন) যুক্ত করতে সক্ষম, অন্যদিকে তা আবার নৃত্যের ছন্দে শরীরের ভারসাম্য সুরক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। একই সাথে থালা নৃত্যের 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়াটির' অঙ্গ সঞ্চালনের সাথে কল্পনার সংযোগ ঘটিয়ে অভিনেতার মনো-দৈহিক অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করতে পারে। অর্থাৎ থালা নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য থালার ঘূর্ণণ শৈলী/প্রক্রিয়াকে কেবল দুই হাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ক্রমানুসারে বা পর্যায়ক্রমে মেরুদণ্ড, কোমর, হাঁটু ও পা'য়ের সাথেও সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং একই সাথে অন্তর-স্পন্দন বা নাচনের কাল্পনিক সংযুক্তি ঘটিয়ে ব্যক্তির মনো-দৈহিক অনুশীলনী-অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। বস্তুত থালা নৃত্যের 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া' ব্যক্তির শরীর ও মনো-ছন্দের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শরীরের নমনীয়তা ও সংবেদনশীলতাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। সুতরাং 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া' একদিকে যেমন দেহের গতি, ছন্দ ও বিন্যাসের দক্ষতা, নমনীয়তা এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে সক্ষম, অপরদিকে অন্তঃশরীরের সাথে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে মনোদৈহিক প্রস্তুতি/চর্চার উন্নয়নকল্পেও এই প্রক্রিয়াটি হতে পারে যথার্থ সংবেদনশীল এবং সম্ভাবনাময়।

থালা নৃত্যের ন্যায় *বাঘ নৃত্যের* 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' ও 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' বৈশিষ্ট্য দুটিও অভিনেতার শরীর ও মনের মেলবন্ধনে মনো-দৈহিক সক্ষমতা অর্জনে সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত প্রদান করে। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের গুণগত তাৎপর্য এমন যে তা ব্যক্তিকে অধিক সাহসী এবং ঝুঁকি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা জোগায়। কেননা এই দুটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যক্তির কৃত্য/ধর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় বিরাজমান তাবৎ প্রাণিকুলের বাহ্যিক আচরণ এবং আরোপিত গুণাবলির (যেমন– হিংস্র বাঘ, ধূর্ত শিয়াল ইত্যাদি) 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা' দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এদের আচরণ, ভঙ্গি ও ছন্দের শারীরিক অভিব্যক্তি নির্মাণ/উপস্থাপন করা সম্ভব। দেহের ভাষায় বিনির্মিত প্রাণীর নানান ভঙ্গি, আচার-আচরণের ছান্দিক অভিব্যক্তির উৎকর্ষ অর্জন প্রকারান্তরে 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' অর্জনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারে। অর্থাৎ *বাঘ নৃত্যের* এই বৈশিষ্ট্য দুটিও পরিণামে ব্যক্তির

শরীর-ক্যানভাসে বিচিত্র সব সুরেলা ভঙ্গি– মনো-দৈহিক ভঙ্গির নির্মাণ-বিনির্মাণের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

জ্যা নৃত্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য 'টরসো', 'বক্র হাঁটু', 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব'-এর ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। নৃত্যের বিশ্লেষণ সূত্রে যে তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো, এর মধ্যে প্রথম দুটি বহুমাত্রিক অঙ্গ-শৈলী ও সঞ্চালন এবং একাধিক ভরকেন্দ্র ও ভারসাম্যের সাথে কুশীলবের/অভিনেতার/ ভূমিস্থিত দৃঢ় উপস্থিতি ও সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। অপর বৈশিষ্ট্য– 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' শৌর্যের (এনার্জি) প্রত্যক্ষ প্রবাহে প্রাণবন্ত হয় দেহের 'টরসো' ও 'বক্র হাঁটুর' মধু-মিলন এবং এ থেকে সৃষ্ট বহুমাত্রিক অঙ্গ-শৈলী ও সঞ্চালন পরিণামে নিপুণ ও নিয়ন্ত্রিত 'লীলা চঞ্চলা' ভাব-শরীর (ভাব দ্বারা তাড়িত) নির্মাণ করে। তাছাড়া একদিকে যেমন 'টরসো' এবং 'বক্র হাঁটু'র সমন্বয়ে একাধিক আঙ্গিক-অনুশীলনে পুরো শরীরকে অন্তর্ভুক্ত করে বহুমাত্রিক দৈহিক-দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব, অপরদিকে এই দুটি অঙ্গের বহুমাত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরের একাধিক ভরকেন্দ্রের সাথে ভারসাম্যের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক ও প্রকৃতি নির্ণয়ের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। তদুপরি অন্তঃশরীরে বিরাজমান 'লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডব' দ্বারা চালিত 'টরসো' ও 'বক্র হাঁটুর' পরস্পর অনুবর্তী অথবা বৈপরীত্যমূলক ভঙ্গি অথবা এ সকল ভঙ্গির গতি-বৈচিত্র্যের লাস্যময় সঞ্চালন দেহ-রূপ শিল্প ভাণ্ডারের অজানা রহস্য সন্ধানে অনাবিল আনন্দ-অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ের উপসংহারে এসে আলোচিত বিষয়ের দিকে আরেকবার ফিরে তাকানো যেতে পারে। এ অধ্যায়ে মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে মারমা জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির সাতটি পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করে (ধ্যান পরিবেশনা– তান্ত্রিক চিকিৎসা, চক্রামন এবং ইচ্ছা ছায়া ; নৃত্য পরিবেশনা– থালা নৃত্য, বাঘ নৃত্য এবং জ্যা নৃত্য এবং কৃত্যনাট্য পাঙখুং) এদের বিচার, বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাতটি পরিবেশনার নিরীক্ষামূলক বিশদ আলোচনা, পর্যালোচনা পরবর্তী অতঃপর সর্বমোট এগারোটি (১১) বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়, যেমন– 'টরসো', 'বক্র হাঁটু', 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব', 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা', 'অনুকরণ অভিজ্ঞতা', 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া', 'পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া', 'বর্ণনাত্মক নৃত্য', 'দম', 'চক্রামন' এবং 'ইচ্ছা ছায়া'। চিহ্নিত এই সকল বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে নাট্য-গুণের উপস্থিতি নিরূপণ করে অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রথম অধ্যায়ের মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা পর্যলোচনা থেকে গৃহীত ১১টি বৈশিষ্ট্য এই গবেষণার লক্ষ্যপূরণে অতঃপর চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা

দ্বিতীয় অধ্যায়

মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা

২.১ : জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়

'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সংস্কৃতি-সামগ্রিকতায় যে সকল বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার সহাবস্থান বিরাজমান, স্বাতন্ত্রের বিচারে এদের কোনোটিরই বিকাশ বিবর্তন বর্তমান ভৌগোলিক পরিমণ্ডল নিরিখে বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। কেননা যে রূপ-বৈচিত্র্য আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতি-সামগ্রিকতায় দৃশ্যমান, তার মূলে রয়েছে সহস্র বছরের বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও গোত্র-ভিত্তিক জনপদ এবং শাসকগোষ্ঠীর অধিকৃত ভূমি-সীমার সম্প্রসারণ ও সংকোচনের অথবা বলা যায় রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তারে ভাঙা-গড়ার খেলা। স্থানীয় ধর্ম, দর্শন, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার তথা সামগ্রিক কৃত্যাচারের সাথে দখলদার/অভিবাসী সংস্কৃতির নিত্য বোঝাপড়ার বিষয়টি প্রাচীন কাল থেকেই বহমান। ফলে বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায় যে, প্রবল স্রোতে নদীর দুই তীরে নিত্য ভাঙা-গড়ার মতোই বাহির ও অন্তঃস্রোতে বহমান বহু ভাষা, ধর্ম, দর্শন, মত-পথের গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণের মধ্য দিয়েই 'বাংলাদেশ' ভূখণ্ডের সংস্কৃতি-সামগ্রিকতার বর্তমান রূপ-বৈচিত্র্য লাভ করেছে– মিলিয়েছে মিলেছে, তথাপি স্বতন্ত্র, স্বকীয়তাকে দূরে ঠেলে রাখেনি কখনো। বরং এ জনপদ নৃ-গোষ্ঠী, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিষ্টান প্রভৃতি বহু ধর্ম-মত-পথের অনুসারী হয়েও, সংখ্যা যোগ দর্শন ও তন্ত্র-মন্ত্রকে সংস্কৃতির ভাব-শরীরে ঠাঁই দিয়েছে পরম ভক্তিতে–

> বাঙ্গালাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত– হিন্দুধর্ম্মের এই কয়েকটি শাখা-প্রশাখার প্রধান কেন্দ্রভূমি। উত্তরকালে ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এইদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই শক্তিশালী দেশকে গ্রাস করিবার উপযোগী প্রতিভা কোন বিদেশীর নাই। কিন্তু যে কেহ এই দেশে আসিয়াছেন, তিনি যাহা কিছু ভাল আনিয়াছেন, এ দেশ-লক্ষ্মী তাহা রাজেশ্বরীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। বিদেশীরা ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছেন, কিন্ত তাঁহাদের প্রধান নৈতিক ও অধ্যাত্ম-সম্পদ বাঙ্গালীরা গ্রাস করিয়াছেন। যে মহাক্ষেত্রে এতগুলি শক্তির সংঘর্ষ হইয়াছে, সে দেশ, সে সমাজ এঁধো পুকুরের মত আবর্জ্জনা-পূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা সে দেশের পক্ষে স্বাভাবিক। এ দেশের লোক নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে শিখিয়াছে।[১]

১ দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ২০

ফলে বাহির এবং অন্দরের নানান মত-প্রবাহের সংমিশ্রণে এই ভূখণ্ড সর্বদাই জন্ম দিয়েছে ধর্মীয় কৃত্যাচারের নব নব রূপ ও আকৃতি। মহাভারতে অর্জুনের সখা, কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধের ব্যাখ্যাদাতা ভগবান কৃষ্ণ এই জনপদে এসে কত সহজেই বংশী হাতে নৃত্যরত প্রেমিক কৃষ্ণ হয়ে রাধার প্রেমে মত্ত হয়ে উঠতে পারলো। সুতরাং এই ভূখণ্ডে বিদ্যমান বিশেষ কোনো একটি জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় নির্ণয় করতে হলে এই জনপদে আসা সংস্কৃতির বাহির-স্রোতকে যেমন বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন, তেমনি কালের ধারাবাহিকতায় এই জনপদের ভৌগোলিক খণ্ডতা, অখণ্ডতা তথা রাজ্যসীমার বিস্তৃতি ও বিযুক্তির ইতিহাসকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। যদিও বঙ্গীয় সংস্কৃতি-সামগ্রিকতার আলোচনা এক্ষণে মূল লক্ষ্য নয়, তথাপিও বাংলা অঞ্চলে বিরাজমান সংস্কৃতি-বৈচিত্র্যের বিশেষ অংশীদার হিসেবে মণিপুরী জাতি-সংস্কৃতির তিনটি পরিবেশনা– *রাসলীলা*, *নটপালা* এবং *থাঙ-তা* বিশ্লেষণ পূর্বে এই জাতিগোষ্ঠীর উৎস, বিকাশ ও বিবর্তনের স্থানিক, কালিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা সঙ্গত মনে করি। কেননা এই আলোচনার মধ্যে দিয়েই মণিপুরী সংস্কৃতির পরিবেশনা-শিল্পকলায় প্রচলিত নানান রীতি-পদ্ধতি, উপাদান, অনুষঙ্গের গভীরে প্রবহমান যে সকল প্রথা ও পরম্পরা এবং ধর্ম ও দর্শনগত চিন্তা স্বয়ংক্রিয় রয়েছে তা খুঁজে দেখার প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে।

***

পরিবেশনা আঙ্গিক, রীতি-বৈচিত্র্য, ভাব-রস, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি, বিবাহ-আচার, প্রভৃতি দৃষ্টে বাংলাদেশে যে সকল জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতি স্ব-বৈশিষ্ট্যে বহমান, ‘মণিপুরী’ এদের অন্যতম। বাংলাদেশে এই জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস উত্তর-পূর্ব প্রান্তীয় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রাম জুড়ে বিস্তৃত। বৃহত্তর এই সিলেট অঞ্চল দেশের উত্তর ও পূর্বের যথাক্রমে ২৩° ৫৯″ থেকে ২৫° ২৩″ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৫৪″ থেকে ৯২°৩৯″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত, যার মোট আয়তন ৪৭৮৫ বর্গমাইল। পূর্বকালে এই সিলেট অঞ্চল ‘হরিকেল’ জনপদের অধীন ‘শ্রীহট্ট’ নামে ইতিহাসের নানা পর্বে যুক্ত ছিল। বর্তমানে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলেই মূলত বাংলাদেশে অবস্থানরত মণিপুরীদের সর্বাধিক বসবাস। তবে এদের সর্বমোট জনসংখ্যা নির্ণয়ে রয়েছে একাধিক গণনা। একটি তথ্যে দেখা যায়, ‘২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী এই সংখ্যা ২৪,৬৯৫।’[২] আবার কারো মতে– Manipuri. This group mumbers perhaps 40,000, mostly in Sylhet District;

২ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*, D. Shima Zamab (edited), *Survival or Extinction ? Adivasi Rights in Bangladesh,* National Human Rights Commission (JAMAKON), Bangladesh, 2014, P. 131

they live in scattered villages around Sylhet town and Maulavibazar especially.[৩] ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে সংযোজিত বাংলাদেশের প্রান্তিক জাতিসমূহের তুলনামূলক জনসংখ্যা বিষয়ক সারণী–১ থেকে জানা যায় যে, মণিপুরী জনসংখ্যা সরকারী হিসেবে (১৯৯১) ২৪,৮৮২ এবং বেসরকারী সংস্থার হিসেবে জনসংখ্যা (১৯৯৫) ৪৫,০০০।[৪] ২০০৫ সালে এম. এস দোহা রচিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশে আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত'-এর দোহাই দিয়ে ড. রণজিত সিংহ মনে করেন বাংলাদেশে 'মণিপুরীদের জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি।[৫]

মণিপুরী জাতির বর্তমান আবাস-অঞ্চল সিলেট অতীতে যা ছিল শ্রীহট্ট– অঞ্চলটি উত্তর ও পূর্ব প্রান্তদেশীয় ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। ইতিহাস সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সুদূর অতীতকাল থেকেই শ্রীহট্ট একাধিক জনপদ ও রাজ্যসীমার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। '৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সিলেট কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপ ছিল আসাম, সিলেট ও ময়মনসিংহের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত। কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন নাম প্রাগ-জ্যোতিষপুর। [....] কামরূপ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাগুলো হলো আসাম, জয়ন্তিয়া, ময়মনসিংহ, কাছাড়, শ্রীহট্ট, রংপুর, জলপাইগুড়ি।[৬] এই উত্তর প্রান্তীয় সীমায় অবস্থিত প্রাচীন কামরূপের ভৌগোলিক ও সংস্কৃতির আধিপত্য ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃত–

> ব্রহ্মপুত্র নদই প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিত। সত্য, কামরূপের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাঙলার উত্তরতম জেলাগুলি– রংপুর-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি– অতিক্রম করিয়া উত্তর বিহারের প্রাচীন কোশনদী স্পর্শও হয়তো করিত; তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মপুত্রই (এবং কখনও কখনও হয়তো করতোয়া) যে ছিল মোটামুটি কামরূপ রাজ্যসীমা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কালের অধিকাংশ পর্বেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকাভূমিতে কামরূপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশই পুণ্ড্রবর্ধনের সীমাভুক্ত ছিল এই অনুমান অসংগত নয়; মধ্যযুগে তো উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পশ্চিমতম প্রান্ত বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলই।[৭]

অপরদিকে প্রাচীন 'বাঙলার' পূর্ব সীমান্তবর্তী জনপদ এবং রাজ্যের সাথেও শ্রীহট্টকে ইতিহাসের নানাপর্বে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়াপাহাড়; দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে পূর্ব-প্রান্তদেশীয় সীমা বিস্তৃত। পূর্বপ্রান্তদেশীয় অঞ্চল ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের

---

৩ Clarence Maloney, *Tribals of Bangladesh and Synthesis of Bangali Culture*, Mahmud Shah Qureshi (edited), *Tribal Culture in Bangladesh*, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1984, P. 10

৪ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশে মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৪

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৬ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৫,

৭ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২ সাল, পৃ. ৬৮

সাথে শ্রীহট্টের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক যোগসূত্রই এর একটি বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়–

> বাঙলার পূর্বসীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলশ্রেণির বিন্যাস দেখিলে স্পষ্টতই বোঝা যায়, বাঙলার সীমা এই পার্বত্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গোয়ালপাড়া জেলার মতো শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার কিয়দংশের লোকও বাঙলা ভাষাভাষী, এবং সামাজিক স্মৃতিশাসন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতিও বাঙলা-ভাষাভাষীর; জন এবং জাতও বাঙালির এবং বাঙলার! তাহা ছাড়া, বরাক ও সুরমানদীর উপত্যকা তো মেঘনা-উপত্যকারই (মৈমনসিং-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব বাঙলার এই কয়টি জেলার– বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও পূর্বমৈমনসিং জেলার– সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাঙলার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাঙলার এই জেলাগুলির সঙ্গে।[৮]

অনেক গবেষক এমন ধারণা পোষণ করেন যে, খ্রিষ্টীয় শতকের প্রথম থেকেই মণিপুরীরা আর্য সভ্যতা বিশেষত হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে চলে আসে। চীনা রাজদূত চাঙ-কিয়েন (খ্রিষ্টপূর্ব ১২৬) প্রদত্ত উত্তর-পূর্বমুখী বাণিজ্যিক ও পর্যটন পথের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এমত ধারণাকে সঙ্গত বলেই মেনে নেওয়া যায়– 'দক্ষিণ-চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া কামরূপ হইয়া আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ প্রান্তাতিপ্রান্ত পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়।'[৯] এই পথ সম্পর্কে নিঃসংশয় প্রকাশ করে নিহাররঞ্জন রায় আরও বলেন– 'এই পথের লোক-যাতায়াত বরাবরই কিছু কিছু ছিল; মধ্যযুগেও ছিল, এবং বর্তমান যুগেও আছে।'[১০] অর্থাৎ এই পথ ধরেই ঐতিহাসিক কালে পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী সাংস্কৃতিক যোগ তৈরি হয়ে থাকবে এটাই সঙ্গত। তাছাড়া পূর্বাভিমুখী আরেকটি পথের সন্ধান পাওয়া যায় যেটি– 'পূর্ব-বাংলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই-ময়নামতি (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান শ্রীহট্ট-শিলচর) ভিতর দিয়া, লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়া মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া, মধ্য ব্রহ্মদেশের পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'[১১] উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ মত পোষণ করা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চল উত্তর এবং পূর্ব প্রান্তদেশীয় নানা অঞ্চলের সাথে বহুমাত্রিক ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে যুক্ত ছিল। ফলে বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়– যে সকল ঐতিহাসিক এবং

---

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৯ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২ সাল, পৃ. ৯৪
১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

রাজনৈতিক কারণে সতেরো থেকে উনিশ শতকের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে একটি বৃহৎ সংখ্যক মুণিপুরীর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে (সিলেট অঞ্চলে) অভিবাসন/আগমন ঘটে, সেটি কোনো অজানা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা ছিল না বরং ঐতিহাসিক কাল থেকে সৃষ্ট বাংলা অঞ্চল তথা শ্রীহট্টের সাথে প্রান্তদেশীয় জনপদ/অঞ্চলসমূহের ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সম্পর্কসূত্রই এই আগমন/অভিবাসন-যাত্রাকে নিশ্চিতভাবে বঙ্গমুখী করে তুলেছিল।

ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কারণেই বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসরত মণিপুরী জাতি-সংস্কৃতির নৃত্য ও নাট্যের নিরীক্ষণ অথবা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্বভাবতই পার্শ্ববর্তী মণিপুর রাজ্যের মণিপুরীদের পরিবেশনা শিল্পকলার উপাদান, অনুষঙ্গ, দর্শন, তত্ত্বকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া বিষয়, ভাব-রস, সুর-ছন্দ, আঙ্গিকগত রীতি-বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় মণিপুরী নৃত্য বর্তমানে শাস্ত্রীয় নৃত্যের মর্যাদায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও চর্চিত হয়ে থাকে– '[...] প্রাচীন নৃত্যধারার সমন্বয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ক বৈষ্ণব শাস্ত্রকে ভিত্তি করে যে নতুন আঙ্গিকের নৃত্যশৈলীর উদ্ভব হলো– সেটাই পরে শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি পেলো।'[১২] সুতরাং মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা নৃত্য, নাট্য ও ক্রীড়ার বিশ্লেষণ নিরেট ভৌগোলিক বিবেচনায় দেখলে চলবে না বরং জাতিতাত্ত্বিক ভাষা, ধর্ম-দর্শন, ভাব-তত্ত্বের সাথে এবং শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান, রীতি-কাঠামো, অঙ্গ-ভঙ্গি, প্রভৃতি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনায় রেখেই এ সকল পরিবেশনার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

***

ভাষাগত দিক থেকে বাংলা অঞ্চলের মণিপুরীরা দুইটি ভাগে বিভক্ত– মৈতেয় (মেইতেই) মণিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। পৃথক এই দুটি ভাষার পরিবারও ভিন্ন– চীনা-তিব্বতি এবং ইন্দো-ইউরোপীয় (ই-ই)।[১৩] 'মৈতেয় মণিপুরীদের ভাষা হলো 'মৈতেয়' পুরনো তিব্বত-বর্মি (কুকী-চীন) শাখার একটি ভাষা। তবে সিলেট অঞ্চলের মৌলভীবাজার জেলায় 'পাঙান' নামে আরও এক সম্প্রদায়ের মণিপুরী বাস করে যাদের ধর্ম ইসলাম। মণিপুরী মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি অনেকাংশেই বাঙালী মুসলিম

---

১২ তামান্না রহমান, *মণিপুরী নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের সংস্কৃতি*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৬

১৩ চীনা-তিব্বতি : ভাষাবিজ্ঞানীরা চীনা-তিব্বতি (সিনো-তিবেতান) পরিবারের ভাষাসমূহের বিস্তৃতি মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে বার্মা এবং বালিস্টান থেকে পিকিং পর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবার দুটি ভাগে বিভক্ত (ভারতবর্ষের বাইরে আরো একটি ভাগ রয়েছে যার নাম 'য়েনিসি') চাইনিজ বা চীনা, এবং টিবেটো-বর্মন বা তিব্বতি-বর্মি। তিব্বতি-বর্মি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত– একটি টিবেটো-হিমালয়ান ও অপরটি আসাম-বার্মিজ। আসাম-বার্মিজ আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। যেমন– বোডো, নাগা, কুকি-চীন, কাচিন, বার্মিজ ইত্যাদি।

ইন্দো-ইউরোপীয় (ই-ই) : ধারণা করা হয় নর্ডিক এবং আলপিনি নামের দুই ভিন্ন নরগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আর্য ভাষার প্রবর্তন করেছিল। নর্ডিকদের রচিত ঋগ্বেদের ভাষাই আর্য ভাষার প্রাচীন নিদর্শন। ঋগ্বেদের ভাষা তথা বৈদিক ভাষা পরবর্তিতে ব্যাকরণবিদদের হাত ধরে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং নানা নিয়ম সূত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে এ ভাষা মৃত ভাষায় পরিণত হয়। আর এরই একটি রূপ কালক্রমে লোক মুখে বিকৃত হতে হতে প্রাকৃত ভাষার রূপ নেয়। এই প্রাকৃত ভাষা থেকেই অপভ্রংশ হয়ে নব্য ভারতীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি। বাংলাদেশে ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারভুক্ত ভাষার মধ্যে বাংলা উল্লেখযোগ্য [....] এছাড়া মণিপুরীদের বিষ্ণুপ্রিয়া, হাজং প্রভৃতি এই বর্গের ভাষা।

সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*, D. Shima Zamab (edited), *Survival or Extinction ? Adivasi Rights in Bangla desh,* National Human Rights Commission (JAMAKON), Bangladesh, 2014, p. 134 & 142

অনুরূপ হলেও, এঁদের ভাষাও মৈতেয়। অন্যদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত বাংলা ও অহমিয়া ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।[১৪] গবেষকগণ ভাষার এই ভিন্নতায় অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের প্রচলিত ভাষা পরিবার প্রাচীন কুকী-চীন শাখা থেকে সরে আসার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সর্বপ্লাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্যচর্চাকেই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। কেননা জাতিগত দিক থেকে মণিপুরীগণ 'আসাম-বর্মা মহাশাখার মঙ্গোলয়েড। এর মধ্যে কুকি-চীনা, গোষ্ঠীর মঙ্গোল-জাতিরা মণিপুর রাজ্যের (মেইথেই) ও লুসাই পাহাড়ের প্রধান অধিবাসী।'[১৫] তাই *জন* বা *জাতি*গত দিকে থেকেই শুধু নয়, *ভাষা*গত দিক থেকেও এই জাতি প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। বলা হয়ে থাকে যে, প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক নানা ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ ও রাজ্যে বিভক্ত মণিপুর অঞ্চলসমূহ অবশেষে একীভূত হয়ে অষ্টম শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে একটি সমন্বিত ভাষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যুক্ত হতে থাকে। এভাবে 'ভিন্ন ভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী এবং তাদের বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতি সমন্বিত হয়ে জন্ম নেয় মৈতে জাতির এবং গড়ে ওঠে মৈতৈ ভাষা ও সংস্কৃতি। '[....] ইতিহাসের গভীর পর্যালোচনা প্রমাণ করে সপ্তম শতাব্দী থেকেই মৈতৈ ভাষা সংহত রূপ লাভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্বকারী উরাকোন্থৌবার (৫৬৮-৬৫৮ খৃ.) শাসনামলে চালু করা ব্রোঞ্জ মুদ্রায় খোদাই করা বিভিন্ন বর্ণামালাই তার প্রমান।'[১৬] কিন্তু বাংলা, আসাম, ত্রিপুরসহ উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির ন্যায় মণিপুরী জাতিও বৈষ্ণবীয় প্রেম-ধর্মে আসক্ত হলে তাদের প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে বৈষ্ণব ধর্মকে সমন্বয় করে নেয় (এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে)। গ্রহণ-বর্জনের এই সময়ে মণিপুরীদের একটি অংশ কেবল ধর্মকেই নয়, পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় দর্শন ও সাহিত্যের বাহন হিসেবে 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষাকেও গ্রহণ করে নেয়। ফলে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ এবং 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা পরিবারের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে মণিপুরী জাতির এ অংশটি 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' সম্প্রদায় নামে পরিচিতি লাভ করে। অপর অংশটি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেও 'ইন্দো-আর্য' ভাষা পরিবারের সাথে যুক্ত না হয়ে প্রাচীন ভাষা মৈতেয় বা চীনা-তিব্বতি ভাষা-পরিবারের সাথে থেকে যায় সে কারণে এরা মৈতেয় মণিপুরী নামে পরিচিতি লাভ করে।

মূলত 'হিন্দ্-আর্য'[১৭] ভাষা হচ্ছে 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষার সদস্য 'গুপ্ত যুগে (খ্রিঃ ৪র্থ শতক) [.....] সংস্কৃত তখন দেশের রাজ-ভাষা; কিন্তু রাজপুরুষেরা মুখে পূর্বী প্রাকৃতেরই কোনো রূপ বলতেন। বাঙলার ভূমিজ অন্ত্যজেরাও খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকের কাছাকাছি এই হিন্দ্-আর্য গোষ্ঠীর কথিত ভাষা হিসেবে এই 'প্রাচ্য-প্রাকৃতকে'

---

১৪ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী : ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৭

১৫ গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৩৭

১৬ থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতী*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শ্রীমঙ্গল, ২০০৮, পৃ. ২০

১৭ বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসী অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোটচীনা প্রভৃতি জাতি-উপজাতিদের হটিয়ে দিয়ে বাঙলার মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করে ক্রমে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে উত্তর-ভারতের আর্য-ভাষী হিন্দ্-আর্য সভ্যতার ধারক নানা জাতের লোকেরা। তারা সকলে রক্ত হিসাবে বা জাতি হিসাবে 'আর্য' ছিল না। 'আর্য' কথাটাই সম্ভবত মূলত একটা সাংস্কৃতিক নাম। যারা পশ্চিম থেকে বাঙলা দেশে আসত তারা এই ভাষায় ও সংস্কৃতিতে একই গোষ্ঠীর। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রিঃ ৫০০ অব্দর মধ্যেই তারা সম্ভবত প্রথমে এসেছিল মগধে, পরে আসে অঙ্গে, আর আরও পরে বঙ্গে, কলিঙ্গে। গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৪

গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল।'[১৮] 'প্রাচ্য-প্রাকৃত' কেবল উচ্চ ও নিম্নকোটির মুখের ভাষা ছিল তাই নয় বরং তা সংস্কৃতের সাথে যুগপৎভাবে কাব্যেরও ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো প্রাচীন কাল থেকে, এমন নিদর্শন পাওয়া যায় ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিভিন্ন পাত্র পাত্রীদের মুখে প্রাকৃত্যের বিভিন্ন রূপের প্রয়োগের মাধ্যমে- 'সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ভাষা বলে বীর নায়কেরা; 'শৌরসেনী প্রাকৃতে' কথা বলে রাণী, রাজসখী, প্রভৃতি অভিজাত মহিলারা; তারা গান গায় আবার 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে' (তা সুললিত ছিল বলে কি?); আর শকুন্তলায় ধীবরদের মতো (সাধারণ শ্রমজীবী) মানুষেরা কথা বলে 'মাগধী প্রাকৃতে'; দস্যু ও ঘাতকেরা বলত 'পৈশাচী প্রাকৃতে'।'[১৯]

বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় ও প্রান্ত-দেশীয় ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা এবং প্রেক্ষিত বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কেননা ভাষাভিত্তিক ঐক্য এবং আত্মীয়তার সূত্র ধরেই মূলত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ তথা বঙ্গ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তদেশীয় জনপদের সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিবর্তন ঘটেছে– দিয়েছে নিয়েছে, মিলিয়েছে আর মিলেছে। আত্মীয়তার এই যোগসূত্র বিনির্মাণে বিশেষ অবদান রেখেছিল যে ভাষা, সেটি– 'প্রাচ্য-প্রাকৃত/অপভ্রংশ'। এমনও বলা হয়ে থাকে যে– 'প্রাচ্য-অপভ্রংশ ওড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া এই তিনেরই জনক। [.....] ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে সচলতা দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই তার রহস্য নিহিত আছে এইসব ভাষাগত সাদৃশ্যের উদাহরণের ভিতর আর নাটক যে এই আন্তঃ রাজ্য যোগাযোগের একটি শক্তিশালী বাহন, সে কথা বলাই বাহুল্য।'[২০] এই কথার সত্যতা যাচাইয়ে অতি দূর-অতীতে তাকানোর প্রয়োজন হয় না। মধ্যযুগের 'বৈষ্ণব আন্দোলনের বাহন হয় "ব্রজবুলি" নামক একটি কবিত্বপূর্ণ ভাষা-মাধ্যম এবং আসাম, বাংলা, মিথিলা, ও ব্রজের (বৃন্দাবন) বৈষ্ণব কবিরা সবাই এই ভাষায় কাব্য রচনা করেন।'[২১] আসামের ঐতিহ্যবাহী 'অঙ্কিয়া-নাট' মৈথিলী ও অসমীয়ার সংমিশ্রণ-সঞ্জাত একধরনেরে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত হতো। এই ব্রজবুলিই আবার এক এক অঞ্চলভেদে কিছু কিছু আঞ্চলিক ভিন্নতাসহ বাংলা, উড়িষ্যা এবং বিহারেও প্রচলিত ছিল। 'ভাষাটি বৃন্দাবনের সঙ্গে এবং সেই সূত্রে ব্রজের ভাষার সঙ্গেও যোগসূত্রস্বরূপ বিদ্যমান ছিল।'[২২] এদিকে সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত *রাসলীলা*র ভাষা ও পরিবেশনার মধ্যে যে প্রান্ত-দেশীয় ঐক্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান সেখানেও রয়েছে ব্রজবুলির প্রভাব– '[কিন্তু] বাংলা হলে কি হবে, তার গায়কী, উচ্চারণ রীতি, ভঙ্গি, আবেগ, প্রক্ষেপণ সবকিছুতে থেকে গেল একেবারেই মণিপুরী ছাপ। যে কারণে এখনো অনেক বাঙালি চিন্তকের কাছে অবিশ্বাস্য যে রাসলীলা

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
২০ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য : বিচিত্র প্রবাহ*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৫, পৃ. ১১২
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

গানগুলো বাঙলা বা অপভ্রংশ বা ব্রজবুলি ভাষায় হয়। তাদের ধারণা সব গানই মণিপুরী ভাষার।[২৩] এসকল উদ্ধৃতি বিচারে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, প্রাচ্য-অপভ্রংশ– *ব্রজবুলি* ছিল এমন এক নিকট-আত্মীয়তুল্য এবং কবিত্বপূর্ণ ভাষা, যা বাঙলাসহ প্রান্তীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগের বাহন হিসেবে বৈষ্ণবীয়– ধর্ম, দর্শন ও সাংস্কৃতিক প্লাবনকে সম্ভব করে তুলেছিল। অপরদিকে সংস্কৃত ভাষাও ছিল ভারতজুড়ে উচ্চকোটি বা রাজদরবারের আন্তঃ যোগাযোগে সর্বজনীন ভাষা– যা বেদ, পুরাণ, উপনিষদ বিশেষত, রামায়ণ ও মহাভারতের রাম ও কৃষ্ণের বাহন হয়ে মন্দির থেকে রাজদরবার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; নৃত্য, গীত, নাট্য, কাব্যের আশ্রয়ে, যার প্রকাশ ছিল শাস্ত্রীয় ও ধ্রুপদী। সুতরাং আন্তঃ যোগাযাগে ভাষাগত সমন্বয় আর আত্মীয়তার এই ধারাতেই যে সংস্কৃত শাস্ত্রীয় ও ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সাথে প্রাচ্য-প্রাকৃত প্রধান শিল্প-আঙ্গিকের মিলন-আত্তীকরণ-সমন্বয় ঘটে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত দশরূপকের অতিরিক্ত “উপরূপক”-এর স্বীকৃতি তো এই সমন্বয়-যুগেরই আত্ম-প্রকাশ বলে মনে করা যায়– ‘গৌণ নাট্যরীতি তথা ‘উপরূপক’ ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মূলধারা বহির্ভূত হলেও জনগণের মাঝে এর ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তীকালে তা পণ্ডিতগণের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয় এবং বেশ গুরুত্বলাভ করে। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর *অভিনবভারতী* গ্রন্থে উপরূপককে ‘নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।’[২৪] উল্লেখ্য– এখানে ‘প্রবন্ধ’ বলতে উৎকৃষ্ট বন্ধ বা বিন্যাস-কে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ সুচারুরূপে বিন্যস্ত যে নৃত্যকলা তাকেই বলা হয়েছে ‘নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ’। পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই সকল উপরূপকে নৃত্য ও সঙ্গীত আধিক্য ছিল বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচনার এই সকল ইঙ্গিত বিবেচনায় *মণিপুরী রাসনৃত্যের* সাথে শাস্ত্রীয়-যোগের শিকড় প্রাচীনকাল অবধি প্রথিত রয়েছে এমন দাবি তো করা যেতেই পারে। কেননা *রাসনৃত্যের* রীতি-কাঠামো, ভঙ্গিগত ‘প্রবন্ধ’ দৃষ্টে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত অষ্টাদশ উপরূপকের অন্যতম ‘হল্লীশ’ উপরূপকের বৈশিষ্ট্যের সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ তৈরি করা যায় অনায়াসে। *রাসনৃত্যের* ভাব ও ভঙ্গিগত যা কিছু সঞ্চালন-শৈলী পরিলক্ষিত হয় তা যে দূর-সম্পর্কের হলেও নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত উপরূপক ধারার গৌণ নাট্যরীতি (প্রাকৃত-প্রধান নাট্য ও সংস্কৃত ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সমন্বয়) ও চর্চার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এমন ধারণা অমূলক নয় বলেই মনে করা যায় (এ বিষয়ের পরবর্তীতে ‘রাসনৃত্য’ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

***

প্রাচ্য-প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্যের হাত ধরে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে কয়েকটি *বিষয়* সর্বাধিক বিকশিত হয়েছিল *শ্রী রাধা-কৃষ্ণের* লীলা, কাব্য, আখ্যান অন্যতম। আর এক্ষেত্রে জয়দেবকৃত *গীতগোবিন্দকে* অগ্রগণ্য বিবেচনা করা যায়। বলা হয়ে থাকে যে, *গীতগোবিন্দের* ধারাবাহিকতায় ভাষার এই বন্ধন– অর্থাৎ ‘প্রাচীন

২৩ শুভাশিস সিনহা, *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা ; রাসলীলা বিষয়ক সংখ্যা*, মণিপুরী থিয়েটার, নভেম্বর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ২০১১, পৃ. ২৪
২৪ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজারবছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ২

সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং পরবর্তী ও সমসাময়িক কালে অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে'[২৫] যেন আরও পূর্ণতা পেয়েছিল। কেননা 'জয়দেবের কালে সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের অবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের মতো; জয়দেবই বোধ হয় সর্বপ্রথম সেই সাহিত্যে নতুন স্রোত সঞ্চার করেছিলেন, লোকায়ত চলিত-সাহিত্যের গান ও গীতিনাট্যের খাত কাটিয়া।'[২৬] অভিজাত এই ভাষার আধিপত্য জয়দেবের *গীতগোবিন্দের* পথ (সংস্কৃত নাট্যচর্চা) অনুসরণ করে 'উনিশ শতকের বৈষ্ণব ও অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল।'[২৭] *গীতগোবিন্দ*-এর ভাষা রীতি ও বিন্যাস প্রসঙ্গে বলা হয় যে– এর 'আখ্যায়িকা বা বর্ণনামূলক অংশ সংস্কৃত কাব্যর ধারা অনুসরণ করিয়াছে– ভাবে, ভাষায়, শব্দে; কিন্তু পদ বা গীতগুলির সমস্ত আবহাওয়াটা অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্যের; ছন্দ এবং মিলও সেই কাব্যেরই। ছন্দ তো পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত, সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরবৃত্ত নয়। ছত্রের অন্ত্য এবং আভ্যন্তর অক্ষরের মিলও অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়াছে।'[২৮] ভাষার এই মেল-বন্ধন যে কেবল বাঙলায় ঘটেছে তা নয় বরং কৃষ্ণলীলার এই বিস্তার 'লক্ষ্মণ সেনের দরবার হইতে মিথিলার রাজদরবারে, পাঠান আমলে পুনরায় গৌড়ের রাজদরবারে, এবং তথা হইতে ত্রিপুরার মতো কোন কোন প্রত্যন্ত রাজসভায়, পদাবলীর– বিশেষ করিয়া ব্রজবুলি ভাষায় লেখা গানের– জের চৈতন্যের বাল্যকাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।'[২৯]

রাজ্য থেকে রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের রাস ও লীলা-আখ্যানের এই যে রাজকীয় পরিভ্রমণ এ থেকে দুটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যায়– প্রথমত, কেবল ভাষাগত নয় পরিবেশনাগত দিক থেকেও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য বা নাট্যবস্তু ধ্রুপদী নাট্য-ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতজনদের জনপ্রিয় শিল্প-রীতি আঙ্গিক ও শৈলীর মধ্যে বিচিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। *গীতগোবিন্দ* প্রসঙ্গে বলা হয় যে, 'জয়দেব "জানপদ" (popular) ও "অভিজাত" (elite) এই দুয়ের মাঝে এক ধরনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে থাকবেন এটাই সম্ভবপর। তিনি সেসময়ে প্রচলিত জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানকে "নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ উপরূপক" নামক সংস্কৃত ধ্রুপদ ঐতিহ্যের গঠন কাঠামোর মধ্যে একত্রিত করে পরিবেশন করেন এবং এমন একটি ধারা নির্মাণ করে যান, যা পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে অনুসৃত হয়েছে।[৩০] দ্বিতীয়ত, রাধা-কৃষ্ণ ভারতবর্ষের যে প্রান্তে এবং যখনই উচ্চকোটির আসন পেয়েছে কিংবা রাজদরবারের আতিথেয়তা পেয়েছে তখনই দেব-দ্বয়ের (রাধা-কৃষ্ণ) প্রেমময় সুরেলা শরীর সজ্জিত হয়েছে ধ্রুপদী ঐতিহ্যের পরিশীলিত, ইঙ্গিতপূর্ণ ও সুললিত সুর, ছন্দ ও দেহের ভাষা-ভঙ্গি দ্বারা। রাধা-কৃষ্ণকে ধ্রুপদী সাজে সজ্জিত করার এই বাসনা কেবল সেকাল বা একালের নয় উভয়কালেই সমভাবে দৃষ্ট হয়েছে। মহর্ষি

২৫ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৬ (বাংলা), পৃ. ৬২৮
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮
২৭ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজারবছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৩
২৮ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২ সাল, পৃ. ৬২৮
২৯ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ১০
৩০ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজারবছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৩

নারদ রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ 'নারদ-পঞ্চরাত্র' (আধুনিক কালের কোন কোন ব্যক্তি বলেন, এই গ্রন্থখানি দুই হাজার বৎসর পূর্বে বা দুই-একশত বছর পরে রচিত হইয়াছিল)[৩১] থেকে জানা যায় যে, তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় প্রভূত পারদর্শী ছিলেন। গ্রন্থটির একাদশ অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেব বলছেন–

'ব্রহ্মার আদেশে–

অথ গন্ধর্ব্বরাজস্ত ভগবানাজ্ঞয়া বিধেঃ।
সঙ্গীতজ্ঞঃ জগৌ তত্র কৃষ্ণরাসমহোৎসবম্॥
সুষমং তালমানঞ্চ সতানং মধুরশ্রুতম্।
বীণা-মৃদঙ্গ-মুরজ-যুক্তং ধ্বনিসমন্বিতম্॥
রাগিণীযুক্তরাগেন সময়োক্তেন সুন্দরম্।
মাধুর্য্যং মূর্চ্ছনাযুক্তং মনসো হর্ষকারণম্॥
বিচিত্রং নৃত্যরুচিরং রূপবেশমনুত্তমম্।
লোকানুরাগ বীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকম্॥

অর্থাৎ অনন্তর ঐশ্বর্যশালী গন্ধর্বরাজ উপবর্হন ব্রহ্মার আদেশানুসারে সেই সভাস্থলে কৃষ্ণের রাসমহোৎসব গান করিলেন। সেই সঙ্গীত সুশোভন তাল মান সুতান সুমধুর বীণা মৃদঙ্গ মুরজধ্বনি মিশ্রিত শ্রুতিমধুর। সময়োচিত রাগিণীযুক্ত সেই গান রাগমূর্ছনাযুক্ত বলিয়া মাধুর্যময় ও মনের উল্লাস কারক। সেই সভায় উপস্থিত বিচিত্র রুচির নৃত্যকারী নটদিগের মনোহর রূপ ও উত্তম বেশ অনুরাগের বীজস্বরূপ এবং হস্তাদির চালন নাট্যোপযুক্ত।'[৩২] আবার মনুসংহিতার দোহাই দিয়ে সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কীর্তন প্রসঙ্গে বলেন– 'কীর্তন নাম কীর্তন এবং লীলাকীর্তন ভেদে দুই প্রকার। নামকীর্তনে শ্রীহরির নাম ও করুণার কথাই প্রধান। আর লীলাকীর্তনে তাঁহার রূপ গুণ ও বিবিধ মনোহারী লীলার বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে। নামকীর্তনই হউক আর লীলাকীর্তনই হউক তাহা যাথাযথ তাল-প্রয়োগে এবং বিশুদ্ধ সুরে ও বিবিধ রাগ-রাগিণী-যোগে গীত না হইলে কীর্তন-পদবাচ্য হইবে না।'[৩৩] বৈষ্ণব পর্বে মণিপুরের 'রাজা ভাগ্যচন্দ্র গুরু স্বরূপানন্দ ও রসানন্দ ঠাকুরের নির্দেশনায় ও রাজ্যের অন্যান্য নৃত্য গুরুদের সহযোগিতায় রাসনৃত্যের আঙ্গিক, পোশাক, সংগীত, ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। অতঃপর মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের সমন্বয়ে আসামের যাত্রা, বাংলার কীর্তনের সংমিশ্রণে রাসনৃত্য নবরূপে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত

---

৩১ সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬৩.
৩২ প্রাগুক্ত, ৬৩
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

করেন।'[৩৪] সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লীলা হোক অথবা গীত, নৃত্য বা নাট্য হোক 'নটদিগের মনোহর রূপ অনুরাগাশ্রিত হস্ত সঞ্চালন করা', 'যথাযথ তাল-প্রয়োগে বিশুদ্ধ সুরে কীর্তন-পদবাচ্য হওয়া', অথবা 'নবরূপে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করণ' এ সবই শাস্ত্রীয়, পরিশীলিত এবং নিয়ম ও তত্ত্বসিদ্ধ উপায়ে রাধা-কৃষ্ণকে ধ্রুপদী কাঠামোর নানা উপায়ে আত্তীকরণ করারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণকে এইভাবে ধ্রুপদী অঙ্গে, সাজ-পোশাকে সাজিয়ে তোলার এই বাসনা কি শুধুই কবি-মনের আনন্দ প্রকাশের নিমিত্তে? নাকি এ-ই হচ্ছে 'পিণ্ড (দেহ) ও ব্রহ্মাণ্ডের (জগৎ)' তত্ত্বকথা অথবা প্রকৃতি-পরমের প্রতীকী মিলন গাথা?

***

বাংলাদেশের মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার নিরীক্ষামূলক আলোচনায় 'ধর্ম'– তত্ত্ব ও দর্শন প্রসঙ্গকে গৌণ-গুরুত্বে বিবেচনা করার সুযোগ নেই, বরং বলা যেতে পারে, এ জাতির ধর্ম-তত্ত্ব, দর্শন ও ক্রিয়াত্মক আচার-আনুষ্ঠানিকতার গভীরেই নিহিত রয়েছে বিশেষ এই নাট্যকলার প্রাণবায়ু। বলা যায় এখানেই নিহিত রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলা, তত্ত্ব ও দর্শনের প্রভেদ। মানুষ যখন থেকে *দেহকে* বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ মান্য করে দেহ-অভ্যন্তরেই সাধন করেছে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব অথবা স্রষ্টাকে খুঁজেছে নিজেরই *দেহ খাঁচায়* বন্দী এক অচিন পাখি (আত্মা) রূপে, সম্ভবত তখন থেকেই ভারতবাসী 'দেহকে দেহাতীত ভাবব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করবার এক অত্যাবশ্যক পূর্বশর্তরূপে ভাবতে শিখেছিল।'[৩৫] আর এই ভাবনার সূত্রপাত ঠিক কখন থেকে মানব মনে দানা বেঁধেছে তার সঠিক হিসেবে করা হয়তো আদৌ সম্ভব নয়, তবে বেদ, উপনিষদ, পৌরাণিক কবির দৃষ্টি ঠিকই মানব মনের এই ভাবনা সাঙ্গীকরণে ভুল করেনি–

> The Vedic writer is fuly conscious of the physical reality of biological man. […] Narayana, who is also the author of the *Purusa-sukta* (R.V.X. 90) describes vividly the organs, limbs, and parts such as the skeleton, bones, muscles, and veins and arteries of the body on the cosmological plane. […] He created the earth and the bodies. […] The moon was born from His mind, the sun from His eyes, from His mouth, Indra and fire, and from His breath was wind born, the heaven, the earth from His feet, the four quarters from His ear –thus they fashioned the worlds.[৩৬]

---

৩৪ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬৪
৩৫ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের-নাট্য ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৫, পৃ. ১০
৩৬ Kapila Vatsyayan, *The Square and the Circle of the Indian Arts,* Roli Books International, New Delhi, 1983, P. 9

অন্যত্র ঋগ্‌বেদের কিছু স্তবগাথায় দেখা যায় পরমপুরুষ (Supreme Being) স্বয়ং এক ব্রহ্মস্তম্ভ (Cosmic Pillar) হিসেবে কল্পিত হয়েছে– 'Several hymns in the *Rgveda* are devoted to the *Stambha or the Skambha* where the Supreme Being itself is seen as a great Cosmic Pilar.'[৩৭] কিন্তু *ব্রহ্মস্তম্ভের* রূপ-কল্পনায় এই পরমপুরুষটি কে? এর ব্যাখ্যাই বা কী? এর উত্তরে অথর্ববেদ *ব্রহ্মস্তম্ভের* অবয়বগত যে ব্যাখ্যা প্রদান করে সে তো *দেহ-অঙ্গেরই* প্রতীকী গঠন–

> Chapter X of the *Atharvaveda* reads: '(7) What is above, below and in the middle, that which the creator created as the universe, to what extent did this Pillar enter therein? The portion (of it) that did not enter, how much was that? (11) In which penance asserting itself, maintains the higher vow, wherein are the moral order and faith, the waters and the knowledge, tell (me) about that Pillar, who 'is He?' And again, '(32) Obeisance unto that supreme *Brahman* of whom earth is the footstool, the ether is the belly, and who made heaven His head. (38) The mighty adorable spirit at the centre of the world, engrossed in penance on the surface of water, on Him rest all the gods that are, even as branches round the trunk of a tree.[৩৮]

অথর্ববেদের এই বর্ণনা মতে ব্রহ্মাণ্ড বা *ব্রহ্মস্তম্ভের* (Cosmic Pillar) *মধ্যবর্তী স্তর*– মহাশূন্য (the ether is the belly) বা কেন্দ্র (Central Pillar) আকাশ (Sky) এবং মর্ত্যকে (earth) সংযুক্ত করে, যা একই সাথে পরমপুরুষ ব্রহ্মার পূর্ণাঙ্গ *দেহরূপের (স্তম্ভ)* তিনটি স্তররূপে প্রতীকায়িত হয়েছে, যেখানে– মধ্যবর্তী স্তর বা কেন্দ্র– *পেট* ভূমির সাথে পায়ের এবং মাথার সাথে আকাশকে সংযুক্ত করেছে। স্বভাবতই মধ্যবর্তী স্তরে থাকবে একটি *কেন্দ্র* বা *বিন্দু* (Central), বেদ-সূত্রে এই বিন্দুকেই দেহের *নাভি* (navel) রূপে বর্ণনা করা হয়েছে,। ফলে দেহের কেন্দ্র– *নাভিকেই স্তম্ভের মধ্যবর্তী* অংশরূপে দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গের সাথে নিম্নাঙ্গের; দেহের সাথে নিখিলের অথবা *জীবের* সাথে পরমের সংযোগ-বিন্দু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে– 'Again many hyms of the Vedas mention a centre which corresponds to the navel of the body. Thus, repeatedly we are told in these cosmological hymns that the *stambha* or the great pillar is located in the middle or the navel of the earth.'[৩৯]

নিখিল ভুবনের বস্তুগত এবং ইন্দ্রিয়াতীত সমগ্রতায় *দেহকে* যুক্ত করে নানাবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অবয়ব-অভিব্যক্তিকে প্রতীকায়িত করার ভাবনা কেবল বেদেই ব্যাখ্যাত হয়েছে তা নয়, বরং উপনিষদও দেহাঙ্গকে যুক্ত

---

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

করেছে দেহাতীত পরমের ভাবব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তির (দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক) নির্মাণ-বিনির্মাণের সূত্রে। ঐতরীয় আরণ্যক জীব (মানব) ও জগতের উৎপত্তি এবং এদের গুণাবলি একসূত্রে বর্ণনা করে– নিখিল এই ব্রহ্মাণ্ড আদিতে ছিল কেবল-ই স্ব বা *আত্মা* (self) রূপে এবং *আত্মা* থেকেই গঠিত হয়েছে মানবকুলে–

> *The Aitareya Upanishad* II.4.1 […] in the beginning there was the self who created the waters, from which he created the Primordial Man, from whose mouth, speech, nose, smell, eye, ear, heart, mind, navel and the generative organ subsequently emerged; how from these limbs and the sense organs were first created the divinities *Fire, Vayu, Aditya, Quarters, Moon, Death, Waters,* etc and then divinity man; how fire (*agni*) entered in the form of speech, air (*vayu)* in the form of breath, the sun *(aditya)* in the form of the eye, quarters (*disa*) in the form of the ear, the moon in the form of the mind, and how finally the highest self entered him'[৪০]

দেহভাণ্ডের (microcosm) এই যে অঙ্গরূপ সৃজন, বিভাজন এবং প্রতীকীকায়ন সে তো *আত্মারূপ* নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের (macrocosm) জ্ঞান অর্জনেরই নিমিত্তে– 'আমি কে? এই দেহ তো আমি নই। দেহ নশ্বর। আত্মা অবিনশ্বর। এই আমির উত্তরটা উপনিষদ আমাদের শিক্ষা দেয়। ভিতরের আমিটাকে জানতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন এই জ্ঞানটাই "আত্মজ্ঞান"।'[৪১] এরূপ অভেদাত্মক বিবেচনায় আত্মজ্ঞান বা আত্মদর্শনেই যদি নিহিত থাকে মোক্ষলাভের গূঢ়-রহস্য, তবে *দেহ* আর *আত্মার* এই অদ্বৈত-ভাবনা, এ তো কেবল বৈদিক উপনিষদ বা পৌরাণিক যুগের সত্য নয়, এ তো প্রাচ্য-প্রাকৃতযুগের সত্য, পরমসত্য বৈষ্ণবদেরও বটে–

> সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিথিলভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র; আর রাধা হইতেছেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিলভাবে বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈষ্ণবধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ-রাধা যে পুরুষ প্রকৃতি ও শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার এক পরিবারভুক্ত, এ সম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নাই।[৪২]

পরমের সন্ধানে দেহ-তে ভর করা অথবা ব্রহ্মাণ্ডের তাবদ চলন ও পরিবর্তন সূত্র দেহ-অভ্যন্তরে তালাশ করার চিরন্তন প্রবণতা, সে তো কেবল দর্শন-তত্ত্ব, কাব্য-সাহিত্য (বৈদিক থকে প্রাকৃত) রচনাতেই সীমিত ছিল তা নয় বরং মানুষ সকল যুগে সকল কালেই অঙ্গীয়-সামগ্রিকতায় প্রায়োগিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশের চেষ্টাও করেছে

---

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪১ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*, রোদেলা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১০০

৪২ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৬ (বাংলা), পৃ. ৫৪৮

সমান আগ্রহে। শাস্ত্রকারগণ তাই দেহরূপ বাহির (physical realities) এবং আত্মারূপ অন্তরের (psychical realities/sences) এক ও অভিন্ন বন্ধন, আন্তঃসংযোগ ও নির্ভরশীলতায় দেহাতীত ভাবব্যঞ্জনা ও ভুবনব্যাপী-প্রপঞ্চকেই (universal phenomenon) ব্যাখ্যা করেছে কখনো দৃশ্যকাব্য, নৃত্য অথবা গীত নানা মাধ্যমে। পরমের-স্বাদ (ultimate experience) পেতে চেয়েছে দূর-যাত্রা পথের *বৃন্দাবনে* নয়, তাঁর নিজেরই *দেহরূপ-বৃন্দাবনে*। এই যদি আত্মতত্ত্বের মূলকথা, তবে নাট্যশাস্ত্রকারগণই বা এই সাধনা হতে দূরে থাকবেন কেন; জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদাত্মক সাধনা সে তো *দেহ* ও *মনের* ভাবকেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে মানব জীবনের *অর্থ* ও *কারণ* অনুসন্ধানের নিমিত্তে যথাক্রমে নাট্য *শরীর– ইতিবৃত্ত (গঠন/বিন্যাস/প্লট)* এবং নাট্যের *আত্মা– রসের* (শিল্পী, দর্শক এবং শ্রোতার পরম আনন্দ/আস্বাদন/অভিজ্ঞতা লাভ) প্রায়োগিক ভাব/অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায়– The relationship of the one and the many, the inner and the outer, the structure of multi-layering are the guiding principles of the *rasa* (*atma*) and *itivrtta* (*sarira*).[৪৩]

সুতরাং দেহ এবং মনের (আত্মা) অদ্বৈত অভেদাত্মক উপস্থিতি, যা বহু নাম ও রূপ বৈচিত্র্যে প্রতীকায়িত হয়েছে যুগে যুগে– কখনো *জীবাত্মা-পরমাত্মার* প্রতীকে কখনো বা *পুরুষ ও প্রকৃতির* রূপে আবার কখনো অর্ধনারীশ্বর বা রাধাকৃষ্ণের অবয়বে। অভিন্ন *দেহ এবং আত্মা অথবা দেহপিণ্ড-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের* অভেদাত্মক সম্পর্কের এই পৌরাণিক ও প্রায়োগিক ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা শিল্পকলা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ইতিহাসের নানা পর্বে মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলায় যুক্ত হওয়া শাস্ত্রীয় এবং পরম্পরাগত স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যের উপাদান, অনুষঙ্গের প্রভাব এবং যুক্তি-বিযুক্তি ও সংযুক্তির বিষয়ে আলোকপাত করাই হচ্ছে এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য।

***

মণিপুরীদের ধর্মীয় সংস্কৃতি-সামগ্রিকতাকে মোটাদাগে দুটি পর্ব বা পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, শ্রী চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-পূর্ব ধর্ম, ও ক্রিয়াত্মক আচার, অনুষ্ঠান ও উৎসব-পর্ব এবং দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব পরবর্তী ধর্মীয়-সংস্কৃতি পর্ব। প্রথম পর্যায়ের আলোচনাকে আবার হিন্দু ও প্রাগ-হিন্দু ধর্ম-দর্শন ও সমন্বয়ের ধারায় দেখা যেতে পারে। তাই সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা-প্রসঙ্গ আলোচনাকে দেশীয়-সীমানা পেরিয়ে প্রান্ত দেশীয় বর্তমান মণিপুর রাজ্যকে যুক্ত করে সম্প্রসারিত ভূ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন।

৪৩ Kapila Vatsyayan, *The Square and the Circle of the Indian Arts,* Roli Books International, New Delhi, 1983, P. 48

মণিপুরীদের ধর্মীয়-সংস্কৃতির সাথে ক্রিয়াত্মক বা পরিবেশনামূলক নৃত্য-গীত-কাব্য, উৎসব-আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির যোগ-সংযোগ সেই প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে অবিচ্ছেদ্য জীবনের অংশ। সংযুক্তির এই বিষয়টি ঠিক এমন– যে নট সংকীর্তনে হয় জীবন-জন্মের উদ্‌যাপন, সেই নট সংকীর্তনেই হয় জীবন-চর্যার সমাপন। ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির এই যে সর্বব্যাপী বিচরণ, এর গভীর স্পর্শ করতে হলে বর্তমান মণিপুর রাজ্যের নৃতাত্ত্বিক গঠন এবং এই জনপদটির মিথিক্যাল ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতিও খানিকটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রায় সকল নৃ-তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতগণের ভাষ্য এমত যে, বঙ্গীয় ও তৎসংলগ্ন নানান জনপদ তো বটেই, বরং সমগ্র ভারতবর্ষে আজ যে নানান জাতি ও ভাষাতাত্ত্বিক মানুষের বহু ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক আদল গড়ে উঠেছে, তা ঐতিহাসিক-পূর্ব যুগ থেকেই আর্য ভাষা/জন-প্রবাহের ধারাবাহিক স্রোতধারার সাথে দেশীয় জন– অনার্যদের সাথে সংঘাত, সংঘর্ষ, মিলন ও মিশ্রণের ফলশ্রুতি। উত্তর-পূর্ব প্রান্তদেশীয় মণিপুরী জাতি-গোষ্ঠীও এর প্রভাবমুক্ত নয়। ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, জাতিগতভাবে মণিপুরীগণ আসাম-বর্মা মহাশাখার মঙ্গোলয়েড এবং তিব্বত-বর্মি (কুকী-চীন) ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য মেনে নিলে– 'দ্রাবিড়, নিষাদ এবং কিরাত'[৪৪] এই তিনটি অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সাথেই মূলত আর্যদের সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি এবং অনার্য কিরাতদের প্রচলিত বহুবিধ ভাষার মধ্যে কুকী, মেইতেই বা মণিপুরী ছিল অন্যতম। ভারতবর্ষে কিরাতদের উপস্থিতির কথা বেদ থেকেই জানা যায় প্রথম– 'ভারতে কিরাতদের উপস্থিতির কথা আমরা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ হইতে জানিতে পারি; অন্ততঃ খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসরের পূর্ব হইতে কিরাতগণ আসাম ও হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালে, উত্তর বিহারে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এবং আসামে উপনিবিষ্ট হইতে থাকে।'[৪৫] এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বেদে কিরাতদের উপস্থিতির কথা কেবল উল্লেখ-মাত্র ছিল না বরং এটিই ছিল আর্য-সংস্কৃতি-বলয়ে কিরাতগণ তথা অনার্য ভাষা/জনদের অন্তর্গত/সংযুক্ত হওয়ার বৈদিক-ভাষণ– 'হিন্দু মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনার্য্য জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহাদের নিজস্ব দেবতাদের ও প্রাচীন রাজাদের কাহিনী– এক কথায়, তাহাদের পুরাণ-কথা– নতুন মিলিত আর্য্যানার্য্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া, কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া, সংস্কৃত ভাষায় নব কলেবর প্রাপ্ত হয়, ও তদন্তর নিখিল ভারতের গ্রহণযোগ্য হয়।'[৪৬] ইতিপূর্বেই ভাষা-সংস্কৃতিগত আলোচনায় ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্থানীয় বা জাতি-ভাষা প্রাচ্য-প্রাকৃতের অন্তর্ভুক্তি ও চরিত্রানুগ ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে সে তো এই সমন্বয়-যুগেরই সাক্ষ্য বহন করে। এমনকি পঞ্চম বেদ নামে পরিচিত এই নাট্যশাস্ত্রেও

---

৪৪ উত্তরবঙ্গ ও আসামের তথা ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসীগণ বোড়ো, মিকির, মিশমি, নাগা, কুকি, মেইতেই বা মণিপুরী প্রভৃতি এবং আসামে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আগত অহমগণ– ইহারা হইতেছে কিরাত-জাতীয় মানুষ।
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মণিপুর-পুরাণ*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

স্থানীয় বা জাতি-ভাষার আলোচনায় কিরাত প্রসঙ্গ রয়েছে, যেখানে– 'বর্বর, কিরাত, অন্ধ্র, শবর, ও চণ্ডাল প্রভৃতির ভাষা কিরূপ ছিল তা জানা যায়।'[৪৭] তাছাড়া *নাট্যশাস্ত্র* উদ্ভবের মূলেই তো ছিল একটি মহা-সমন্বয়ের প্রায়োগিক/ব্যবহারিক প্রতিফলন– Bharata elaborates further by specifying the elements, culling out 'words' (*pathya)* from the *Rgveda,* acting' (*abhinaya*) from the *Yajurveda,* 'song' (*gita*) from the *Samaveda,* and the 'emotion' (*rasa*) from *Atharvaveda* (N .S .B .I. 17-18)[৪৮]

আলোচনার এ সকল দিক বিচারে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, প্রাচীন আসাম-বর্মা মহাশাখার মঙ্গোলয়েড পরিবার ভূক্ত মণিপুরীগণ জাতিগতভাবে 'বিরাট কিরাত-জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত কুকি (বা চীন, অথবা কুকি-চীন) প্রশাখার একটি বিশিষ্ট উপজাতি। সৌন্দর্য্যবোধ এবং কর্মকুশলতায়, তথা চিন্তাশীলতার ও মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজেদের প্রাচীন দেব-কথা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই; ইহা একাধারে ইহাদের রক্ষণশীলতার ও জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আনুষঙ্গিক আত্মসম্মান-জ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক।'[৪৯] সুতরাং ভাষা ও জাতিগত পরিচয়ের সূত্রে মণিপুরীদের শরীরে পূর্ব-জন কিরাতদের রক্ত-প্রবাহের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে এবং বেদ ও নাট্যশাস্ত্রে কিরাতজনদের উদ্ধৃত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় এনে এমন অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত হবে না যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে কিরাতগণ উচ্চকোটি আর্যদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল এবং বর্তমান *মণিপুরী জাতি* এই মিশ্র *আর্য্যানার্য্য* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরি।

তাছাড়া *মণিপুর পুরাণের* (মিশ্র মণিপুরী– মেইতেই বা কুকি-চিন ও হিন্দু শাস্ত্রীয় পুরাণ-কাহিনীকে মণিপুর পুরাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে) একাধিক উপাখ্যান থেকে যেমন ধর্ম ও জাতিগত পরিচয়ের প্রাচীন ইঙ্গিত ধরতে পারা যায় অপরদিকে মিশ্র *আর্য্যানার্য্য* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি উপাখ্যানের বর্ণনায় দেখা যায়–

> শিব ও পার্বতী মণিপুর রাজ্যের ঈশান-কোণে অবস্থিত 'কোউ-ব্রু' বা কুমার পর্বতে গিয়া অবস্থান করিলেন। মণিপুরে ইহাদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইহারা এখানে আসিয়া রাস-নৃত্য করিবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাস-নৃত্য করিতেছেন, তখন গোপেশ্বর শিব ও দেবী রাস-মণ্ডপের বাহিরে দ্বারে দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত। ভিতরে রাস-নৃত্যের বাদ্য ও ধ্বনি শুনিয়া দেবীর আকাঙ্ক্ষা হইল যে, তিনিও রাসদর্শন করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি শিব ও উমাকে অন্য কোনোও উপযুক্ত স্থানে গিয়া নিজেরা যাহাতে রাস-নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন,

---

৪৭ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪

৪৮ Kapila Vatsyayan, *The Square and the Circle of the Indian Arts,* Roli Books International, New Delhi, 1983, P. 40

৪৯ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মণিপুর-পুরাণ*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৭

তদ্বিষয়ে নির্দেশ করিলেন। মহারাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ইহারা মণিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং 'কোউ-ব্রু' পাহাড় রাসের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া, শিব ও উমা বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু দেশটি নানা নদীর জন্য জলময় ছিল। যাহাতে দেশটি শুষ্ক হইয়া যায়, তজ্জন্য শিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন আগমন করিলেন; একটি বিশেষ অঞ্চল জনশূন্য হওয়ায় উহা 'বিষ্ণুপুর' নামে পরিচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সঙ্গে দশজন দেবতা আসিলেন– 'হাওবা শোরারেল' বা ইন্দ্র, 'মারজিঙ' বা কুবের, 'বাঙব্রেল্' বা যম, 'খোরিফাবা' বা বরুণ, 'ইরুম নিঙখৌ' বা অগ্নি, 'থাঙজিঙ' বা অশ্বিনীকুমার অথবা নির্ঋতি, 'চিঙ্ খেই-নিঙ থোই' বা ঈমান, 'লোইয়া-লাকপা' বা বায়ু এবং 'নোঙসোবা' ও 'কোঙ্বা-মেইরোম্ব'। ইহাদের চেষ্টায় সমস্ত দেশটি আর্দ্রতা হইতে মুক্ত হইল, এবং এই দশজন দেবতার প্রথম আটজন অষ্ট দিক্পাল হইলেন, কেবল 'নোঙ্সাবা' ও 'কোঙ্বা-মেইরোম্ব' ইন্দ্রের সহিত পূর্বের অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিলেন। মণিপুরে শিব ও পার্বতী আসিয়া পর্বতের অধিবাসীরূপে কেবল কিরাত-জাতীয় লোকেদের দেখা পান।[৫০]

অপর এক প্রচীন মণিপুরী পুরাণে (লৈথাক লৈখারোল) প্রথম মানব সৃষ্টির উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে, অনেকের মতে এটি আর্য-পূর্ব যুগের মণিপুরী সৃষ্টি-কথন। উপাখ্যানটিতে দুটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে– প্রথমত, এই পুরাণে মণিপুরী জাতির সাতটি 'শালাই' বা উপজাতি/গোত্রের পূর্বপুরুষদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, পরমেশ্বর 'আতিয়া-গুরু-শি-দবার' সঙ্গী সাত অপ্সরার সাথে সাত গ্রহ-দেবতার বিয়ে হয় এবং এদের প্রত্যেকের একটি করে পুত্র হয়, এই পুত্ররাই মণিপুরীদের সাতটি গোত্র বা উপজাতির পূর্বপুরুষ। এই বৈবাহিক সম্পর্ককে প্রকারান্তরে আর্যদের সাথে আর্য-পূর্ব মণিপুরীদের মিলন-মিশ্রণের প্রতীকী কথন রূপেও ব্যাখ্যা করা যায়, কেননা এই উপাখ্যানে 'আর্য্য বা হিন্দু গোত্রের সহিত এই সাতটি গোত্রের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।'[৫১] দ্বিতীয়ত, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বহুকে এক *দেহভাণ্ডে* নানা রূপে প্রতীকায়নের প্রবণতা এসকল পুরাণেও লক্ষ্য করা যায়– 'ইহার পরে আতিয়া-গুরু-শি-দবা মানবের রূপে সূর্য্য (নুমিৎ) ও চন্দ্র ('থা') সৃজন করিলেন; সূর্য্যের নাম হইল 'কোজিন্-তু থোক্পা ও চন্দ্রের "আশিবা".'[৫২] বলা যায়, এ হচ্ছে চিরকালের অদ্বৈত ভাবনা যা ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের সংস্কৃতি বিনির্মাণকে সম্ভব করে তুলেছে– 'বিশ্বের সভ্যতাবিকাশে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজন-বিদিত। ভারতবর্ষ চিরকাল বহুর মধ্যে ঐক্যস্থাপনে প্রয়াসী। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরম্পরা ওই সাধনার এক পুণ্যময় প্রমাণ।'[৫৩]

এ কথা সত্য যে, পুরাণ বর্ণিত আখ্যান, উপাখ্যানগুলোকে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি-তর্কের দৃষ্টিতে বিচার করা যায় না। তথাপি জাতি সংস্কৃতির পরিবেশনামূলক অনুষঙ্গের গঠন-কাঠামো, বিকাশ ও বিবর্তনের উৎস নির্ণয়ের

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৫৩ দর্শনা ঝাভেরী, কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন*, মণিপুরী নর্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১

প্রেক্ষাপটে পুরাণোক্ত উপাখ্যানে বর্ণিত চরিত্রদের সাথে আর্যদের শাস্ত্র বর্ণিত নানা চরিত্রের যেরূপ আত্মীয়তা ও মৈত্রী-বন্ধনের দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হলো, মিলন-আত্তীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সকল দৃষ্টান্তসমূহকে মণিপুরীদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করাকে সঙ্গত বলেই মনে করি। আর এই সূত্রধরে বলা যায় যে, 'কোউ-ব্রু' পাহাড়ের কিরাতজনের মাঝে *রাস-নৃত্য* প্রচলনের বর্ণনা অথবা গ্রহ-দেবতাদের সাথে অপ্সরাদের বিবাহসূত্রে মণিপুরী *গোত্রের* উদ্ভব হওয়ার বিষয়গুলো নেহাতই উপাখ্যানের কল্পকথা নয়, বরং এই হচ্ছে স্থানীয়দের সাথে বহির ভাষা, ধর্ম ও জন সংস্কৃতির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ার বা *আর্য্যানার্য্যের* সমন্বিত পুরাণ কথন এবং সম্ভবত মণিপুরীদের পরিবেশনামূলক ঐতিহ্যেরও প্রাচীনতম ইঙ্গিত।

মণিপুরীদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির প্রধান উপাস্য দেবতা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রেম যে উপাসন-ার *আত্মা* বা *প্রাণ* আর ক্রিয়াত্মক অনুষ্ঠানাদি বা সংকীর্তন যার *শরীর*– 'সঙ্কীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥'[৫৪] বলা হয়ে থাকে যে, বৈদিক পরবর্তী পুরাণ-যুগে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ব্যাপ্তি ছিল সর্বময়– 'পুরাণ-কথায় ঐশ্বর্য সকলের চেয়ে বেশি আশ্রয় করিয়াছে বিষ্ণু-কৃষ্ণ কথাকে। বিষ্ণু এখন আর ভাগবতদ্ধর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কৃষ্ণ এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারী, প্রভৃতি তাঁহার নাম। এই সব নামের প্রত্যেকটির সঙ্গেই কাব্য ও পুরাণ-কাহিনী জড়িত।'[৫৫] বিষ্ণুর উপাসক অর্থে বৈষ্ণব, এই হিসেব তো বহু প্রাচীন। এ কারণেই ব্রহ্মাণ্ড থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু থেকে কৃষ্ণের একাধিক রূপ-পরিক্রমায় লক্ষ্য করা যায় যে, বঙ্গীয় অঞ্চলে (বহৎ বঙ্গ) এসে এই কৃষ্ণ দুটি বিশিষ্ট ধারায় বিস্তার লাভ করেছে, যার একদিকে রয়েছে দেবকুলের পরমপুরুষ, ধর্মযুদ্ধের ব্যাখ্যাদাতা, বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশিত দেবলোকের অশরীরী শ্রীকৃষ্ণ এবং অপরদিকে পুরাণ নির্দেশিত ভক্তি ও প্রেমময় পরমপুরুষ তবে 'আধ্যাত্মিক বিগ্রহ মাত্র নন; একটু স্থূল হলেও রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধি' অর্থাৎ দেহরূপে বিরাজমান মর্তলোকের-কৃষ্ণ।[৫৬] এ প্রসঙ্গে কপিলা বাৎসায়ণের ব্যাখ্যাটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য–

> কৃষ্ণকাহিনীর দুটি বিশিষ্ট ও দৃশ্যতঃ একের সঙ্গে অন্যটির সম্পর্কহীন ধারা আছে যা ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পগুলির ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এর প্রথমটি হলো মহাভারত ও ভগবদ্‌গীতার কৃষ্ণ, তা সে-বিষয়টি ঐতিহাসিক সত্যের একটি ক্ষীণ ভিত্তির উপরেই স্থাপিত হোক আর কল্পকথাই হোক, অন্যটি হলো বৃন্দাবন ও মথুরার বালক কৃষ্ণ, যার জীবনকথা বিধৃত আছে মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ রচিত 'হরিবংশ পুরাণে'। [...] বৃন্দাবন ও মথুরাবিহারী কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করে গঠিত সাহিত্য ও শিল্পের ঐতিহ্য এমন এক পরিপূরক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, যে ঐতিহ্য প্রথম ঐতিহ্যের (রামভিত্তিক ঐতিহ্য) মতই সমান শক্তিশালী ও জনপ্রিয়। এর ধারাবাহিকতা দু'হাজার বছর কি তারও বেশী সময়

---

৫৪ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৮৫

৫৫ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০০ সন, পৃ. ৫১১

৫৬ গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৪৮

ধরে ব্যাপ্ত রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণাদি, নাটকাদি ও কাব্যাদির মধ্য দিয়ে এবং দ্বাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছড়ানো ভারতের বিবিধ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতা ও নাট্যসৃষ্টিতে তার বিস্তৃতি।[৫৭]

কেউ কেউ মনে করেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধ্রুপদী নৃত্য/নাট্যের সূত্রপাত রামায়ণ, মহাভারতের সময়কাল থেকে– 'মহাভারতের যুগের নৃত্যের উপাদান বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে যে 'ক্ল্যাসিক্যাল' যুগের সূত্রপাত ধরা হয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যেরও সূত্রপাত বুঝতে হবে।'[৫৮] তবে রামায়ণ-মহাভারতে যে সকল নৃত্যের উল্লেখ ও নিদর্শন দেখা যায়, *হরিবংশ পুরাণ* (২০০ খ্রীঃ পূর্বে সংকলিত)-এর যুগে এসে নৃত্যের এই বিষয়টি যেন অনেকাংশে পূর্ণতা পেল, বিশিষ্টরূপ পেল। *হরিবংশ পুরাণে* বিষ্ণু– নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাসুদেবের স্তব-স্তুতি ও উপাসনা প্রাধান্য পেলেও বিশেষ কতক নৃত্য-আঙ্গিক ও শৈলীর স্পষ্ট বর্ণনা থাকায় তা পুরাণের সাথে পরিবেশনা রীতি-আঙ্গিক ও শৈলীগত সম্পর্ক এবং নৃত্যকলার তত্ত্বগত উপস্থিতির বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে– 'হরিবংশ পুরাণেই যেন কয়েকটি নৃত্যের নাম স্পষ্ট পাওয়া গেল– যে নামের নৃত্যগুলি পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত কোন কোন ক্ল্যাসিক্যাল নাচে, সেই নাচগুলির আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন হরিবংশ উল্লিখিত "হল্লিসক" (Hallisaka) "রাস" নৃত্য (Rasa) এবং "ছালিক্য" (Chalikya) গান ও নৃত্য, "আসারিত" নৃত্য প্রভৃতির মধ্যে "রাসনৃত্য" তো আমরা বর্তমান মণিপুরী ক্ল্যাসিক্যাল নাচে নানা নামে ও আঙ্গিকে এ যুগেও বিভিন্ন মঞ্চে ও অনুষ্ঠানে দেখে থাকি।'[৫৯] এদিকে বাংলায় কৃষ্ণ-কাহিনী ও বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারে নীহাররঞ্জন রায়ের স্পষ্ট ধারণা এমন যে– 'বোধ হয় সংশয় করা চলে না যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের লোকায়ত বাঙালী জীবনে কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণের কাহিনী যথেষ্ট প্রসার ও সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং এই কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণ আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সীমাও বিস্তৃত হইয়াছিল।'[৬০] অপরদিকে মধ্যযুগের বাংলা ও প্রান্ত দেশীয় বিভিন্ন রাজ্যে বিকশিত শ্রী চৈতন্যদেব প্রবর্তিত রাধা-কৃষ্ণ আখ্যানের যে সকল রীতি-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করা যায়, এর উৎসমূলেও রয়েছে পুরাণ-উপপুরাণ– ভাগবত-পুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রেরণা ও ভক্তি-বীজ। এদের মধ্যে *হরিবংশ পুরাণের* কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি বলা হয়ে থাকে যে, ভাগবত পুরাণ হচ্ছে এই সকল পুরাণাদির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের প্রচার ও প্রসারে রয়েছে যার ব্যাপক ভূমিকা– 'সামগ্রিকভাবে ছত্রিশটি পুরাণ-উপপুরাণ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বৈষ্ণব ধর্মতাত্ত্বিক ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছে কৃষ্ণ ভাগবতই একমাত্র আরাধ্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য। এমনকি মধ্যযুগে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার বহু পূর্ব

৫৭ কপিলা বাৎস্যায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লি, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৩
৫৮ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯২
৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৬০ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০০ সন, পৃ. ৫০০

থেকে বাঙালি কবিগণ, ভাগবত-কাহিনী দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।'[৬১] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি অনুসারে খ্রিষ্টীয় 'দশম শতাব্দীর দিকে পূর্বভারতে'[৬২] ভাগবত পুরাণের প্রচলন শুরু হয় এবং এই ভাগবতের 'দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত বর্ণিত কৃষ্ণকথার প্রভাবেই বাঙলা ভাষায় চতুর্দশ শতকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পাঁচালির উদ্ভব। কিন্তু অন্যান্য পুরাণ, যথা বিষ্ণু ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ভাগবতের অনুরূপ কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান দৃষ্ট হয়।'[৬৩] আর এক্ষেত্রে বাংলায় কৃষ্ণ কাহিনীর বিস্তারে যে কাব্যটি প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে সেটি জয়দেবে *গীতগোবিন্দ* (বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে), যাকে বাংলায় আধুনিক আর্যভাষার আদি কবি হিসেবে দেখা হয়।

আলোচনার এই প্রেক্ষিতে বাংলা ও প্রান্তদেশীয় রাজ্যসমূহে বৈষ্ণববাদ বিস্তারের বিষয়টিকে একটি ধারাবাহিক সমগ্রতায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে– বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত পুরাণের যোগসূত্রে জয়দেব রচিত ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত *গীতগোবিন্দের* পথ ধরেই বাংলার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও পরিবেশনা আসরে রাধা-কৃষ্ণের পদার্পণ ঘটে। মধ্যযুগে বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* আসরে মর্তলোকে সাধারণ মানুষের মাঝে এসে এই রাধা-কৃষ্ণই সহজ উপবেশন করে। পরিশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের *কৃষ্ণলীলার* আসরে উপনীত হয়ে *পরমাত্মার* প্রতিনিধি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাংলার ভক্তহৃদয়ে স্থায়ী অধিষ্ঠান করে নেয়। অতঃপর মধ্যযুগের পরবর্তী সময়জুড়ে এই রাধা-কৃষ্ণ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রান্ত থেকে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলজুড়ে।

এতক্ষণের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, শাস্ত্র ও পুরাণের হাত ধরেই এতদঞ্চলে কৃষ্ণ কাহিনীর প্রসার ঘটেছে এবং এ ধারায় গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ থেকেই বৈষ্ণবদের বিস্তার লাভ করেছে এমনটাই দাবি করা হয়েছে একাধিক গবেষকগণের বয়ানে। তথাপি এই কৃষ্ণ বঙ্গীয় অঞ্চলে এসে তাঁর শাস্ত্রীয় বিশেষণ ছেড়ে দিয়ে সাধারণের মাঝে, সাধারণের গীত, কাব্য, সাহিত্যে কানু, কালা, কানাই প্রভৃতি নাম-রূপে আপন-ভাবে আপন-বিশেষণে মিশে গেছে নানা বর্ণ, ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার মানুষে মাঝে।

***

অপরদিকে মণিপুরীগণের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির যে রূপ বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়, এর গভীরে রয়েছে তিনটি ধর্মীয় স্রোতধারার রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানের সমন্বয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আফসার আহমদের মন্তব্যটি গ্রহণ করা যেতে পারে–

---

৬১ সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০২
৬২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (২য় খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ. ৭১৮
৬৩ সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০১

মণিপুরীরা প্রধানতঃ বৈষ্ণব ধর্মানুসারী। এদের মধ্যে অনেকেই আছে প্রাচীন ‘আপোকপা পন্থী’ যারা রাজা গরীব নওয়াজের আমলে শান্তিদাস গোস্বামী প্রচারিত রামানন্দী বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে নি। তবে মেইতেইদের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও বিষ্ণুপ্রিয়ারা সকলেই ধর্মত বৈষ্ণব। মণিপুরীদের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ বা মতাদর্শ স্পষ্ট না হলেও আঠারো শতকের শুরুতে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব-মতবাদের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। আসামের শঙ্করাচার্যের ধর্মপ্রভাবও এতে পরিলক্ষিত হয়। আদি ধর্ম ‘আপোকপা’, বৈষ্ণবধর্ম ও হিন্দু সনাতন ধর্মের সমন্বিত ত্রিমাত্রিক রূপ পরিদৃশ্যমান হয়। আর এই ত্রিমাত্রিক রূপটির মূল সুর তাদের উৎসব, পর্ব, পার্বণ ও নানা রকম আচারের ভেতর দিয়ে একটি সর্বজনীন রূপ পেয়েছে।[৬৪]

এক্ষেত্রে নবীনতম রূপটি বৈষ্ণবধর্ম হওয়াটাই সঙ্গত এবং হিন্দু সনাতম ধর্মের সংস্পর্শে আসার পূর্বে মণিপুরীদের স্থানীয় ‘ধর্ম বিশ্বাস ছিল ‘আপোকপা’ ধর্ম বা সনামহী লাইনিং অর্থাৎ প্রাচীনতম রূপ। আপোকপা শব্দের অর্থ জন্মদাতা। সে কারণেই কেউ কেউ এ ধর্মকে ‘ancestral worshipping’ বা পূর্বপুরুষের পূজা বলে অভিহিত করে থাকেন। আবার কেউ কেউ এ ধর্মের প্রধান দেবতা ‘সনামহী’র নামানুসারে এ ধর্ম বিশ্বাসকে সনমহী লাইনীং ‘Sanamahi cult’ বলেও উল্লেখ করেন। কারও কারও মতে এ ধর্মমত প্রকৃতি পূজারই নামান্তর।’[৬৫] গবেষক রণজিৎ সিংহ মনে করেন, ‘বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের বহু পূর্ব থেকেই মণিপুরীরা হিন্দুধর্মের আওতায় এসেছিল বলে জানা যায়। মহাভারত মহাগ্রন্থ মতে, চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহন বৈষ্ণধর্মের অনুসারী ছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে তারা বিষ্ণুর উপাসনা করত।’[৬৬] এক্ষণে আবারও যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, মণিপুরীগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের বহু পূর্বেই হিন্দু ধর্মের সংস্পর্শে আসে এবং ঐতিহাসিকপূর্ব কাল থেকেই স্থানীয় বা আদি ধর্মের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে *আর্যানার্য* মিশ্র-সংস্কৃতি গড়ে তোলে– ‘ধর্মীয় দিক থেকে আগে ছিল শাক্ত প্রাধান্য– তাই শিব পার্বতী ছিল নাচের প্রধান দেবতা। পরবর্তীকালে বাংলার গৌড়ীয় ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব প্রাধান্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলা শুরু হয়। এই ব্যাপারে জয়দেব রচিত “গীতগোবিন্দ” গ্রন্থটির প্রভাব অপরিসীম। অবশ্য এই গ্রন্থটির ভাবরস ভারতীয় নৃত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাকেই রস সিক্ত করেছে।[৬৭] এছাড়াও সমন্বয়ের প্রসঙ্গে মণিপুরী রাজ-রাজাদের নাম গ্রহণে চমকপ্রদ একটি প্রবণতা ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা যায়– ‘ইহাদের সকলেরই দুইটি করিয়া নাম মিলে একটি সংস্কৃত, একটি মণিপুরী। যেমন “কোইবা তোম্বা” বা ক্ষেমচন্দ্র, “কোন্থোউবা’ বা কবিচন্দ্র সিংহ”,

৬৪ আফসার আহমদ, চাঁদ নয়, রাধা নেমে এসেছিল মহারাস-পূর্ণিমার আসরে, শুভাশিস সিনহা (সম্পাদিত), *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা, রাসলীলা বিষয়ক সংখ্যা*, মণিপুরী থিয়েটার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নভেম্বর, ২০১১, পৃ. ৭

৬৫ এ কে শেরাম, *মণিপুরীদের ঐতিহ্যময় নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৯

৬৬ রণজিৎ সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৫৭

৬৭ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৫

"অয়াংবা" বা "অখণ্ড প্রতাপ সিংহ।'[৬৮] পরবর্তী সময় অর্থাৎ প্রাচীনযুগের শেষ দিকে এবং মধ্যযুগেও নাম গ্রহণের এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল, যেমন– ১১২৭ থেকে ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিলেন রাজা 'লোয়াম্বা' বা লবঙ্গ সিংহ, ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রভাবশালী রাজা 'পামহেইবা' বা গরীবনওয়াজ অথবা গোপাল সিংহ, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মোয়াম্বা' বা গৌরশ্যাম সিংহ, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রভাবশালী রাজা মহারাজ 'চিঙ্আঙ্-থাম্বা' বা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ, মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যিনি সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেন, প্রমুখ সকল রাজগণই সংস্কৃত এবং মণিপুরী দুটি নাম-পরিচয় গ্রহণ করেন। নাম গ্রহণের এই প্রবণতা পক্ষান্তরে মণিপুরী রাজা মহারাজাদের আর্য সংস্কৃতির প্রতি প্রবল-প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

তাছাড়া মণিপুরীদের সাথে আর্যদের সখ্যতা দেখা গেছে ইতিহাসের নানা পর্বে, নানাভাবে। মণিপুরীরা সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে লালন করে এসেছে। ধারণা করা হয় 'খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে মণিপুরীরা আর্য সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মের আওতায় এসে পড়ে।'[৬৯] এই মতকে সমর্থন করে *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন* গ্রন্থ– '৩৩ খ্রীষ্টাব্দে *পাখাংবার* সময়কালে পশ্চিম থেকে *পৈরোইতোন* এসে আর্য-সংস্কৃতির প্রচার করেন। [...] অষ্টম শতাব্দীর অন্তিম ভাগে রাজা খোঙতেকচার শাসনকালে এক তাম্রলিপির প্রারম্ভে 'শ্রীহরি' শব্দ দিয়ে করা হয়েছে। [...] ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্মার পোংরাজা *খেখোম্বা* মণিপুর রাজা *কিয়াম্বাকে* বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়েছিলেন। রাজা এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজা করেছিলেন। এই স্থান বিষ্ণুপুর নামে প্রসিদ্ধ।'[৭০] মণিপুরী নৃত্য বিশেষজ্ঞ দেবযানী চলিহা মনেকরেন– 'মণিপুরের ঐতিহ্য মূলত ভারত-মোঙ্গলীয়, যদিও ইতিহাসের ধারায় তা আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে মিশে একটি নিজস্ব রূপ নিয়েছে। যে তান্ত্রিক সূত্রটি কাশ্মীর থেকে শুরু করে নেপাল, ভুটান, কামরূপ ও বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার রেশ মণিপুরে স্পষ্ট। লাই হারাওবাতে পুরাণ-তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। মাইবীর পূজারীতিতে তান্ত্রিক সাধনার আভাস পাওয়া যায়।'[৭১]

সুতরাং মণিপুরী ধর্ম-সংস্কৃতির সামগ্রিক আলোচনায় ভাষা, ধর্ম, জাতি ও নৃ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ অন্তে এমনটা মনে করা যায় যে, মণিপুরীদের পরিবেশনামূলক ধর্মীয়-সংস্কৃতির যে সামগ্রিক আদলটি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, তা ঐতিহাসিক কালের নানা পর্যায়ে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির যোগ-সংযোগ এবং প্রবল বোঝাপড়ার ধারাবাহিক ও পরম্পরাগত ফলশ্রুতি, আর এটি সম্ভব হয়েছে মূলত একটি মহা-মিশ্রণ বা সিনথেসিসের মাধ্যমে। যার একদিকে রয়েছে প্রকৃতি পূজারি মণিপুরীদের আদি ধর্মবিশ্বাস– প্রাচীন মেইতেই সংস্কৃতিজাত আপোকপা ধর্ম ও তান্ত্রিক আচার, উৎসব, রীতি-পদ্ধতি এবং অপদিকে রয়েছে আর্য হিন্দু সংস্কৃতিজাত ভাষা, ধর্ম এবং শিল্প-সাহিত্য– [...] the ethos of Meithei culture has been systematically subsumed

৬৮ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মণিপুর-পুরাণ*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৪

৬৯ তামান্না রহমান, *মণিপুরী নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের সংস্কৃতি*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা) *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৫

৭০ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ. ১৪

৭১ দেবযানী চলিহা, *মণিপুরী নৃত্যে দুটি ধারা*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৮

within the values of an increasingly powerful Hindu hegemony।[৭২] বোঝাপড়ার এই পর্যায়টি খ্রিষ্টীয় যুগের পূর্ব থেকে পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমান্বয়ে সমন্বিত হতে থাকে এবং এই সময়ে মণিপুরী উচ্চকোটি সমাজের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রাজসভা থেকে মন্দির উভয় প্রাঙ্গণে ধর্মভিত্তিক কাব্য-সাহিত্য ও পরিবেশনা শিল্পকলা একটি বিশিষ্ট ও পরিশীলিত রূপ লাভ করে। মূলত এই পর্যায়ে আর্য বা উচ্চকোটির ধ্রুপদী শিল্প-ঐতিহ্য অনার্য শিল্পকলা ঐতিহ্যকে সমন্বয় ও সংরক্ষণ করেই বিকশিত হয়েছে। কেননা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, ধ্রুপদী শিল্পকলা ঐতিহ্যের সাথে উচ্চকোটির রাজ-রাজাদের প্রীতি ও সম্পৃতির ইতিহাস এবং স্থানীয় পর্যায়ের শিল্পী কলা-কুশলীদের সাথে এদের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর যোগাযোগের ইতিহাস খ্রিষ্টপূর্ব যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারাটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের, যে ধারাটি ঐতিহাসিকভাবেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত *আর্য্যানার্য্য* শিল্পকলা ঐতিহ্যের সাথে মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় ভাব/ভক্তি/প্রেমের সংযোগ-সম্পর্ক ও সমন্বয়ে নবরূপে আবির্ভূত একটি ধারা। এই পর্বেও উচ্চকোটির বা রাজা মহারাজা এবং ব্রাহ্মণদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় মণিপুরীদের প্রচলিত *আর্যানার্য* শিল্পকলা ঐতিহ্য তথা পরম্পরাগত মণিপুরীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে বৈষ্ণবী ভাব, ভক্তি, প্রেমধর্মের সমন্বয় ঘটেছে (পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে)। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নব বিকশিত শিল্পকলার এই ঐতিহ্যটি শ্রীচৈতন্যের ভাব, ভক্তি ও প্রেমধর্মকে গ্রহণ করলেও পরিবেশনার রীতি, বৈশিষ্ট্য ও শৈলীগত ভঙ্গি বা পদ্ধতিতে বাংলার তথা মথুরা-বৃন্দাবনী ধারা সম্পূর্ণত অনুসরণ করা হয়নি বরং মণিপুরীগণ স্বীয়-পরম্পরাগত *আর্যানার্য* সংস্কৃতির শিল্পকলা ঐতিহ্যকেই (নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কৃত্যমূলক আচার আনুষ্ঠানিকতা) সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে।

তদ্‌সত্ত্বেও মধ্যযুগে মণিপুরী সমাজে শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের (১৭৫৯-১৭৯৮ খ্রিঃ) শাসনামলে সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই সময়ে 'মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম রাজার, রাজবংশের ও জনসাধারণের ধর্মরূপে গৃহীত হয়। নবদ্বীপ হইতে গোস্বামী ও ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মণিপুরের বৈষ্ণব ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন।'[৭৩] যদিও রাজা ভাগ্যচন্দ্র শাসনামলের বহু পূর্বেই বৈষ্ণব ধর্ম সাধারণের মাঝে পরিচিতি লাভ করেছিল এমন দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়–

> 'নরোত্তম ঠাকুরের প্রধান শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী গুরু প্রণালিকা অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বৈষ্ণববাদ প্রচারে ভূমিকা রাখেন। তিনি তাঁর অনুগামীদেরসহ মণিপুর গমন করেন এবং শত শত মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া-মৈতৈ নির্বিশেষে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। মণিপুর রাজা কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মকে প্রধান ধর্ম বলে ঘোষিত হয়। হাজার হাজার মণিপুরী বৈষ্ণব ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। লোকনাথ গোস্বামী স্বাস্থ্যগত কারণে মণিপুর গমনে অসমর্থ হলে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও প্রেমানন্দ ঠাকুর সমগ্র মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের জোয়ারে ভাসিয়ে দেন। স্বয়ং রাজা ভাগ্যচন্দ্র

---

৭২ Rustom Bharucha, *The Theatre of Kanhailal : Pebt & Memories of Africa,* Seagull, Calcutta, 1998, P. 16

৭৩ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মণিপুর-পুরাণ*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৪

বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হন। রাজার সমস্ত কীর্তন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মৈতে বিষ্ণুপ্রিয়া নির্বিশেষে আমন্ত্রিত হন এবং যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করেন।[৭৪]

তাছাড়া *বঙ্গদেশ পালা* পরিবেশন করতেন এমন একদল কীর্তনগায়কদের সন্ধান পাওয়া যায় ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা খাগেম্বার শাসনামলে। আবার 'রাজা *চরাইরম্বার* সময়ে বাংলাদেশ থেকে যে কীর্তনের গায়কদল এসেছিল, তাঁরাই *বঙ্গীয়কীর্তনের* বীজরোপণ করেন এবং বঙ্গদেশ থেকে এই পালার আগমন কারণে এর নাম *বঙ্গদেশপালা* রাখা হয়। মণিপুরে এদেরকে *অরিবা পালা* বা প্রাচীন গায়কদল বলা হতো।'[৭৫] এসকল ঐতিহাসিক ঘটনা ভাগ্যচন্দ্রের শাসন-পূর্ব মণিপুরে বাংলার গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্মের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রকে নির্দেশ ধরে। এছাড়াও আরও বেশকিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, যার দ্বারা মণিপুরী উচ্চকোটির ব্রাহ্মণসমাজ ও রাজা মহারাজাদের সাথে বৈষ্ণবধর্ম, সংস্কৃতি এবং পরিবেশনা শিল্পকলার যোগ-সংযোগের প্রামাণিক উপাত্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, 'রাজা কিয়াম্বার শাসনকালে মণিপুরে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সূচনা হয়, কেননা পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক মন্দির বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অর্পিত হয় এবং সেই মন্দিরে সংকীর্তনগায়কগণ, যাঁরা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশীয় ছিলেন, তাঁরা গান গাইতেন।'[৭৬] এ বিষয়ে সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায়ের উক্তি অধিক সুস্পষ্ট– 'ইঁহার সময়ে (রাজা কিয়াম্বা) শৈব ও বৈষ্ণব উভয় প্রকারের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মণিপুর রাজবংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যায়। মণিপুরে ব্রাহ্মণের বাসও হইতে থাকে।'[৭৭] শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায়– 'মণিপুর রাজ পামহৈবা বা গরীবনেওয়াজের সময় (১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে) থেকেই মণিপুরের সাথে শ্রীহট্টের যোগাযোগ ও সংযোগ ঘটে। অতঃপর কোন এক মণিপুরী রাজা কিছু কালের জন্য সিলেটে এসে অবস্থান করেন। তখন তার সাথে সিলেটের দেওয়ান মুক্তারামের সৌহার্দ জন্মে এবং ঐ রাজা বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ দেওয়ানকে দুটি দেব বিগ্রহ দান করেন।'[৭৮] অচ্যুতচরণ চৌধুরীর উদ্ধৃতিসূত্রে থোঙাম ধীরেন-এর ধারণা যদি সত্যি হয় তবে আঠার শতকের শুরু থেকেই মণিপুরের সাথে সিলেটের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয় রাজা ভাগ্যচন্দ্রের হাত ধরে– 'মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র বা জয়সিংহ একবার সপারিষদ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতীর্থ সিলেটের ঢাকা দক্ষিণে এসেছিলেন। সেখানে রামনারায়ণ শিরোমণির ধর্ম্মজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে মণিপুর ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। রাম নারায়ণ শিরোমণির প্রচেষ্টাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।'[৭৯] বৈষ্ণবধর্ম ও ধর্মীয়-সংস্কৃতি চর্চার প্রতি কতটা প্রীতি ও প্রবল আনুগত্য থাকলে পরে একজন রাজা স্বপ্নাদৃষ্ট হতে পারেন এবং স্বপ্নের আদেশ অনুসারে রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা প্রচলন শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ

---

৭৪ রনজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৫৯

৭৫ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ. ১৫

৭৬ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ. ১৫

৭৭ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মণিপুর-পুরাণ*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৪

৭৮ অচ্যুতচরণ চৌধুরী, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ. ৪-৫, উদ্ধৃত করা হয়েছে– থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শ্রীমঙ্গল, ২০০৮, পৃ. ১১ গ্রন্থ থেকে

৭৯ থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শ্রীমঙ্গল, ২০০৮, পৃ. ১১

করতে পারেন, রাজা ভাগ্যচন্দ্র তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ– 'মণিপুরীদের মাঝে লোক-কথা আছে যে– কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই মণিপুরী রাজা ভাগ্যচন্দ্রই স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে ভারতের মণিপুরীদের মাঝে নতুনভাবে রাসলীলার প্রচলন শুরু করেন।'[৮০] ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাজা ভাগ্যচন্দ্রের স্বপ্নাদৃষ্ট হওয়ার ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকলেও এই স্বপ্নের বস্তুগত সত্যতা কতখানি অথবা এই স্বপ্ন ইতিপূর্বে মণিপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে রাজ-স্বীকৃতি প্রদানের প্রতীকী বয়ান কি না সে বিষয়েও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। কেননা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জনগণের ভাব-রাজ্য জয় না করে, কেবল রাজার নির্দেশে একটি ধর্ম (বৈষ্ণবধর্ম) মণিপুর-রাজ্য জয় করে সর্বজনীন ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে, এমন বয়ান কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

***

ইতিহাসের নানা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মণিপুরী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বৃহৎ অংশের আগমন ও অভিবাসন প্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে আঠারো শতকের শুরু থেকে উনিশ শতকের শুরুর দুই/তিন দশক (১৭০৯-৪৮ গরীবেনেওয়াজের শাসনামল থেকে ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্মিজ কর্তৃক মণিপুর দখল এবং ১৮১৯-১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের বর্মা কর্তৃক মণিপুর অধিকার ও শাসনকাল পর্যন্ত) এই সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হয়। যদিও এই সময়ের পূর্বেও বাংলাদেশে মণিপুরীদের বসতি স্থাপনের ঘটনার কথা জানা যায় এবং এই ঘটনাটি ঘটে মোগল শাসনামলে– 'পনেরো শ খ্রিষ্টাব্দে মীরজুমলা নিজ সেনাপতিত্বে মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বাঞ্চলে বর্ধিত করেন এবং আসাম, সিলেট ও কাছাড় অধিকার করেন। এ সময়ে আসামের পূর্বস্থিত মণিপুরীদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে ধৃত মণিপুরীদের ঢাকায় নির্বাসন দেয়া হয়। ১৬৬১ সালে ঢাকায় মণিপুরী বসতির কথা এই ঘটনার সাক্ষী।'[৮১] যদিও স্ব-সিদ্ধান্তে অথবা পরিস্থিতির কারণে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে দেশান্তর হওয়া অর্থে যে অভিবাসন বুঝায় সেই অর্থে এই ঘটনাটিকে গ্রহণ করা যায় না, তথাপি জোরপূর্বক হলেও বাংলা অঞ্চলে মণিপুরীদের অবস্থান বিবেচনায় এটিকে গ্রহণ করা যায়। অপরদিকে থোঙাম ধীরেনের বক্তব্য অনুসারে সিলেট অঞ্চলে মণিপুরী বসতি স্থাপন 'চহী তরেৎ কুন্তাকপা'-এর সময় কালের আগে থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ মহারাজ গরীবনেওয়াজের আমলে (১৭০৯-৪৮) বা অন্ততঃ মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের (১৭৬৪-৯৮) শাসন আমল থেকেই সে সব অঞ্চলে মণিপুরী বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল।[৮২] ইতিহাস সাক্ষ্যে দেখা যায়, একটি বৃহৎ সংখ্যক মণিপুরীদের বাংলাদেশে আগমন ঘটে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের শাসনামলের কিছুকাল আগে বা পরে– 'An account of Assam'-এর লেখক ফ্রান্সিস হ্যামিলটন ১৭৯৮

৮০ সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা* (চতুর্থ পর্ব), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩১

৮১ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩২

৮২ থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শ্রীমঙ্গল, ২০০৮, পৃ. ১২

খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা সফরের সময় মণিপুর রাজ জয়সিংহ বা ভাগ্যচন্দ্রের সহগামী এক মণিপুরী ব্রাহ্মণের সাক্ষাত পান যাঁর বিবরণ অনুযায়ী ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্মিজরা মণিপুর দখল করে এবং ক্রমাগত আট বছর ধরে সবধরনের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালায়, যার ফলশ্রুতিতে ৩,০০,০০০ মণিপুরী অধিবাসী দেশত্যাগ করে এবং তিনি (লেখক) যখন আভাতে ছিলেন তখন আভা শহরের উপকণ্ঠে লক্ষাধিক মণিপুরীর দেখা পান। সেই সময়ই দেশত্যাগী মণিপুরীদের কিছু অংশ আসাম, কাছাড়, ত্রিপুরা ও সিলেটের কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।'[৮৩] ড. রণজিত সিংহ মণিপুরীদের বাংলাদেশে অভিবাসনের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেন– 'মণিপুরীদের বাংলাদেশে তথা পূর্ববঙ্গে অভিবাসনের তিনটি পর্যায় স্পষ্টত দৃশ্যমান। প্রথমত, প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময়, দ্বিতীয়ত, ১৮১৯-১৮২৫ সালের খ্রি. পুরো সাত বছর বর্মা কর্তৃক মণিপুর অধিকার ও শাসনকাল, তৃতীয়ত, ১৮২৫ সালের পর।'[৮৪] পর্যবেক্ষণসূত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মণিপুরীদের আগমন বা অভিবাসনের পশ্চাতে কারণ প্রধানত দুটি– এক. যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী নির্যাতন নৃশংসতার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে রাজ্য ত্যাগী হওয়া– 'ব্রহ্ম বাহিনীর অত্যাচারে মণিপুরের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ রক্ষার তাগিদে মণিপুর ছেড়ে কাছার, আসাম, ত্রিপুরা বা সিলেটে পালিয়ে যায়। এই সাত বছর কাল সময় মণিপুরের ইতিহাসে "চহিতরেৎ কুন্তাকপা" বা seven years devastation নামে খ্যাত।'[৮৫] এবং দুই. মণিপুরী রাজাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে অন্তঃকলহ এবং বৃটিশ আগ্রসন। ড. রণজিত সিংহ মণিপুরী অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় কারণটিতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন–

> প্রকৃতপক্ষে মণিপুরের রাজা পামহইবা বা গরিবে নেওয়াজ (১৭১৪-১৭৫৪) মৃত্যুর পর মণিপুর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজসিংহাসন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এর ফলে অনেকেই রাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এবং রাজার সঙ্গে প্রজারাও পশ্চাদগামী হয়ে অন্য দেশে বসবাস করতে শুরু করে। সত্যেন সেন রচিত 'গ্রামবাংলার পথে পথে' নিবন্ধে বলেন, সিপাহী যুদ্ধের কিছুকাল পরে স্বাধীনচেতা মণিপুরীরা তাদের রাজ্যে ইংরেজ শাসন নিঃশব্দে মেনে নেয়নি। পরাধীনতার অসহ্য জ্বালায় তারা জ্বলে পুড়ে মরছিল। মণিপুরের রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই বিক্ষুব্ধ। সেই বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠতে উঠতে একদিন তা প্রকাশ্য বিদ্রোহে ফেটে পাড়ল। ইংরেজ সরকার মণিপুরের এই বিদ্রোহকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। আর ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য মণিপুরের রাজাকে সিলেট এনে অন্তরীণ করে রাখা হলো। দলে দলে মণিপুরী স্বদেশের মায়া ছেড়ে সিলেট অঞ্চলে এসে ভানুবিল অঞ্চলে বন কেটে

---

৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৮৪ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩২
৮৫ থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শ্রীমঙ্গল, ২০০৮, পৃ. ১২

আবাদ করে তারা বসবাস শুরু করলো এবং কালক্রমে এখানকার অস্থায়ী বাসিন্দারা এখানকার মাটির মানুষে পরিণত হয়ে গেল। এই ভাবেই মণিপুরীদের এই উপনিবেশ সৃষ্টি হলো।[৮৬]

প্রাপ্ত তথ্যসূত্রের আলোকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, উল্লেখিত এ দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াসূত্রেই মূলত অসংখ্য মণিপুরী নিজ রাজ্য ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদেরই একটি বড় অংশ বাংলাদেশে অভিবাসিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষের এই সময় এবং পূর্বাপর দিনগুলিতে মণিপুরীদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন ততদিনে মণিপুরের প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যাপক এক সমন্বয়সূত্রে এই ধর্মের রাষ্ট্রীয় ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠাও সম্পন্ন হয়ে যায়, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উচ্চকোটির ব্যক্তিবর্গ ও রাজ-রাজরাগণ। ফলে অতীত সময় থেকে বাংলার সাথে বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে মণিপুরের মধ্যে গড়ে ওঠা নানা পর্যায়ের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ; বৈষ্ণব পদকর্তা ও কীর্তনীয়া কর্তৃক ধর্ম ও দর্শন বিনিময়ে পুনঃপুন গমন, বিচরণে সক্রিয় হওয়া; নানা পর্যায়ে রাজন্যবর্গ কর্তৃক এই অঞ্চলে ভ্রমণ/আগমনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং ক্রম-পরিবর্তিত ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও বিন্যাসের প্রেক্ষিত বিবেচনায় নিলে রাজনৈতিক অস্থিরতায় সৃষ্ট তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ অভিবাসন প্রক্রিয়া বঙ্গমুখী হওয়ার বিষয়টিকে সঙ্গত ও যৌক্তিক একটি প্রক্রিয়া বলেই মনে করা যায়। এই প্রক্রিয়াসূত্রেই বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে গড়ে ওঠে মণিপুরীদের স্থায়ী আবাসন এবং বাংলার সংস্কৃতি সমগ্রতায় যুক্ত হয় মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ও পরিবেশনা শিল্পকলা ঐতিহ্যের নানা আঙ্গিক, রীতি ও পদ্ধতি।

বাংলাদেশের মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা নিরীক্ষা প্রসঙ্গে মণিপুরীদের ভৌগোলিক, ভাষা, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় প্রদান উপলক্ষে নাতিদীর্ঘ এই বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি বিষয় গ্রহণ করা যেতে পারে, যা পরবর্তী অংশের আলোচনার জন্যও হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলো হচ্ছে– এক. মণিপুরী নৃত্য ও নাট্যকলা ঐতিহ্যের সাথে *আর্যানার্যের* সমন্বয়ের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। দুই. মণিপুরী রাসনৃত্যকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ধ্রুপদী নাট্যের রীতি-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত উপ-রূপক– *হল্লিশক* অনুরূপ বা এর সম্পর্কসূত্রে বিচারের সম্ভাবনা এবং তিন. মণিপুরী শিল্পকলার নৃত্য ও নাট্যের পরিবেশনা বিনোদনের নিমিত্তে নয়, ভাবের নিমিত্তে পরিবেশনা। বলা যায় জীবের সাথে জগতের, পুরুষের সাথে প্রকৃতির অথবা বস্তুর সাথে ভাবের সম্পর্ক নির্ণয়ের পরিবেশনা।

---

৮৬ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০

ক্ষেত্র সমীক্ষার অংশ হিসেবে মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মেইতেই) জনগোষ্ঠীর মোট ৮টি পরিবেশনা– *রাসনৃত্য, নটপালা, থাঙ তা, খুপাউসি নৃত্য (বিষ্ণুপ্রিয়া), খুপাউসি নৃত্য (মেইতেই), লাইহারাওবা নৃত্য, তান্ত্রিক ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতি, পুং চলম বা মৃদঙ্গ বাদন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি* পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিষয় এবং উদ্‌যাপন পদ্ধতির বিবেচনায় খুপাউসি এবং লাইহারাওবা নৃত্য বিশদ আলোচনার দাবি রাখলেও নৃত্যের অন্তর্গত পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার বিবেচনায় অনেকাংশে রাসনৃত্যের সমান্তরালে গ্রহণ করা যায় বলে কেবল রাসনৃত্যের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতিটি প্রধানত নীরব-মন্ত্র পাঠ এবং নির্দিষ্ট কিছু কৃত্যাচার নির্ভর হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট করে দম, ধ্যান, ধ্বনিগত আচরণ বা ভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলে এটিকেও পরিবেশনার অন্তর্গত করা হয়নি। এবং মৃদঙ্গ বাদন প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণত বাদ্যের কৌশলগত হিসেবে-নিকেশ সম্বলিত হওয়ায় এটিকেও মূল আলোচনায় গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এই সকল বিষয় এবং প্রেক্ষিত পর্যবেক্ষণসূত্রে এবং গবেষণার সার্বিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে পরবর্তী উপাধ্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা ঐতিহ্যের ‘রাসনৃত্য’, ‘নটপালা’, এবং ‘থাঙ তা’ এই তিনটিকে বিশদ বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২.২ : ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– মণিপুরী

২.২.১ রাসনৃত্য

বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী মণিপুরীদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে প্রচলিত নানাবিধ আচার, অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশনা *রাসলীলা*। বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় বসবাসরত বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতেই ভাষা-ভিত্তিক মণিপুরী সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বছরের নির্ধারিত পার্বণ ও তিথির আবর্তন অনুসরণ করে উদ্‌যাপন করে থাকে *রাস* কৃত্যানুষ্ঠান। বক্ষ্যমাণ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয় *মণিপুরী নাট্যের* ক্ষেত্র সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে ১২.০৭.২০১৫ তারিখে মণিপুর ললিতকলা একাডেমি, মাধবপুর, শিববাজার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজারে প্রত্যক্ষণ করা হয় *রাসলীলার* চর্চা ও এর আনুষ্ঠানিক মহড়া/প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া। ক্ষেত্র সমীক্ষার এ পর্যায়ে *রাসনৃত্যের* প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। *রাসের* প্রকারভেদ; দলের গঠন ও পরিবেশন প্রক্রিয়া; নৃত্যের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ও পরম্পরা; *রাসনৃত্যের* সাথে শাস্ত্র, পুরাণ এবং সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের যোগ-সংযোগ; ভাব-রস, দেহভঙ্গি ও শৌর্য প্রকাশে কুশীলবের কৌশলগত বিষয়গুলির নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা ছিল এই ক্ষেত্র সমীক্ষার উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, *রাসনৃত্য* নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিনেতার প্রস্তুতি-সহায়ক অনুশীলন উপাদান অনুসন্ধান করাই ছিল এ পর্যায়ের ক্ষেত্র সমীক্ষার তথা বক্ষ্যমাণ গবেষণার মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে *রাসনৃত্যের* সামগ্রিক আলোচনাকে– এক. ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন, দুই. দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ এবং তিন. পরিবেশন ও বিশ্লেষণ এই তিনটি বিষয়-বিভাজনে আলোচনা করা হলো।

ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন

বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার প্রসিদ্ধতম পরিবেশনার মধ্যে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মণিপুরী *রাসনৃত্য* বা *রাসলীলা* অন্যতম। ‘রাস’ হচ্ছে– রস্যতে আনে ইতি রাসঃ। অর্থাৎ যার দ্বারা রস জন্মায় তাই রাস। আবার ‘রাস’ অর্থ রস, রস থেকেই ‘রাস’ কথাটির উৎপত্তি– ‘রাধা-কৃষ্ণের রস হইতে উৎপত্তি রাস। ভাব-কান্তি-বিলাশ, তিন বাঞ্ছা অভিলাষ’[৮৭] এভাবেও বলে থাকেন কেউ কেউ।। ‘লীলা’ হচ্ছে খেলা বা ক্রীড়া, কিন্তু কৃষ্ণের লীলাময় অর্থাৎ ক্রীড়াতুল্য নানাবিধ ঘটনার ক্রিয়াত্মক উপস্থাপনার কারণে তা ‘নাট্য’ রূপেও বিবেচ্য

৮৭ ওঝা/রাসধারী কৃষ্ণকুমারী-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১২/৭/২০১৫, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

হয়– যেমন, লীলানাট্য, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি। তথাপি 'রাসে' ক্রিয়া এবং অভিনয়ের উপাদান– কথা ও গানের আধিক্য থাকলেও 'রাস'-কে 'বিশুদ্ধ নৃত্য ('নৃত্ত') ভিন্ন আর কিছু নয়'[৮৮] বলে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। কেউ আবার রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রণয়-আখ্যানের নাটকীয় বা লীলাময় রূপের প্রত্যক্ষণে একে *Dance of Divine Love* নামেও অভিহীত করেছেন–

> *Dance of Divine Love* presents India's classical sacred love story known as the Rasa Lila. It is a dramatic poem about young maidens joining with their ideal beloved to perform the wondrous "circle dance of love," or Rasa. Its story is an expression of the eternal soul's loving union with the supreme deity in "divine play," or Lila. [89]

সুতরাং'রাস'-কে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেমময় রসের নিষ্পত্তি বা আস্বাদন করা হচ্ছে 'রাসের' প্রেষণা, ফলে কৃষ্ণকাহিনীকে আশ্রয় করে 'রস' প্রধান নৃত্য/নাট্যের প্রদর্শনকে বলা যায় 'রাস'। মণিপুরী জাতি-সংস্কৃতির ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে 'রাস' হচ্ছে প্রধানতম কৃত্যানুষঙ্গ। *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন* গ্রন্থে 'রাস'-কে একাধিক বিভাজন এবং প্রকারে চিহ্নিত করা হয়। 'রাস'-এ রয়েছে প্রধানত দুটি বিভাজন– পুরুষ প্রধান রাস এবং স্ত্রী প্রধান রাস। স্ত্রী-প্রধান রাসের মধ্যে রয়েছে– *মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস* ও *নিত্যরাস* এবং পুরুষ প্রধান রাসের মধ্যে রয়েছে *রাখালরাস* যা গোপরাস নামেও প্রচলিত। তাছাড়া 'প্রাচীন শাস্ত্রে রাসের তিনটি বিভাগ– তালরাস, দণ্ডরাস এবং মণ্ডলরাস।'[৯০] এদিকে কোমলগঞ্জ উপজেলার নটপালার সূত্রধর রাশকান্ত সিংহ চার প্রকার 'রাসের' উল্লেখ করেন– 'নিত্যরাস, বসন্তরাস, শারদীয়রাস এবং দিবারাস। বসন্তকালে বসন্তরাস যখন রং খেলা বিশেষে হয়ে ওঠে। নিত্যরাস– প্রাতঃকালীন ক্রিয়া থেকে গোষ্ঠগমন, বৃন্দাবন লীলা, যুগল মিলন, আনন্দ-নর্তন, গৃহে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। দিবারাস– দিনে এবং শরৎকালে শারদীয় রাস হয়।'[৯১] প্রকার বা বিভাজনের এইরূপ নামকরণ আদতে 'রাস' সম্পাদনে রাধা-কৃষ্ণের ভক্তি-প্রেম-মিলনের স্থান ও কাল-যুক্ত লীলাময় নানান ঘটনাকেই নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে মণিপুরীদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কৃত্যাচারে পাঁচ রকমের 'রাস'-এর প্রচলন লক্ষ করা যায়। মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, নিত্যরাস এবং দিবারাস।

কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় *মহারাস*। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীর অনুসরণে মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বয়ং রসানন্দ এবং স্বরূপানন্দের সহায়তায় *মহারাস* প্রচলন করেন। পুরাণ অনুসৃত রাধা-কৃষ্ণের নানাবিধ লীলা যেমন– কৃষ্ণের অভিসার, রাধা ও গোপীদের অভিসার, বাঁশি চুরি, রাধা-কৃষ্ণের নর্তন, কৃষ্ণের

---

৮৮ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৫৩

৮৯ Graham M. Schweig, *Dance of Divine Love*, Princeton University Press, New Jersey, 2005, P. 1

৯০ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৮

৯১ সূত্রধার রাশকান্ত সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

অন্তর্ধান, রাধা বিরহ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়ে থাকে এই *রাসে*। বস্তুত মণিপুরীদের উদ্‌যাপিত সকল প্রকার *রাস* উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে *মহারাসই* সর্বাধিক আড়ম্বরপূর্ণ এবং সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে উদ্‌যাপন করা হয় *বসন্তরাস*। বসন্তের বাসন্তী রূপে সজ্জিত পৃথিবীর অপরূপ রূপ পরিদর্শনে রাধা ও সখীদের সঙ্গী করে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ভ্রমণের রাসই *বসন্তরাস*। বলা হয়ে থাকে *বসন্তরাসের* গঠনে রয়েছে *গীতগোবিন্দ* এবং চৈতন্যচরিতামৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই *রাস* উৎসবে হোলি খেলা, রাধার অভিমান, রাধাকুঞ্জে কৃষ্ণের গমন, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার মানভঞ্জন প্রভৃতি লীলার পরিবেশন করা হয়।

আশ্বিনে হয় *কুঞ্জরাস*। এ মাসের অষ্টম দিবসে পরিবেশিত *কুঞ্জরাসে* অভিসার এবং কুঞ্জ গমন পর্ব প্রদর্শিত হয়। *কুঞ্জরাসের* প্রচলনেও রয়েছে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা।

মূলত সারা বছর জুড়ে *নিত্যরাস* অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। *নিত্যরাস* ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং মানত পূরণের লক্ষ্যে বছরের যেকোনো সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই *রাসে* রাধা-কৃষ্ণের অভিসার এবং মিলন পর্ব পরিবেশিত হয়ে থাকে।

দিবসকালে বা দিনের মধ্যাহ্নকালে অনুষ্ঠিত হয় *দিবারাস*।

উদ্‌যাপিত এই সকল *রাস* কৃত্যানুষ্ঠানে রাধা ও কৃষ্ণের লীলাসমূহ নৃত্য, গীত এবং গীত-সংলাপের নাটকীয়তায় প্রদর্শিত হয় এবং অনুষ্ঠানে পরিবেশিত বিশেষ ও শৈলীবদ্ধ নৃত্যই মূলত *রাসনৃত্য* নামে পরিচিত। পরিবেশনার রীতি, গঠন-কাঠামো ও আঙ্গিক বিবেচনায় বেশ কিছু গবেষণামূলক রচনায় *রাসনৃত্যকে* প্রচলিত লোক বা সাধারণের নাট্যকলা ঐতিহ্য-বলয়ের বাইরে ধ্রুপদী ঐতিহ্য-সংলগ্ন একটি পরম্পরা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন গ্রন্থে মণিপুরী নৃত্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'বৈষ্ণব বিদ্বানেরা সংগীত, নৃত্য, এবং নাট্যবিষয়ক ভারতীয় শাস্ত্রীয় মূলধারা থেকে প্রেরণা নিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের জন্য ওই সব গ্রন্থ থেকে উপলব্ধ সূক্ষ্ম তথ্যগুলিকে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করেছেন। বর্ত্তমানে মণিপুরবাসীরা নৃত্য এবং সংগীতের এই জীবন্ত এবং গতিশীল মৌখিক তথা শাস্ত্রীয় পরম্পরাগুলিকে কঠোরতার সঙ্গে পালন করেন।'[৯২] শ্রীমতী নয়না ঝাভেরী প্রণীত *গুরু বিপিন সিংহ* গ্রন্থে মণিপুরী নৃত্য প্রসঙ্গে বিপিন সিং-এর মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে– Monipuri dance is rich, graceful, lyrical and aesthetically elevating. Its rhythm pattern in complex and absorbing, essentially devotional, its themes are varied and vast and intensly dreamatic।[৯৩] *ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা* গ্রন্থে যে 'আট ধরনের ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের'[৯৪] উল্লেখ করা হয় মণিপুরী নৃত্য তাদের একটি। গ্রন্থটিতে মণিপুরী নৃত্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'ভারতীয়

---

৯২ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ.প্রস্তাবনা অংশ

৯৩ Smt. Nayana Jhaveri, *Guru Bipin Singh*, Manipuri Nartanalya, Calcutta, 1979, P. 8

৯৪ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪০৭

ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলির মধ্যে মণিপুরী নাচ আপন স্বাতন্ত্র্যে দেদীপ্যমান।[৯৫] বাংলাদেশের খ্যাতনামা মণিপুরী নৃত্যশিল্পী তামান্না রহমান *আদিবাসী সংস্কৃতি* গ্রন্থে মণিপুরী নৃত্য প্রসঙ্গে বলেন– [এই] মণিপুরী নৃত্য এখন ভারত উপমহাদেশের প্রধানতম শাস্ত্রীয় (Classical) নৃত্যগুলির অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত।[৯৬] *রাসনৃত্যের* গঠন-কাঠামো, উপস্থাপন-রীতি, গুরু-শিষ্য পরম্পরাগত নৃত্য গীত ও বাদ্যযন্ত্রের শৈলীগত প্রশিক্ষণ ও চর্চা পদ্ধতির সাথে পূর্বকালের রাজসভা ও মন্দির সংশ্লিষ্টতা তথা উচ্চকোটির পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্য প্রভৃতি বিবেচনায় নিলে এই দাবিকে যথাযথ এবং সঙ্গত বলেই মেনে নেওয়া যায়। যদিও শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদী অন্যান্য পরিবেশনার ন্যায় ব্যাকরণ সিদ্ধ, সুনির্দিষ্ট সংকেতাবদ্ধ (codified) মুদ্রার বিধানানুগ অভিনয় শৈলী ও রীতির সমান্তরালে *রাসনৃত্যকে* বিবেচনা করা যায় না। এটা যতটা না শাস্ত্রীয় সংকেতে বা কঠিন মুদ্রায় আবদ্ধ ততোধিক আবদ্ধ ভাব-দর্শন বা *ভাবমুদ্রায়*, কেননা 'ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের শিল্পনিরীক্ষা থেকে গৃহীত ভাবমুদ্রাগীতি ধীরে ধীরে একেবারেই লৌকিক বা প্রাকৃত হয়ে যায় রাসলীলায়। যদি তা-ই না হত, তাহলে আবালবৃদ্ধবনিতা এভাবে রাসের স্বাদ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারত না।'[৯৭] যদি তাই হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে যে, কী কী উপাদান-অনুষঙ্গ অথবা প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য এর মূলে ক্রিয়াশীল ছিল বা এখনও আছে যার কারণে মণিপুরী *রাসনৃত্যকে* ধ্রুপদী পরিবারের সদস্যভুক্ত করা হয়েছে? এই প্রশ্নের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপট পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে 'পরিবেশন ও বিশ্লেষণ' পর্বেও এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে উদ্ধৃত উক্তির আলোকে মণিপুরী সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অভিব-াসনসূত্রে চর্চিত বাংলায় মণিপুরী *রাসনৃত্যের* বর্তমান যে ধারাটির প্রচলন রয়েছে, তা কোনো বিশেষ একটি শ্রেণীর অথবা উচ্চকোটির শিল্প রুচি ও দর্শন অনুরাগীদের চর্চা বা পৃষ্ঠপোষকতার অধীন হয়ে থাকেনি বরং তা মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতিতে সর্বজনীন সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবেই স্বীকৃতি ও সামষ্টিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। 'আসলে রাস কার্যকর দুইভাবে হয়ে থাকে। একটা আমাদের প্রাত্যহিক– প্রাতঃকর্ম, মধ্যাহ্নকর্ম ও সান্ধ্যকর্ম তিনটি দৈনন্দিন পূজা, সে তো রাস থেকেই এসেছে, আরেকটি আনুষ্ঠানিক– মহারাস, মানতপূর্ব রাস। রাস ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক। প্রাত্যহিক বা নৈমিত্তিক দিক থেকে কার্যকর একটি দিক, অপরদিকটি আনুষ্ঠানিক।'[৯৮]

এই ক্ষণে 'রাসের' উৎস ও বিবর্তন আলোচনাসূত্রে *রাসনৃত্যের* ধ্রুপদী বা শাস্ত্রীয় সম্পর্ক-সূত্রের প্রতি আলোকপাত করা হলো এবং সম্পূর্ণ আলোচনাটিকে চারটি পর্যায়ে সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে– ক. শাস্ত্রীয় পরম্পরায় রাসনৃত্য খ. রাসনৃত্যের বঙ্গীয় শিল্পরূপ গ. মণিপুরে রাসনৃত্যের চর্চা এবং ঘ. বাংলায় রাসনৃত্যের

---

৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

৯৬ তামান্না রহমান, *মণিপুরী নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের সংস্কৃতি*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৫

৯৭ শুভাশিস সিন্হা, মণিপুরী রাসলীলা : একটি জাতিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা, রাসলীলা বিষয়ক সংখ্যা*, মণিপুরী থিয়েটার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নভেম্বর, ২০১১, পৃ. ২৮

৯৮ রাসধারী গোপীমোহন সিংহ (৭৫)-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

অভিবাসন। প্রেক্ষাপট আলোচনার ধারাতেই অতঃপর ভানুগাছ, কোমলগঞ্জ, মৌলভীবাজারে প্রত্যক্ষণকৃত *রাসনৃত্যের* বিশ্লেষণ পূর্বক নিরীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. শাস্ত্রীয় পরম্পরায় রাসনৃত্য

একথা পুনরায় একবার বলে নেওয়া উচিত যে, বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলসহ সমগ্র ভারতবর্ষের স্থানীয় জনপদ থেকে আভিজাত্যের শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডল উভয়ক্ষেত্রে কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি শিল্পমাধ্যমগুলো অভেদাত্মক বিবেচনায় গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানেও এই প্রবণতা প্রচলিত আছে। পুরাণকালের এই বিষয়টি যে কেবল শিল্প-সাহিত্যের অভিন্ন-মাধ্যম হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে তা নয় বরং প্রাচীন ভারতের বেশকিছু কৌতুক-ক্রীড়া এবং উৎসবের অনুষঙ্গ রূপেও এদের বর্ণিত হতে দেখা যায়, যেমন– 'জলক্রীড়া', 'রাসক্রীড়া', 'হল্লীসকক্রীড়া', 'নৃত্য ক্রীড়া', 'নাট্যক্রীড়া', 'ইন্দ্রধ্বজ উৎসব', 'হোলিকামহোৎসব', 'বসন্তোৎসব' প্রভৃতি। কৃষ্ণ-বিষয়ক এই সকল অনুষঙ্গ নৃত্য ও গীতে প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও তা ক্রীড়া-রূপে বিবেচ্য হয়েছে। ক্রীড়ার বিষয়টি একালের 'রাস' অনুষ্ঠানেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে– *বসন্তরাসে* রঙ-এর খেলা অথবা বৃন্দাবনে রাধার মধ্যাহ্নকালীন অভিসার পরবর্তী যুগল-মিলন বা মহা-মিলন উদ্‌যাপনে নানা কৌতুক-ক্রীড়ার প্রদর্শন তো বর্তমানেও 'রাস' উৎসবের বিশেষ অনুষঙ্গ– 'যুগল-মিলন শেষে বনভ্রমণ– তারা দুজন বনে ঢুকে হিন্দোলা– দোলা লীলা, জল ক্রীড়া, ফাল্‌গুন মাসের ফাগু খেলা ইত্যাদি নানা ক্রীড়া শেষে পুনরায় বেশভূষণ পরিধান করে বন্য-ভোজন শেষ করে আসনে বসবে।'[৯৯]

ক্রীড়ারূপেই হোক বা সঙ্গীত, নৃত্য অথবা নাট্যরূপে হোক পৌরাণিকযুগেই মূলত কৃষ্ণ বিষয়ক 'রাসলীলা'/'রাসনৃত্যের' শাস্ত্রীয়করণ এবং এর বিকাশ ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী সময়ে একাধিক ভাষ্যকার এবং কবির রচনায় তা বহু ও বিচিত্র গঠন-কাঠামোয় সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, পৌরাণিকযুগে শাস্ত্রীয় শিল্প-সাহিত্য চর্চার যা কিছু দিকে দিকে আলো ছড়িয়েছে তার অন্যতম প্রেরণা– শিব ও বিষ্ণু। এই দুই দেবতাকে আশ্রয় করে পূর্বকালে রচিত হয়েছে নানান শাস্ত্র এবং মহাকাব্য। রামায়ণ এবং মহাভারত এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দীপনা জুগিয়েছে, যা পুরো উপমহাদেশ জুড়ে শাস্ত্রীয় নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীতসহ সকল বিশিষ্ট শিল্প-মাধ্যমকে পরিপুষ্ট স্রোতধারায় করেছে প্লাবিত–

> ভারতীয় শিল্পে পৌরাণিক যুগ একটি উল্লেখযোগ্য সময়কাল। পুরাণগুলিতে নৃত্যের যে মূল্যবান উপাদান পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় যে, শিল্প, পৌরাণিক কাহিনী ও বাস্তবতা মিলিয়ে এই তিনের সাঙ্গীকরণে শিব ও বিষ্ণুর নৃত্য বিকাশের ধারাটি কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও সংকেতাকারে প্রকাশিত হয়ে

৯৯ গায়েন রাশকান্ত সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

উঠেছে। নৃত্যের ঔপপত্তিক প্রকরণ বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও পদ্ধতিগত আঙ্গিক প্রকরণের নাম পুরাণগুলিতে অজস্রবার দেখা যায়। যদিও পুরাণগুলির কিছু কিছু ভরতোত্তর যুগের রচনা বলে অনেকে মনে করেন।[১০০] সংকেতের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা যে রূপেই প্রদর্শিত হয়ে থাকুক, বলা যায় পুরাণযুগ থেকেই কৃষ্ণ-বিষয়ক শাস্ত্রীয় নৃত্যের গঠন-কাঠামো, রীতি-বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। 'রাসনৃত্যে'-এর প্রাথমিক গঠন-কাঠামো সম্পর্কে যা কিছু ধারণা পাওয়া যায় সেটি *চক্রাকার* এবং রমণী বহুল– দলীয়। চক্রের কেন্দ্রে থাকতো একজন পুরুষ– কৃষ্ণ (কুশীলব) অথবা প্রতীক (দণ্ড, ধ্বজা) যাকে ঘিরে পরিবেশিত হতো এই নৃত্য। এক্ষেত্রে 'রাস' এবং 'লীলার' ধারণা সর্বপ্রথম সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায় মহাভারতের পরিশিষ্ট রূপে বিবেচিত হরিবংশ পুরাণে (প্রায় ২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে সংকলিত)– 'রাস হতো মাটির ভিতর প্রোথিত এক মজবুত ও মসৃণ খুঁটির উপর ভর করে,'[১০১] চক্রাকার নৃত্য যার কাঠামো। হরিবংশপুরাণে 'রাস' প্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, একটি পুরুষকে (কৃষ্ণ) ঘিরে একদল স্ত্রীলোক (গোপিনী) চক্রাকারে নৃত্য করতো। বিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণেও কৃষ্ণের জীবনী বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে 'রাস' এবং 'লীলা'-এর প্রদর্শন *চক্রনৃত্যের* কাঠামোতেই সংঘটিত হতে দেখা যায়– 'বিষ্ণুপুরাণে একটি রাসনৃত্যের সবিস্তার বর্ণনা আছে, সেটি একটি চক্র-নৃত্য, শরতের পূর্ণিমা-রাত্রিতে পরিবেশিত।'[১০২] যদিও বিভিন্ন পুরাণে কৃষ্ণের জীবন-কর্ম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, তাথাপি 'রাস' ধারণাটির বিশদ বর্ণনা 'শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পুরাণেই মেলে–

> [শেষোক্ত] গ্রন্থের দশম স্কন্দের প্রায় পনেরোটি অধ্যায়ে গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবিধ লীলার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, লীলাগুলির মধ্যে কৃষ্ণের বংশীবদন, গোপী-কৃষ্ণ সংলাপ, কৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং গোপীদের কৃষ্ণবৎ আচরণ অনুকরণ, যমুনাতীরে কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব, 'মহারাস'–এর অনুষ্ঠান, সর্বশেষ জলকেলি প্রধান। এই সমস্ত লীলা ও তাদের বিভিন্ন পর্ব মনে হয় ষোড়শ শতকের মথুরার 'অষ্টচাপ' ঘরানার কবিদের 'রাস'–এর উপরে রচিত বহুবিধ কাব্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা যুগিয়েছিল।[১০৩]

তবে 'চক্রনৃত্য', 'রাসনৃত্য' অথবা 'রাসলীলার' ক্ষেত্রে হরিবংশ পুরাণই হচ্ছে প্রথম গ্রন্থ, যে গ্রন্থে 'চক্র', 'ক্রীড়া', 'রাস' বা 'লীলার' স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে– চক্রাকার কাঠামোতে গোপিনীসহ নৃত্যরত কৃষ্ণের বিশদ বর্ণনাও পাওয়া যায় এতে। শুধু তাই নয় এই গ্রন্থের মাধ্যমেই নৃত্যের এমন তিনটি স্বতন্ত্র ধারার বর্ণনা পাওয়া যায়, যাদের সাথে বর্তমান মণিপুরী 'রাসনৃত্যের' গঠন-কাঠামো, রীতি-বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আরোপ করা যায়– 'এই হরিবংশ পুরাণেই যেন কয়েকটি নৃত্যের নাম স্পষ্ট পাওয়া গেল– যে নামের নৃত্যগুলি পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত কোনো কোনো ক্ল্যাসিক্যাল নাচে, সেই নাচগুলির আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন, হরিবংশে উল্লেখিত 'হল্লীসক' (Hallisaka) 'রাস' (Rasa) নৃত্য এবং 'ছালিক্য' (Chalikya)

---

১০০ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৫

১০১ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৪৪

১০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

১০৩ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৪৫

গান ও নৃত্য, 'আসারিত' নৃত্য প্রভৃতির মধ্যে 'রাসনৃত্য' তো আমরা বর্তমান মণিপুরী ক্ল্যাসিক্যাল নাচে নানা নামে ও আঙ্গিকে এ যুগেও বিভিন্ন মঞ্চে ও অনুষ্ঠানে দেখে থাকি।'[১০৪] 'হল্লীসক' হচ্ছে নৃত্যের প্রাচীনতম একটি রূপ যেখানে একটি পুরুষকে ঘিরে একদল নারী চক্রাকার নৃত্য করে এবং 'ছালিক্য' হচ্ছে নারী পরিবৃত নৃত্যবিশেষ। এই হিসেবে 'রাস', 'হল্লীসক' এবং 'ছালিক্য' এই তিনটি নৃত্যধারাই প্রায় সমরূপ গঠন-কাঠামোয় বিন্যস্ত ছিল বলে মনে হয়– নারী-বহুল, নৃত্য ও গীত প্রধান ও চক্রাকার আবর্তন প্রভৃতি সাদৃশ্য বিদ্যমান।

এদিকে শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন গ্রন্থে অভিনবগুপ্তের টীকায় নৃত্তভেদে 'রাসক' কথাটির উল্লেখ রয়েছে বলে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'রাসক' হচ্ছে এক প্রকার নৃত্য যার একাংশ নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়।'[১০৫] পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্য এবং নাট্য ভাষ্যকারগণ কর্তৃক নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত দশটি রূপকের অতিরিক্ত যে সকল গৌণ নাট্যরীতি– উপরূপকের উল্লেখ করা হয় 'রাসক' তাদের একটি। 'রাস' ও 'রাসক'-এর মধ্যে গভীর আত্মীয়তা নিরিখে চতুর্দশ শতকে রচিত হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশীলন' ও সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশ'-এর আলোচনায় উভয় শিল্পমাধ্যম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং এ প্রসঙ্গে গবেষক কপিলা বাৎস্যায়ন মন্তব্য করেন– 'রাসক' কিংবা 'রাস' কালক্রমে নিছক চক্র-নৃত্য হয়েই রইল না, তা একটি নাট্যানুষ্ঠানও হয়ে দাঁড়ালো।'[১০৬] অপরদিকে অভিনবগুপ্ত এক ধাপ এগিয়ে *মণ্ডলীকৃত নৃত্য* বা *চক্রনৃত্য* বলতে *হল্লীসক* বিবেচনা করেছেন– 'মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকমিতি নৃতম্।'[১০৭] আরও পরবর্তীকালে রাম ও কৃষ্ণের জীবনীকে কেন্দ্র করে 'চক্র-নাটক' নামে একপ্রকার মন্দির-আনুষ্ঠানিকতা তথা নাট্যক্রিয়ার সন্ধান জানা যায়, যাকে *লীলা* নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।'[১০৮] সুতরাং'চক্র' বা 'মণ্ডলাকার' বিষয়টি সেই শুরু থেকেই 'রাসনৃত্যের' সাথে সাঙ্গীকৃত হতে দেখা যায় এবং পুরো ব্যাপারটাতেই নৃত্য এবং গীত পেয়েছে শাস্ত্রীয় সান্নিধ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা। এক্ষেত্রে ড. শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়ের মণিপুরী নৃত্যের ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য–

> মণিপুরী নৃত্যকে সংস্কৃতে বলে 'মণিপুরী নর্তন', আর মণিপুরী ভাষায় বলে 'জগোই'। এই জগোই শব্দটি এসেছে চৎ+কোই (চৎ– যাওয়া, কোই– ঘোরা) থেকে। শাস্ত্রীয় মতে মণিপুরী নাচে যে বাহ্যভ্রমরী ও অন্তর্ভ্রমরী ব্যবহৃত হয় তা অনেকটা anti-clockwise circular movement–এর মতো। ঋক্‌বেদেও আদিত্যস্তুতি বর্ণনার অনুসরণে নাকি এই গতিভঙ্গিও সৃষ্টি–একথা মণিপুর থেকে প্রকাশিত একটি নৃত্য পুস্তিকায় লক্ষ্য করা গেছে।[১০৯]

---

১০৪ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯৩
১০৫ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর ; বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২
১০৬ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৪৬
১০৭ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯৮
১০৮ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৪৩
১০৯ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৫

এতক্ষণের আলোচনা থেকে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা যায়– প্রথমত, 'রাসনৃত্য' নাট্যশাস্ত্রের পরিশিষ্ট হিসেবে খ্যাত হরিবংশ পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পুরাণ প্রভৃতি পুরাণে বিশেষ একটি রীতি হিসেবে স্থান লাভে সমর্থ হয়েছে। ফলে 'রাসের' শাস্ত্রীয়-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, মণিপুরী 'রাসনৃত্যের' মণ্ডলাকার পরিবেশনার সাথে কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক রমণীদের 'চক্রনৃত্যের' সাদৃশ্যপূর্ণ যোগসূত্র আরোপ করা যায়। যদিও চক্রাকারে নৃত্য পরিবেশন করা অন্য অনেক জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতিরই সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য, তথাপিও পুরাণোক্ত এই 'চক্রনৃত্যে' কৃষ্ণের– বিষয় ও চরিত্রকে বিশেষ 'ভাবমুদ্রায়' এবং পরিবেশন-কাঠামোয় প্রতীকায়িত হতে দেখা যায়। কেননা 'পুরাণাদিতে 'রাসের' এবং হস্ত ও বাহু-শৃঙ্খলের যেসব নক্‌শার বর্ণনা আছে বৃত্তরচনা সেগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়।'[১১০] ফলে এই ধারাবাহিকতায় 'মণ্ডলাকার পরিবেশনা' মণিপুরী 'রাসনৃত্যের'ও বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে এবং মণিপুরী নর্ত্তন-এর সংজ্ঞায়ও বৃত্তের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মণ্ডলাকরের প্রতীকীরূপটি কেবল নৃত্যেই নয়, বরং তা আসর নির্মাণ ও পরিকল্পনাতেও পরিলক্ষিত হয়– 'কেন মণ্ডলাকার? কারণ *রাস* শুরুর পূর্বে *বৃন্দা* এসে বৃন্দাবন সাজিয়ে দিয়ে যায়, যেখানে রাধা-কৃষ্ণের *রাস* অতঃপর *লীলা* সংঘটিত হয়। এই যে বন অথবা কোনো বনে কি একদিক থেকে প্রবেশ করে, নাকি চারিদিক থেকেই প্রবেশ করা যায় ? তাই তো রাধা কৃষ্ণের লীলার জন্য তৈরি করা হয় যে বৃন্দাবন তা তো বৃত্তাকার হবে, মণ্ডলাকারে ঘুরতে হবে এটা নিয়ম। অর্থাৎ বনে যখন বিহার করছেন তখন তো পুরোটা জুড়ে বিহার করছেন বা বৃত্তাকারে ভ্রমণ করছেন। তাই তো মণ্ডলাকার হয়।'[১১১]

তৃতীয়ত, 'রাস' এর সাথে উপরূপক 'রাসক'-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে 'রাসনৃত্যকে' ধ্রুপদী-ঘনিষ্ঠ একটি নাট্যরীতি হিসেবে পরিগণিত করা যায়। এক্ষেত্রে কেবল 'রাসক' নয়, অপর একটি উপরূপক– বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণে* বর্ণিত 'হল্লীশ'-এর গঠন-কাঠামোর সাথেও 'রাসনৃত্যের' সাদৃশ্য নির্ণয় করা যায়। সংস্কৃত ও শৌরসেনী প্রাকৃত এই দুই ভাষায় রচিত একটি দৃশ্যকাব্য হচ্ছে এই 'হল্লীশ'। বহু তাল ও বহুবিধ লয়ে বিন্যস্ত এই গৌণ নাট্যরীতিটিও একটিমাত্র পুরুষ এবং আট/দশজন নারী কুশীলব দ্বারা পরিবেশিত হয়। এর বৃত্তি 'কৈশিকী' অর্থাৎ 'সুকুমার'। 'সুকুমার' অভিনয় নৃত্য-গীত-রমণীয়, এ কারণে রমণী-বহুল। তাই রীতি-কাঠামোর দিক থেকে *হরিবংশ পুরাণের* 'হল্লীসক' এবং *সাহিত্যদর্পনে*র 'হল্লীশ'-এর মধ্যে কার্যত বিশেষে কোনো প্রভেদ লক্ষ করা যায় না। অপরদিকে 'রাসনৃত্যের' সাথে উপরূপক 'হল্লীসকের' রয়েছে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। সুতরাং এই সকল যুক্তি বিবেচনায় এনে যদি ড. শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়ের অভিমত গ্রহণ করা হয়, তবে বলা যায়– 'রাসনৃত্য' এই সময় (পৌরাণিকযুগ) থেকেই ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের মর্যাদা পেয়েছে। [...] বর্তমানে আমরা যে 'রাসনৃত্য' দেখি তার আদি রূপ বা অবস্থা এই সময়েই পাওয়া যায়। সুতরাং সেদিক

---

১১০ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৫৩

১১১ নাট্য নির্দেশক, কবি, মণিপুরী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শুভাশিষ সিনহা-এর প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১৩/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

থেকে বিচার করলে মণিপুরী ‘রাসনৃত্য’ প্রাচীন ধারারই নব সংস্করণ বলা যায়।[১১২] অপরদিকে কপিলা বাৎস্যায়ন মনে করেন মণিপুরী নৃত্যই হচ্ছে পুরাণোক্ত শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রত্যক্ষ পরম্পরা– ‘Perhaps the most direct descendents of the rasa dances described in the Puranas are the rasa dances from Manipur.’[১১৩] তবে এই পর্বের লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে কৃষ্ণের পাশে নৃত্যরত একাধিক স্ত্রীলোকের দেখা মিললেও ‘রাধা’ চরিত্রটি তখনও স্ব-ভাবে আবির্ভূত হয়নি। ‘রাধা’ চরিত্রটি আরও পরবর্তী কালের, বলা যায় বঙ্গীয় কৃষ্ণই প্রথম যিনি পরম-ভালোবাসায় জীবাত্মা ‘রাধা’কে সঙ্গী করে নিয়েছে।

খ. রাসনৃত্যের বঙ্গীয় শিল্পরূপ

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে বস্তুত পুরাণকাল থেকেই কৃষ্ণ-কাহিনী ভিত্তিক ‘রাস’ শাস্ত্রীয় গঠন-কাঠামোয় ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে শুরু করে এবং এ সময়েই তিনটি নৃত্যধারা– ‘রাসনৃত্য’, ‘হল্লীসক’ এবং ‘ছালিক্য’ শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে এগুলো একক চরিত্র– পুরুষ/কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক, দলগত রমণী-বহুল, চক্রাকার নৃত্য এবং গীতাভিনয় দ্বারা সমৃদ্ধ। ‘রাসের’ শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই একাধিক শিল্পরূপ মধ্যযুগে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আর তা কেবল নৃত্যের মাধ্যমে নয়, হাতের তালিতে ‘তালরাস’, দণ্ড বা কাঠি বাজিয়ে ‘লটকরাস’, রাগ, তাল, সুরে বৃন্দাবনের ব্রজরাস (পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে) প্রভৃতি শিল্পরপের আবির্ভাব ঘটে। নানাবিধ শিল্পরূপ ও আঙ্গিকে বিকাশ ও বিস্তারের ধারায় বাংলা-অঞ্চলের কৃষ্ণ-কাহিনীও নব উদ্দীপনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। এই পর্বে কৃষ্ণ ভাব-দর্শনের সাথে ভক্তি ও প্রেমের সমন্বিত অভিব্যক্তি এমন এক কাব্যময় শিল্পরূপের জন্ম নেয় যার ব্যাপকতা অচিরেই পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে ক্রমান্বয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বলা যায়, ‘পঞ্চদশ শতক থেকে আরেকটি পর্বের সূচনা। বৈষ্ণব আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো এবং ওই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় আবার লোকের উৎসাহ নতুন করে উদ্দীপ্ত হলো, এইভাবে কৃষ্ণকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত নাট্য ও নৃত্যরূপমূলক অনুষ্ঠানগুলি নবভাবে উদ্দীপ্ত হলো।’[১১৪]

বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ সে তো বংশী হাতে গীত-সঙ্গীত প্রিয় এক পরম পুরুষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন সৃষ্ট মধ্যযুগের বাংলায় বিকশিত কৃষ্ণের এই সাঙ্গীতিক রূপটির মূলসূত্র ও প্রেরণা হিসেবে তিনটি প্রভাব চিহ্নিত করা যায়– এক. কবি জয়দেব রচিত (১২ শতক) *গীতগোবিন্দ*, দুই. ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত *ব্রজমণ্ডল* এবং তিন. বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্ব– *চর্যাপদ*।

---

১১২ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০২

১১৩ K. Vatsyayana, *Classical Indian Dance in Literature and Art.* Page 194, উদ্ধৃত হয়েছে ড. শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০২ গ্রন্থ থেকে

১১৪ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৪৭

এই তিনটি সূত্রের মধ্যে যেটি বৈষ্ণবদের ভাব, ভক্তি ও প্রেমধর্মের সূত্রগ্রন্থরূপে এবং পরিবেশনার গঠন-কাঠামোয় অনুসরণীয় রীতি হিসেবে সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে সেটি– 'গীতগোবিন্দ'। বাংলায় বিকশিত চৈতন্যদেব প্রবর্তিত কৃষ্ণ-আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনায় *গীতগোবিন্দের* প্রভাব প্রসঙ্গে বলা হয় যে– 'গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মণিমঞ্জুষা, তথা অধ্যাত্মতত্ত্বের রত্নসম্পুট। শ্রীগীতগোবিন্দ রাধা পারম্যবাদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার প্রামাণ্যপুরাণ।'[১১৫] *গীতগোবিন্দ* কাব্যের নতুনত্ব হচ্ছে এই যে, 'জয়দেব কৃষ্ণকাহিনীর এক ভিন্নতর ছাঁচ নির্মাণে তাঁর শিল্পকুশলতার প্রয়োগ করেছিলেন : তিনি রাধা-চরিত্রের অবতারণা করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যের রাগ ও তালের সংযোজন ঘটিয়েছিলেন– দুটোই নতুন।'[১১৬] *রাসের* পূর্বোক্ত সকল আলোচনায় কৃষ্ণের সাথে নারী/স্ত্রীগণের উপস্থিতি দেখা গেলেও কোথাও *রাধার* উল্লেখ ছিল না। পণ্ডিতগণের ভাষ্যমতে জয়দেবই প্রথম *রাধাকৃষ্ণের* যুগলরূপের প্রতিষ্ঠা করেন– 'রাধাকৃষ্ণের ধ্যান-কল্পনাও বোধ হয় এই পর্বের বাঙলাদেশরই সৃষ্টি এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গ্রন্থেই বোধ হয় প্রথম এই ধ্যান-কল্পনার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত রূপ আমরা দেখিতেছি। [...] সেন পর্বের কোনও সময়ে বোধ হয় অন্যতমা গোপিনী রাধা কল্পিতা হইয়া থাকিবেন এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তিধর্মের প্রভাবে।'[১১৭]

জয়দেব সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি 'বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য–ভাষার আদিকবিও বটেন। ইঁহারই গীতিকবিতার আদর্শে বাঙ্গালা দেশে মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ও অনুরূপ গীতিকবিতার ধারাস্রোত নামিয়াছিল।'[১১৮] তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং প্রামাণ্য পণ্ডিত ব্যক্তি। *গীতগোবিন্দের* প্রতিটি গানে তিনি তাল ও রাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং গীতোক্ত পদগুলি গাওয়া হতো রাগ ও তাল অনুসারে যেমন, মালব-রাগ– রূপকতাল; গুর্জরী-রাগ– নিঃসার তাল, যতিতাল, একতালী; দেশাগ-রাগ– একতালী প্রভৃতি। *গীতগোবিন্দে* সর্বমোট ২৪টি গান সন্নিবেশিত রয়েছে, 'রাধাবিরহ' যার মূল বস্তু। রাধার অগোচরে কৃষ্ণ অন্য গোপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এ কথা জানতে পেরে রাধার তীব্র অভিমান, ভর্ৎসনা অতঃপর সখীদের মধ্যস্থতায় উভয়ের মিলিত হওয়া, এই হচ্ছে *গীতগোবিন্দের* সার কথা। এর পাত্র-পাত্রী বা চরিত্র সংখ্যা তিন– রাধা, কৃষ্ণ এবং সখী বা দূতী। পরিবেশনা-রীতির বিচারে নানা জন নানাভাবে *গীতগোবিন্দকে* অভিহিত করেছেন। সুকুমার সেন এই কাব্যকে 'গীতিনাট্য-"প্রবন্ধ"[১১৯] নামে অভিহিত করেছেন। কোনো কোনো গবেষক *গীতগোবিন্দকে* "চিত্ররাগকাব্য" এবং "নাটগীত" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, আবার কেউ কেউ একে "অপেরা" হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন।[১২০] ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর কাব্যগুণ প্রসঙ্গে বলেন– 'ছন্দ-নৈপুণ্যে,

---

১১৫ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬
১১৬ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নায়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৫০
১১৭ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গলীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ.৫৪৮
১১৮ সুকুমা সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩২
১১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১২০ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর ; বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩

ভাষার কারুতায় ও চারুতায়, ভাবে প্রাবল্যে, রসের প্রাচুর্যে, ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যে গীতগোবিন্দ দ্বিতীয়-রহিত গীতিকাব্য।'[১২১]

জয়দেব এবং তাঁর সমসাময়িক কালের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যান-কাব্যের মূল শক্তি– *রস*। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষত রাজসভা কিংবা উচ্চকোটি-অভিজাতের আসরে এই *রস* কামদহনে মদ্যের পর্যায় উন্নীত হলেও *গীতগোবিন্দের* কীর্তি এখানেই যে, এই কাব্যে নারী ও পুরুষের দেহজাত বা জৈবিক-কামনার এক অপূর্ব ভক্তিরসময় রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরই বস্তুত পাঠক/রসিককে জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে এক পরম ভক্তি-রসাবেশময় ব্যঞ্জনায় আখ্যানের কাব্য-রস আস্বাদনে নিমগ্ন করে তোলে। অপরদিকে এটি গীতিকাব্য হয়েও এতে নাট্য-লক্ষণ স্পষ্টত বর্তমান– নৃত্য, গীত ও ছন্দের সু-বিন্যস্ত ও সমন্বিত শিল্প-ভূমির ওপর রাধা, কৃষ্ণ বা সখীদের গীতময় সংলাপাত্মক উপস্থিতি এবং চরিত্র ও ঘটনার ভাব-ব্যঞ্জিত বর্ণনায় কাব্য-আখ্যানের ক্রমাগত অগ্রগতি, ভক্ত/রসিকচিত্তে নাট্যের রস-আস্বাদন করায় ষোলআনাই। বস্তুত *গীতগোবিন্দে* রয়েছে তিনটি গুণের অপূর্ব সমন্বয়– এর বিষয়বস্তু ধর্মীয় স্তুতিমূলক, গঠন-কাঠামো নাট্যলক্ষণ সমৃদ্ধ এবং শ্রুতি বা দর্শনে ভক্তিরসোদ্দীপক। ফলে এসকল গুণ-সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থটি কেবল সাহিত্য-মূল্যে অনন্য বিবেচিত হয়েছে তাই নয় বরং তা বৈষ্ণবদের শাস্ত্রীয়গ্রন্থ রূপেও পেয়েছে বিশেষ মর্যাদা। '[এবং এই হিসেবে] পরবর্তী বাঙলা পদাবলী-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য এই দুই সাহিত্যধারার আদিতে গীতগোবিন্দের স্থান।'[১২২] সুতরাং মধ্যযুগে বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী যে ব্যাপক প্লাবনের ন্যায় সমগ্র বাংলা তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এর আকর-সূত্র হিসেবে *গীতগোবিন্দকেই* সর্বাত্মকরূপে চিহ্নিত করা যায়।

এই আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাধনার সার কথা যদি হয় এই যে– কৃষ্ণই প্রেম, প্রেমই ঈশ্বর, তবে এই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি-মহাভাবের বীজ ঐ *গীতগোবিন্দ* থেকেই আহরিত হয়েছে। কেবল ভাব-রসের ক্ষেত্রেই নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর সাথে গীতগোবিন্দের গঠন-কাঠামোর মধ্যেও রয়েছে অভিন্ন সম্পর্ক। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ভাষাগত মিল-অমিল প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> আগেই বলিয়াছি, পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় ও গঠনরীতি জয়দেবের গানেরই মতো। জয়দেবের গানের ভাষা সংস্কৃত। এ সংস্কৃতরীতি আসলে প্রাকৃত (অপভ্রংশ-অবহট্ঠ) ভাষার সম্পূর্ণ ছায়াবহ। সংস্কৃতের হ্রস্বদীর্ঘ অক্ষর-পরম্পরা অথবা প্রাকৃতের হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রা-মান বাঙ্গালা ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না। সেইজন্য বাঙ্গালা (ও মৈথিলী) ভাষা উদ্ভূত ও প্রচলিত হইবার পরেও জয়দেবের গানের ভাষার ভাঙা পদ্ধতি চলিতে থাকে। এই পদ্ধতির মূলে ছিল অবহট্ঠ গান।

---

১২১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬

১২২ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ৬২৯

সুতরাং সেই ভাঙা পদ্ধতিতে অবহট্‌ঠেরই কালোপযোগী পরিবর্তিত রূপ অবলম্বিত। ইহাই মিশ্রভাষা "বজ্রবুলি"র উৎস।[১২৩]

তবে *গীতগোবিন্দের* কাব্য-ভাষার সাথে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের (অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ) আত্মীয়তা অল্প-বিস্তর যা-ই থাকুক, একদিকে এই কাব্যের গঠন-কাঠামো– পদ ও ছন্দ বিন্যাসের সাথে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর রয়েছে গভীর সাদৃশ্য, অপরদিকে বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস হিসেবে খ্যাত *গীতগোবিন্দের* কাব্য, পদ ও ছন্দ বিন্যাসে পালযুগের বৌদ্ধগান ও দোঁহাবলী– *চর্যার* গঠন-কাঠামো এবং ভাব-দর্শনেরও রয়েছে সুস্পষ্ট প্রভাব। *চর্যাপদের* ছন্দ, যা অন্ত্য মিলে বিন্যস্ত, কবিতায় আদিরসের আবরণে গূঢ় সাধনসঙ্কেতের রহস্যময় প্রকাশ এবং বৌদ্ধ গান ও দোঁহাবলীতে ধর্ম ও বর্ণের (ডোম, চাঁড়াল, চণ্ডাল) শ্রেণী/জাত-বৈষম্যহীন সহজ ভাব-দর্শনের গীতি-কথন বৈষ্ণব *পাদাবলী* এবং *গীতগোবিন্দ* উভয়কেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। চর্যাপদের ছন্দ ও সাধনসঙ্কেতের বিষয়গুলো *গীতগোবিন্দকে* কতটুকু প্রভাবিত করেছে এ প্রসঙ্গে ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন– 'জয়দেব এই (চর্যার) ছন্দ ও অন্ত্যনুপ্রাসকে আত্মসাৎ করিয়া, সাধনসঙ্কেত নিহিত রাখিয়া উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন– শ্রীগীতগোবিন্দ। তাহারও অন্তরে বাহিরে আছে আদিরস, উজ্জ্বলরস– অপ্রাকৃত প্রেমরসায়ন।'[১২৪]

অন্যদিকে বাংলার বৈষ্ণব সাধনায় গীত-সঙ্গীত, সুর-ছন্দের যা কিছু শাস্ত্রীয়-যোগ বর্তমান, এর মূলে ভারতীয় সঙ্গীতের বরণীয় পীঠস্থান *ব্রজমণ্ডলের* সঙ্গীত-ঐতিহ্যের প্রভাব ও পরম্পরাকেও অস্বীকার করা যায় না। *বজ্রমণ্ডলের* স্থান ও পরিধিকে চারটি সঙ্গীত কেন্দ্রে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে– বৃন্দাবন, যতিপুরা, মথুরা ও গোকুল এবং সাধারণ ব্রজবাসীর মতে যা ৮৪ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বজ্রমণ্ডলের সঙ্গীত সাধনার জনপ্রিয় সঙ্গীত-ধারার মধ্যে বালক কৃষ্ণের লীলাচঞ্চলতা ছিল অন্যতম। ইতিহাসে বৃন্দাবন ঐতিহ্য লুপ্ত হওয়ার পর চৈতন্যদেবই প্রথম যিনি তীর্থ-বৃন্দাবনকে পুনঃ আবিষ্কার করেন–

> বৃন্দাবনে তীর্থের পুনরুদ্ধারে শুধু নয়, সেখানকার সঙ্গীতচর্চার সঙ্গেও বাংলার সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। ভারতীয় প্রবন্ধ সঙ্গীতের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র তৎকালীন বৃন্দাবন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৃন্দাবন বাস উপলক্ষে সঙ্গীত চর্চাও কেউ কেউ করেন ধর্ম-জীবনের অঙ্গস্বরূপ। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মাধ্যমে সেই ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বাংলাদেশেও আসে। কখনো তা নব রূপ ধারণ করে বাংলায়। যথা– রাজশাহী অঞ্চলের নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩৪-১৬১৫) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় বৃন্দাবনবাসী হন ও লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হন। বৃন্দাবন নিবাসী হয়ে তিনি ভারতীয়

---

১২৩ সুকুমা সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৫
১২৪ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫

> সঙ্গীতচর্চাও বিশেষভাবে করেন বিদগ্ধ সঙ্গীতগুরুর শিক্ষাধীনে। নরোত্তমই পরে সেই পদ্ধতিগত সঙ্গীতের ভিত্তিতে বাংলার পদাবলী কীর্তন-গানের প্রবর্তন করেন।[১২৫]

বলা হয়ে থাকে যে কৃষ্ণলীলাধন্য এই বজ্রভূমি– *ব্রজমণ্ডলের* সঙ্গীত ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ সূত্রেই বাংলার পদাবলী ও কীর্তনে ক্রমনির্দিষ্ট রাগালাপ ও গৌরচন্দ্রিকা-সমন্বিত সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন ঘটে এবং এ ক্ষেত্রে নরোত্তম ঠাকুরই প্রথম যিনি এই সঙ্গীত আদর্শ অনুসারে 'লীলাকীর্তন' পরিবেশন করেন **১৫৮২** খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর খেতরিয়র বৈষ্ণব মহা-উৎসবে। এই *লীলাকীর্তনের* আদর্শে-ই পরবর্তীতে 'বাংলায় প্রবর্তিত হয় কীর্তন সঙ্গীতের দূরপ্রসারী ধারা।'[১২৬] সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলার কৃষ্ণ-কাহিনী ভিত্তিক যে সকল শিল্পরূপ– পদাবলী ও কীর্তন আঙ্গিকে বিকশিত হয়েছে এর মূলে রয়েছে *ব্রজমণ্ডলের* বৃন্দাবন ও মথুরা কেন্দ্রিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আদর্শ এবং ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

সুতরাং বাংলায় বিকশিত *রাস ও লীলার* আলোচনায় রাধা-কৃষ্ণের ভাব, ভক্তি ও প্রেমধর্মের সাঙ্গীতিক রূপটিকে সর্বাধিক গুরুত্বে এবং বিশিষ্ট বঙ্গীয় রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ বাংলায় বিকশিত সকল শিল্পরূপ ও রীতিতে নৃত্যের (রাসনৃত্য, হল্লীসক, ছালিক্য) শাস্ত্রীয় পরম্পরার চেয়ে গীত-সঙ্গীত প্রধান 'পদাবলী' ও 'কীর্তন' বিশেষত শ্রীরাধাগোবিন্দের বা শ্রীগৌরচন্দ্রের নাম, লীলা ও গুণকীর্তন সর্বাধিক প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং অনেকাংশে তা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উত্তরাধিকার হিসেবেও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ফলে বাংলা অঞ্চলে *নাম সংকীর্তন, পদাবলী কীর্তন, ঢপকীর্তন, লীলাকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন* প্রভৃতি বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। যদিও *গীতগোবিন্দের* প্রত্যক্ষ প্রভাবে ত্রি-চরিত্রের নাট্যলক্ষণযুক্ত নৃত্য ও গীতময় সংলাপাত্মক ধারায় নাটগীত রীতির উপস্থিতি বর্তমান, তথাপিও এই বাংলার কৃষ্ণ-বিষয়ক আখ্যান পরিবেশনায় 'নৃত্য' কোনো বিশিষ্ট শিল্পরূপ হিসেবে বা শাস্ত্রীয় মর্যাদায় আবির্ভূত হতে পেরেছে এমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অপরদিকে *চর্যাপদ* থেকে *গীতগোবিন্দ* অতঃপর *ব্রজমণ্ডল* এই তিনটি পর্বেই পদ/কবিতা, ছন্দ ও সুর/গীতের গঠন-কাঠামো ক্রমান্বয়ে বিশিষ্ট রূপ লাভ করে শাস্ত্রীয় বলয়ে যুক্ত হবার পথ খুঁজে পায়। এই ঐতিহ্যই বস্তুত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের *পদাবলী* এবং *কীর্তনে*র বাহন হয়ে ওঠে এবং বিপুল গ্রহণযোগ্যতায় পরবর্তীতে প্রান্তদেশীয় মণিপুরসহ নানা রাজ্যের সাথে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র নির্মাণের পথ সুগম করে। বস্তুত বৈষ্ণব ভক্ত, সাধক তথা পরিব্রাজকগণের হাত ধরেই বঙ্গীয় রাধাকৃষ্ণের সাথে মণিপুরের প্রথাগত, ধর্মীয় এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক ও কৃত্যমূলক অনুষ্ঠানাদির মেলবন্ধন ঘটে। মিলন ও আত্তীকরণের এই সূত্রে অতঃপর মণিপুরে রাধাকৃষ্ণ-আখ্যান এমন একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়, যেখানে 'লীলা'-র দিকটা কম গুরুত্ব পায়, সেই স্থলে 'রাস' নৃত্যের বিভিন্ন রূপ এমন পরিমার্জিত শৈলীতে সূক্ষ্ম আকারে বিকশিত করে তোলা হয় যে ওই

১২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ

শিল্পরূপগুলির ভিতর সেইসব চিহ্নাদির সামান্যই বর্তমান ছিল যাকে এমনকি দূরতম কল্পনায়ও লৌকিক বা 'দেশী' বলা যায়।'[১২৭]

গ. মণিপুরে রাসনৃত্যের চর্চা

ভারতীয় নৃত্যের যে কয়টি ধারা শাস্ত্রীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে 'মণিপুরী রাসনৃত্য' এদের অন্যতম। ভারতের মণিপুরীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানান উপাদান, অনুষঙ্গের সাথে উত্তরকালের *রাধাকৃষ্ণের* বিষয়াবলীর মেলবন্ধনেই বস্তুত *মণিপুরী রাসনৃত্যের* প্রচলন ঘটে। কিন্তু *রাসনৃত্যের* উদ্ভব বিষয়ে ইতিহাস সূত্রে যা কিছু জানা যায়, তাতে এই নৃত্যের পরম্পরা দীর্ঘ-প্রাচীন নয়, বলা যায় মধ্যযুগের শেষ অধ্যায়ে এই নৃত্যের গঠন-কাঠামো এবং রীতি-পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। এক্ষেত্রে *রাসলীলার* আনুষ্ঠানিক সূচনা বা প্রদর্শন রাজা ভাগ্যচন্দ্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৭৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। একদা তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং স্বপ্নে নিজ কন্যা বিম্বাবতীকে রাধা রূপে দেখলেন, এরপর তিনি মণিপুরের এই লীলার আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন প্রচলন করলেন। তবে *রাসনৃত্যের* শাস্ত্রীয় সূচনার মূলে শুধু রাজা ভাগ্যচন্দ্র একা নন, মণিপুরের পূর্বাপর আরও বেশ কয়েকজন রাজা এবং আভিজাত এক শ্রেণীর সংস্কৃতি-প্রেমী মানুষের প্রত্যক্ষ এবং আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বলেও ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ব্যক্তি পর্যায়ের আগ্রহ আর আনুকূল্যই যে শুধুমাত্র *রাসনৃত্যের* উদ্ভব ও বিকাশের মূলে সক্রিয় ছিল তা কিন্তু নয়, বরং মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকলার বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ বিশেষত 'লাইহারাওবা'– উৎসব অন্তর্গত নৃত্যের শৈলীবদ্ধ বিধি-বিধানের প্রতি ব্যক্তির আনুকূল্যতা এবং নান্দনিক চর্চায় সৃষ্ট দীর্ঘ নৃত্য-পরম্পরাই ক্রমান্বয়ে শাস্ত্রীয় শিল্পরূপের মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে। *রাসনৃত্যের* শাস্ত্রীয়করণের মূলে একদিকে যেমন মণিপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-অনুষঙ্গ 'লাইহারাওবার' প্রত্যক্ষযোগ নির্ণয় করা সম্ভব, অপরদিকে এই নৃত্যের 'বিষয়' হিসেবে সন্নিবেশিত *লীলার* মূলগত প্রেরণায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তাদের ধ্যান-কল্পনায় সৃষ্ট রাধাকৃষ্ণের কথা, কাব্য ও আখ্যানের উপস্থিতিকেও গৌণ বিবেচনা করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

রাসনৃত্যে বাংলার বৈষ্ণবীয় প্রভাব প্রসঙ্গে ইতিহাসের পাঁচটি কাল-সূত্রকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়– এক. রাজা কিয়াম্বার রাজত্বকালে বঙ্গদেশীয় সংকীর্ত্তন পরিবেশনা (পঞ্চদশ শতাব্দী), দুই. রাজা খাগেম্বার শাসনামলে (১৬৩০ খ্রিঃ) বঙ্গদেশ পালা পরিবেশনা, তিন. রাজা পাম্‌হৈবা তথা গরীবনেওয়াজের (১৭০৯-১৭৪৮) রামানন্দী ধর্মগ্রহণ, চার. রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র তথা চিংথাংখোম্বা, জয়সিংহ, কর্তামহারাজ (১৭৬৩-১৭৯৮) কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মকে রাজধর্ম ঘোষণা করা এবং পাঁচ. রাজা চন্দ্রকীর্ত্তির রাজত্বকাল। গবেষকদের মতে মণিপুরে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের পদার্পণ ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা কিয়াম্বার শাসনামলে এবং এই সময়ে বিষ্ণু মন্দিরে যে সকল সংকীর্ত্তনগায়কগণের সন্ধান পাওয়া যায় এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বঙ্গদেশীয়। রাজা খাগেম্বার শাসনামলে

১২৭ কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল ট্রাস্ট বুক ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৫০-৫১

একদল কীর্ত্তনগায়কদের উল্লেখ পাওয়া যায় ; 'তারা নিজেদের বঙ্গদেশ পালা (অরিবা পালা) বলতেন।'[১২৮] উপদেশক শান্তিদাসের রামানন্দী ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় রাজা গরীবনেওয়াজের শাসনামলেই এবং তিনি এই ধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রাচীন পুরাণাদি গ্রন্থ জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। গরীবনেওয়াজের সময়ে 'বঙ্গদেশপালা রামানন্দী ধর্মের সাথে সাথে একই সঙ্গে প্রবৃত্ত হয়।'[১২৯] উল্লেখ্য, *বঙ্গদেশ পালাকে* প্রাচীন গায়কদল বলা হয়। *রাসনৃত্যের* বিকাশে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। বস্তুত এই রাজার শাসনামলেই মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়। আর এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসারী শ্রীনরোত্তম গোস্বামীর সঙ্গী সাথিগণই মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপকতা ছড়িয়ে দিতে বিশেষ অবদান রাখেন। ইতিহাসের এই পর্বে রাজা ভাগ্যচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মের সান্নিধ্যে আসেন এবং এই ধর্মের প্রতি বিশেষ প্রীতি ও ভক্তির সূত্রেই তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি বৈষ্ণবধর্মকে রাজধর্ম ঘোষণা করেন এবং প্রজা সাধারণদেরও এই ধর্মে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি ও আনুকূল্যতা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গোবিন্দজীর মূর্তি স্থাপন করেন এবং তাঁরই অনুরোধে পরমভক্ত রসানন্দ এবং গুরু স্বরূপানন্দের সহায়তায় পাঁচদিনব্যাপী রাসলীলার আয়োজন করা হয়। 'এই সময় রাসলীলায় *অচৌবা ভঙ্গিপারেং* (ভঙ্গাবলী) এর মতো কঠিন এবং সুন্দর নর্ত্তন রচিত হয়। এই ভঙ্গিপারেংটি মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের সময়ে প্রবর্তিত *মহারাস, বসন্তরাস এবং কুঞ্জরাসের* জন্য আবশ্যক করা হয়।'[১৩০] ইতিহাসে ১৮৫০ থেকে ১৮৮৬ মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির শাসনামলকে মণিপুরের সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ হিসেবে দেখা হয়। তাঁর শাসনামলেই *নর্ত্তনরাস* বা *নিত্যরাস* প্রবর্তিত হয়। মণিপুরী *রাসনৃত্যের* উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনে রাজা গরীবনেওয়াজ এবং মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির অবদান প্রসঙ্গে ড. কপিলা বাৎস্যায়ন বলেন– The origin of the famous *Rasa* dances is attributed to Rajarshi Bhagya Chandra Maharaj (1763-1798); he along with Chandra Kirti (1850-1886) laid the foundation of all that is known by the name of Classical Manipuri dance. [১৩১]

ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে ক্রম-আত্তীকরণের মাধ্যমে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে তা মণিপুরী জন-মানসে এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবল এক পরিবর্তন সাধন করে। যদিও মণিপুরীদের ধর্মীয় সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্য এবং পরম্পরায় শৈব বা শাক্তের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্যণীয়, এমনকি শিব ও পার্বতী ছিল তাদের ধর্মীয় উৎসব, অনুষঙ্গ এবং নৃত্যেরও প্রধান দেবতা, অর্থাৎ নৃত্যের সাথে শাক্ত-শাস্ত্রীয় যোগ পূর্বকাল থেকেই ছিল। তথাপিও পরবর্তীকালে 'বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলা ব্যাপকতা পায়। এই ব্যাপারে

---

১২৮ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫
১২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৩১ Kapila Vatsyayan, *Traditions of Indian Folk Dance,* India Library, New Dilhi, 1976, p. 132

জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটির প্রভাব অপরিসীম, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অবশ্য 'এই গ্রন্থটির ভাব-রস ভারতীয় নৃত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাকেই রস সিক্ত করেছে'[১৩২] এবং মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবেরও অনুসরণীয় শাস্ত্ররূপে গৃহীত হয়। সুতরাং এ সকল তথ্য উপাত্তের আলোকে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, রাধা ও কৃষ্ণ *রাসনৃত্যের* আসরে ভক্ত/রসিক চিত্তকে যে ভাব, ভক্তি ও প্রেম দ্বারা আন্দোলিত করেছিল সেটি বস্তুত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন প্রভাবজাত।

কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ এবং সখীদের লালিত্যময় শরীরের যে সকল ছন্দ ও ভঙ্গির শৈলীবদ্ধ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় সেটি কোনো মতেই বাংলার নয় বরং বলা যায় মণিপুরের পৌরাণিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত নৃত্যেরই বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রকাশ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বঙ্গীয় অঞ্চলে কৃষ্ণ-বিষয়ক নানাবিধ পরিবেশনায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-ঐতিহ্য ও পরম্পরার বেশকিছু রীতি অনুসৃত হতে দেখা গেলেও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা ঐতিহ্যের পরম্পরা এবং চর্চা সুনির্দিষ্ট কোনো ধারায় বিকশিত হয়েছে এমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মণিপুরী ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ, গবেষক, নৃত্য ও সঙ্গীত গুরু প্রমুখ সকলেই প্রায় একমত যে, মণিপুরী *রাসনৃত্যের* শাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধ কাঠামোর আদি রূপ হচ্ছে *লাইহারাওবা*– মৈতেই মণিপুরীদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অত্যন্ত শৈলীবদ্ধ নৃত্য ও গীত প্রধান একটি উৎসব। দেবতার সন্তুষ্টি বিধানার্থে নৃত্য ও গীত প্রধান উৎসব এই *লাইহারাওবাকে* creation of cosmos বলে থাকেন কেউ কেউ। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, নৃত্য-সমৃদ্ধ এই উৎসব কেবল *রাসনৃত্যের* নয় বরং মণিপুরী সকল নৃত্য বা নর্ত্তনেরও আদি রূপ। *লাই* অর্থ হচ্ছে দেবতা এবং *হারওবা* অর্থ হচ্ছে আনন্দঘন– অর্থাৎ আনন্দঘন চিত্তে দেবতাকে প্রসন্ন করাই হচ্ছে এই উৎসবের লক্ষ্য। উৎসবে নৃত্য ও সঙ্গীতগুরু– *মাইবী*, যারা মণিপুরী সমাজে স্ত্রীপুরোহিত হিসেবে সম্মানীয়, এঁরা নৃত্য, গীত সহযোগে নাট্যধর্মী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দেবতার সম্মুখে জগৎ সৃষ্টির লীলাসমূহ প্রদর্শন/অভিনয় করতেন। প্রাচীন কিছু গ্রন্থে *লাইহারাওবার* যে সকল পর্যায়ক্রম বা অধ্যায়ের বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তৃতীয় অধ্যায়ের *লাইবৌ খুৎথেক* অংশে সম্পূর্ণ মুদ্রা অনুসৃত নৃত্য প্রদর্শনের উল্লেখ রয়েছে এবং এই সকল 'হস্তমুদ্রা দ্বারা সৃষ্টিরহস্য ব্যক্ত করা হয়।'[১৩৩] তাছাড়া লাইবৌ খুৎথেক পর্যায়ের বেশকিছু অংশের বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে নানাবিধ ক্রিয়া প্রদর্শনে হস্তমুদ্রা ব্যবহার করা হতো বলে জানা যায়, যেমন– য়ুম সারোন খুৎথেক– যেখানে ঘর বানানোর ক্রিয়া হস্তমুদ্রায় প্রকাশ করা হতো। সুতরাং কেবল স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে কোনো একজন একটি শিল্পরূপ ও রীতি প্রবর্তন করেছেন বিষয়টিকে এরকম সাধারণ দৃষ্টে গ্রহণ করার অবকাশ নেই। বরং মণিপুরী *রাসনৃত্যের* উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনে এক দীর্ঘকালীন সমন্বয় ও আত্তীকরণের ধারাবাহিক যোগসূত্র নির্ণয় করা সম্ভব। এক্ষেত্রে দেবতাদের (শিব, পার্বতী) উদ্দেশে নিবেদিত মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের (লাইহারাওবা) বিধিবদ্ধ আঙ্গিক, রীতি-কাঠামোর সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তিত রাধা-কৃষ্ণের বিষয় ও

---

১৩২ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৫

১৩৩ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩

ভাব-দর্শনের মধ্যে দীর্ঘকালীন এক সমন্বয় এবং আত্তীকরণের মাধ্যমে এই শিল্পরূপটির উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন সম্ভব হয়েছিল এমন ধারণাই সঙ্গত মনে করি।

সুতরাং *রাসনৃত্যে* বহিরাঙ্গিক রীতি-কাঠামোর শাস্ত্রীয় প্রকাশ যদি হয় দেহরূপ– *মুদ্রা*, তবে এর প্রাণরূপ আত্মা হচ্ছে– *পরমাত্মা* কৃষ্ণ ও *জীবাত্মা* রাধা। বলাবাহুল্য যে, এই কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণ নয়, এই কৃষ্ণ রাধাভাবে মত্ত এক প্রেমিক কৃষ্ণ– চৈতন্যদেবের প্রকৃতি ও পুরুষের মিলিত রূপ রাধা-কৃষ্ণ। বলা যায় এই রাধা ও কৃষ্ণের ভক্ত-অনুসারী 'বৈষ্ণব পদকর্তাদের নানান পদ ও বোল নিয়ে মণিপুরী চিন্তকেরা রচনা করতে লাগলেন রাসলীলার আঙ্গিক। আর ভরত প্রমুখ শিল্পগুরুদের নানান মুদ্রা বা করণের সাথে মণিপুরের লোকনৃত্যকলার নানান নমুনার পরিমিত সিনথেসিস গড়ে উঠল এই নব্য শিল্পআঙ্গিকে। সবকিছুই কিন্তু একটি ধর্মদার্শনিক ভাবনা অধিগ্রহণের প্রয়াস। বৈষ্ণবিজম গিয়েছিল বাঙলা থেকে, ফলে রাসলীলায় বাঙলায়ন তো থাকবেই [..]।'[১৩৪] অর্থাৎ ইতিহাসের ধারাবাহিক সম্পর্ক সূত্রে বিকশিত এই শিল্পরূপ প্রসঙ্গে আলোচিত উপরোক্ত বিষ-য়সমূহ বিবেচনায় এনে *রাসনৃত্যকে* মণিপুরী জাতিসংস্কৃতিজাত স্বতন্ত্র একটি শিল্পরূপ হিসেবে মেনে নিলেও এর উদ্ভব ও বিকাশের মূলে গৌড়ীয় *বৈষ্ণবিজম* বা বাংলার রাধাকৃষ্ণের ভাব, দর্শন ও শিল্পভাবনাকে অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই বরং বলা যায়– এক মহা-সমন্বয়ের অনিবার্য ফলাফলই হচ্ছে মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্য– *রাসনৃত্য*।

ঘ. বাংলায় রাসনৃত্যের অভিবাসন

অভিবাসন সূত্রে প্রচলিত বাংলাদেশের *রাসনৃত্য* এবং এর আনুষ্ঠানিক সূচনা সম্পর্কে কালগত সামান্য মতভিন্নতা থাকলেও বড় ধরনের কোনো গরমিল নেই। গবেষক থোঙাম ধীরেন-এর মতে– 'ত্রিপুরায় রাস নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। সুতরাং অনুমিত হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও মণিপুরী রাসনৃত্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটেছিল।'[১৩৫] ড. রণজিত সিংহ-এর *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রাস উৎসব কমিটির হিসাব অনুযায়ী ১৭০তম রাস উৎসব পালিত হলো ২০১০ সালে।'[১৩৬] এই হিসেবে বাংলায় রাসনৃত্য প্রচলনের সূচনাকাল হচ্ছে ১৮৪০ সাল। অপরদিকে *মণিপুরের থিয়েটারর প্রত্রিকায়* 'মণিপুরীরা আজ থেকে প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই দেশে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রধান উৎসব রাসলীলার সূচনা করেন'[১৩৭] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে *রাসনৃত্যের* প্রচলনে ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্বের তিনটি দশক যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকের উল্লেখ থাকলেও মোটামুটিভাবে চতুর্থ দশককেই সর্বাধিক

---

১৩৪ শুভাশিস সিনহা, *মনিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা*, রাসলীলা সংখ্যা, মণিপুরী থিয়েটার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ২৩

১৩৫ থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সিলেট, ২০০৮, পৃ.৩০

১৩৬ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*. উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬৫

১৩৭ সাইমন জাকারিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের রাস উৎসব, *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা*, *রাসলীলা সংখ্যা*, মণিপুরী থিয়েটার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১১

উক্ত হতে দেখা যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলায় *রাসনৃত্য* প্রারম্ভের কাল অনুযায়ী এ অঞ্চলে মণিপুরীদের অভিবাসনের কালগত হিসেবকে একসূত্রে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। কেননা ইতিহাসের নানা পর্বে অভিবাসন সূত্রে বসবাসকারী মণিপুরী জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গের চর্চা এবং পরিবেশনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করার বিষয়টি নির্ভর করে মূলত বাংলাদেশে এই জাতিগোষ্ঠীর নিরাপদ স্থিতি এবং অবস্থানের ওপর। ফলে মণিপুরীদের অভিবাসন প্রক্রিয়াটি এক বা একাধিক দশকের বিষয় নয় বরং এটি দীর্ঘ বছরের নানা ঘটনার কার্যকারণসূত্রে সম্পাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশে মণিপুরীদের অবস্থান বিষয়টিকে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল অভিবাসনের মূলে– যুদ্ধ এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রধান দুটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই বিবেচনায় বাংলাদেশে অভিবাসী অধিকাংশ মণিপুরীদের অবস্থান ধর্মপ্রচার অথবা জীবনমান উন্নয়নে বা ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় সংগঠিত হয়েছে এমনটা বলা যায় না। এক্ষেত্রে প্রথম কোনো বড় ধরনের অভিবাসন সংগঠিত হয় গরিবনেওয়াজের (১৭১৪-১৭৫৪) মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্তী বার্মা সৈন্যদের আক্রমণ এবং নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কারণে। ইতিহাসসূত্রে জানা যায় যে, গরিবনেওয়াজ তাঁর শাসনামলে বার্মার কিছু অংশ দখল করে এবং বার্মা সৈন্যদের বেশ কিছু আক্রমণও প্রতিহত করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শক্তিশালী বার্মা সৈন্যদের প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। ফলে অসংখ্য মণিপুরী প্রাণভয়ে পার্শ্ববর্তী নানান অঞ্চল– কাছাড়, সিলেট এবং ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলা অঞ্চলে মণিপুরীদের অবস্থান নেত্রকোনার সুসংদুর্গাপুর থেকে সিলেটের কমলগঞ্জ, ভানুগাছ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক মণিপুরীদের অভিবাসন হয় ১৮১৯-১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা সৈন্য কর্তৃক পুনরায় আক্রমণ এবং দীর্ঘ সাত বছর মণিপুর অধিগ্রহণের ফলে। ইতিহাসের পাতায় মণিপুরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপক ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের এই সাত বছরকে 'চহিতরেৎ খুন্তাকপা' বা Seven years Devastation' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৩৮] এই সময়কালে বার্মিজ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মণিপুরী প্রাণ রক্ষার্থে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্য ও দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, যার মধ্যে সিলেট ছিল অন্যতম নিরাপদ অঞ্চল। ১৮১৯ সালে বার্মিজ আমক্রমণের ফলে যুবরাজ মারজিত-এর কাছাড়ে পলায়ন এবং সেখানে তাঁর ভাই গম্ভীর সিংহ চৌরজিতের সাথে অন্তঃকলহে জড়িয়ে পড়ে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে পরাজিত গম্ভীর সিংহ অসংখ্য অনুসারীসহ সিলেট অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এছাড়াও পনেরো শ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট মীরজুমলা কর্তৃক রাজ্য বিস্তারের অভিযানে আসাম, কাছাড় এবং সিলেট অধিকৃত হয়। এ সময়ে যুদ্ধ-বন্দী অসংখ্য মণিপুরী সৈন্যদের নির্বাসন দেওয়া হয় বাংলা অঞ্চলে। এই হিসেবে বাংলায় মণিপুরীদের বাধ্যতামূলক অভিবাসন ঘটে আরও পূর্বকালে বিশেষত পনের শতকের কোনো এক সময়। যুদ্ধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নির্বাসন ছাড়াও

১৩৮ থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সিলেট, ২০০৮, পৃ. ১২

মণিপুরের সাথে বাংলা অঞ্চলের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক যোগাযোগও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের (১৭৬৪-৯৮) শাসনামলে সিলেটের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, তিনি 'সপারিষদ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতীর্থ সিলেটের ঢাকা দক্ষিণে এসেছিলেন। সেখানে রামনারায়ণ শিরোমণির ধর্ম্মজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে মণিপুর ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। রামনারায়ণ শিরোমণির প্রচেষ্টাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।' [১৩৯] অনুমান করা হয় যে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের শাসনামলে সংগঠিত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলস্বরূপ সিলেট অঞ্চলে মণিপুরীদের আগমন এবং স্থায়ী আবাসনের সূত্রপাত ঘটে।

এভাবে ইতিহাসের নানা পর্বে সংঘটিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতি হিসেবেই বাংলাদেশের সিলেট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় মণিপুরীদের অভিবাসনসূত্রে স্থায়ী আবাসন গড়ে ওঠে এবং এরই ধারাবাহিকতায় মণিপুরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে চর্চিত মণিপুরী শিল্প-অনুষঙ্গ– *রাসনৃত্য* অতঃপর বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও বিশেষ ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

---

১৩৯ থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সিলেট, ২০০৮, পৃ. ১১

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– *রাসনৃত্যের* দল ও সংগঠনের পরিচালনা ও পরিবেশন প্রক্রিয়া বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিতাত্ত্বিক নৃত্য ও নাট্যকলা ঐতিহ্যে প্রচলিত দল ও সংগঠনের ন্যায় বায়নাসূত্রে পরিভ্রমণ নির্ভর নয়। অথবা এর সাংগঠনিক চরিত্রটি কিছু সংখ্যক কুশীলবের আগ্রহে গড়ে তোলা *অধিকারী* নির্ভর দলের পরিচালিত কার্যক্রম অনুরূপও নয়। *রাসনৃত্যের* দলগত সাংগঠনিক কাঠামোটি এক অর্থে অস্থায়ী যা প্রতিবছর নবাগত নৃত্যশিল্পীদের (উৎসর্গকারী/ভক্ত) দ্বারা গঠিত দলের প্রস্তুতি ও প্রদর্শনে সম্পাদিত হয় এবং তা সর্বাংশে মণিপুরী সমাজের সর্বজনীন বা সমষ্টির অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হয়ে থাকে। মণিপুরী সমাজে সাধারণের অংশগ্রহণে উদ্‌যাপিত/চর্চিত ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে *মণ্ডপ*– 'মণিপুরী মণ্ডপগুলোই সমাজের সকল সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ও বিচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সকল প্রকার সভা-সমাবেশও মণ্ডপগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজা-পার্বণ, ভোজ ও কীর্তনাদির স্থলও মণিপুরী মণ্ডপ।'[১৪০] মণ্ডপের প্রধান পুরুষ যেমন ব্রাহ্মণ, তেমনি নৃত্য, নাট্য, গীত ও বাদ্যের (পুং/মৃদঙ্গ) শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রমের প্রধান পুরুষ বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন গুরু বা ওস্তাদ মণিপুরী ভাষায় এঁদের বলা হয় *ওঝাঁ* বা *রাসধারী*। ফলে ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যে এবং ওঝাঁ বা রাসধারী গুরুদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনাতেই বস্তুত মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। তাছাড়া মণিপুরী সমাজে *রাসধারীগণ* অত্যন্ত পূজনীয় ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহ্যগত ভাবে এঁরাই মণিপুরী সমাজে *রাসলীলা*সহ অন্যান্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার পরম্পরা বজায় রেখেছেন। ঐতিহ্যগতভাবে মণিপুরী সমাজ-সংগঠনে গুরুগৃহই হচ্ছে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং চর্চার মূলকেন্দ্র। বৈষয়িক আদান-প্রদানে নয়, কেবল ভক্তিযোগে গুরুকে সেবার বিনিময়ে গুরুগৃহে অবস্থান করে এই দক্ষতা অর্জন করা হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাসকেন্দ্রিক নৃত্য, গীত, বাদ্যের প্রশিক্ষণে 'বাড়িতে রাসধারী বা ওঝাঁ রাসলীলার ওস্তাদকে আমন্ত্রণ করে এনে শিক্ষা দেয়ার রীতিও প্রচলিত রয়েছে।'[১৪১] এক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাব, ভক্তি ও বিশ্বাস সর্বোপরি মহান এক দায়িত্ববোধ থেকেই গুরু ও শিষ্যের শিক্ষা দান ও গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আর এভাবেই মণিপুরী সমাজে নৃত্য ও গীত চর্চার পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে বহু যুগ ধরে। তবে গুরুগৃহে অথবা শিষ্যের বাড়িতে আমন্ত্রণের রেওয়াজটি বর্তমানে বহুলাংশে লোপ পেয়েছে। বর্তমানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের গুরু-শিষ্যের বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি বহুলাংশে *একাডেমি* (ক্ষেত্র সমীক্ষা অঞ্চল কমলগঞ্জে রয়েছে মণিপুরী

১৪০ *রণজিত সিংহ*, বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৯
১৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

ললিতকলা একাডেমি) কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রথাগতভাবে দক্ষ এবং প্রবীণ রাসধারীগণ এক্ষেত্রে একাডেমি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

মণিপুরীদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ও শিক্ষার যে রীতি এখনো বিদ্যমান রয়েছে এর সাথে প্রাচীন *মাইবী নৃত্যের* গুরু-শিষ্য সম্পর্কের কঠিন নিয়ম ও বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রথাগত সাদৃশ্য ও যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। মাইবী হচ্ছে নারী পুরোহিত যারা মণিপুরীদের প্রাচীন বনদেবতার পূজায়, *লাইহারাওবা* উৎসবে পৌরোহিত্য করে থাকেন এবং এ উপলক্ষে প্রদর্শিত নৃত্যের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করে থাকেন। পরিমার্জিত এবং সুবিন্যস্ত *মাইবী নৃত্য* সম্পর্কে এমনও বলা হয় যে– 'মাইবী সৃষ্ট নৃত্যই মণিপুরী ধ্রুপদী নৃত্যের অঙ্কুর বিশেষ।'[১৪২] এই নৃত্যেরও চলন, অঙ্গ-ভঙ্গি, হস্ত ও শরীরের ভাষা পূর্ব-নির্ধারিত এবং কঠিন নিয়মে আবদ্ধ যার শিক্ষা কেবল মাইবীগণই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লাভ করে থাকেন।

রাসনৃত্যের ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে। কারণ *রাসলীলার* বৈশিষ্ট্য অনুসারে বয়োঃসন্ধিকাল-পূর্ব বয়সের কিশোর, কিশোরীরাই কেবল *রাসনৃত্যে* অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে প্রকৃতির নিয়মানুসারেই একজন কিশোর বা কিশোরীর পক্ষে রাসনৃত্যে একাধারে দুই বা তিন বছরের অধিক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। আর এ কারণেই লীলা প্রদর্শনে নৃত্য ও গীতের দক্ষতা অর্জনে কিশোর কিশোরীদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকার বিষয়টি কার্যকর হয় না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে কেন রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রে কিশোরী ও কিশোরের অংশগ্রহণের বিধান প্রচলিত হলো? এ বিষয়ে পুরাণের ব্যাখ্যা তো পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে– রাধা-কৃষ্ণের প্রেম/লীলা মানব-মানবীর দেহজাত জৈবিক প্রেমের প্রদর্শন নয়, এ হচ্ছে *পরমের* সাথে *প্রকৃতির* প্রেম/লীলা যা পবিত্র ও পরম আরাধ্য। অধিকন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শাস্ত্রকারদের ব্যাখ্যায় 'শৃঙ্গার' রসকে 'মধুর' রূপে মুখ্য রস হিসেবে গ্রহণ করায় স্ত্রীবিষয়ক *রতি– স্থায়ী ভাব* এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অকার্যকর বরং স্বয়ং *কৃষ্ণ* এখানে *স্থায়ী ভাব* হিসেবে গণ্য হয়। এ তো শাস্ত্রের তত্ত্ব কথা, কিন্তু প্রায়োগিক ব্যাখ্যায় *রাসধারী* নৃত্য ও গীতের প্রশিক্ষক এবং *রাসলীলার* সূত্রধারী গুরু কৃষ্ণকুমারী মনে করেন– 'ছোট বালক বালিকাদের মধ্যে কামভাব থাকে না। শিশুরা পবিত্র আর সুন্দরের প্রতীক। ওদের কামভাব থাকে না তাই ভক্ত বিশ্বাসীদেরও থাকে না। ১২ বছরের বেশী বয়সে এই চরিত্র (রাধা, কৃষ্ণ, গোপী) করা যাবে না। দর্শনে কামভাব থেকে দূরে থাকতেই বালক-বালিকাদের অংশগ্রহণ।'[১৪৩] বস্তুত এই রাসধারী/ওঝাঁদের নেতৃত্বেই প্রতিবছর কার্তিক মাসের *মহারাস*-এর প্রায় দুই তিন মাস পূর্ব থেকেই শুরু হয় পর্যায়ক্রমিকভাবে এক একটি *রাসে* অংশগ্রহণ-আগ্রহী কিশোর-কিশোরীদের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া। প্রতিটি *রাসেই* কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ জন কিশোর কিশোরী অংশগ্রহণ করে থাকে এবং এই হিসেবে 'তিনটি *রাসলীলানুষ্ঠানে* প্রায়

১৪২ দেবযানী চলিহা, *মণিপুরী নৃত্যের দু'টি ধারা*, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৭

১৪৩ ওঝা/রাসধারী কৃষ্ণকুমারী -এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১২/৭/২০১৫, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

৬০-৭০ জন কিশোরী আলাদাভাবে তালিম নিয়ে থাকে।'[১৪৪] *রাসনৃত্যের* প্রশিক্ষণ স্বল্পকালীন হলেও এর প্রণালীটা বেশ কঠিন নিয়ম অনুশাসনে আবদ্ধ– 'প্রশিক্ষণকালীন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপোস থাকতে হয়। উপোস থেকেই নৃত্যচর্চা কালীন নানা রকম কৃত্য সম্পাদন করতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে শিশুটিও সকলের ভক্তিতে, বিশ্বাসে কৃষ্ণ বা রাধা হয়ে ওঠে।'[১৪৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *রাসনৃত্য* পরিবেশন ও পরিচালন প্রক্রিয়াটি প্রথাগত দল-ভিত্তিক নয়, এটির পরিচালন প্রক্রিয়ায় রয়েছে সমষ্টির অংশগ্রহণ ও তত্ত্বাবধান। তবে সমষ্টির অংশগ্রহণের মূল প্রেরণাটি এক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের দর্শন বা মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই বস্তুত *রাসলীলা*– ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমষ্টির অংশগ্রহণমূলক হয়ে ওঠে। এ কারণে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ভিত্তিক নৃত্য ও গীত প্রধান *রাসলীলার* যে কোনো পর্যায়ে কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ পারিবারিকভাবেই উৎসাহিত করা হয়। *রাসে* অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কেবল পুণ্য অর্জন করা যায় তা-ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা পবিত্র *মানত* পূরণের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষেত রাধা ও কৃষ্ণের ভূমিকায় অংশগ্রহণ/ অভিনয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই *মানসিক* বা *মানত* পূরণের দুটি বিশেষ চরিত্র হয়ে ওঠে– 'কোনো মানত পূরণের বিনিময়ে অথবা মানত পূরণের লক্ষ্যে রাধা বা কৃষ্ণ চরিত্র হয়ে রাসনৃত্যে অংশ নিতে পারিবারিকভাবেই তাদের শিশু সন্তানদের ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।'[১৪৬]

রাসনৃত্যের প্রশিক্ষণ গুরু-শিষ্যের *আনুষ্ঠানিক অনুকরণ* পদ্ধতিতে *শরীর শিক্ষণ* (Body learning) প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয় (প্রথম অধ্যায়ের বাঘনৃত্য প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে)। *শরীর শিক্ষণ* পদ্ধতিতে গুরুর প্রদর্শিত নৃত্যের কৌশল এবং ভঙ্গি যথাযথভাবে শারীরে আয়ত্তকরণ এবং প্রদর্শন করাই হচ্ছে এই শিক্ষার মূল বিবেচ্য। এক্ষেত্রে কুশীলবের (শিষ্যের) স্বাধীন চিন্তা, ভাব, ভঙ্গি অথবা সৃজনশীলতার প্রয়োগ ও প্রকাশের সুযোগ থাকে সীমিত। অর্থাৎ শিক্ষক/প্রশিক্ষক/গুরু/ওঁঝা যেভাবে এবং যে প্রক্রিয়ায় নৃত্যের কৌশল এবং ভঙ্গি প্রদর্শন করেন, ছাত্র বা শিষ্যকে ঠিক ঠিক সেভাবেই শারীরিকরণ করতে হয়। ফলে *রাসনৃত্যের* মূলগত প্রেরণা কৃষ্ণ-মহাভাব ও ভক্তি রসের প্রদর্শন এবং আস্বাদন বস্তুত দুই ধরনের পরিবেশন প্রক্রিয়ার মিথস্ক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। পরিবেশনার একদিকে রয়েছে পুং (মৃদঙ্গ) বাদক এবং রাসধারী বা সূত্রধারীগণ, যাঁরা সুর, সঙ্গীত ও কাব্য আশ্রয়ে কৃষ্ণ-আখ্যান পরিবেশন করেন এবং আখ্যান-যুক্ত তাল, লয় ও ছন্দের নিয়ন্ত্রণ করেন। *রাসের* আসরে এঁদের অবস্থান থাকে নির্মিত মণ্ডলীর বাইরে এবং এখান থেকেই বাচিক ও সাত্ত্বিকযুক্ত অভিনয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণের লীলাময় আখ্যানের ভাব ও রসের নিস্পত্তি করে থাকেন। অপরদিকে রয়েছে রাসের নৃত্যশিল্পী বা নৃত্য কুশীলব– রাধা, কৃষ্ণ এবং গোপীগণ। এঁরা রাস মণ্ডলে অবস্থান করে সূত্রধারীদের

---

১৪৪ রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*. উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬৫

১৪৫ ওঝা/রাসধারী কৃষ্ণকুমারী-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১২/৭/২০১৫, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৪৬ প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকার

পরিবেশিত আখ্যান এবং সুর, তাল, লয় অনুসারে বিধিবদ্ধ দেহভঙ্গি ও চলনের মাধ্যমে তথা সম্পূর্ণ আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণের লীলা পরিবেশন করেন। বাচিক (গীত, গদ্য, কাব্য) আশ্রিত ভাব ও রস নির্ভর সাত্ত্বিক অভিনয় এক্ষেত্রে গুরুত্বহীন, বলা যায় সম্পূর্ণ অনপুস্থিত থাকে। কেননা *রাসনৃত্যে* বয়োঃসন্ধিকাল-পূর্ব অপরিণত বয়সের কুশীলবকৃত নৃত্যে কেবল লীলা অনুসৃত ভাব, ভক্তি, গতি ও শৌর্যের সমন্বয়ে দেহের ভঙ্গি এবং চলনের নান্দনিক ও শৈলীবদ্ধ প্রদর্শনই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে, বাচিক (গীত, গদ্য, কাব্য) এবং বাচিক নির্ভর সাত্ত্বিক অভিনয় এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে।

> 'আমরা সাহায্যকারী/রাসধারী বা সূত্রধারী হিসেবে বাইরে থাকি। সূত্রধারী এবং পুং বাদক (মৃদঙ্গ) একাধিক থাকে। পূর্বে সূত্রধারীদের পরিবেশিত গীত-এর সাথে গোপীগণের গীত ও কাব্যাভিনয়ে যৌথ বা কোরাস অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক এত বড় একটি কাহিনী শিশুদের মুখস্থ রাখা কঠিন তাই রাসধারী/সূত্রধারীরাই মণ্ডলের বাইরে থেকে ভাব ও রসভিত্তিক গীত ও কাব্যাভিনয়ের মাধ্যমে আখ্যান পরিবেশন করে থাকেন এবং মণ্ডলের ভিতরে নৃত্য করে থাকে কেবল রাধা, কৃষ্ণ ও গোপীর দল।'[১৪৭]

ফলে *রাসমণ্ডলে* কিশোর-কিশোরীদের সমর্পিত ও ভক্তিমূলক নৃত্যাঙ্গিকের সাথে সূত্রধারীদের সাত্ত্বিক নির্ভর গীতাভিনয়ের অপূর্ব মেলবন্ধনেই নিষ্পত্তি হয় *রাসের* মহাভাব– প্রকৃতি ও পরমের মধুর লীলা।

রাসনৃত্যে দেহের বিন্যাস ও শৈলী নির্মাণের ভিত্তিমূল দুটি– *ভঙ্গিপরেং* এবং *চালি* যা সম্পূর্ণতই *আনুষ্ঠানিক অনুকরণ* পদ্ধতিতে *শরীর শিক্ষণ* প্রক্রিয়ায় আয়ত্ত করা হয়। এটি আনুষ্ঠানিক, কারণ শিষ্যকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারিত বিধি বিধান মেনেই এই শিক্ষা অর্জন করতে হয়। নানাবিধ *ভঙ্গি* এবং *চালি*-বিধান শরীর-ছন্দের সাবলীল উৎকর্ষে যুক্ত হতে/করতে পারার বিষয়টিকেই এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জনের পরিমাপক মনে করা হয়– 'গুরুগৃহে শিক্ষা করতে হবে। সাধন করতে হবে, নিয়মানুসারে সাধন করতে হবে। গুরুর নিকট হইতে গূঢ় তত্ত্ব আয়ত্তকরে অতঃপর নিজে নিজে ট্রায়েল না দিলে হবে না, অথবা নিজেকে সর্বদাই সাধনে রত থাকতে হবে।'[১৪৮] কারো মতে '*ভঙ্গিপরেং* মণিপুরী নৃত্যের আত্মা-স্বরূপ'[১৪৯] আবার কেউ মনে করেন '*রাসলীলার* কেন্দ্রবিন্দু ভঙ্গ পরেং অর্থাৎ নৃত্য মালিকা।'[১৫০] *ভঙ্গিপরেং* হচ্ছে *ভঙ্গি* এবং *পরেং* এই দুটি শব্দের সমষ্টি। *ভঙ্গি* হচ্ছে ভাঙা বা শরীর-অঙ্গকে নানান অবয়ব/রূপে বা ভঙ্গিতে নির্মাণ করে এক চলমান-স্থিতি তৈরি করা এবং *পরেং* হচ্ছে ক্রমানুসারে বিন্যাস। নানাবিধ *ভঙ্গিতে* নির্মিত শরীর যখন ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হয় এবং সঞ্চালিত হয় তখন তাকে *ভঙ্গিপরেং* বলা হয়। *ভঙ্গিপরেং* পাঁচ রকম– এক. আচৌবা

---

১৪৭ প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকার

১৪৮ গায়েন রাশকান্ত সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/০৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৪৯ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৮

১৫০ দেবযানী চলিহা, *মণিপুরী নৃত্যের দুটি ধারা*, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪১

ভঙ্গিপরেং, দুই. বৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং, তিন. খুরুম্বা ভঙ্গিপরেং, চার. গোষ্ঠ ভঙ্গিপরেং এবং পাঁচ, গোষ্ঠবৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং। এগুলোর ভাব (বৈষ্ণবীয়), সুর-সঙ্গীত, তাল, এবং দেহের গতি (লয়) ও শক্তি/শৌর্য (এনার্জি– লাস্য ও তাণ্ডব) নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত। যেমন প্রথম তিনটি *ভঙ্গিপরেং* লাস্যময় গতি ও শৌর্যে প্রদর্শিত হতে হবে এবং শেষ দুটি *গোষ্ঠ ভঙ্গিপরেং* ও *গোষ্ঠবৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং*-এর গতি ও শৌর্যের প্রকাশ হবে তাণ্ডবময়। অপরদিকে নির্দিষ্ট গতি ও শৌর্যের আশ্রয়ে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত দেহের সঞ্চালন বা চলনকে বলা হয় *চালি*। 'মণিপুরী নাচে বেসিক হচ্ছে *চালি*, চালি মানে চলনের ভঙ্গি। অর্থাৎ আপনি কত রকম ভঙ্গিমা করে করে চলতে পারেন, সেটা আপনি লাস্য ভঙ্গিতেও চলতে পারেন আবার তাণ্ডব ভঙ্গিতেও চলতে পারেন।'[১৫১] আবার কারো মত এমন যে– *চালি* মণিপুরী নৃত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যময় অঙ্গ সঞ্চালন। এটি প্রাথমিক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় রূপে শিক্ষণীয়। সাধারণত *চালি* বলতে চারটি বোলের নাচকেই বোঝায়। কারও কারও মতে পঁ-াচটি বোলের নাচ।'[১৫২] *রাসনৃত্যের* গতি বা লয় আপাত দৃষ্টিতে ধীরলয় বলেই পরিলক্ষিত হয়, তথাপি এতে লয়ের ভিন্নতা– দ্রুত, মধ্যম এবং ধীর এই তিনটি লয়েরই ব্যবহার রয়েছে। এক্ষেত্রে গুরু বিপিন সিংহ-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে–

> It is generally believed that Manipuri is done in slow speed. This is not true. Manipuri is executed in all the three variations, slow, medium and fast. In *rasa-lilas*, the traditional compositions like *lasya bhangi parengs*, dances on *talas rajamel tinatala-macha* etc. are done in *simitangam* style of *lasya* in slow tempo whereas *pungalol jagoi* (dances on *talas* and rhythm patterns) and dances on *seigonnabi* (songs and combinations of bolas) are done in all the three *variatioins* of *laya* (i.e. in *sfuritangam* style of *lasya*) The body movements are always done in accordance with the syllables, songs etc. The syllables are of slow or fast tempo according to the particular structure of its composition. [153]

অর্থাৎ রাসধারী এবং মৃদঙ্গবাদকগণের গীত ও বাদ্যের সহযোগিতায় কিশোর/কিশোরীদের যাবতীয় ভঙ্গি, চলন এবং গতি বৈচিত্র্যের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের আখ্যান অন্তর্গত ভাব ও ভক্তির *নাট্যধর্মী* প্রদর্শনেই অতঃপর *রাসনৃত্য* সম্পাদিত হয়। 'মণিপুরী ললীতকলা একাডেমিতে' *রাসনৃত্যের* প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, মহড়া/অনুশীলন এবং কুশীলবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলাপনসূত্রে নৃত্য সংশ্লিষ্ট ভঙ্গি (ভঙ্গিপরেং), চলন (চালি), বৈষ্ণবীয় ভাব-রস (মধুর, দাস্য, সাখ্য, বাৎসল্য এবং ভিন্ন মতানুসারে ভক্তি রস প্রভৃতি), শৌর্য (তাণ্ডব ও লাস্য), গীত বা

---

১৫১ সুইটি দাস (২৮) নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক (সাধনা)-এর সাক্ষাকৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ০৬/০৭/ ২০১৫, সাধনা প্রশিক্ষণ কার্যালয়, বনানী, ঢাকা । সুইটি দাস বিশ্বভারতী, ইন্ডিয়া থেকে নৃত্যকলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে নৃত্যকলার চর্চা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান *সাধনা*র সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

১৫২ মিনা মোঃ নজরুল ইসলাম, *নাচের কথা*, মিনা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৫৩.

১৫৩ Nayana Jhaveri, *Guru Bipin Singn,* Munipuri Nartanalaya, Calcutta, 1979, P. 18

সংগীতের বিধিবদ্ধ ক্রমানুসার (রাগালাপ, ধ্যানমূর্তি, বৃন্দাবনের বর্ণনা এবং বিষয়-ভিত্তিক আখ্যান-গীত) এবং রাধা, কৃষ্ণ ও গোপী এই ত্রি-চরিত্রের রূপায়ণে সংলাপাত্মক গীত ও কাব্যের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। ক্ষেত্র-পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক উপলব্ধি এমন যে, *রাসনৃত্যের* ভাব থেকে ভঙ্গি এবং সঙ্গীত থেকে শৌর্য প্রায় সব কিছুই পরম্পরাগত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসৃত, প্রথা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার অন্তর্ভুক্ত। তথাপিও *রাসনৃত্যের* রীতি-পদ্ধতি, উপাদান-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রথাগত বিষয় পর্যবেক্ষণের বিপরীতে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, মহড়া ও প্রস্তুতিমূলক বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। কেননা রীতিগত দিক থেকে এটি *নাটগীত* ধর্মী এবং এর গঠন কাঠামো, ত্রি-চরিত্রের আন্তঃসম্পর্ক, প্রবেশ-প্রস্থান, সুর-সঙ্গীত সহ সকল বিষয়ে-ই রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। তদুপরি, এই সকল নির্দেশনা সম্বলিত প্রকাশিত তথ্য উপাত্তের সংখ্যাও অপ্রতুল নয়। সুতরাং বিধি-বিধান অনুসৃত এবং সুনির্দিষ্ট এই শিল্পরূপটির পরিবেশনা রীতি-পদ্ধতি, অভিনয় উপাদান, গঠন-কাঠামো, পোশাক-পরিচ্ছদ, সুর, তাল লয়ের বিধিবদ্ধ ক্রমানুসার প্রভৃতি বিষয়ের প্রথাগত বিবরণের অভিপ্রায়কে বর্তমান আলোচনায় গৌণ-গুরুত্বে বিবেচনা করা সঙ্গত মনে করেছি। বরং এর পরিবর্তে নৃত্যের মহড়া, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিকালীন কুশীলবের দেহভঙ্গি (body posture), শৌর্য (তাণ্ডব ও লাস্য), ভাব-রস (ভক্তি, দাস্য, সাখ্য, বাৎসল্য, মধুর) প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা এবং এর প্রায়োগিক ও কৌশলগত সম্ভাবনা যাচাইয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণে যে বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টি আর্কষণ করে সেটি হলো, *রাসনৃত্যের* সকল দেহভঙ্গি শৌর্য দ্বারা বিন্যস্ত ও গতিপ্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণ-মহাভাব ও রস দ্বারা হয় প্রাণবন্ত। আবার এই তিনটি বিষয়, অর্থাৎ ভাব, ভঙ্গি ও শৌর্যের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট কুশীলবের নৃত্যকালীন সামগ্রিক উপস্থিতি (presence) ভূমি-অনুবর্তী নিবেদনমূলক হয়ে ওঠে। ফলে এখানে দেহভঙ্গি, ভাব ও শৌর্যের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান, এর কৌশলগত দিক এবং প্রায়োগিক সম্ভাবনা যাচাইয়ের মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ গবেষণার লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে বলে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বিষয় তিনটির বিশদ আলোচনার নিমিত্তে অতঃপর মহড়াকালীন প্রস্তুতি এবং অনুশীলন প্রক্রিয়ায় চর্চিত নৃত্যশিল্পীর দেহভঙ্গি ও চলন– মৌল পদচলন (basic foot step), প্রাথমিক বা মৌল দেহভঙ্গি (basic body posture), চালি বা চলন, চালি অরৈবী; দেহের শৌর্য (energy)– তাণ্ডব ও লাস্য এবং বৈষ্ণবীয় ভাব-রস (emotion) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আলোচনায় এই সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির মূলে চিন্তাগত উদ্দীপনা ছিল এই যে, দেহের সাথে শৌর্য এবং ভাবের যে আন্তঃসম্পর্ক এখানে পরিলক্ষিত হয় এটি একটি মনো-দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সচেতন ও বিন্যস্ত ফলাফল। তাই এ সম্পর্কিত অর্থাৎ কুশীলবের দেহভঙ্গি এবং এর অন্তর্গত ভাব ও শৌর্যের ব্যবহারিক ও কৌশলগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে এর সম্যক জ্ঞানার্জন পরিণামে নাগরিক নাট্য-আয়তনের অভিনেতার জন্য হতে পারে একটি প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা।

পরিবেশন ও বিশ্লেষণ

মণিপুরী *রাসনৃত্য* একটি 'নাটগীত' রীতির পরিবেশনা। 'নাটগীত' রীতির অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এটি নৃত্যপ্রধান গীত-সংলাপ নির্ভর, তবে গদ্য এবং কাব্যযুক্ত সংলাপ ও বর্ণনাতেও কাহিনীর অংশবিশেষ পরিবেশিত হয়ে থাকে। গবেষকগণ 'নাটগীত' রীতিকে Song-and-dance type নামে অভিহিত করে এর ব্যাখ্যায় বলেন– Those genres which are characterized by predominance of dance rendered by performers enacting roles in the first person; they may render their dialogue in lyric or dance silently to the lyric renderded by a group of choral singers and musicians.[১৫৪] অভিনয়ের রীতি বা পদ্ধতি হিসেবে 'নাটগীত'-এর উল্লেখ বহু আগে থেকেই নানা কাব্য কাহিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে দেবপূজা সকল প্রকার অনুষ্ঠানে 'নাটগীতের' পরিবেশন হতো বলেও নানা গ্রন্থসূত্রে জানা যায়। কৃত্তিবাস রচিত *রামায়ণ*-এর উত্তরখণ্ডে 'নাটগীত'-এর উল্লেখ প্রকারান্তরে এই রীতির অভিনয়ের প্রাচীনত্ব এবং ব্যাপক প্রচলনের বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে–

> নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
> কেহ বেদ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গলে॥
> নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
> পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে॥[১৫৫]

'নাটগীতের'-এই সংজ্ঞা সূত্রে মণিপুরী *রাসনৃত্যকেও* একটি নৃত্যপ্রধান নাটগীত রীতির পরিবেশনা বলা যায়। কেননা এই পরিবেশনায় একদল নৃত্য শিল্পী দোহার/কোরাস কর্তৃক অভিনীত সংলাপাত্মক গীত, কাব্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গদ্যের আঙ্গিকাভিনয় বা ক্রমাগত নৃত্যের ছন্দে দেহের ভাষায় কৃষ্ণ-কাহিনী প্রদর্শন করে থাকেন। সূত্রধারী/দোহার/কোরাসের মধ্য থেকেই কেউ রাধা, কেউ কৃষ্ণ আবার কেউ কেউ গোপী চরিত্রে অংশগ্রহণ করে সংলাপাত্মক গীত এবং কাব্যের রসছন্দময় কৃষ্ণ-আখ্যান পরিবেশন করেন– Instrumental music accompanies all passages of pure dancing, and two women singers periodically relieve the performers from singing, so that they can gesticulate more freely.[১৫৬] সুতরাং কোরাস কর্তৃক পরিবেশিত গীতের তাল, লয় ও ছন্দ অনুসরণ করে সুললিত, ছন্দোবদ্ধ, তথা বিধি সম্মত দেহের শৈলী প্রদর্শন করাই এক্ষেত্রে রাস-নৃত্যশিল্পীদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অতঃপর, আসরে উপস্থিত দর্শক/ভক্ত বিশ্বাসীগণ নৃত্যের ভাব-সাংকেতিক দেহশৈলী এবং দোহারের সাত্ত্বিক নির্ভর সংলাপাত্মক গীত ও কাব্যাভিনয়ের (কিছু কিছ ক্ষেত্রে কাব্য এবং গদ্যের) সমন্বয়ে সৃষ্ট রাসের তথা পরম কৃষ্ণ-কথা বা লীলা

---

১৫৪ Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity; Indigenous Theatre of Bangladesh*, UPL, Dhaka, 2000, P.341
১৫৫ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, অষ্টম সংস্করণ, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৯১
১৫৬ Kapila Vatsyayan, *Tradions of Indian Folk Dance,* Clarion books, New Delhi, 1987, P.144

উপভোগ করেন। তবে কৃষ্ণ-কথা বা লীলার প্রদর্শনের প্রক্রিয়াটি একটি ধারাবাহিক ও নির্ধারিত ক্রমানুসারেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক. বৃন্দা কর্তৃক রাসের মণ্ডলী স্থাপন ও সজ্জিতকরণ, দুই. মণ্ডলীতে কৃষ্ণের উপবেশন এবং বংশীধ্বনিসহ নৃত্যের প্রদর্শন, তিন. গোপীসহ রাধার উপবেশন এবং নৃত্যের প্রদর্শন, চার. রাধা এবং কৃষ্ণ একের প্রতি অপরের মান-অভিমান প্রদর্শন এবং সম্মিলিত নৃত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, পাঁচ. রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত নৃত্য প্রদর্শন, ছয়. রাধা-কৃষ্ণের মিলন এবং মধুর আনন্দে গোপীদের সাথে নৃত্য প্রদর্শন এবং সাত. প্রার্থনা এবং রাধা ও গোপী কর্তৃক কৃষ্ণের প্রতি চিরন্তন ভক্তির প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন।

যদিও শাস্ত্রীয় বিধি মেনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ বা মহড়াতেই অর্জিত হয় *রাসনৃত্যের* প্রায়োগিক উৎকর্ষ এবং বিনম্র-ভাব-চঞ্চল দেহের ভঙ্গি, চলন আর ছন্দের দোলায় প্রতিফলিত হয় এ শিল্পরূপটির চূড়ান্ত উৎকর্ষতা, তথাপিও এই *নৃত্যের* প্রদর্শন তথাকথিত দর্শক 'বিনোদনের' জন্য নয় বা দর্শককে 'বিনোদিত' করাও এর লক্ষ্য নয়। বরং *রাস* আসরে দর্শক ও কুশীলবগণ বিশেষ এক ভাব-সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়– 'আমি যেন আপনাকে (দর্শকে) পূজা করছি, আমরা তাদের পদধূলি গ্রহণ করতে চাই, আপনারাই আমার গুরুজি। দর্শক কুশীলব উভয় উভয়ের মাঝে লীন হয়ে যায়। আমি মনে মনে ভাবছি আপনি একজন কৃষ্ণ– দর্শক কুশীলব অদ্বৈত। এখানে দর্শক এবং কুশীলব উভয়ে পঞ্চ আত্মায় মিলে যায়। যারাই ঐ মন্দিরে বসবেন তারা সবাই বৈষ্ণব– নামের ভক্ত।'[১৫৭] তাই দর্শক এখানে কেবল শিল্প-নান্দনিকতা উপভোগে নয় বরং ভাবে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে এক তন্ময়ী-ভক্তপ্রাণ হয়ে ওঠে। দর্শক/ভক্ত-কুশীলবের মধ্যে স্থাপিত বিশেষ এই সম্পর্কসূত্রে *রাসনৃত্য* প্রকারান্তরে মণিপুরী সমাজের সামষ্টিক-সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। কেননা এই সম্পর্কের মূলে রয়েছে জাতিতাত্ত্বিক ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং বৈষ্ণবীয় ভাব ও দর্শনগত সংযুক্তি। ফলে ভক্ত/দর্শক ও কুশীলব উভয়ের নিকট অতঃপর নৃত্যটি রূপান্তরিত হয় মৌলিক-মানবিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চাহিদাপূরণের উৎসব-নৃত্যে। মণিপুরী সম্প্রদায়ের একজন কবি, নাট্যনির্দেশক ও সমাজকর্মীর সঙ্গে আলাপন থেকে দুটি উদ্ধৃতিসূত্রে প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে–

> টোটালিটির সাথে পারফরম্যান্সটা (রাসনৃত্য) আসলে জড়িত। ওটা ঠিক করে দিচ্ছে আপনার পারফরম্যান্সটা আসলে কী হবে। যেমন– এতে যে টিউনিং-এ গান করে, সেটা মণিপুরের ঐ যে ভ্যালি থেকে জাত, এখন কিন্তু তারা শিখে ঐ টিউনিংটা আনে, ওখানে ওরিজিনালি ঐ টিউনিংটা জন্মসূত্রে পায়, কিন্তু এখানে ভৌগোলিক কারণে এই প্লেইন ল্যান্ডে এসে সেটা অনেকটা হারিয়েছে। এখানে ভৌগোলিক পরিবর্তনের কারণে, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কারণে, এখানে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করি যা ইনজেনারেল বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু মণিপুরে এই কালচারটা যখন গ্রো করে, সেখানে তাদের টোটাল উৎপাদন পদ্ধতিটা কিন্তু তাদের শরীর, তাদের কণ্ঠ প্রক্ষেপণ, টোটাল যে

১৫৭ মণিপুরী রাসনৃত্য এবং নটপালার পুং বাদক, বিধান সিংহ- এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১২/০৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

প্রাক্টিসের কথা বলছেন, ঐ শুধুমাত্র একটি ভাবগত জায়গা থেকে না, শারীর বৃত্তির জায়গা থেকেও নির্ধারিত হয়।[১৫৮]

অতঃপর তিনি আরও বলেন–

ইস্কনে যেভাবে হরিনাম কীর্তন করা হয়, মাটিতে আঘাত দিয়ে, বার বার লাফ দিয়ে দিয়ে করা হয়, না আমরা তো এভাবে মাটিতে আঘাত করে, লাফ দিয়ে দিয়ে করতে পারবো না, কারণ মাটি হচ্ছে মা। মায়ের উপর তো এভাবে পা দিয়ে আঘাত করতে পারবো না। আর একটি বড় ফিলোসফি আছে এটায়, রাস যখন দেখা হয় বা রাসের যে মণ্ডলীটা তৈরি করা হয়, তখন রাসের যে মাটি, যেটাকে আমরা মণ্ডলী বলি, মঞ্চ না কিন্তু, বলি রাসের মণ্ডলী, যেটিকে সাজানো হয় ওটাকে বলা হয় রাধার বক্ষ– রাধার বুক, সে কারণে ওখানে আঘাত দেওয়া যাবে না, তাহলে রাধা আহত হবে।[১৫৯]

শুভাশিস সিনহার উদ্ধৃত এই দুটি উক্তির বিশ্লেষণে প্রথমে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটি হলো *রাসনৃত্য* শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান নির্দেশিত ও প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ হলেও দেহের ভঙ্গিতে, চলনে, সুর, তাল ও ছন্দের দোলায় তথাপি যে অভিব্যক্তির প্রকাশ পায় তাতে মণিপুরি জাতিসংস্কৃতির সামষ্টিক শিল্প-ভাবনারই প্রতিফলন ঘটে। দ্বিতীয়ত, মণিপুরীগণ তাদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনাচারে ভূমি, বৃক্ষ, জল-স্থল তথা সমগ্র ভূ-প্রকৃতিকে বিশেষ শক্তি ও নির্ভরতার প্রতীকরূপে মান্য করে, এমনকি দেবতার আসনেও অধিষ্ঠিত করেছে কখনো– বনদেবতার পূজা তো এমনই এক প্রকৃতি পূজার নিদর্শন। তাছাড়া সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তাঁর দেহ, মন, আত্মাকে কখনো জগৎ, ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মাণ্ড-সমগ্রের অংশ হিসেবে কিংবা কখনো জগৎ-স্রষ্টার প্রতিরূপে নিজেকে দেখেছে, দেখিয়েছে অথবা করেছে রূপায়ণ। ফলে গুহাচিত্রে, মন্দিরে, আসরে অথবা মণ্ডলে অঙ্কিত/প্রদর্শিত হয়েছে এমন সব দেহভঙ্গি, চলন-সঞ্চালন তথা মুভমেন্ট যাতে কেবল নান্দনিক শিল্পরূপেরই প্রকাশ পেয়েছে তা নয় বরং প্রাচীন, পৌরাণিক সব বিশ্বাস, ধর্ম-দর্শন, শাস্ত্রকেও করেছে প্রতীকী রূপায়ণ। মানুষ ভূমিকে যেমন উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেছে আবার সেই ভূমিতেই বৃত্ত-রচনা করে বা মণ্ডলীবদ্ধ করে তাকে জগৎ-বৃত্তের অশেষ-অনন্তের প্রতীকে রূপায়ণ করেছে। কেবল তাই নয়, আবার নিজেকেই সেই বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছে স্বয়ং ব্রহ্মার প্রতিরূপে আবার কখনো সখীগণের বৃত্ত-মাঝে স্বয়ং কৃষ্ণরূপে। আসর/মঞ্চ/মণ্ডল তথা বৃত্ত মাঝে মানবদেহের (কুশীলবের) উপস্থিতি তাই নিছক একটি 'বিনোদনের' উপদান হিসেবে নয় বরং ভাব, ভক্তি, শৌর্য-সমৃদ্ধ এক মনো-দৈহিক সত্তা রূপে মানুষ-কুশীলব নিজেকে সম্পর্কিত করে মহা-সমগ্রের সাথে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ধর্ম, দর্শন আর শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়, নন্দনশিল্প বা কাব্য শাস্ত্রেও গৃহীত হয়েছে সম-গুরুত্বে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* কুশীলবগণ তাই কেবল নাট্য-সাহিত্যের চরিত্র রূপায়ণের

---

১৫৮ নাট্য নির্দেশক, কবি, মণিপুরী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শুভাশিস সিনহা-এর প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১৩/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৫৯ প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকার

উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়নি বরং তিনি কুশীলবদের দেখেছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বলোক আর মর্ত্যলোকের সেতুবন্ধের উপায় হিসেবে।

> The Man-body, corresponding to the *purusa* of the Upanisads is placed in space, in relation to floor space and space around. From this point onwards Bharata investigates the possibilities of establishing the relationship with the earth below and the space or sky above (*akasa*). The Man-Body is conceived of as erect Man with his feet equibalanced on the ground and equidistant from a hypothetical vertical median (*brahma-sutra)* corresponding to the physical pull of gravity.[160]

সুতরাং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে ভাব-সংযোগ প্রতিষ্ঠায় মানবদেহের ছন্দময় রূপক অবস্থান গ্রহণের প্রাচীন রীতি বিবেচনায় এ কথা বলাই যায় যে,– প্রকৃতির সাথে যে জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস থাকে গভীর, আর তা যখন পরিবেশিত আখ্যানেরও বিষয়ভুক্ত হয়, তবে সেই জনগোষ্ঠী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনা আয়তনের ভূমি তথা রাসমণ্ডলীকে রাধার বক্ষ-সদৃশ কল্পনায় বিনয়াবনত হবে এটাই স্বাভাবিক। আর তাই রাসমণ্ডলীকে পৌরাণিক-পবিত্রতায় বিবেচনা করার সুস্পষ্ট প্রভাব *রাসনৃত্যের* রীতি, বৈশিষ্ট্য, ভঙ্গি এবং চলনে প্রতিফলিত হবে এটাও অধিক সঙ্গত।

ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ভিত্তিক মণিপুরী রাসনৃত্য একাধিক ওঝাঁ/রাসধারী এবং পুং-বাদক (মৃদঙ্গবাদক) কর্তৃক পরিচালিত ও পরিবেশিত সকল সুর, সঙ্গীত, তাল, লয় বিধিবদ্ধ ক্রম-অনুসারে পরিবেশিত হয়। বিধিবদ্ধ এসকল ক্রম অনুসারেই অতঃপর রাসের নৃত্যশিল্পীগণ নির্ধারিত ভঙ্গি এবং চলনযোগে নৃত্যের উৎকর্ষ ও শৈলী প্রদর্শন করে থাকেন। তবে অন্যান্য ধ্রুপদী নৃত্য বিশেষত *ভরতনাট্যমের* ন্যায় অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সুনির্দিষ্ট মুদ্রার ব্যবহারে *সংকেতাবদ্ধ অভিনয়* (codified acting) *রাসনৃত্যে* পরিলক্ষিত হয় না বরং এতে দেহের ভঙ্গি এবং চলনের সমন্বয়ে বিশেষ কিছু ভাব-অর্থপূর্ণ 'অঙ্গভঙ্গিই প্রাধান্য পায়।'[১৬১] এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন রাস-নৃত্যশিল্পী এবং অভিনেত্রী জ্যোতি সিন্‌হার মন্তব্য এমন যে–

> এইটা (নৃত্য) আমার কাছে অনেক ফেক্সিবল। কারণ তখন আমি এর মধ্যে বুঁদ হয়ে আছি, তখন আমি নাচছি। আমার নিজের ভেতরে খেলা চলছে। আমাদের মণিপুরী ড্যান্সের মূল পারফরম্যন্স, মূল যে মুদ্রা থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি, কারণ আমাদের গ্রামীণ পরিবেশে মুদ্রাকে ঠিক ইউনিক রাখতেই হবে তা ভাবি না। আমরা ভাবি ভাবটা। [...] এমন অনেক রাস আছে যেখানে রসসিদ্ধি হয়

---

১৬০ Kapila Vatsyana, *The Square and the Circle of the Indian Arts,* Abhinav Publications, New Delhi, 1983, P. 51

১৬১ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা,* ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৪

কিন্তু আমরা যখন দেখতে যাই, দেখি যে, যে নাচছে অনেক ভুল মুদ্রা নিয়ে নাচে। কিন্তু ঐ পুরা পরিবেশটাই এমন একটা রস তৈরি হয় তখন আমরা আর এইগুলা দেখি না।[১৬২]

তথাপিও *রাসনৃত্যের* সকল ভঙ্গি এবং চলনের রয়েছে শাস্ত্রীয় বয়ান। যেমন মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যের 'মৌল পদচলন' (basic foot step) নির্দিষ্ট পাঁচটি ক্রমিক অবস্থান ও চলনে সম্পাদিত হয়। ক্রমানুসারে এগুলো হচ্ছে– এক. *সমপদ* (সংযুক্ত পায়ে দেহের ভর ও ভারসাম্য থাকে সমবণ্টিত), দুই. *অঞ্চিতা* (সমপদ অবস্থান থেকে ডান পায়ের গোড়ালি সম্মুখে বাড়িয়ে রাখা), তিন. *কুঞ্চিতা* (সম্মুখে বাড়িয়ে রাখা অঞ্চিতা পা অপর পা-কে ক্রস করে সমান্তরাল রেখায় টো বা পায়ের অগ্রভাগের ওপর অবস্থান করা), চার. *সুচী* (কুঞ্চিতা ক্রস-পা থেকে ফিরে এসে অতঃপর পদাঙ্গুলি অথবা বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভরযোগে অপর পায়ের সমান্তরাল রেখা থেকে সামনে স্থাপন করা), এবং পাঁচ. *অগ্রতলা সঞ্চলন* (সুচী অবস্থান থেকে পায়ের অগ্রভাগের তলা বা অগ্রতলা অথবা টো দ্বারা অপর পায়ের গোড়ালি সমান্তরালে বক্র/ভাঙা হাঁটু সহকারে অবস্থান গ্রহণ করা) প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক এই *পদচলনের* সাথে হাত ও মাথার অবস্থান এবং ভঙ্গিও নির্দিষ্ট থাকে। অপরদিকে *চালি, চালি অরৈবীতে* (চালিকা ভ্রমরী) রয়েছে *অগ্রতলা* নির্ভর *সঞ্চলন*। তবে *অগ্রতলা সঞ্চলনের* সাথে রয়েছে বক্র হাঁটুর সমন্বিত মুভমেন্ট। এই ধরনের পদ-সঞ্চলনের সাহায্যে দেহের ঘূর্ণন, পাশাপাশি ঘূর্ণন, হালকা উল্লম্ফনসহ দেহে নানারূপ বিন্যাস ও চলন সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাছাড়া মণিপুরী নৃত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশৈলী যা নির্মিত হয় 'figure eight motion-এর মাধ্যমে। এটি একটি *গতি* যা স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্নে নির্মিত হয় তাই মণিপুরী নৃত্যে এটি সর্পিল প্যাটার্ন নামে বিশেষভাবে খ্যাত। এই *গতির* প্যাটার্ন বা ভঙ্গিটি নির্মিত হয় 'figure eight motion' অনুসারে। অর্থাৎ ইংরেজী '8' অক্ষরের ফিগার বা প্যাটার্ন অনুরূপ কুশীলবের মাথার গতি/মুভমেন্ট পরিচালিত হয়ে থাকে। মাথার এই মুভমেন্টটি পরিচালিত হয় নাকের অগ্রবিন্দুকে কেন্দ্র করে। নাকের অগ্রবিন্দুকে শরীরের বাম দিকে কৌণিক রেখা বরাবর নিচে ভূমি থেকে ক্রমান্বয়ে অর্ধ-বৃত্তাকারে উপরে তুলে বিপরীতদিকে অর্থাৎ ডানদিকে কৌণিক রোখায় ভূমি বরাবর নিচের দিকে নিয়ে পুনরায় অর্ধ-বৃত্তাকারে উপরে তুলে ডান থেকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ইংরেজী '8' অক্ষরের পূর্ণ ফিগার বা প্যাটার্ন নির্মিত হয়। মাথার এই *গতিকে* অনুসরণ করে অতঃপর হাতসহ দেহের ঘূর্ণনযুক্ত মুভমেন্ট সম্পাদিত হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, এই প্যাটার্নটির মাধ্যমে মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যের মৌলিক দর্শনের প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ এটিই হচ্ছে মানবদেহের সেই অনন্ত অসীম শৌর্য যা বিরামহীন অশেষ-বৃত্তে চলমান/ঘূর্ণায়মান– This figure eight motion is very very important in Monipuri

১৬২ প্রাক্তন রাস নৃত্যশিল্পী, অভিনেত্রী এবং মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক কর্মকতা জ্যোতি সিনহা-এর প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১৩/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

dance, it is one of the main philosophies of movement. This is the endless cycle of infinity in your energy.[163]

অপরদিকে নৃত্যে ব্যবহৃত প্রাথমিক *পদচলন*, ভঙ্গি এবং নানাবিধ সঞ্চলনে একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়, সেটি হচ্ছে ভূমি-অনুবর্তী সমর্পিত দেহের স্থিতি বা মৌলিক দেহভঙ্গি (basic body posture/position) নির্মাণ করা। ভূমি-অনুবর্তী সমর্পিত দেহভঙ্গিতে কুশীলব *সমপদ* থেকে ক্রমান্বয়ে হাঁটু খানিকটা বক্র/ভাঙা (knee bent) অবস্থানে পরিবর্তন করে এবং পুনরায় *সমপদ* অবস্থানে ফিরে আসে। কোমর থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বা মেরুদণ্ড থাকে সোজা তবে খানিকটা ঝোঁক থাকে সম্মুখাবর্তী, চলনের ক্ষেত্রে পায়ের পাতার অগ্রভাগ (toe) বা *অগ্রতলা সঞ্চলন* বিশেষ প্রাধান্য পায়, সন্দংশ মুদ্রায় নির্মিত দুই হাত কনুই-এর ভাঁজে অনেকটাই প্রসারিত ও বর্ধিত তবে একাধিক বৃত্তে হয় আবর্তিত বা পরিবর্তিত, দৃষ্টি থাকে অবনত, অথাৎ সমর্পিত। পর্যবেক্ষণকৃত এই সকল ভঙ্গিগত অবস্থান ও চলন শাস্ত্রীয় বিধান নির্দেশিত হলেও তা চরিত্রের (রাধ, কৃষ্ণ, গোপীদের) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অথবা সংলাপকে সাংকেতিক মূদ্রায় প্রকাশ করে না বা শারীরিক অনুবাদ (physical transtation) করে না, বরং তা বিষয়ের সাথে চরিত্রের ভাবগত সম্পর্ক নির্মাণ করে।

সুতরাং মণিপুরী নৃত্যের এই সকল শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান বিবেচনায় রেখেই কমলগঞ্জের *রাসনৃত্যের* মহড়াকালীন কুশীলবের চর্চা থেকে তিনটি বিষয়– এক. মৌলিক দেহভঙ্গি (basic body posture/position)– 'ভূমি-অনুবর্তী সমর্পিত দেহ', 'মৌল পদচলন' নির্ভর সঞ্চলন বিশেষত 'বক্র হাঁটুতে *অগ্রতলা সঞ্চলন*', দুই. 'শৌর্য'– তাণ্ডব ও লাস্য এবং তিন. 'ভাব-রস' এই বিষয়গুলোর কৌশলগত ও প্রায়োগিক সম্ভাবনা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।। এই তিনটি বিষয়ের নিরীক্ষাসূত্রে কুশীলবের দেহের সাথে ভূমির (মঞ্চ/আসরের) এমন কিছু বিশেষ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে, গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী যা অভিনেতার মঞ্চ উপস্থিতিকে আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় ও সাবলীল করে তুলতে পারে। কেননা শরীরের ঊর্ধ্বংশ অর্থাৎ কোমড় থেকে উপরের অংশের মুভমেন্টের স্বাভাবিক ছন্দ, গতি ও শৌর্যের প্রকাশ নির্ভর করে পায়ের অবস্থান/স্থিতি, ভর ও বিন্যাসের ওপর। আবার ভূমিস্থিত (মঞ্চে/আসরে) পায়ের ভর, বিন্যাস, অবস্থান ও চলনের ওপর নির্ভর করে গোটা শরীরের বা দেহ-ভাষার পরিপূর্ণ অর্থ বা অভিব্যক্তি। এমনও বলা হয়ে থাকে যে– [an] actor's basic sense of his physicality comes from his feet.[১৬৪] অপরদিকে কুশীলবের দেহের ভঙ্গি বা চলন দ্বারা নির্মিত কাঙ্ক্ষিত অর্থবহ অভিব্যক্তি প্রকাশে দেহস্থিত শৌর্য কিভাবে কার্যকর হতে পারে তারও একটা হদিস করা যেতে পারে এই আলোচনায়। মোদ্দাকথা, ভূমিস্থিত দেহের ভঙ্গি ও চলন, দেহ-শৌর্য, ভাব-রসের বিশ্লেষণ দুটি কারণে

১৬৩ Nupur Singha, *Indian Monipuri Dance : The first position for monipuri dance*, https://www.youtube.com/watch?v=5Ooz1GPreT0, Date- 8/3/2016, time- 11 pm

১৬৪ Tadashi Suzuki, *The Way of Acting*: *The Theatre Writtings of Tadashi Suzuki*, Theatre Communications Group, Inc. New York, 1985, p. 9

গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে– এক. ভূমি অনুবর্তী হালকা বেন্ট বা বক্র হাঁটু নির্ভর দুই পায়ের ওপর পূর্ণ ভর দিয়ে অথবা টো-নির্ভর অগ্রতলা সঞ্চলন কিভাবে একজন অভিনেতার শরীরে গতি-বৈচিত্র্য ও নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে, তার সম্ভাবনা খুঁজে দেখা। এবং দুই. বিশেষ ও নির্দিষ্ট কিছু ভাব ও শৌর্যের দ্বারা কিভাবে কুশীলবের শরীরী-ভঙ্গি নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তার কৌশলগত দিকটি যাচাই করা।

প্রথমে *রাসনৃত্যের* অনুশীলন প্রক্রিয়ায় কুশীলবের ভূমি-অনুবর্তী দেহভঙ্গি বিশেষত 'বক্র হাঁটুতে *অগ্রতলা সঞ্চ-লন*' নির্ভর মুভমেন্টের কৌশলগত গুরুত্ব ও সম্ভাবনার দিকটি খতিয়ে দেখা যাক। দেহের ভঙ্গি বা সঞ্চলনের কৌশলগত গুরুত্ব ও সম্ভাবনা অন্বেষণের শুরুতেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে– পরিবেশনা আয়তন বা ভূমি (মঞ্চ/আসর/রাস-মণ্ডল) এবং কুশীলবের মধ্যে প্রথম যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেটি তাঁর পায়ের সাথে। যদিও কুশীলবের সাথে ভূমি-অনুবর্তী সম্পর্কের বিষয়ে ইতিপূর্বেই খানিকটা আলোকপাত করা হয়েছে, তথাপিও বলা যায় যে, রাসমণ্ডলে কুশীলবের উপস্থিতি এবং অবস্থান নিরেট একটি বিনোদনমূলক শিল্পরূপ প্রদর্শনের নিমিত্তে নয় বরং *রাসের* মণ্ডলী-ভূমিতে উপস্থিত সকল কুশীলবই প্রকারান্তরে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে ভাবসূত্র বিনির্মাণে এক একটি প্রতীকী দেহে বা ভাব-দেহে রূপান্তরিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে রাসমণ্ডলীতে কুশীলবের পায়ের প্রতিটি স্পর্শ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই ভক্তিরই পরম প্রকাশ ঘটে নৃত্যের ছন্দে, দেহের ভাষায় অত্যন্ত হালকা ও কোমল তথা লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব শৌর্যের প্রয়োগের মাধ্যমে, ভূমিতে কঠিন ও তুমুল আঘাত এক্ষেত্রে কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু নৃত্যের ভঙ্গি ও চলনের মূলে ধর্মীয় দর্শন ও ভাব-রসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা যে পর্যায়েই ক্রিয়াশীল থাকুক না কেন, প্রদর্শনমূলক যেকোনো ভঙ্গি ও চলনের (সাধারণ, বিশেষ অথবা বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ) একটি কৌশলগত দিক রয়েছে যা প্রত্যক্ষ অনুশীলন সাপেক্ষ একটি বিষয়। আর দেহজাত যাবতীয় ভঙ্গি বা চলন মাত্রই ভূমি সাপেক্ষ একটি ব্যাপার অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবেই কুশীলবের দেহভঙ্গি ও চলনের কৌশলগত প্রায়োগ ভূমি সম্পর্ক-যুক্ত একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্তর্গত ভাব ও শৌর্য যেমন বহিস্থ ভঙ্গি ও অভিব্যক্তিকে মূর্ত করতে পারে, ভূমির সাথে দেহের ভর, ভারসাম্য, ছন্দ, গতির অবস্থান ও স্থিতির কৌশলগত সম্পর্ক তেমনি বিপরীতক্রমে ভাব ও শৌর্যের প্রকাশকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতে পারে। কারণ–

> A performance begins when the actor's feet touch the ground, a wooden floor, a surface, when he first has the sensation of putting down roots; it begins in another sense when he lifts himself lightly from that spot. The actor composes himself on the basis of his sense of contact with the ground, by the way in which his body makes contact with the floor. Of course there are many ways in which the human body can make contact with the floor, but most of us, excepting small children, make contact with the lower part of the body, centering on

the feet. The various pleasures that an actor feels as he comes in contact with the ground.[165]

বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যায় যে, ভূমির সাথে পায়ের স্পর্শানুভূতির ধরন এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অভিনেতা একদিকে যেমন ভূমির সাথে সংযোগ স্থাপন করে, অপরদিকে তাঁর দেহের বিন্যাসকেও সাবলীল করে তোলে। কেননা–

The way in which the feet are used is the basis of a stage performance. Even the movements of the arms and hands can only augment the feeling inherent in the body positions established by the feet. There are many cases in which the position of the feet determines even the strength and nuance of the actor's voice. An actor can still perform without arms and hands, but to perform without feet would be inconceivable.[166]

দাঁড়িয়ে থাকা নিত্যদিনের অভ্যস্ত একটি শরীর এবং বক্র হাঁটুতে পায়ের *অগ্রতলা সঞ্চলন* বা টো নির্ভর অবস্থানে থাকা অপর একটি শরীর– একটি অ-বিন্যস্ত শরীর যা দৈনন্দিন, বিশেষ অথবা প্রদর্শনার্থে নির্মিত নয়, সেহেতু আকর্ষণীয়ও নয়, অপরটি বিন্যস্ত শরীর যা বিশেষ বা প্রদর্শনার্থে নির্মিত, ফলে তা হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। বিন্যস্ত এবং অ-বিন্যস্ত শরীরের এই সরল ভিন্নতায় ভূমির সাথে পায়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে 'বক্র হাঁটুতে পায়ের *অগ্রতলা সঞ্চলন* বা টো নির্ভর মুভমেন্টের' কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনা কতটুকু তা এ পর্যায়ে খুঁজে দেখা যেতে পারে। বক্র হাঁটুতে দেহের চলন, সঞ্চলন অথবা মুভমেন্ট প্রসঙ্গ আলোচনার শুরুতে *ভরতনাট্যম* শিল্পী, শিক্ষক এবং গবেষক অমিত চৌধুরীর অভিজ্ঞতার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে–

আমি *মণিপুরী কলাক্ষেত্র*-এর (ভারতের মণিপুর রাজ্যের প্রসিদ্ধ একটি নাট্য সংস্থা, যার প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক শ্রী কানহাইয়া লাল) একজন অভিনেতাকে (তোম্বা তিং) জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের সব চলন বেন্ট (knee bent) কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন– বেন্ট মানে হচ্ছে আমি যে মাটির সাথে আঁকড়ে আছি, এটাকে অনেক গভীরভাবে দর্শক ইন্টারেক্ট করতে পারে বা খুব দ্রুত সেটা বুঝতে পারে। বেন্ট মুভমেন্টের ক্ষেত্র প্রসারিত করে অর্থাৎ যাওয়ার জায়গা বেশি থাকে এবং সেটাতে আমি দর্শককে বেশি কনসেনট্রেট করাতে পারি। বেন্টটা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[১৬৭]

কিন্তু কিভাবে বেন্ট পজিশন মুভমেন্টের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারে? পারে, এবং তা এই জন্য যে, বেন্ট বা বক্র হাঁটু পজিশনের সাথে *অগ্রতলা সঞ্চলন* বা টো নির্ভর চলনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও বিশেষ। বক্র

---

১৬৫ Tadashi Suzuki, *The way of Acting*, translated by J. Thomas Rimer, Theatre communications group, New York, 1985, P. 8

১৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৬৭ নৃত্যশিল্পী, শিক্ষক, গবেষক অমিত চৌধুরীর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, সময়- সকাল ১০.১৯ মিনিট, স্থান- নাটমণ্ডল, থিয়েটার এণ্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়.

হাঁটুতে টো নির্ভর অবস্থান ব্যক্তির শরীরে খোলা, উন্মুক্ত, নমনীয়, হালকা অথবা অভিমুখীন হওয়ার ধারণা বা উপলব্ধিকে সহজ করে তোলে অর্থাৎ শরীরের বহুমুখী গতিশীলতার উপলব্ধি এবং শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে। টো নির্ভর চলন/মুভমেন্ট প্রসঙ্গে তাডাশী সুজোকীর *দ্য ওয়ে অব অ্যাক্টিং* গ্রন্থে উল্লেখিত কন্ডো শিরো-এর *কনভারসেশন এবাউট দ্য ফিট* থেকে উদ্ধৃত একটি বয়ানের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে–

> Animals that walk on their toes, such as dogs, cats, and other carnivorous species, do not touch their heels to the ground. They are able to walk comparatively quickly.
>
> Hooved animals such as deer, goats, and horses also stand on their toes, which constitute the hoof, and so are able to move quite swiftly.
>
> […] According to this system of categories, hooves provide the fastest means of movement, particularly in running. [১৬৮]

উল্লেখিত উদ্ধৃতির আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে টো নির্ভর অবস্থান দেহে বহুমুখী গতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। অপরদিকে বক্র হাঁটু মানবদেহের স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র এবং ভারসাম্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায়। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শ্রোণীচক্র (pelvis) হাঁটুর অবস্থান সহ দেহের ভঙ্গিগত বিন্যাস ও গতির সাথে স্নায়বিক ও পেশি শৌর্যের মধ্যে কৌশলগত এক মহা 'সমন্বয়' সৃষ্টি করে। এই 'সমন্বয়ের' মাধ্যমেই অতঃপর দেহের চলমান গতির সাথে পরিবর্তিত ভরকেন্দ্র ও ভারসাম্যের মধ্যে একটি সার্বক্ষণিক তথা সচল-স্থিতি বজায় রাখা সম্ভব হয়। বলা যায় এই মহা 'সমন্বয়'ই হচ্ছে দেহের ঝুঁকিপূর্ণ সকল সঞ্চলন বা মুভমেন্টের গতি বা শক্তির উৎস। কারণ এই 'সমন্বয়' মাধ্যাকর্ষণ নির্ভর ব্যক্তির নিত্যদিনের স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র এবং ভারসাম্যকে খারিজ করে দিয়ে এর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে এবং পরিবর্তিত ভরকেন্দ্র ও ভারসাম্যের সচল-স্থিতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়ের নিমিত্তে ভূমির সাথে দেহকে গভীর ও দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত করে। সঞ্চয় করা এই শক্তির ব্যবহারেই অতঃপর সম্পাদিত হয় বিশেষ, ঝুঁকিপূর্ণ তথা দৈনন্দিন-অতিরিক্ত সকল বিশেষায়িত ভঙ্গি, চলন বা মুভমেন্ট। ভঙ্গি, সঞ্চলন, মুভমেন্টের ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের এই ব্যাপারটিকে negation principle বা 'বৈপরীত্যের আদর্শ' দ্বারা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়– জাম্প করার জন্য হাঁটু বেন্ট করতে হয় অথবা দূরে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারতে হাতটিকে পিছনে টেনে নিতে হয়। 'হাঁটু বেন্ট' করা বা 'হাত পিছনে টেনে নেওয়ার' ব্যাপারটি এক্ষেত্রে অভিমুখীন হওয়ার উদ্দেশ্যেই শক্তি সঞ্চয়ের নিমিত্তে পশ্চাৎমুখী বা বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিষয়টি হচ্ছে এই যে– [we could call it] the 'negation

---

১৬৮ Tadashi Suzuki, *The way of Acting*, translated by J. Thomas Rimer, Theatre communications group, New York, 1985, P. 19

principle': before carrying out an action, the actor negates it by executing its complementary opposite. [169]

সুতরাং টো নির্ভর দেহাবস্থান একদিকে যেমন শরীরে খোলা, উন্মুক্ত, হালকা ও নমনীয় মনো-দৈহিক উপলব্ধির সম্মুখে দাঁড় করায় এবং দেহতে বহুমুখী গতির সম্ভাবনা তৈরি করে অপরদিকে বক্র হাঁটু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে ভরকেন্দ্র, ভারসাম্য, গতি, স্নায়বিক ও পেশিগত শক্তির মধ্যে এমন এক কার্যকরী 'সমন্বয়' সৃষ্টি করে যা টো-নির্ভর সেই খোলা, উন্মুক্ত, হালকা ও নমনীয় মনো-দৈহিক ভঙ্গির সঞ্চলন বা মুভমেন্টকে সাবলীলতায় সম্ভব করে তোলে। 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন বা টো নির্ভর দেহভঙ্গির' এই কৌশলগত দিকগুলিই অত-ঃপর *রাসনৃত্যের* ভূমি-অনুবর্তী সমর্পিত দেহের অবস্থান, মৌল পদচলন, চালি-সংযুক্ত বিভিন্ন ভঙ্গি এবং সঞ্চলনের মাধ্যমে কার্যকর হয়। ফলে কৌশলগতভাবে চর্চিত 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন' বা টো নির্ভর দেহভঙ্গির সাথে কৃষ্ণ– মহাভাব, ভক্তি এবং দেহস্থিত শৌর্যের বিশিষ্টপূর্ণ ব্যবহার (পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে) ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অতঃপর রাস-মণ্ডলে ধারাবাহিকভাবে নির্মিত, বিনির্মিত হতে থাকে শরীরের অপরূপ সব নৃত্যশৈলীর রূপায়ণ। তবে 'বক্র হাঁটু ও টো নির্ভর অবস্থান' যে কেবল *রাসনৃত্যে* কার্যকর হয় ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। এই দেহাবস্থানটি *ভরতনাট্যম, মার্শাল আর্ট, নো, কাবুকিসহ* প্রভৃতি আরও অনেক ধরনের পরিবেশনায় এর প্রয়োগ লক্ষ করা যাবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ *রাসনৃত্যে* 'বক্র হাঁটুতে *অগ্রতলা সঞ্চলনের'* প্রায়োগিক কৌশলের সাথে বৈষ্ণবীয় ভাব-রস এবং দেহস্থিত শৌর্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিন্যাস ও সমন্বয়ে অতঃপর যে দেহরূপটি মূর্ত হয় তা অপরাপর অন্যসকল ধ্রুপদী নৃত্য/নাট্যের দেহের বিন্যাস ও রূপ থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে ওঠে।

রাসনৃত্যের ভঙ্গি ও চলনের বিশ্লেষণসূত্রে, পরিশেষে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'বক্র হাঁটুতে *অগ্রতলা সঞ্চলনের'* প্রায়োগিক কৌশলের সাথে ভাব-রস ও শৌর্য প্রয়োগের এই প্রক্রিয়াটি মনো-দৈহিক এবং তা প্রত্যক্ষ অনুশীলন সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া। 'বক্র হাঁটুতে *অগ্রতলা সঞ্চলন'* বা টো নির্ভর দেহাবস্থান শরীরে যে সকল খোলা, উন্মুক্ত, হালকা ও নমনীয়তার বোধ বা উপলব্ধির সম্মুখীন করে তা কেবল *স্পাইরাল* বা *সর্পিল* অথবা *ফিগার এইট মোশনের* ক্ষেত্রে নয় বরং অভিনেতা তাঁর কল্পনাশক্তির ওপর ভর করে একাধিক মনো-দৈহিক ভঙ্গি, অন্যভাবে বলা যায় শরীরে বিমূর্ত কাঠামো নির্মাণেও আগ্রহী হতে পারে। অথবা এটিকে একটি কৌশল হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে অভিনেতা তাঁর দেহের সচল-স্থিতি, গতি, ভর ও ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চলন অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারে। সুতরাং দেহের সচল-স্থিতি, গতি, ভর ও ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চলন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি মনো-দৈহিক অনুশীলনেও সহায়ক

১৬৯ Eugenio Barba and Nicola Savarese, *A dictionary of theatre Anthropology: The Secret Art of The Performer,* Routledge, London, 1991, p. 57

হতে পারে এই বিবেচনায় *রাসনৃত্যের* 'বক্র হাঁটুতে *অগ্রতলা সঞ্চলনকে*' অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক একটি অনুশীলন উপাদান হিসেবে পরবর্তী আলোচনায় গ্রহণ করা হলো।

এ পর্যায়ে *রাসনৃত্যে* কুশীলবের দেহ-স্থিত শৌর্য– তাণ্ডব ও লাস্য বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। পূর্বেই লক্ষ করেছি যে, *রাসনৃত্য* বিনোদনের নয় এমন কি ভয়ঙ্কর রৌদ্র মূর্তিরও নয় বরং সমর্পণ নিবেদনের উদ্দেশ্যে কুশীলবের দেহের ভঙ্গি ও চলন হয়ে ওঠে বিনম্র চঞ্চল। *রাসনৃত্যে* কুশীলবের বিনম্র চঞ্চল দেহেরভঙ্গির নির্মাণ ও প্রদর্শনে ভূমিস্থিত সম্পর্ক কিভাবে প্রতিফলিত হয় তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রশিক্ষক সুইটি দাসের মন্তব্যে–

> মণিপুরী নাচে যাই করা হোক না কেন, সমস্ত স্টেপগুলো কিন্তু মোটামুটি এই– টো-পয়েন্টে বডি মাটি রিলেটেড বা সংলগ্ন থাকে, অর্থাৎ পুরো মাটির সাথে রিলেটেড থাকে এবং শরীর খানিকটা বেন্ট থাকে। জাম্প অথবা মুভমেন্ট সব ক্ষেত্রে মাটির সাথে সম্পর্কিত থাকে। অর্থাৎ মণিপুরী নাচটা আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ ভূমিকেন্দ্রিক, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে রিলেটেড। কারণটা ভৌগোলিক। ভৌগোলিক বলার পিছনে কারণ হচ্ছে মণিপুর কিন্তু উত্তর-পূর্বাংশে যেটি সম্পূর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল। আদি সময়ের পানে দৃষ্টি দিলে এটি সুস্পষ্ট যে তখন পাহাড়ি প্রতিকূল পরিবেশে পায়ের স্টেপ বা শরীরের ভঙ্গির প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই করতে হতো। সম্ভবত সেই থেকেই যুগের পর যুগ ধরে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে মণিপুরী নাচের বর্তমান রূপ যা আজ অবধি ভূমি সংলগ্ন বা ভূমিকেন্দ্রিক রয়েছে।[১৭০]

সুইটির এই বয়ানে পুনরায় স্পষ্ট হয় যে, 'টো-পয়েন্টে' মুভমেন্ট/চলনের সাথে খানিকটা বক্র-হাঁটু ও সম্মুখাবর্তী ঝোঁকানো শরীর এবং ভূমি সংলগ্ন হয়ে থাকার বিষয়টি *রাসনৃত্যের* বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি দেহভঙ্গি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শাস্ত্রীয় বিধিমতে ভূমি-অনুবর্তী বিনম্র চঞ্চল দেভঙ্গি ও চলন, মৌল পদচলন, ঘূর্ণন, সর্পিল ভঙ্গিসহ যা কিছু বিশিষ্ট রূপ দেহে মূর্ত হয়ে ওঠে এর দেহগত 'অন্তঃপ্রবাহ' কি বা এর গতি এবং লয় নিয়ন্ত্রিত হয় কিভাবে? এ প্রসঙ্গে নৃত্যশিল্পীর দেহস্থিত স্নায়বিক এবং পেশির সমন্বয়ে সৃষ্ট শক্তি বা শৌর্য (energy) প্রয়োগের বিষয়টিকে সর্বাগ্রে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে–

> Performer's energy is a readily (willingly/eagerly) identifiable quality: it is the performer's nervous and muscular power. The mere fact that this power exists is not particularly interesting, since it exists, by definition, in any living body. What is interesting is the way this power is molded in a very special context:

১৭০ সুইটি দাস (২৮) নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক (সাধনা)-এর সাক্ষাকৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ০৬/০৭/ ২০১৫, সাধনা প্রশিক্ষণ কার্যালয়, বনানী, ঢাকা

> the theatre. At each moment of our lives, consciously or otherwise, we model our energy.[১৭১]

অর্থাৎ মানুষ তাঁর দেহ-অভ্যন্তরে বিরাজমান স্নায়বিক ও পেশিগত জটিল প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট শক্তি/শৌর্য (এনার্জি) থেকে একদিকে যেমন কর্ম-উদ্দীপনা লাভ করে থাকে, অপরদিকে এই শৌর্যের মাধ্যমেই পরিবর্তিত নানান পরিস্থিতিতে ব্যক্তি তাঁর সৃষ্ট নতুন নতুন শারীরিক অভিব্যক্তি/ভঙ্গি/মুভমেন্টকে সুনির্দিষ্ট ও অর্থবহ করে তোলে। তবে দৈনন্দিন বাস্তবতায় শৌর্যের প্রকাশ হয় স্বাভাবিক ও আকর্ষণহীন কিন্তু পরিবেশনার (নাট্য, নৃত্য প্রভৃতি) ক্ষেত্রে শৌর্যের প্রকাশ হচ্ছে সচেতনমূলক– প্রশিক্ষণলব্ধ, মহড়াকৃত তবে নিয়ন্ত্রিত এবং বিন্যস্ত। তাই *রাসনৃত্যে* আমরা কেবল নির্দিষ্ট কতিপয় ভঙ্গি বা চলনের শৈলীবদ্ধ দেহ-বিন্যাস প্রত্যক্ষ করি তা নয় বরং এই সকল ভঙ্গি বা চলনের দেহগত 'অন্তঃপ্রবাহ' হিসেবে প্রশিক্ষণলব্ধ শৌর্যের শৈল্পিক প্যাটার্ন বা 'মডেল'ও প্রত্যক্ষ করে থাকি। অথবা বলা যায় দেহস্থিত শৌর্যের বিন্যস্ত বিমূর্ত প্যাটার্ন বা *মডেল* দ্বারা-ই বহিস্থ দেহে নানাবিধ ভঙ্গি বা ভাষা ক্রমাগত মূর্ত হয়ে ওঠে। মণিপুরী নৃত্যের পেঁচালো (spiral), 'বিজড়িত সর্পিল' (intertwined serpent) বা figure eight motion অথবা নৃত্যশিল্পী সুইটিদাসের ব্যাখ্যা মতে 'টো-পয়েন্টে ভূমি-সংলগ্ন' অবস্থান প্রভৃতি যে সকল দেহরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, বস্তুত কৌশলগত দিক থেকে এগুলো দ্বারা কোনো বাস্তবানুগ বা নিত্যদিনের শরীরকে নয় বরং একপ্রকার *জ্যামিতিক বিমূর্ত* ধারণার শরীরী-রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করে থাকি–

> The body is depersonalized to the point of geometrical abstraction. The continuities of this approach and the consequent methodology of 'form' are consistently apparent in the various dance styles of India. *Bharatanatyam* is a series of triangles in space, *Kathakali* a square, *Manipuri* a spiral or and intertwined serpent and *Kathak* an axis.[১৭২]

অর্থাৎ এই হচ্ছে দেহ অন্তর্গত শৌর্যের বিমূর্ত প্যাটার্ন বা মডেল যা ব্যক্তির কল্পনা, ভাব ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে মূর্ত হয় দেহের ক্যানভাসে। দেহস্থিত শৌর্যের বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে যে, দেহের বহিস্থ শৈলী বা ভঙ্গি ঠিক ততখানি নান্দনিক আকর্ষণে সুনির্দিষ্ট শিল্পভাষাময় হয়ে উঠতে সক্ষম, ঠিক যতখানি দেহের *অন্তঃপ্রবাহ*– শৌর্যের প্যাটার্ন বা *মডেলটি* হতে পারে সুনির্দিষ্ট, বিন্যস্ত এবং সুগঠিত। Figure eight motion ঠিক তেমনি একটি প্যাটার্ন যেটি বহিস্থ ভঙ্গিকে শৌর্যের অন্তস্থ মডেল ইংরেজি '8' দ্বারা বিনির্মাণ করে। কিন্তু মণিপুরী *রাসনৃত্যের* সর্পিল চলন বা মুভমেন্ট (spiral or intertwined serpent), ভূমি-অনুবর্তী

---

১৭১ Eugenio Barba. Nicola Savarese, *A dictionary of theatre anthropology :The secret art of the performer :* routledge, London, 1991, P. 74

১৭২ Kapila Vatsyana, *The Square and the Circle of the Indian Arts,* Abhinav Publications, New Delhi, 1983, P. 57

দেহভঙ্গি ও চলন সহ সকল সঞ্চলন ভঙ্গিমায় শৌর্যের ব্যাখ্যা কিভাবে বিশিষ্টরূপ লাভ করে সেটি এক্ষণে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল প্রকার ধ্রুপদী বা প্রথাগত নৃত্য ও নাট্যকলা ঐতিহ্যে কুশীলব/অভিনেতা তথা মানব দেহে 'তাণ্ডব' এবং 'লাস্য' নামে পরস্পর বিপরীত শক্তি/শৌর্যের দুটি রূপ চিহ্নিত করে থাকে। শৌর্যের কোনো লিঙ্গভেদ করা যায় না, কেননা মানবদেহ মাত্রই শৌর্যময় দেহ, কখনো তা প্রলয়ে প্রকাশ আবার কখনো সুকুমারে। তথাপিও কখনো পুরুষ রূপের প্রকাশে তাণ্ডব এবং নারীর প্রকাশে লাস্যের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। কখনো আবার লিঙ্গভেদে নয় বরং ঘটনা বা বিষয়ের প্রকারভেদেও শৌর্যের প্রয়োগ নির্ধারিত হয়ে থাকে, যেমন– প্রলয়, ধ্বংস, ভয়ংকর, বীভৎস প্রভৃতির প্রকাশে (নারী অথবা পুরুষ উভয়ে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) তাণ্ডব প্রয়োগ করা হয়, আবার প্রেম, প্রণয়, নির্মল আবেগের প্রকাশে হয় লাস্যের প্রয়োগ। তবে মণিপুরী রাসনৃত্যে পরস্পর বিপরীত এই দুটি শৌর্য– তাণ্ডব ও লাস্যের উপস্থিতি ও প্রয়োগ বিশেষ এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেহেতু ভগবান কৃষ্ণের প্রতি সমর্পণ ও ভক্তির প্রকাশ এই নৃত্যের মূল প্রেরণা, সেহেতু দেহের শৌর্য প্রকাশে লাস্যের ব্যবহারই মুখ্য হয়ে ওঠে, প্রথাগত তাণ্ডবের তুমুল ও ভয়ংকর রৌদ্র রূপের প্রদর্শন এক্ষেত্রে অকার্যকর। যদিও *রাসনৃত্যের* কিছু কিছু ভঙ্গি ও চলনে তাণ্ডবের প্রয়োগ নির্দিষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি সেই তাণ্ডবে প্রলয়ংকর রূপের প্রকাশ পায় না বরং সেই তাণ্ডবের প্রদর্শনও লাস্যময় অর্থাৎ লাস্যময়-তাণ্ডব হয়ে ওঠে। *রাসনৃত্যে* তাণ্ডব ও লাস্যের ব্যবহার প্রসঙ্গে গবেষক ও প্রশিক্ষকগণের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য–

> 'লাস্য ও তাণ্ডবে দেহের বিশেষ বিশেষ চলন ভঙ্গিমায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও সাধারণ হচ্ছে বডি সোজা থাকবে। টো বেজড এবং বডিকে মাটির সাথে পুশ করা অর্থাৎ ডাউনওয়ার্ড থাকবে। অর্থাৎ বডি ভূমি সংলগ্ন থেকে ভূমি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, শক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণত ডাউনওয়ার্ড। জাম্প করার ক্ষেত্রেও ভূমি থেকে শক্তি নিয়ে জাম্প করা হয়। মাধ্যাকর্ষণ, ডাউনওয়ার্ড, চোখ নিচে, ফলে ভঙ্গিটির সার্বিক প্রকাশ তাণ্ডব হলেও তা লাস্যময়-তাণ্ডব হয়ে ওঠে, অর্থাৎ নিবেদনমূলক হয়ে থাকে।[১৭৩]

মণিপুরী মেইতেই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গবেষক এ কে শেরামের মন্তব্যেও *রাসনৃত্যের* লাস্যময়-তাণ্ডবের ধারণাকে সমর্থন করে– 'মণিপুরী নৃত্য মূলত লাস্যধারার। এ নৃত্যের বৈশিষ্ট্য তার শান্তশ্রী, তার ভক্তিময়তা, তার নম্র মুখরতা। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে একমাত্র মৃদঙ্গ নৃত্যই পুরোপুরি তাণ্ডব ধারা। অন্যান্য কিছু কিছু নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্য ধারার এক সুষম সমন্বয় লক্ষ করা যায়।'[১৭৪] অপরদিকে *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন* গ্রন্থে *রাসনৃত্যের* দেহের গতি ও শৌর্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে– 'এর সৌন্দর্য অঙ্গচলনের সূক্ষ্মতায়, এর

---

১৭৩ সুইটি দাস (২৮) নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক (সাধনা)-এর সাক্ষাকৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ০৬/০৭/ ২০১৫, সাধনা কার্যালয়, প্রশিক্ষণ কক্ষ, বনানী, ঢাকা

১৭৪ এ কে শেরাম, *মণিপুরীদের ঐতিহ্যময় নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা:) *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫২

সৌন্দর্য নিয়ন্ত্রিত গতিতে, 'অতি'তে নয়। ভাবনা প্রধান হওয়ায় এটি নম্র এবং গম্ভীর।'[১৭৫] লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, 'লাস্যময়-তাণ্ডব' ধারণাটি প্রাচীন এবং পৌরাণিকযুগের নৃত্যকলা থেকেই উদ্ভূত। তাণ্ডব সম্পর্কে বলা হয় যে এটি মূলত শৃঙ্গার রস থেকেই উদ্ভূত। কেননা–

> 'শৃঙ্গার রস থেকে উদ্ভূত বলে তাণ্ডব নৃত্যে সত্ত্বের প্রসন্নতা ও সুকুমারতা নিহিত। এই প্রসন্নতার উদ্বোধক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই। পুনরায় তাণ্ডবে সৃষ্টি ও সংহার দু রকম বৃত্তিই থাকে। নটরাজ তাণ্ডবনৃত্যে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার মহিমা নিজেই উপভোগ করেন ও পরে প্রলয়– মূর্তিতে তাণ্ডবের উদ্দাম নৃত্যে বিশ্বসংসার ধ্বংসও করেন। তাই তাণ্ডবে দুটি রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়।'[১৭৬]

এই উদ্ধৃতির আলোকে বলা যায় যে, মণিপুরী *রাসনৃত্যে* তাণ্ডবের যে ব্যবহার তাতে ঐ প্রসন্ন সুকুমার রূপেরই প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়– যে নৃত্য সমর্পণের, নিবেদনের সে নৃত্যে তাণ্ডবের প্রকাশ যে নির্মল, সুকুমার তথা লাস্যময় হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কুশীলবের দেহস্থিত শৌর্যের লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব রূপের সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাসে সৃষ্ট প্যাটার্ন বা *মডেলই* অতঃপর দেহ শৈলীতে ভাব-অর্থপূর্ণ শিল্পভাষায় মূর্ত হয়ে *ওঠে*। শিল্পীর দেহে মূর্ত হওয়া নানাবিধ ভঙ্গির গভীরে এই যে স্নায়বিক এবং পেশিগত শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাস, গতিময়তা বা নৃত্য চঞ্চল সক্রিয়তা এটিই হচ্ছে দেহের *অন্তঃপ্রবাহ*– লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব, যা দীর্ঘ পরম্পরাসূত্রে *রাসনৃত্যে* চর্চিত হয়ে বিশিষ্টরূপ লাভ করেছে। সুতরাং দেহে নির্মিত ভঙ্গি বা চলন *ঠিক* ততটুকুই বিশেষ, সুনির্দিষ্ট অথবা *জ্যামিতিক বিমূর্ত* হতে সক্ষম হয়, *ঠিক* যতটুকু বিশেষ, সুনির্দিষ্ট অথবা বিমূর্ত হতে সক্ষম হয় নৃত্যশিল্পীর দেহস্থ শৌর্যের বিন্যাস, প্যাটার্ন অথবা *মডেল*-এর রূপায়ণ। মণিপুরী নৃত্যে এই *মডেলটি* মূর্ত হয়ে *ওঠে* কখনো ভূমি-অনুবর্তী সমর্পিত শরীরে, কখনো পেঁচিয়ে থাকা ঘূর্ণয়মান সর্পিল ভঙ্গিমায় আবার কখনো *চালি* বা *চালি অরৈবীর* চলন, উল্লম্ফন এবং ঘূর্ণনে। অতএব নৃত্য, নাট্য, অ্যাক্রোবেট, ব্যালে প্রভৃতি পরিবেশনায় কুশীলব/অভিনেতার 'শারীরিক উপস্থিতির' প্রাথমিক আকর্ষণ তৈরিতে বা দেহের ভাষায় নান্দনিক অভিব্যক্তি প্রকাশের ব্যাপারটি কৌশলগতভাবে শৌর্যেরও অধীন যা অনুশীলন, বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ একটি বিষয় এবং ক্রমাগত শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণসূত্রেই তা কেবল আয়ত্ত করা বা এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

শৌর্যের অনুশীলন, নিয়ন্ত্রণ এবং বিন্যাসের গুরুত্ব ও সম্ভাবনার এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে *অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডব শৌর্যের বিমূর্ত প্যাটার্ন* (মডেল) নির্মাণের কৌশলটিকে অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতি-সহায়ক একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা দেহের সঞ্চালন বা মুভমেন্ট মাত্রই মনো-দৈহিক প্রক্রিয়ার ফলাফল যাতে অভ্যন্তরীণ অভিপ্রায় বা ইচ্ছা (inner intend) দ্বারা বাহ্যিক অভিব্যক্তি

---

১৭৫ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন*, মণিপুরী নর্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৭১

১৭৬ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০৪

নির্মিত/প্রদর্শিত হয়। ফলে শৌর্যের প্যাটার্ন নির্মাণের এই ধারণাটি অভিনেতাকে তাঁর মনো-দৈহিক ভঙ্গি এবং এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংবেদশীল ও সাবলীল করে তুলতে পারে। অর্থাৎ অভিনেতা তাঁর অভিপ্রায় বা ইচ্ছা-শক্তির ওপর আস্থা রেখে তাঁর শৌর্যকে একাধিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্যাটার্নে বিন্যাস করতে পারেন এবং পরিণামে তা অভিনেতার মনো-দৈহিক ভঙ্গির প্রকাশ অভিজ্ঞতাকেই নানা সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ করতে পারেন। ঠিক যেভাবে অন্তস্থ মডেল ইংরেজি '8' দ্বারা বিন্যস্ত Figure eight motion দেহের শৈলীতে সুনির্দিষ্ট শিল্পভাষাময় ও নান্দনিক হয়ে ওঠে। সুতরাং অভিনেতার মনো-দৈহিক অনুশীলনে 'অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণে' এই কৌশলটির অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে এটিকে অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতি উপযোগী একটি উপাদান হিসেবে পরবর্তী আলোচনায় গ্রহণ করা হলো।

রাসনৃত্যের সকল ভঙ্গি, চলন এবং গতির *অন্তঃপ্রবাহ* যদি হয় লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব তবে এদের প্রাণভোমরা হচ্ছে কৃষ্ণ-মহাভাব বা ভক্তি রস। *রাসনৃত্য* গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন আশ্রিত হওয়ায় এর রস-বিন্যাস, বৈচিত্র্য এবং প্রকারভেদ ভরতকৃত *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত রসভেদ (শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বী-ভৎস, অদ্ভুত) অনুরূপ নয় এমনকি বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণ-আখ্যান পরিবেশনায় এ সকল রসের গুরুত্ব মুখ্যও নয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রচার করেন যে, ভক্তিই প্রেমের বীজ। ভক্তিই শৃঙ্গার-রসরাজকে শ্রীমণ্ডিত করে– 'ভক্তিই রস। রসের আস্বাদনেই আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম।'[১৭৭] পরবর্তীতে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ভক্তিকে কেবল মুখ্যরসই নয় বরং একে *মধুরাখ্য ভক্তিরসরাজ* হিসেবে আখ্যায়িত করে এর শাস্ত্রীয় বয়ান প্রদান করেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রণীত *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে ভক্তি রসের ব্যাখ্যায় বলা হয়–

> (মধুর ভক্তিরসরাজ লক্ষণ যথা)
>
> বক্ষ্যমাণ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারি প্রভৃতি কার্য্য কারণ সহকারি ভাব দ্বারা মধুরা আস্বাদনীয় হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকেই মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন॥
>
> (বিভাব যথা)
>
> রতিবিষয়ক আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। ঐ বিভাব দুই প্রকার সালম্বন ও উদ্দীপন। সেই উদ্দীপন আবার দুই প্রকার হয়, কৃষ্ণ এবং ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ বিষয়ক উদ্দীপন এবং ভক্ত বিষয়ক উদ্দীপন॥[১৭৮]

সুতরাং বৈষ্ণবমতে কৃষ্ণই আনন্দ, কৃষ্ণই রসসর্বস্ব এবং কৃষ্ণ রসরূপময়। আর এই যুক্তিতে ভক্তিকে রস হিসেবে মেনে নিলে *কৃষ্ণরতি* হয় স্থায়ীভাব। তবে 'মণিপুরীরা ভক্তিমার্গানুসারী হওয়ায় তাঁরা ভক্তিরসকে দ্বাদশ-প্রকার বলে মেনে থাকেন। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মাধুর্য– এই পাঁচটি মুখ্য এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস– এই সাতটি গৌণরস হিসাবে গণনা করা হয়।'[১৭৯]

---

১৭৭ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫২
১৭৮ শ্রী রূপগোস্বামী, *উজ্জ্বলনীলমণি*, শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনুদিত, বহরমপুর, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫
১৭৯ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৪

অপরদিকে ভরত প্রণীত *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সাহচর্যে এসে স্থায়ী ভাবের রসোনিষ্পত্তি ঘটে। এ হিসেবে স্থায়ীভাব *রতি* থেকে নিষ্পত্তি ঘটে *শৃঙ্গার রসের*– 'পৃথিবীতে যা কিছু শুভ্র, পবিত্র, সুদর্শন তা শৃংগারের সঙ্গে উপমিত হয়। যে উজ্জ্বলবেষ পরিহিত সে শৃঙ্গারবান্ বলে অভিহিত হয়। [...] এইরূপে এই আচার সিদ্ধ, হৃদয়গ্রাহী রস উজ্জ্বলবেষাত্মক বলে শৃঙ্গার (নামে অভিহিত)। ঐ (রস) স্ত্রীপুরুষ থেকে উৎপন্ন এবং উত্তম যুবাপুরুষের প্রকৃতিসম্পন্ন।'[১৮০] এখানে ভরত এবং বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মধ্যে স্থায়ীভাব *রতির* ব্যাখ্যায় ভিন্নমত সুস্পষ্ট। *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী *রতি* স্থায়ীভাব থেকে *শৃঙ্গার* রসের নিষ্পত্তিতে নারী-পুরুষের কাম নির্ভর প্রেমের সম্পর্ক যুক্ত থাকলেও বৈষ্ণব ধারায় তা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এখানে প্রেমের পূর্ণতা হয় মধুর লীলায়– 'শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের লীলা বিশেষই শৃঙ্গার রসের পরম উৎকর্ষ।'[১৮১] *রতিভাব* এখানে সম্পূর্ণ নিষ্কাম দ্বারা ব্যাখ্যাত, ভক্তিই এর একমাত্র বিবেচ্য– 'রাধা-কৃষ্ণের প্রেম– নিগূঢ় প্রেম, এই প্রেমকে জাগতিক প্রেমের সাথে তুলনা করা মহাপাপ। কেউ যদি এই প্রেমের সাথে জাগতিক প্রেমের তুলনা করতে সামান্য মনোভাব যায় তবে সে আমাদের ভাষায় নরকে যাবে। এই প্রেম– নিষ্কাম প্রেম, সেই প্রেমের প্রতি ভক্তি, সেই ভক্তিতে হয় শক্তি।'[১৮২] প্রদত্ত উক্তিটির আলোকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পরম পুরুষ কৃষ্ণের প্রতি নিগূঢ় প্রেম থেকে জাত *ভক্তিই* হচ্ছে কুশীলবগণের মূলগত প্রেরণা (Inner motivation) যা দেহের '*অন্তঃপ্রবাহ*– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডব শৌর্যের' আশ্রয়ে বিধিবদ্ধ ভঙ্গি, চলন ও গতিতে হয় মূর্ত। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়– *রাসনৃত্যে* প্রদর্শিত সকল দেহভঙ্গি ও চলনের *অন্তঃপ্রবাহ* (প্যাটার্ন বা মডেল) যদি হয় লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব তবে এর প্রাণদায়িনী শক্তি হচ্ছে কৃষ্ণ মহাভাব– স্থায়ীভাব যার *কৃষ্ণরতি*, রসেতে যা হয় *ভক্তি*। পরিণামে কৃষ্ণ আখ্যান হয়ে ওঠে রসোময় অর্থাৎ সম্পাদিত হয় রাসলীলা।

রাসনৃত্যের বিশ্লেষণ অন্তে পুরো আলোচনার উপসংহার নির্ণয় করা যেতে পারে। 'ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– মণিপুরী' শীর্ষক আলোচনায় মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সূত্রধরেই *রাসনৃত্যের* প্রসঙ্গ আলোচনা অবতারণা করা হয়। যদিও ক্ষেত্র সমীক্ষার অংশ হিসেবে *রাসনৃত্যকে* বিস্তারিত আলোচনায় গ্রহণ করা হয়, তথাপিও বিস্তারিত আলোচনার অংশ হিসেবে এই নৃত্যের পরিবেশনা রীতি, অভিনয় উপাদান ও রীতি, মণ্ডল পরিকল্পনা, পোশাক পরিকল্পনা, তাল, লয়, সুর, ও ছন্দের বিধিবদ্ধ ক্রমানুসার ও রীতি-পদ্ধতির বিস্তারিত এবং প্রথাগত আলোচনাকে গৌণগুরুত্বে বিবেচনা করা হয়। কেননা *মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্য* তথা *রাসনৃত্যের* রীতি-পদ্ধতি, উপাদান, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গে রয়েছে সুনির্দিষ্ট এবং বিশদ মুদ্রিত আলোচনা। এ কারণে পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে বরং মহড়াকালীন প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এমন কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের চেষ্টা করা হয় যা গবেষণার লক্ষ্য এবং

---

১৮০ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৪১

১৮১ শ্রী রূপগোস্বামী, *উজ্জ্বলনীলমণি*, শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত, বহরমপুর, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭

১৮২ গায়েন রাশকান্ত সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/০৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

উদ্দেশ্য পূরণে হতে পারে অধিক কার্যকর এবং সহায়ক। আর এই লক্ষ্যে স্থির থেকেই *রাসনৃত্যের* মহড়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নৃত্যের প্রাথমিক এবং বিশেষ কিছু দেহভঙ্গি ও চলন (ভূমি-অনুবর্তী দেহভঙ্গি, প্রাথমিক পদচলন, চালি প্রভৃতি), বৈষ্ণবীয় ভাব ও ভক্তিরস এবং দেহস্থিত শৌর্য (লাস্য ও তাণ্ডব) এই তিনটি বিষয়ের প্রায়োগিক এবং কৌশলগত নিরীক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই তিনটি বিষয়ের প্রায়োগিক এবং কৌশলগত নিরীক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমে অতঃপর অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতি বা অনুশীলনে সহায়ক দুটি উপাদানকে চিহ্নিত পূর্বক পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপাদান দুটি হচ্ছে– এক. 'অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ' এবং দুই. 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি'। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের কৌশলগত এবং প্রায়োগিক দিকগুলো নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, *রাসনৃত্যের* ঘূর্ণন, স্পাইরাল বা সর্পিল, ফিগার এইট মোশন, প্রভৃতি দেহশৈলী রূপায়ণের মূলে সক্রিয় *অন্তঃপ্রবাহ* হচ্ছে কুশীলবের দেহস্থিত শৌর্যের সচেতন বিন্যাস। অর্থাৎ দেহস্থিত শৌর্য– 'লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবেরই' সচেতনভাবে বিন্যস্ত কতিপয় প্যাটার্ন বা মডেলের *জ্যামিতিক বিমূর্ত* প্রকাশ ঘটে কুশীলবের দেহে। ফলে *অন্তঃপ্রবাহ* হিসেবে শৌর্যের প্যাটার্ন বা মডেল নির্মাণের কৌশলগত এবং প্রায়োগিক বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করা সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ অনুশীলন উপাদান হিসেবে চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে অভিনেতা তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং কল্পনার সমন্বয়ে কেবল রাস নির্দেশিত প্যাটার্নগুলোই নয় বরং অন্য একাধিক দেহ অন্তর্গত মডেলের *জ্যামিতিক বিমূর্ত* শরীর নির্মাণ ও বিনির্মাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেন এবং শৌর্য ভিত্তিক তাঁর অভিজ্ঞতা তথা মনো-দৈহিক ভঙ্গিগত অভিজ্ঞতাকে করতে পারেন সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময়।

অপরদিকে 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন ভঙ্গির' প্রায়োগিক এবং কৌশলগত দিকসমূহ নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে, এটিও একটি প্রত্যক্ষ অনুশীলন সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। 'বক্র হাঁটুতে টো নির্ভর দেহাবস্থান' অভিনেতার শরীরে বহুমুখী ভঙ্গি সম্পাদনে খোলা, উন্মুক্ত, হালকা, নমনীয় এবং অভিমুখীন হওয়ার বোধ বা উপলব্ধি সক্রিয় করে তুলতে পারে। ফলে এই ভঙ্গিটি কেবল *রাসনৃত্য* নির্দেশিত *স্পাইরাল* বা *সর্পিল, ফিগার এইট মোশন, ঘূর্ণন, উল্লম্ফন* প্রভৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে নয় বরং অভিনেতা তাঁর কল্পনাশক্তির ওপর ভর করে একাধিক মনো-দৈহিক ভঙ্গির নির্মাণ, বিনির্মাণ করতে পারেন এবং দেহের সচল-স্থিতি, গতি, ভর ও ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চলন অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারে। সুতরাং মণিপুরী নাট্য নিরীক্ষার অংশ হিসেবে *রাসনৃত্যের* পরিবেশন এবং বিশ্লেষণ শীর্ষক এই আলোচনার মাধ্যমে উল্লিখিত দুটি উপাদানকে নাগরিক আয়তনে অভিনেতার দেহে গতি, ভর, ভারসাম্যের সচল-স্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ দক্ষতায় এবং মনো-দৈহিক প্রস্তুতিতে সম্ভাবনাময় অনুশীলন উপাদান হিসেবে পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২.২.২ মণিপুরী নটপালা

ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন

বাংলাদেশের মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রচলিত রয়েছে আরেকটি সমৃদ্ধ পরিবেশনা– *নটপালা* যা নট সংকীর্তন নামেও পরিচিত। *নটপালা* মণিপুরী সমাজের অপরিহার্য সাংস্কৃতিক-অনুষঙ্গরূপে উঠান থেকে শ্মশান, মণ্ডপ থেকে মণ্ডলী-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্যাচার যেমন– রথযাত্রা, হোলি, রাখাল-রাস, হরি-শয়ন, হরি-উত্থান, কৃষ্ণজন্ম প্রভৃতি ধর্মীয় প্রসঙ্গ এবং সামাজিক প্রসঙ্গ যেমন– বিবাহ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনের করণীয় বা পালনীয় একটি অনুষ্ঠান হিসেবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কেবল কৃত্যমূলক অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রেই নয় এমনকি মানসজাত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা মানত পূরণের লক্ষ্যেও *নটপালার* অংশগ্রহণ মণিপুরী সমাজের জনপ্রিয় একটি প্রথা হিসেবে গণ্য করা হয়–

> সামাজিক ও ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের উদ্‌যাপন ও স্মরণে নটপালা হয়ে থাকে। মানতের অংশ হিসেবেও এই নটপালা করা হয় এবং রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী পরিবেশন করা হয়, এক্ষেত্রে মানতকারী ব্যক্তি, যার বা যাদের জন্য মানত করা হয়, তাঁরাও পূণ্যধামে (মণ্ডলী/আসর) উপস্থিত থেকে পুণ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। উপস্থিতির বিষয়টিকে নিশ্চিত করা হয় রাধা-কৃষ্ণে যুগল মিলন পরবর্তী রাধা-কৃষ্ণের নির্ধারিত স্থানে মানতকারীর অধিষ্ঠানের মাধ্যমে, কৃষ্ণ-দর্শনলাভের প্রতীকী ভাব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সামাজিক ও ধর্মীয় যাবতীয় ঘটনায় কৃষ্ণ-সংকীর্তন– নটপালার ব্যবহার রয়েছে। সবকিছুতে ধর্মীয় ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া আরকি, ধর্মীয়ভাবে বিষয়গুলোকে পালন করা হয়।[১৮৩]

তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সর্বসাধারণের কৃত্যানুষ্ঠান হলেও *নটপালার* প্রদর্শন শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান, গঠন-কাঠামো এবং ক্রম মেনেই সম্পন্ন হয়–

> এটা মন্দির, এটা পুরাটাই আমাদের মণ্ডপ, মাঝখানে চুন বা আটা দিয়ে মণ্ডপ এঁকে নিতে হয়। পালামচা- করতাল বাদক/ দোহার এবং দুইজন মৃদঙ্গ বাদক থাকবে। রাগ-আলাপ হবে। মন্ত্র দিয়ে শুরু হবে। রাগ হচ্ছে 'আত্মা'– তা রি তা না না ইত্যাদি নব অক্ষরে রাগ। রাগ দ্বারা মূর্তি নিরূপণ করবে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ/প্রত্যঙ্গ/উপাঙ্গ সবকিছুই ঐ রাগ-তালের বোলে– মন্ত্রদ্বারা নিরূপণ করা হয়। যখন রাগের শেষ ঠিক তখনই সম্পূর্ণ মানুষটি/মূর্তি তৈরি বা নিরূপণ হয়ে গেল– অর্থাৎ কল্পনায় দেবতা/গৌরাঙ্গ/কৃষ্ণের অবয়ব গঠন করা হয়ে গেল। এটাকে বলে রাগালাপে মূর্তি স্থাপন। এবারে মূর্তিতে প্রাণ দিতে হবে– সঞ্চার/সঞ্চারী হলো প্রাণ– প্রাণ দানের ক্ষেত্রে এই সঞ্চার কেবল মৃদঙ্গের

---

১৮৩ পুং বাদক বিধান সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ০৮/০৭/২০১৫, সময়, বিকাল ৩ ঘটিকা, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, ভানুগাছ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

বোলে বাজানো হয় (পুংচোলম), এখানে কণ্ঠ/গীত গাওয়া হয় না। এটি সম্পূর্ণ একটি প্রতীক-যেখানে প্রভু গৌরাঙ্গকে নিরূপণ/নির্ণয়/নির্মাণের মাধ্যমে পূর্ণ অবয়বকে কল্পনায় সুনির্দিষ্ট করে-বৃন্দাবন ধাম/মর্ত্যে/আসরে অধিষ্ঠান করিয়ে অতঃপর প্রাণ দানের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণরূপ দান করা হয়। এর মাধ্যমে গৌরভাবের প্রথম অবস্থান নিশ্চিত হলো। যেহেতু তিনি মর্ত্যে এসেছেন অর্থাৎ অবতার হয়েছেন তাই এখন অবতার গাইতে হবে (গৌরাঙ্গ বন্দনা)। গৌরাঙ্গের অবতার কেন হলো, কী কারণে অবতার হলো, জগতের তিনটি বাঞ্ছা (ভাব, কান্তি, বিলাস) পূরণ করার জন্য তার মর্ত্যে আগমন। গৌরাঙ্গ তিনি কী ছিলেন– রাধা, কৃষ্ণের মিলিত তনু। আগের জন্মে রাধা-কৃষ্ণ, বর্তমান যুগে এসে তিনি রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু– যুগল অবস্থান। বাইরে রাধা বর্ণ ভিতরে কৃষ্ণ বর্ণ– কৃষ্ণ মানে কালো। বাইরে রাধার রঙ-গৌর বা গৌরাঙ্গ, ভিতরে কৃষ্ণ। এইভাবে আমরা ওনাকে বর্ণনা করি। অবতারের পর ক্রমতাল বা তিন তাল আসবে। এইভাবে ভাবের উদয় হওয়ার মাধ্যমে তার কাহিনী (রাধা-কৃষ্ণের লীলা) আরম্ভ করা হয়।[১৮৪]

যদিও রীতির বিচারে *নটপালা* স্বতন্ত্র ও স্ব-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তথাপিও এর 'ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন' প্রসঙ্গ আলোচনাটি মণিপুরী *রাসলীলার* বিকাশ, বিবর্তন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সূত্রেই নির্ণয় করা যায় (রাসনৃত্য এবং মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক ধর্মীয়, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রসঙ্গ আলোচনা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। কেননা বাংলা অঞ্চলের বৈষ্ণবীয় ভাব, ধর্ম ও দর্শনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে মণিপুরী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানাবিধ উপাদান, অনুষঙ্গ, রীতি-কাঠামোতে ব্যাপক এক পরিবর্তন, গ্রহণ-আত্তীকরণ এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্পাদিত হয় (পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সমন্বয়ের এই প্রক্রিয়াটি ঘটে মূলত *বিষয়*-এর সাথে *শিল্প-আঙ্গিকের*। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের বিষয় আশ্রিত বৈষ্ণবীয় ভাব, ধর্ম, দর্শনের সাথে মণিপুরী উচ্চকোটির/রাজদরবার কেন্দ্রিক নৃত্য, নাট্য তথা পরিবেশনা ঐতিহ্যের নানান রূপ, রীতি ও আঙ্গিকের অভূতপূর্ব এক মেলবন্ধন সূচিত হয়– 'It is the Vaishnava content which has been superimposed on the existing layers of artistic performance'.[১৮৫] মূলত এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সমন্বয়েরই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বিকশিত হয় একাধিক শিল্প-আঙ্গিকের– যেমন, *রাসনৃত্য*, *খুপা-ঈশেই*, *সংকীর্তন*, *নটসংকীর্তন* বা *নটপালা* প্রভৃতি। যদিও নব্য বিকশিত এই সকল শিল্প-আঙ্গিক প্রত্যেকেরই রয়েছে সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তথাপিও মধ্যযুগের অন্তে এসে বৈষ্ণবীয় ভাব-চেতনার সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত এই সকল শিল্প-আঙ্গিক প্রায় এক এবং অভিন্ন ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়। প্রসঙ্গটিকে এভাবে বলা যায়– যে সকল ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আত্তীকরণের

১৮৪ পুং বাদক বিধান সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ০৮/০৭/২০১৫, সময়, বিকাল ৩ ঘটিকা, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, ভানুগাছ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৮৫ Kapila Vatsyayan, *Traditions of Indian Folk Dance,* India Library, New Dilhi, 1976, p. 138

প্রেক্ষাপটে *রাসনৃত্যের* উদ্ভব ও বিকাশ, প্রায় একই প্রেক্ষাপটে সম্পন্ন হয় *নটপালার* উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন। কেননা যে মহারাজার (ভাগ্যচন্দ্র) প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় *রাসনৃত্যের* বিকাশ বলে ঐতিহাসিক সূত্রে স্বীকৃত, সেই একই মহারাজার সময়কালে (১৭৬৪) *নটপালা* বা *নটসংকীর্তন* বা *অনৌবা* পালা সৃষ্টি হয় বলে ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে। আবার ইতিহাসসূত্রেই জানা যায় *রাসনৃত্য* এবং *নটপালা* উভয়ের অন্তর্নিহিত ভাব-দর্শন রূপায়ণ ও আত্তীকরণে *বঙ্গদেশ পালা* বা *অরিবা পালার* গুরুত্ব এবং এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। বাংলাদেশ থেকে আগমনসূত্রে এই *বঙ্গদেশ পালাটিকেই* বলা হয়ে থাকে *নটপালার* মূল বা আদি এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এই পর্বেই অর্থাৎ ভাগ্যচন্দ্রের পূর্ববর্তী মহারাজা গরীব নওয়াজের সময়কালেই *বঙ্গদেশ পালা* মণিপুরে প্রবর্তিত হয়।

অপরদিকে রীতি ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাস উৎসবের রাস-মণ্ডলীতে বিধিবদ্ধ ক্রম অনুসারে *রাসনৃত্য ও নটপালা* একে অপরের পরিপূরকরূপে পরিবেশিত হয়– ‘যেকোনো রাসের পূর্বরঙ্গ হিসাবে সর্বপ্রথম নটপালা আবশ্যক।’[১৮৬] একই অভিনয় আয়তন বা রাস-মণ্ডলীতে *রাসনৃত্য ও নটপালার* ক্রমানুসার পরিবেশনের এই বিষয়টিকে একটি শাস্ত্রীয় শিল্প-আয়তনে অপর আরেকটি শাস্ত্রীয় শিল্পরূপকে আত্তীকরণ বা সমন্বয়ের চেষ্টা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। কেননা অভিনয় অথবা পরিবেশনের প্রকৃতিগত দিক থেকে এদের পার্থক্য সুস্পষ্ট– *রাসনৃত্য* ‘নাটগীত রীতির’ এবং *নটপালা* ‘বর্ণনাত্মকরীতির’ অভিনয়ে পরিবেশিত হয় (এর ব্যাখ্যা পরবর্তীতে করা হয়েছে)। *রাসনৃত্য* বয়োসন্ধিকাল-পূর্ব কিশোর ও কিশোরী কুশীলবের পরিবেশনা কিন্তু *নটপালা* পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ কুশীলবের পরিবেশনা। *রাসনৃত্যে* নৃত্য-কুশীলবগণ বাচিক নির্ভর সাত্ত্বিক অভিনয়ে যুক্ত হয় না কিন্তু রাধা, কৃষ্ণ এবং গোপী চরিত্রদের আঙ্গিকাভিনয় (নৃত্যাত্মক ভঙ্গি, চলন ও সঞ্চলন) এবং আহার্যাভিনয়ের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করে রূপায়ণ করেন। বিপরীতক্রমে *নটপালায়* বাচিকাভিনয় ও সাত্ত্বিকাভিনয় মুখ্য, গায়েন কর্তৃক চরিত্র রূপায়ণে (রাধা, কৃষ্ণ এবং গোপী) শাস্ত্র-নির্দেশিত মুদ্রা নির্ভর আঙ্গিকাভিনয় এক্ষেত্রে অনপুস্থিত বরং চরিত্রের ভাব-দেহের (পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) প্রকাশ হয়ে ওঠে মুখ্য। তথাপিও রাস-মণ্ডলীতে *নটপালা* ও *রাসনৃত্যের* পর্যাক্রমিক পরিবেশনায় দুটি মৌল সাদৃশ্য– বিষয় (কৃষ্ণ) এবং ভাব (কৃষ্ণভক্তি) পরস্পরকে সংযুক্ত রাখে। রাস-মণ্ডলীতে রাগ-আলাপ, পুংচোলম, করতাল-চোলম, গৌরাঙ্গ বন্দনা, গুরু বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা প্রভৃতি কৃত্যানুষ্ঠান পূর্বরঙ্গে পরিবেশনের মাধ্যমে বস্তুত কৃষ্ণের ভাব-দেহের প্রতীকী রূপায়ণ এবং কৃষ্ণের আসর অধিষ্ঠান সম্পন্ন করা তথা কৃষ্ণ-ভাবায়তনকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-ভাবায়তনে, ভক্তির আবেশে পূর্ণ রাস-মণ্ডলীতে প্রদর্শিত হয় রাসলীলা বা রাসনৃত্য। সুতরাং *রাসের* ‘পূর্বরঙ্গ’ হিসেবে *নটপালার* এইরূপ সম্পৃক্ততাকে প্রকারান্তরে এক মহা সাংস্কৃতিক-সমন্বয় হিসেবেও ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ সমন্বয়ের এই

---

১৮৬ দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন*, মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯

প্রক্রিয়াকে বাংলার বৈষ্ণবীয় ভাব-দর্শন আশ্রিত *বঙ্গদেশ পালা*র শিল্পরূপ, রীতি ও বৈশিষ্ট্যের সাথে মণিপুরের প্রচলিত পরিবেশনা শিল্পকলার নানা রূপ-রীতি-আঙ্গিকের মধ্যে সম্পাদিত মেলবন্ধনের প্রায়োগিক প্রতিফলন রূপেও গণ্য করা যায়–

> [সে সময়] বঙ্গদেশের কয়েকজন কীর্তনীয়া মণিপুরে এসেছিলেন। মন্দির পেয়ে তাঁরা মহা খুশী। সন্ধ্যা আরতির সময় মন্দিরে এসে তাঁরা কীর্তন করতেন। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য রাজা উপহার দিলেন একটি পুং অর্থাৎ মৃদঙ্গ। এই পুং তৈরি হয়েছিল রাজ দরবারের ব্যবহৃত খুনবুং বাদ্যযন্ত্র ও বাংলার মাটির খোলের সংমিশ্রণে– একটি অভিনব আবিষ্কার। কীর্তন জমে উঠলো পুং-এর সহযোগিতায়। সঙ্গে লোহার তৈরি ঘণ্টা তো ছিলই। বিষ্ণুর উপাসনার জন্য এভাবে একটি নতুন কীর্তন ধারার সূত্রপাত হলো।[১৮৭]

উক্তিটিতে স্পষ্ট হয় যে, মণিপুরী *নটপালার* প্রবর্তন প্রায় একই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিনিময় ও সমন্বয়সূত্রে সম্পাদিত হয়। বাংলার প্রচলিত কীর্তনাঙ্গিকের সাথে মণিপুরের স্থানীয় শিল্পরূপ ও রীতির অপূর্ব সমন্বয় এবং মেলবন্ধনে সৃষ্ট *নটপালা* তেমনই এক সমন্বয়ের শিল্পরূপ।

---

১৮৭ দেবযানী চলিহা, *মনিপুরী নৃত্যে দু'টি ধারা*, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *আদিবসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৯

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

নটপালার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গুরুগৃহ কেন্দ্রিক এবং পরম্পরাগতভাবেই এর পারফরম্যান্স-জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এর প্রশিক্ষণ প্রণালী দীর্ঘমেয়াদি এবং পরিবেশনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়াটি বহুমাত্রিক– অর্থাৎ এটি যেমন একদিকে ব্যক্তি ও সামাজের নানাবিধ কৃত্য এবং মানসা-পূরণের পালনীয় অনুষ্ঠান-অনুষঙ্গরূপে আমন্ত্রিত হয়, অপরদিকে মণিপুরীদের সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসব তথা রাস উৎসবেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিবেশিত হয়। *নটপালার* দুটি গুরুত্বপর্ণ নর্ত্তন আঙ্গিক– এক. পুংচোলম (মৃদঙ্গ বাদন)– মৃদঙ্গের বাদ্য সহকারে বিশেষ দেহভঙ্গিমায় চলন, সঞ্চলন এবং ঘূর্ণন প্রদর্শন এবং দুই. করতাল-চোলম (করতাল বাদন)– করতালের বাদ্য সহকারে বিশেষ দেহভঙ্গিমায় চলন, সঞ্চলন এবং ঘূর্ণন প্রদর্শন করা। এই দুটি নর্ত্তন ও বাদনের বিধি-বিধানসহ রাগ, তাল, গীত, কাব্য, বৈষ্ণব ভাব-রস, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ-জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি গুরুগৃহে দীর্ঘ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের সূত্রেই কেবল আয়ত্ত করা সম্ভব। এ জন্য কৈশোর থেকে যুক্ত হওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ বছরের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে হয়–

> (নটপালা) গুরুগৃহে গিয়ে শিখতে হয়। গুরুগৃহে তার অবস্থান ঘরের ছেলের মতো। গৃহের যা কাজ সব কাজ করবে– যেমন ধান কাটা থেকে মাটিকাটা, রান্না থেকে গৃহস্থালি কাজ সব এবং বিনিময়ে গুরু তাকে সকল প্রকার সুর, তাল বা গীত-বাদ্য শিখিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সাধারণত একজন শিষ্যকে আট থেকে দশ বছর গুরুগৃহে থেকে এই বিদ্যা অর্জন করতে হয়। এই শিক্ষার মূল ভক্তি/প্রেম। প্রেম/ভক্তির মাধ্যমে শেখা ও শেখানোর প্রক্রিয়াটি চলমান থাকে। বর্তমানে এই ধারা অনেকাংশেই কমে গেছে। বর্তমানে একাডেমী বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরম্পরা বজায় রাখা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিষ্য আর গুরুর বাড়িতে যায় না, বরং গুরুই যাচ্ছে শিষ্যের বাড়িতে।[১৮৮]

গুরুগৃহে দীর্ঘকালীন অবস্থানপূর্বক শিক্ষাগ্রহণ অথবা গুরুর শিষ্য গৃহে গমনপূর্বক শিক্ষাদান উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক লেনদেনের বিষয়টি কখনোই প্রাধান্য পায় না। গুরু তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, ভক্তি প্রেম ও ভাবগত বিষয়-আসয় সব কিছু বিনিময় করেন বিনা অর্থে, পরম্পরা রক্ষার্থে আর এটা তিনি করেন পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য থেকে। পূর্বে একজন গুরুর অধীনে কমপক্ষে দশ/পনেরজন শিষ্য শিক্ষাগ্রহণ করতো কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যা দু-একজন তাও আবার কদাচিৎ হয়ে থাকে। বর্তমানে কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের শাস্ত্রীয় শিক্ষার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাডেমি (মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মাধবপুর, ভানুগাছ, শ্রীমঙ্গল) কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং একাডেমির মাধ্যমেই অধিকাংশ ছাত্র/শিষ্য/ভক্ত তালিম

১৮৮ পুং বাদক বিধান সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ০৮/০৭/২০১৫, সময়, বিকাল ৩ ঘটিকা, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, ভানুগাছ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

গ্রহণ করে থাকেন। তবে মাঠ পর্যবেক্ষণসূত্রে জানা যায় যে, একাডেমির পাশাপাশি নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন গুরুদেও কেউ কেউ তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই সুদীর্ঘ ও শাস্ত্রীয় পরম্পরার অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে শিষ্যের গৃহ-গমন পূর্বক *নটপালার* শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছেন।

বলা যায় দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পরূপ বা আঙ্গিকের সংশ্লেষণে পরিবেশিত হয় মণিপুরী *নটপালা*– যথা, এক. নির্দিষ্ট ভঙ্গি, চলন ও সঞ্চলনযুক্ত এবং রাগ, তাল, সুর ও ছন্দ আশ্রিত দুটি শাস্ত্রীয় চোলোম বা নর্ত্তন– পুংচোলম ও করতাল-চোলম (পুর্বে আলোচিত হয়েছে) এবং দুই. গায়েন নির্ভর বর্ণনাত্মক অভিনয়-রীতিতে আখ্যান বা পালা প্রদর্শন।

পুংচোলম ও করতাল-চোলম

পুংচোলম হচ্ছে মৃদঙ্গের বাদ্যের তালে তালে পুং-বাদকগণের প্রদর্শিত বিশেষ নর্ত্তন এবং করতাল বাদকগণের বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে প্রদর্শিত করতাল বাদন হচ্ছে করতাল-চোলম। বিশেষ এই দুটি চোলোম বা নর্ত্তনে প্রদর্শিত দেহভঙ্গি, চলন ও সঞ্চলন-শৈলী সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ এবং এর সাথে যুক্ত মৃদঙ্গ ও করতালের রাগ, তাল, লয় ও ছন্দের বাদ্য-বাদনও শাস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট। শিক্ষার্থী/শিষ্যগণ এই দুটি নর্ত্তনেরই প্রয়োগিক দক্ষতা অর্জন করে থাকেন গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দীর্ঘ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, পুংচোলম এবং করতাল-চোলম বা নর্ত্তনে গায়েন ও দোহারের (ইশালপা/আখ্যান বর্ণনাকারী, সহযোগী গায়েন) অংশগ্রহণ করেন না এবং একই ভাবে পূর্বরঙ্গ (ব্রাহ্মণপর্ব, ঘটস্থাপন, রাগালাপ, তিনতাল, পরিক্রমন, গৌড়াঙ্গ বন্দনা, গুরু বন্দনা প্রভৃতি) এবং আখ্যানের নির্ধারিত অংশ ব্যতীত পুংচোলম এবং করতাল-চোলম প্রদর্শিত হয় না। তবে গায়েন পরিবেশিত গীত ও কাব্যাভিনয়ে ভাব ও রসের পরমানন্দীয় আবেশকে ঘনীভূত করতে মৃদঙ্গ এবং করতাল বাদ্য অব্যাহতভাবে চলমান থাকে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুংচোলম এবং করতাল-চোলম নির্ধারিত কিছু ভঙ্গি ও সঞ্চলন দ্বারা বিন্যস্ত। এক্ষেত্রে উভয় নর্ত্তনে কুশীলবগণের দেহের মৌল অবস্থান বা দাঁড়ানোর ভঙ্গি একই রকম পরিলক্ষিত হয়। এই ভঙ্গিতে পায়ের গোড়ালি প্রায় এক বিঘৎ ফাঁকা রেখে ইংরেজি 'ভি' আকৃতিতে হাঁটু খানিকটা বেন্ট বা বক্র রেখে মেরুদণ্ড থাকে সোজা তবে খানিকটা সম্মুখাবর্তী ঝোঁক অবস্থায় রাখা হয়। চোলোমের শুরুতে মৃদঙ্গ এবং করতালের সম্মিলিত বাদ্যের তালে কুশীলবগণের প্রাথমিক দেহ-ছন্দ মৃদু দোলাময় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ডান পায়ে ভর পরিবর্তন করে ডান দিকে এবং বাম পায়ে ওপর ভর দিয়ে বামদিকে এভাবে গোটা শরীরকে ডান থেকে বাম আবর্তনে দোলানো বা দোলাময় করে রাখা। অতঃপর রাগ, তাল, লয় অনুসারে দেহ-সঞ্চলনে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ভঙ্গি ও চলন প্রযুক্ত হতে থাকে। এক্ষেত্রে পুং এবং করতাল বাদকগণের দেহভঙ্গিতে চার ধরনের বিন্যাস ও সঞ্চলন পরিলক্ষিত হয়– এক. বক্র হাঁটুতে যথাক্রমে ডান পায়ের কৌণিক পদক্ষেপে যন্ত্র বাদন। দুই. ডান পায়ের সম্মুখ পদক্ষেপে আগমন এবং পশ্চাৎ-পদক্ষেপে পূর্বের অবস্থানে গমন

গতিতে যন্ত্র বাদন, তিন. পর্যায়ক্রমে দুই পায়ের ওপর ভর ও ভারসাম্য বজায় রেখে ঘড়ির কাঁটার অনুবর্তী এবং উল্টো দিকে ঘূর্ণন গতিতে যন্ত্র বাদন, এবং চার. এক পায়ের বক্র হাঁটুতে অবস্থান করে অপর পা'কে ভূমি থেকে উপরে নব্বই ডিগ্রি কোণে বক্র অবস্থায় দেহের সচল-স্থিতি বজায় রেখে সঞ্চালন গতিতে মৃদঙ্গ বাদ্য প্রদর্শন করা। তবে করতাল-চোলমের গতি সঞ্চলনে আরও একটি অতিরিক্ত ভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়– ক. এক পায়ের ওপর ভর ও ভারসাম্য স্থীর রেখে অপর পা'কে নব্বই ডিগ্রি কোণে বক্র অবস্থায় শূন্যে রেখে ঘূর্ণন গতিতে করতাল বাদন প্রদর্শন করা।

মণিপুরী নর্ত্তন গ্রন্থে পুংচোলম এবং করতাল-চোলমে কুশীলবের দাঁড়ানোর ভঙ্গিকে 'স্থানক' বা 'ফিরেক' নামে অভিহিত করে পুংচলোমের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ভঙ্গির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– এক. থোংখোং আওয়াঙবা– পায়ে গোড়ালির মধ্যে এক বিঘৎ ফাঁক রেখে এবং দক্ষিণ অর্থাৎ ডান-পা'কে ত্র্যস্র অবস্থায় কিছুটা নামিয়ে রাখতে হবে। দুই. থোংখোং ময়ায়– দুটি পায়ের মধ্যে বেশি ফাঁক রেখে দুই জানুর উপর দুই হাতের মণিবন্ধ যাতে রাখা যায়, ততটা নিচু হওয়া। এবং তিন. থোংখোং অনেম্বা– দুই পায়ের মধ্যে ওই ধরনের ফাঁক রেখে কনুই জানুতে লাগার মতো নিচু হওয়া।

পুংচোলম এবং করতাল-চোলমের ভঙ্গি যেমন নির্ধারিত তেমনি বাদ্যের তাল এবং রাগসমূহও নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, নটরাগ– বোল বিশিষ্ট প্রবন্ধ; সঞ্চার– বোল বিশিষ্ট প্রবন্ধ যার দ্বারা মণ্ডলীতে কৃষ্ণ মূর্তির প্রতীকী প্রাণ দান করা হয়; তিনতাল– আট বর্ণকাল অথবা সাত বর্ণকাল– তিন তালি বা তাল হচ্ছে তিনটি বাঞ্ছা (ভাব, কান্তি, বিলাশ) পূরণার্থে পরিবেশিত যে গীত তাকে তিন তাল বলে; রাজমেল– সাত/চৌদ্দ বর্ণকাল প্রভৃতি তাল এবং রাগ ব্যবহৃত হয়।

পালা প্রদর্শন

নটপালার ক্রম অনুসারে আখ্যান-পূর্ব অংশ বা পূর্বরঙ্গের পর মূল আখ্যান বা রাধা-কৃষ্ণের আখ্যান পর্ব পরিবেশিত হয়। *নটপালার* আখ্যানে অনান্য অনেক কবির রচনা থাকলেও নরোত্তম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত পদাবলীই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। 'বস্তুতপক্ষে মণিপুরী নট সঙ্কীর্তন বাংলার ঠাকুর নরোত্তম দাসের লীলা কীর্তনের ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।'[১৮৯] *নটপালা* অষ্টকাল/প্রহরে (এক প্রহর= তিন ঘণ্টা এই হিসেবে ২৪ ঘণ্টা) পরিবেশিত হয় এবং এই সময়ে সাধারণত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ, অভিমান ও মিলন প্রভৃতি লীলা বা পর্ব গীত হয়ে থাকে। *নটপালা* বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় সূচনান্তে। আবার শ্রাদ্ধ বা সামাজিক কীর্তনানুষ্ঠানে এক দিনে বেলা চার প্রহর বা কালে (প্রাতঃকাল, পূর্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং অপরাহ্নকাল) গাওয়া হয়ে থাকে। পরবর্তী চারকাল/প্রহর রাত্রিকালীন যাকে মূলত রাধা-কৃষ্ণের রাস বলা হয়। রাধা-কৃষ্ণ একই আত্মা, রাধা-কৃষ্ণের যুগল আরতি-

১৮৯ দেবযানী চলিহা, *মনিপুরী নৃত্যে দু'টি ধারা*, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *আদিবসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪১

যুগল-মিলন আরতি উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। আরতি করেন গোপী/সখীগণ। অতঃপর পুনরায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাহিনী বর্ণনা এবং ষড়্‌গোঁসাই– চৈতন্য মহাপ্রভুর ছয় শিষ্যের ধর্মবাণী ও ফলশ্রুতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে অষ্টকালীন পালা শেষ হয়। তবে এ সময়ে যদি কারো মানত থাকে তবে ব্রাহ্মণের মাধ্যমে যাঁর মানত তাঁকে কেন্দ্র করে নির্মিত বৃন্দাবনধামকে আশ্রয় করে অর্থাৎ ধামে অধিষ্ঠান করিয়ে মানত পূরণের কৃত্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে এবং বৃন্দাবনধাম, নবদ্বীপধাম কি জয় ধ্বনি দিয়ে শেষ হয় পূর্ণাঙ্গ *নটপালা*।

নটপালায় আট থেকে বারজন কুশীলব অংশগ্রহণ করে থাকেন, তবে ঘোড়ামাড়া, কমলগঞ্জের মাঠ পর্যবেক্ষণকৃত এই পালায় অংশগ্রহণ করেন আটজন কুশীলব। এদের মধ্যে একজন মূল গায়েন (ইশালপা), সহযোগী গায়েন (দোহার), দু'জন মৃদঙ্গবাদক (ডাখুলা) এবং অপর চারজন করতাল বাদক (পালা) অংশগ্রহণ করেন।

রীতি ও বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে *নটপালায়* বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রাধান্য সুস্পষ্ট এবং বাংলার কীর্তন আঙ্গিকের গায়েন নির্ভর যন্ত্রী ও দোহার অংশগ্রহণে *বর্ণনাত্মক অভিনয়-রীতির* প্রভূত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় (পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। মণিপুরীগণ অবশ্য একে নট-সংকীর্তন নামেও অভিহিত করে থাকে। তবে পালা প্রদর্শনে পুংচোলম এবং করতাল-চোলমের শাস্ত্রীয় বিধি ও ক্রম অনুসৃত রাগ-আলাপ, তাল এবং নর্ত্তন-শৈলী যুক্ত হওয়ায় মণিপুরী *নটপালা* বিশিষ্ট একটি শিল্পরূপের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, পুংচোলম এবং কর-তাল-চোলমে যন্ত্রীদের দেহের বিন্যাসে ও বাদ্য-বাদনে শাস্ত্রীয় রাগ, তাল, ভঙ্গি, চলন ও সঞ্চলন অনুসরণ করা হলেও পালা প্রদর্শনে আখ্যানের প্রধান দুটি চরিত্রের (রাধা ও কৃষ্ণ) ভঙ্গিগত রূপায়ণ/নির্মাণ বা প্রদর্শনে গায়েনের দেহের ভাষা ও বিন্যাসে বিধিবদ্ধ কোনো ভঙ্গি নির্মাণ পরিলক্ষিত হয় না। দেহের ছন্দে দৃশ্যমান যা কিছু নৃত্যময় তা কেবলই সুর ও তালের ছন্দ বজায় রেখে চলন বা সঞ্চলন মাত্র। যদিও রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক ও প্রচলিত ইমেজ (চিত্রিত ভঙ্গি)– 'বংশী হাতে কৃষ্ণ', 'রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি', 'বালক কৃষ্ণ' প্রভৃতি কতিপয় ইমেজ দেহের ভাষায় মূর্ত হয় কখনো কখনো, তথাপিও পালা পরিবেশনে গায়েন কর্তৃক রাধা ও কৃষ্ণকে নির্মাণ/প্রদর্শন বা রূপায়ণের মৌল-প্রবণতা দেহের ভাষা, ভঙ্গিগত শৈলীর প্রকাশে নয়, ভাবগত প্রকাশে বা ভাব দ্বারা মূর্ত করা হয়। অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের ভাব প্রদর্শন বা ভাবের রূপায়ণই কোমল শৌর্য ও ছন্দের দোলায় দেহের ভাষা ও বিন্যাসে মূর্ত হয়ে ওঠে। ফলে সার্বিকভাবে গায়েনের দেহরূপ বা ভঙ্গির প্রকাশ হয় অভিব্যক্তিমূলক যা ভগবান কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত এবং ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। উদ্দেশ্যগত দিক থেকেও *নটপালা* ভক্ত/বিশ্বাসী/দর্শক মাঝে ভাবের সঞ্চার করে, পবিত্র ও পরমানন্দীয় ভাব-আবেশ দ্বারা করে উদ্দীপ্ত। অধিকন্তু পুংচোলম ও করতাল-চোলমের শৌর্যরূপ তাণ্ডবময় হলেও গায়েনের ক্ষেত্রে তা লাস্যময়। পরিণামে *নটপালার* আসরে গায়েনের শারীরিক উপস্থিতির সার্বক্ষণিক ভঙ্গিটি রূপান্তরিত হয় কোমল ছন্দের দোলায়

ভাব-ভক্তিতে পূর্ণ এক প্রাণবন্ত ছন্দময় শরীরে– 'এইটাই হলো ভাব, এটাই হলো গুরুর নিকট হতে আশ্রয় পাইছে তো, সেই আশ্রয়ে ভাবের দ্বারা সাধন দ্বারা এখানে (আসরে) উপস্থিত। সবকিছু ভাবে বন্দী, ভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ভাবটা এদের (কুশীলব) শরীরে, সুরে, ছন্দে আসে এবং আমাদের (দর্শক/ভক্ত) শরীরে সঞ্চারিত হয়।[১৯০]

নটপালার আসরে আখ্যান পরিবেশনায় ভাবের এইরূপ সর্বব্যাপী এবং সর্বাত্মক প্রকাশের ব্যাপারটিও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটি বিষয়, যা পরম্পরাগতভাবে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের শরীরে 'পারফরম্যান্স জ্ঞান' রূপে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণ স্বয়ং একটি 'ভাব', যা 'কৃষ্ণ-ভাব' রূপে চর্চিত এবং প্রদর্শিত হয়। কেননা ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে যে, বৈষ্ণব দর্শনে রসোরাজ শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি, যার নিষ্পত্তি হয় ভক্তিরসে। ফলে রাধা বা কৃষ্ণকে দেহের ভাষায় মূর্ত করার ব্যাপারটি বিধিবদ্ধ ও নির্দিষ্ট কিছু দেহের চলন বা ভঙ্গি নির্ভর না হয়ে ভাব নির্ভর হয়ে ওঠে অর্থাৎ ভাবের মাধ্যমেই রাধা ও কৃষ্ণ দেহের ভাষায় মূর্ত হয়। রাধা বা কৃষ্ণকে গায়েনের ভাব-দেহে মূর্ত করার ব্যাপারটি *নটপালাতে* সুনির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা হয়। কৃত্যমূলক এই প্রক্রিয়ায় পূর্বরঙ্গের *গৌরচন্দ্রিকা* অংশে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের আশ্রয়ে কৃষ্ণের প্রতীকী মূর্তি/ আকৃতি/ অবয়ব বিনির্মিত হয়–

> রাগ হচ্ছে– আত্মা। গৌরচন্দ্রিকার শুরুতে একটি রাগ গাওয়া হয় বা রাগ দিয়ে শুরু করতে হয়। এই রাগটি নব অক্ষরের– তা, রে, তা, না, রে, তা, না, তা, না ॥– এই রাগ মানে মূর্তি স্থাপন। রাগের মাধ্যমে মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রতিটি অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন মানে থাকে/অর্থ থাকে, যে অর্থের মাধ্যমে মূর্তিটি নিরূপিত হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার হাত পা মাথা শরীরের সকল অঙ্গ সৃজিত হলো বা আকৃতি দেওয়া হলো। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ/প্রত্যঙ্গ/উপাঙ্গ সবকিছুই ঐ রাগ-তালে বোলে– মন্ত্রদ্বারা নিরূপণ করা হয়। যখন রাগের শেষ ঠিক তখনই সম্পূর্ণ মূর্তি তৈরি বা নিরূপণ হয়ে গেল– অর্থাৎ কল্পনায় দেবতা/গৌরাঙ্গ/কৃষ্ণের অবয়ব গঠন করা হয়ে গেল। এটাকে বলে রাগালাপে মূর্তি স্থাপন।[১৯১]

রাগ-আলাপে মূর্তি স্থাপনের বিষয়টি প্রতীকী তবে এর মৌল ভিত্তি ভাব অথবা এটি ভাব দ্বারা সঞ্চালিত একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াসূত্রেই দেবতা ব্রহ্মা– বিষ্ণু– কৃষ্ণ– গৌরাঙ্গের বিমূর্তরূপ মর্ত্যে মানবের ভাব-দেহে মূর্ত হয় বা প্রতীকায়িত হয়। প্রক্রিয়াটিকে একদিকে যেমন প্রকৃতি ও পরমের প্রতীকী মিলন রূপে ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভক্ত/বিশ্বাসীগণ দৃশ্যমান ও জাগতিক বাস্তবতার বাইরের পরম ও পবিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে থাকেন। অপরদিকে *কৃষ্ণের অবয়ব* গঠনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে কৃষ্ণের কল্পিত ভাব-আকৃতি বা ভাব-দেহকেই গায়েন তাঁর দেহের ভাষায় কোমল ছন্দে ভক্তি-ভাবে মূর্ত করে তোলেন। তবে এই

১৯০ রাসধারী গোপীমোহন সিংহ (৭৫)-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৯১ গায়েন রাশকান্ত সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/০৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

প্রক্রিয়ায় রাধা-কৃষ্ণের অবয়ব নির্মাণের বিষয়টি কৌশলগত অথবা বাহ্যিক আচরণে গায়েনের শারীরিক ভঙ্গি ও চলন নির্ভর হয়ে ওঠে না। এমনকি গায়েনের বাহ্যিক আচরণে, কণ্ঠের ধ্বনিগত অলংকরণে অথবা শৌর্যের (লাস্য ও তাণ্ডব) প্রকাশেও রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রদ্বয় পৃথক ও ভিন্ন মডেলরূপে বিনির্মিত/প্রদর্শিত হয় না। বরং রাগ, তাল এবং গীত-ছন্দের দোলায় গায়েনের তাঁর শরীরে রাধা-কৃষ্ণের ভাব-দেহকে মূর্ত করে তোলেন অথবা বলা যায় ভাবের রূপায়ণ করেন। ফলে সামগ্রিকভাবে মূর্তি নির্মাণের এই প্রক্রিয়াটি গায়েনের শরীরে দৈনন্দিন-অতিরিক্ত এমন এক ভাবোদ্দীপক ব্যক্তিত্ব আরোপ করে অথবা গায়েন নিজের ওপর আরোপ করতে সক্ষম হন, যেটি অচিরেই দর্শক/ভক্তদের মাঝে মহা-পবিত্রতম ও পূজনীয় ব্যক্তিত্বরূপে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আর 'তখন ভক্তদের মধ্যে এক ধরনের ভাব জন্ম নেয় গৌরাঙ্গেরই প্রতি... ভক্তরা তখন কান্নাকাটি করে... গায়েনদেরকে প্রণাম করে... সে সময় গায়েনরা হয়ে ওঠে গৌরাঙ্গ অবতার... তা না হলে ভক্তেরা গায়েনদের প্রণাম করবেন কেন?'[১৯২] তাছাড়া মূর্তি নির্মাণের এই প্রক্রিয়া বিষয়ে *নটপালার* গায়েনদের উপলব্ধিও এমন যে– 'বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ-করতালের মাধ্যমে সম্পূর্ণত গৌর গুরুমূর্তি তৈরি করা হয় দেহের (মনের) ভিতরে। এই মূর্তি আমাদের মধ্যে থেকেই এই সংকীর্তন করে।'[১৯৩] লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে *নটপালায়* একদিকে যেমন রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন আত্মা রূপে বিবেচিত হয়, অপরদিকে রাধা-কৃষ্ণের ভাব-চরিত্র গ্রহণ করে গায়েন স্বয়ং এক পরম ব্যক্তিত্বরূপে ভক্ত/দর্শক অভিমুখে হাজির হন অথবা ভক্তগণ তাঁকে পরম ব্যক্তিত্বরূপে মান্য করেন। *নটপালার* শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনে ভাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতটা গভীর তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। মাঠ পর্যবেক্ষণ-কালে ধারণকৃত *নটপালা* প্রসঙ্গের সাক্ষাৎকার থেকে রাসধারী গোপীমোহন সিংহের আলাপচারিতার চুম্বক অংশ উদ্ধৃত করা হলো–

প্রশ্ন : ভাব কী?

উত্তর : ভাব বলতে রাধা আয়নঘোষের স্ত্রী হয়ে আয়নঘোষের ঘরে থেকেও কেবলই এই আকাঙ্ক্ষা যে আমি কৃষ্ণকে কবে পাবো। কৃষ্ণ লাভে রাধার এই যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এটিই ভাব। অর্থাৎ কৃষ্ণ দর্শন লাভের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এটাই হলো ভাব বা কৃষ্ণ-ভাব।

প্রশ্ন : রাধার উৎপত্তি কোথায়?

উত্তর : রাধার উৎপত্তি কৃষ্ণের স্থায়ী ভাব হইতে। রাধা-কৃষ্ণ একাত্মা, শুধু লীলার কারণে, আমাদের শিক্ষা দেওয়ার কারণে ওদের ভিন্ন রূপ।

প্রশ্ন : কোন ভাবটা প্রাধান্য পায়, রাধা-ভাব নাকি কৃষ্ণ-ভাব?

উত্তর : ভাব তো আমার একটাই, রাধা-কৃষ্ণ আমার কাছে তো ভিন্ন না, ও তো এক আত্মা।

প্রশ্ন : কী উপায়ে এত ভাবে মগ্ন হতে পারেন?

---

১৯২ সাইমন জাকারিয়া, মৎ প্রণীত, চল মন বৃন্দাবন নাচিয়া নাচিয়া, প্রণমহি বঙ্গমাতা, *শুক্রবারের সাময়িকী*, *প্রথম আলো*, কাওরান বাজার, ঢাকা, ১২ এপ্রিল, ২০০২, পৃ. ১৪

১৯৩ প্রাগুক্ত

উত্তর : ট্রায়েল দিতে হবে অর্থাৎ গুরুগৃহে শিক্ষা করতে হবে। সাধন করতে হবে, যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেনো, সেই সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে সাধন করতে হবে। গুরুর নিকট হইতে গূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করে অতঃপর নিজে নিজে ট্রায়েল না দিলে, অথবা নিজেকে সর্বদাই সাধনে রত থাকতে হবে।

প্রশ্ন : আসরের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আপনি অতি সাধারণ শান্ত একটি মানুষ কিন্তু আসরে দাঁড়ালে বিশেষ এক শক্তি আপনার দেহকে উদ্দীপ্ত করে, কেন?

এইটাই হলো ভাব, আমাদের যেটা সাধন বা ভজন, সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করতে হলে, যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, বিভিন্ন পন্থা আছে, আমাদের বৈষ্ণবীয় মতে- এই যে আমাদের অষ্টকাল, এখানে আমরা যেটা বর্ণনা করেছি (পর্যবেক্ষণকৃত নটপালা) এটা চার কাল। এই অষ্টকালটাই আমাদের মূল সাধনের পথ। এবং সেখানে আমাদের মূল ভাবটা- ঐ যে বললাম না নিষ্কাম প্রেম, এটিই আমাদের মূল ধারা, কেউ যদি এটাকে স্বকাম মনোভাব দ্বারা একটু মনে আনে তাহলেও তার নরকবাস। ঐ ভাবে যদি কেউ যেতে পারে, তাহলে তার অন্তর বিগলিত হবে, তখন সে মূল সাধন অঙ্গে প্রবেশ করতে পারবে। এটাই আমাদের গুরু শিক্ষা– যে এই পথ অনুসরণ করে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব।[১৯৪]

উপরোক্ত সকল আলোচনা এবং উদ্ধৃত সাক্ষাৎকার দৃষ্টে স্পষ্টতই বলা যায় যে, 'ভাব' হচ্ছে *নটপালার* সেই প্রাণশক্তি যা আসর থেকে আসরে ভক্ত মাঝে ছড়িয়ে দেয় কৃষ্ণ-ভক্তির রসধারা। তবে কুশীলবগণ যে কেবলই কৃষ্ণ-ভক্তির রসধারায় অবগাহন করে অনিয়ন্ত্রিত ভাব-স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন বিষয়টি তাও নয়, বরং শাস্ত্রীয় রাগ, তাল, সুর, ছন্দ এবং দেহের শৈলীবদ্ধ চলন, সঞ্চলন ও ভঙ্গির বন্ধনে ঐ ভাব-স্রোতকে করেন নিয়ন্ত্রিত, নিবেদিত সর্বোপরি শিল্পিত। আর তাই *নটপালার* শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শন ব্যাপারটিকে দুই ধরনের পরিবেশন-প্রক্রিয়ার সন্ধিবদ্ধ ও সমন্বিত শিল্পরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। যার একদিকে রয়েছে শাস্ত্রীয় নর্ত্তন-শৈলী– যন্ত্রীদের (পুং বাদক ও করতাল বাদক) বিধিবদ্ধ চলন, সঞ্চলন এবং রাগ, তাল, সুর ও ছন্দের প্রদর্শন, অপরদিকে রয়েছে গীত ও কাব্য আশ্রিত কৃষ্ণ-আখ্যানের গায়েন নির্ভর বর্ণনাত্মক অভিনয়ে ভাব ও ভক্তির প্রদর্শন। তবে *নটপালার* বিশেষত্ব এখানে যে ভাব ও ভক্তির প্রদর্শন প্রক্রিয়াটি একটি কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতায় (রাগালাপে মূর্তি স্থাপন) গায়েনের ভাব-দেহে রূপান্তরিত হয়। কারণ হিসেবে ধর্মীয় দর্শনগত দিকটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে– এখানে ভাব ও কৃষ্ণ সমার্থক রূপে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ এখানে কৃষ্ণ স্বয়ং ভাব– স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি। আর তাই পূর্বরঙ্গের গৌরচন্দ্রিকায় কৃষ্ণের অবতার গৌরাঙ্গের কল্পিত মূর্তি নির্মাণ/স্থাপনের কৃত্যটি প্রকারান্তরে গায়েনের কল্পনায় সৃষ্ট দেবতাকে বা দেবতার ভাব-দেহকেই মূর্ত করার একটি শাস্ত্রীয় বা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রদর্শিত হয়। তবে কল্পিত ভাব-দেহ মূর্ত করণের এই প্রক্রিয়াটিকে গায়েন কৌশলগত উপায়ে কোনো মডেল বা কতিপয় ভঙ্গি, চলন, সঞ্চলন দ্বারা প্রকাশ করেন না,

১৯৪ রাসধারী গোপীমোহন সিংহ (৭৫)-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

বরং অন্তঃস্থকরণের মাধ্যমে সুর, তাল ও ছন্দের দোলায় ভাব ও ভক্তিমূলক অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলেন। ফলে *নটপালায়* গায়েনের আখ্যান পরিবেশনায় রাধা ও কৃষ্ণকে বিশেষ এবং পার্থক্য-নির্দেশক কোনো দেহরূপে, ভঙ্গি বা আচরণে মূর্ত হতে দেখা যায় না। কেননা এঁদের মতে রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন, এক দেহ এক 'আত্মা'। তাই পৃথক-রূপে নয় বরং বিনম্র ভক্তিতে নিবেদনের তরে এক ও অভিন্ন রূপ– রাধা-কৃষ্ণের 'ভাব-দেহ মূর্তকরণ' বা 'কৃষ্ণ-ভাবের কল্পিত রূপায়ণ'ই *নটপালা* পরিবেশনায় পরম লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে।

মাঠ-পর্যবেক্ষণমূলক এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ গুরুত্বে চিহ্নিত করা যায়– এক. *নটপালা* সংশ্লিষ্ট কুশীলবদের (গায়েন, রাসধারী, দোহার, যন্ত্রী) ব্যাখ্যা ও বিশ্বাসমতে শ্রীগৌরাঙ্গ হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের যুগ্মাবতার অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণের অবস্থান এই পালায় অদ্বৈত বা এক ও অভিন্ন আত্মারূপে বিবেচিত হয়। দুই. পূর্বরঙ্গের গৌরচন্দ্রিকায় রাগালাপে মূর্তি স্থাপনের প্রক্রিয়াটি শরীর-কেন্দ্রিক নয় অর্থাৎ মূর্তির প্রকাশ গায়েনের ভঙ্গি, চলন, সঞ্চলন, আলংকারিক-কণ্ঠধ্বনি, পোশাক ও দ্রব্য সম্ভার প্রভৃতি দ্বারা কোনো দেহ-রূপ মডেল নির্মাণ করা হয় না, বরং ভাব দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণের কল্পিত ভাব-দেহকেই রাগ, তাল, লয়ের আশ্রয়ে ভক্তি-ভাবে দেহের কোমল ছন্দের দোলায় মূর্ত করে তোলা হয়। তিন. *নটপালার* পূর্বরঙ্গ, আখ্যান-অন্ত পর্ব এবং পরিবেশিত আখ্যানের নির্ধারিত অংশের যা কিছু পূর্ব-নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ নৃত্যের (পুংচোলম এবং কর-তাল-চোলম) প্রয়োগ লক্ষ করা যায় তা পুং-বাদক এবং করতাল-বাদক কর্তৃক পরিবেশিত হয়। অপরপক্ষে আখ্যানের গীতাভিনয় অংশে গায়েন এবং সহযোগী গায়েন বা দোহারগণের শরীরাঙ্গে যা কিছু নৃত্য প্রযুক্ত হয় সেটি কেবলই সুর, তাল ও লয়ের অনুবর্তী দেহের ছন্দময় চলন বা দোলা মাত্র– *বিষয়ের* ভাবোদ্দীপনামূলক বর্ণনাত্মক-নৃত্য অথবা হস্ত-মুদ্রায় বা অর্থপূর্ণ দেহের ভাষা ও শৈলীতে প্রকাশিত বিধিবদ্ধ নৃত্যের লক্ষণ এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

পরিবেশন ও বিশ্লেষণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে *নটপালায়* দুই ধরনের পরিবেশন প্রক্রিয়ার মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়– একদিকে যন্ত্রী ও দোহারগণ পরিবেশিত বিধিবদ্ধ নর্ত্তন, রাগ, তাল, ছন্দের প্রদর্শন অপরদিকে গীত ও কাব্যের আশ্রয়ে গায়েন অভিনীত ভাব ও ভক্তিমূলক বর্ণনাত্মক আখ্যান বা লীলার পরিবেশন। নিম্নে *নটপালা* পরিবেশনের ক্রমানুসার আলোচনাপূর্বক অভিনয়-রীতি বিশ্লেষণ করা হলো।

পূর্বরঙ্গ : ব্রাহ্মণ পর্ব : যে আসরে সংকীর্তন পরিবেশিত হয় সেটা প্রতীকী অর্থে বৃন্দাবনধাম রূপে গণ্য হয়। ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁর মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বৃন্দাবনধামকে পরিশুদ্ধ করেন। পরিশুদ্ধকরণের পর শুরু হয় নট সংকীর্তন, যার ক্রমগুলো এইরূপ :

গৌরচন্দ্র : চার যুগ বা চার কাল– সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। দ্বাপরে নন্দের সূত– কৃষ্ণ। এ সংকীর্তন হচ্ছে দ্বাপর যুগের কৃষ্ণের লীলার অনুকরণ। সত্য যুগে যিনি ছিলেন হরি, ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ এবং কলিতে গৌরাঙ্গ। জীবের প্রতিনিধি হিসেবে তাই গৌরাঙ্গ আশ্রিত হন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গকে বন্দনা আগে করতে হয়। গৌরচন্দ্রিকার শুরুতে একটি রাগ গাওয়া হয় বা রাগ দিয়ে শুরু করতে হয়। এই রাগটি নব অক্ষরের– তা রে তা না রে তা না তা না – এই রাগ মানে মূর্তি স্থাপন। রাগের মাধ্যমে মূর্তি স্থাপন করা হয়। সৃষ্টিকর্তা বা ভগবানের মূর্তি নিরূপণ/স্থাপন।

বেড়িঘাঁটু (পরিক্রমণ) : আসরে গুরুর আশ্রিত হওয়া– 'বন্দে শ্রীগুরুর পদচরণ, কোমল মম শিক্ষাগুরু', এটা বলে গুরু আশ্রিত হয়।

অবতার : গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে গীত পরিবেশন। স্বয়ং ভগবান যিনি দ্বাপর যুগে লীলা করেছিলেন, উনি রাধা প্রেমে ঋণী। তিনি এই ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে এবং কলি যুগের উদ্ধারের লক্ষ্যে অতঃপর নবদ্বীপে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন– গৌরাঙ্গ। ঋণ হচ্ছে তিনটি– ভাব, কান্তি ও বিলাস। এই তিনটি ঋণ পরিশোধ করার জন্যই তিনি (কৃষ্ণ) গৌরাঙ্গ অবতার হয়ে মনুষ্যরূপে মর্ত্যে আগমন করেন।

কৃষ্ণ লাভে রাধার তীব্র বাসনা/আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে 'ভাব'। অর্থাৎ কৃষ্ণ দর্শন লাভের যে আকাঙ্ক্ষা এটাই হলো ভাব বা কৃষ্ণ-ভাব। 'কান্তি' হচ্ছে গো দোহন কালে কৃষ্ণের কাজে কোনো মন নেই, সে কেবলই রাধার রূপ দর্শনের চেষ্টায় মত্ত/আকুল/ব্যাকুল, তাই তো কৃষ্ণের কোনো কাজই ঠিক মতো সম্পন্ন হয় না। এই যে শ্রীমতি রাধার রূপ দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের তীব্র ব্যাকুলতা এটিই হলো কান্তি। এবং 'বিলাস' হচ্ছে বৃন্দাবনের রাসলীলায় শত ব্রজ-গোপী নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের যে প্রেম এই প্রেমই হলো বিলাস।

তিন তালি বা তিন তাল : তিনটি বাঞ্ছা (ভাব, কান্তি ও বিলাস) পূরণার্থে যে গীত পরিবেশন হয় তাকে তিন তাল বলে। গৌরাঙ্গ তিনি ছিলেন– রাধা, কৃষ্ণের মিলিত তনু। আগের জন্মে রাধা কৃষ্ণ, বর্তমান যুগে এসে তিনি রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু– যুগল অবস্থান।

মেল : ভক্তের সাথে আনন্দ মিলন। মেল হচ্ছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ণরূপ- মূর্তি এবং তার লীলা এক্ষণে পরিপূর্ণ হলো– অর্থাৎ রাগ দিয়ে কৃষ্ণের মূর্তি নিরূপণ করা এবং তাঁর তিনটি বাঞ্ছা বর্ণনা করার মাধ্যমে গৌরাঙ্গের কাজ সম্পূর্ণ হলো, এখন তিনি কেবলই নামযজ্ঞের মাধ্যমে কলি যুগের জীব উদ্ধার করবেন। ভক্তের সাথে তাঁর আনন্দ মিলন– এটিই হচ্ছে মেল।

মণ্ডলীবিচার : কীর্তনের পরিচালক/ব্রাহ্মণ উনি পঞ্চতত্ত্ব– নিত্যানন্দের (গৌরাঙ্গের বড় ভাই) ভাব নিয়ে আসর-বিলাস উপবেশন করেন। তাঁর আজ্ঞাতেই সব কিছু হয়। দ্বাপর যুগের কৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম কলিতে এসে হন নিত্যানন্দ।

পর্যায়ক্রমিক এই সকল কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতায় অতঃপর সমাপ্ত হয় *নটপালার* পূর্বরঙ্গ বা আখ্যানপূর্ব পরিবেশনা। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বহুবিধ বন্দনা ও কৃত্যানুষ্ঠান দৃষ্টে *নটপালার* পূর্বরঙ্গকে স্পষ্টতই জীবের সাথে পরমের এক মধুর মিলন-কীর্তনের প্রস্তুতি-রঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। মহা-মিলনের উদ্দেশ্যে কৃত এই প্রস্তুতি-রঙ্গে তখন শুধুমাত্র শাস্ত্রের পাঠে নয় অথবা কেবল উচ্চারিত বাণীতেও নয় বরং গীত, কাব্য, সুর, তাল, লয় এবং নৃত্যের ছন্দে তুমুল আহ্বানে অতঃপর মানবেরই ভাব-দেহে অধিষ্ঠিত হন স্বয়ং কৃষ্ণ পরমপুরুষ– মুখোমুখি দাঁড়ান ভক্তের, পূর্ণ হয় আকাঙ্ক্ষার, আস্বাদিত হয় কৃষ্ণ মহাভাবের। বলা যায় পূর্বরঙ্গের এই সকল কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতাই আসরে দেবতা অধিষ্ঠানের বিষয়টিকে ভক্তের ভাব ও বিশ্বাসকে নিশ্চিতরূপে সম্ভব করে তোলে। কেননা– The cosmology given in the *Purana* is the devotiee's experience of the outer universe, which is interiorized in the text of the hymn. Thus the hymn is an integral part of the *Puranic* narrative and not extraneous to it at all. The *Kirtana* is therefore functional in the specific context of the narrative. The *Purana* is *Kirtana* writ large.[১৯৫]

আখ্যান পর্ব : পূর্বরঙ্গের সকল আনুষ্ঠানিকতার শেষে গায়েন কর্তৃক পরিবেশিত হয় রাধাকৃষ্ণের লীলাময় আখ্যান বা পালা। *নটপালা* সম্পূর্ণ হয় আট প্রহরে, যার মধ্যে দিনে চার প্রহর এবং রাতে চার প্রহর। বক্ষ্যমাণ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত *নটপালাটি* দিনের চার প্রহর অর্থাৎ প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণের লীলা পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিম্নে চার প্রহরের কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হলো :

প্রাতঃ : "প্রাতঃকালে নন্দরাণী কৃষ্ণ জাগাইলা, উঠি কৃষ্ণ প্রাতঃকৃত শুভ সমাধিলা॥ সখা সঙ্গে গৃহাঙ্গনে খেলা আরম্ভিল, গোপাল হেরিয়া রাণী আনন্দিত ভেল॥" কৃষ্ণের প্রাতঃকালীন লীলা বর্ণনা করা হয় এই প্রহরে। রাণী/মা যমুনাতে স্নানে যাচ্ছেন, ঐদিকে কৃষ্ণ ব্রজগোপীর ঘরের ননী চুরি করছেন। ধরা পড়ায় তা আবার

---

১৯৫ K. Ayyappa Paniker, *Indian Narratology,* Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi, 2003, P. 37

মায়ের নিকট নালিশ করা হচ্ছে এমন সব কাহিনী/পদ বর্ণিত হয় এই প্রাতঃকালের বর্ণনায়। এ সকল পদের মাধ্যমে মূলত বাৎসল্য প্রেমের প্রকাশ পায়– মায়ের সাথে কৃষ্ণের সকল লীলা বাৎসল্য রসে নিষ্পত্তি হয়।

পূর্বাহ্ণ : গোষ্ঠ লীলা। কৃষ্ণের সখাবৃন্দ কৃষ্ণকে ডাকছেন, কৃষ্ণ গো নিয়ে গো-চারণে যাবেন। তখন কৃষ্ণ মায়ের অনুমতি চাচ্ছেন গো চারণে গহিন বনে যাওয়ার জন্য, কিন্তু মা তাকে যেতে দিতে নারাজ। গহিন বনে তো অসুর– কংসচোর রয়েছে, সে কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে, ক্ষতি করতে পারে। তাই মা তাকে ছাড়তে চায় না, কিন্তু সখারাও মিনতি জানাচ্ছে কিন্তু মা কিছুতেই অনুমতি দিতে রাজি নয় কারণ কৃষ্ণের আহার নিদ্রার কষ্ট হবে, দানব, কন্টকের আঘাত পাবে, তাই তাকে ছাড়াতে নারাজ। শেষে বড় ভাই বলরাম– বিজ্ঞ ঠাকুর, শেষপর্যন্ত তিনি মায়ের কাছে গেলেন এবং বললেন যে তিনি কৃষ্ণের সাথে যাবেন এবং তার সকল যত্ন-আত্তি, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন, রোদ আসলে ছায়া দেওয়া, বৃষ্টি হলে ছাতা ধরা সব সবকিছু দেখাশোনা করবেন। তিনিই তাকে নিয়ে যাবেন এবং কোনো বিপদ ছাড়াই আবার তাকে নিয়ে আসবেন। বলরাম বলেন– "মাত না কর চিন্তন, তোমার কানাই যে তোমার নন্দন॥ মা আমি সঙ্গে যাব, ক্ষুধেতে খাওয়াবো॥ তোমার চিন্তার কি বালাই, বেলা অবশেষে তোমা এনে দিব জীবন কানাই॥" মা আশ্বস্ত হয়ে বলরামের কাছে কৃষ্ণকে সমর্পণ করলেন। লীলার এই অংশ সখ্য ভাবে নিষ্পত্তি ঘটে।

মধ্যাহ্ন : কৃষ্ণের ধেনু নিয়ে গমনকালে রাধা সখীসহ গৃহ থেকে তা দেখতে পায়। জগতের সকলেই কৃষ্ণের নিকট কিছু কিছু না কামনা করে, চায় বা আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু রাধার আকাঙ্ক্ষা একটিই তা কেবল কৃষ্ণ। ধেনু নিয়া গমনকালে কৃষ্ণ ও তার সখাদের আনন্দ উল্লাস রাধাকে তীব্র ব্যাকুল করে তোলে। "সখী দেখ আমার কৃষ্ণ, কেমন মধুর বাঁশি বাজায় আমার পানে চাহিয়া। সখী দেখ কেমন নির্লজ্জ কানাই হাসে আমার মুখপানে চাহিয়া। দেখ, দেখ সখি কেমন চঞ্চল-ছন্দ পদে কৃষ্ণ আমার চলিলা ভূমি উছলিয়া। দেখ সখি মোহন মুরলি বাজায়, কটাক্ষ সংহারে প্রাণ নিয়ে যায়, দেখ সখি মোহন মুরলি বাজায়॥" এভাবে কৃষ্ণ যখন বনের গহিনে যাচ্ছে রাধার মন আরও ব্যাকুল হয়ে উঠছে– "থমকে থমকে যায়, নয়ন পানে আমা চায়॥" কৃষ্ণের রূপকর্ম দেখে রাধা ক্রমশই ব্যাকুল হয়ে উঠতে থাকে। এরপর বনে প্রবেশ করলো যখন– তখন আরও ধৈর্য হারা হয়ে উঠলো। এদিকে কৃষ্ণ বনে প্রবেশ করে, ধেনুবৎসদের জলপান করিয়ে কৌশলে ছলনা করে তাঁর প্রধান সখা সুবলকে সাথে নিয়ে যমুনা তীরে রাধাকুণ্ডের দিকে রাধা মিলনে যায়। কিন্তু কৃষ্ণ গিয়ে দেখে রাধা নাই, তখন কৃষ্ণও অপরদিকে রাধা বিহনে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। রাধা-কৃষ্ণ এমন একটি প্রেম যে– কৃষ্ণ সবসময় রাধাময়ী। সব সময়, সকল ক্ষেত্রে সে রাধাময়, শুইতে রাধা, খাইতে রাধা, খেলতে রাধা সব কিছুতেই সে এক কথায় রাধাময়ী আবার রাধা কৃষ্ণময়ী। সুবলকে বলে– "সুবল আসবার সময় রাধাকে এতকিছু করে বুঝিয়ে আসলাম যে তুমি রাধাকুণ্ডের তীরে যাও আমি সেখানে যাচ্ছি, কই সে তো এখনো এলো না, তবে কি রাধা আসবে না, আমার কথা কি সে অমান্য করবে? আমার কিছুই যেন ভালো লাগেনা, আমার আর ধৈর্য সহে না।" এই বলে

সে রাধা-বিলাপ শুরু করে দেয়। এইভাবে রাধার বিরহের বর্ণনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সখা সুবলের কোলেই নিদ্রাগত হলো। এদিকে রাধাও হা হুতাশ করছে, কৃষ্ণ তো বনে চলে গেল। রাধাও তখন কৃষ্ণ বিরহে দারুণ অনলে পুড়ছে যেন– "প্রিয় সখি ললিতে, জ্বালার উপরে দ্বিগুণ জ্বালা, বন্ধু প্রেমানলে, কৃষ্ণ প্রেমানলে, শ্যাম প্রেমানলের জ্বালা, প্রিয় সখি ললিতে॥" এভাবে দুই দিকে দুই জনই দুজনের জন্য বিরহ জ্বালায় পুড়ছে। রাধার সখি দুতি/বৃন্দা/তুলশি তখন তাকে সান্তনা দিয়ে জানায় যে সে এই খবর নিয়ে যাবে কৃষ্ণের কাছে। এরপর সে রাধার খবর নিয়ে গেল কৃষ্ণের কাছে এবং কৃষ্ণের খবর এনে দিলো রাধার কাছে। এরপর দুতি তাকে বলল যে–'রাধা তোমার জন্য রাধাকুণ্ড তীরে কৃষ্ণও তদ্রূপ হা-হুতাশ করছে শুধু তোমার জন্য, তুমি তাড়াতাড়ি বেশভূষা পরে তার কাছে যাও।' এই বেশভূষা পরার এই পর্বকে বলা হয় 'সাজন' পর্ব।

সাজন শেষে যাত্রা আরম্ভ হলো, কৃষ্ণ দর্শনের জন্য– এটাকে বলে অভিসার। সূর্য পূজার ছলে এবারে রাধা কৃষ্ণ অভিসারে রওনা হলো। কেননা আয়ানঘরনী রাধার গৃহে জটিলা কুটিলা নামে রয়েছে নানা জন যাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই অভিসারে যেতে হচ্ছে। এবারে রাধা সূর্যকুণ্ড পেয়ে, তাকে প্রণতি জানিয়ে পুনরায় নিজকুণ্ড (রাধা-কুণ্ড)-এর কাছাকাছি গেল। দূর থেকে তখন কৃষ্ণকে দেখতে পেল, একটু একটু করে কৃষ্ণ যেন দেখা দিতে লাগলো- এটা হচ্ছে লীলার দূর-দর্শন পর্ব। এরপর গেল কুণ্ডের তীরে। কিন্তু কৃষ্ণ দর্শনের পর রাধা তার অন্তরে তীব্র মিলনোন্মুখ হলেও বাইরে অবদমন অভিলাষ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ তাকে যতই কাছে পেতে চাচ্ছে রাধা ততই বলছে– "আমাকে আর ধরে রেখ না, আমাকে এখনই যেতে হবে, আর যে সময় নেই, আর বাধা দিও না"– লীলার এই অংশ হচ্ছে পথরুদ্ধ পর্ব, ভিতরে সখ্য/সক্ষমন বাইরে বাম্যতা। এরপর কৃষ্ণ তাকে আদর করে বাম পাশে নিয়ে বসালেন, এতে তার বাম্য-ভাব দূর হলো। এটাই হচ্ছে– যুগল পর্ব। মূল ভাব– মধুর। এরপর বনভ্রমণ– তারা দুজন বনে ঢুকে হিন্দোলা– দোলা লীলা, জল ক্রীড়া, ফালগুন মাসের ফাগু খেলা ইত্যাদি নানা ক্রীড়া শেষে পুনরায় বেশভূষা পরিধান করে বনভোজন শেষ করে আসনে বসে। কৃষ্ণ সাধনের মূল ভাব এখানে। সেখানে ভোজন শেষে উভয়ে যখন আসন– সাধন-মিলনে যুক্ত হবে, সেখানে নিহিত রয়েছে ভক্তের সাধনের পথ। আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার প্রতীক স্বরূপ আসন-মিলন হলো। এখানে বংশী শিক্ষার একটি পর্যায় আছে– কৃষ্ণ রাধাকে বংশী বাজানো শিক্ষা দিল। এই মিলনের মধ্য দিয়েই মধ্যাহ্ন পর্ব শেষ হয়। এই পর্বের অভিনয় মধুর রসে নিষ্পত্তি হয়।

অপরাহ্ণ : গৃহ গমন পালা। স্ব স্ব গৃহে গমনের পালা। "ভোজন শয়ন সারি, পাশা ক্রীড়া শুখসারি॥ অপরাহ্ণে দিবা শেষে, কৃষ্ণ গোষ্ঠ পরবেশে॥" গোটস্থানে সূর্যপূজা শেষে প্রসাদ ভোজন করে গৃহ গমনের উদ্দ্যেগ করে। বনবিলাস শেষে– "এথা রাধা সখি সহিত, আইলা আপন গৃহে। উপহার করি কৈল স্নান, তবে নানা বেশ পরি, চড়ি অট্টালিকা উপরি, কৃষ্ণ গেল আপন গৃহ॥ তবে কৃষ্ণ একত্র করি গোধন, সখা সঙ্গে করি গৃহে করে

আগমন॥ পথে রাই সুদর্শন হলো আনন্দময়, চলি আইলা আপন ভুবন। যশমতি কৃষ্ণ পাইয়া, চাঁদ মুখি নিরিখিয়া নিশিয়া লইল রমাকানুন॥

অতঃপর সমাপ্ত হয় দিনের চার প্রহরের রাধাকৃষ্ণের লীলাময় আখ্যান। আখ্যান অন্তেও পরিবেশিত হয় বেশকিছু কৃত্যানুষ্ঠান– মৃদঙ্গ এবং করতাল বাদ্যের তুমল নর্ত্তন, ফাগুখেলা, ফলশ্রুতি বর্ণনা প্রভৃতি।

অভিনয়-রীতি

কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গলের মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) সম্প্রদায়ের *নটপালার* পর্যবেক্ষণ লব্ধ ধারণা থেকে এটিকে একটি *বর্ণনাত্মক অভিনয়-রীতির* পরিবেশনা বলা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে দু-একটি ঐতিহাসিক তথ্য পুনরুল্লেখপূর্বক আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে করি। ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্যমতে মণিপুরী *নটপালার* নাটলিপি এবং পরিবেশনার রীতি-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বাংলার *লীলাকীর্তন* এবং নরোত্তমদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত পদাবলীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। *নটপালার* উদ্ভব ও বিকাশের মূল হিসেবে বিবেচ্য বাংলা অঞ্চল থেকে আসা *বঙ্গদেশ পালা* বা অরিবা পালা ছিল একটি কীর্তন-আঙ্গিকের পরিবেশনা। তাছাড়া বাংলার কীর্তনের অবিচ্ছেদ্য একটি বাদ্যযন্ত্র *খোলের* আদলে নির্মিত মণিপুরী পূং-এর শৈলীবদ্ধ বাদ্যে বাংলার একদল কীর্তনীয়া যে সান্ধ্যকালীন মন্দির-পূজায় কীর্তন পরিবেশন করতেন তাও উদাহরণদৃষ্টে লক্ষ করা গেছে। অপরদিকে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে *কীর্তন* হচ্ছে একপ্রকার স্তবগান, বিষয়গতভাবে যা সম্পূর্ণ ভক্তিপ্রদর্শনমূলক এবং গীত ও কাব্যময় বর্ণনা হচ্ছে *কীর্তনের* মুখ্য অভিনয় উপাদান– The *Kirtana* is a condensed version of the narrative episode, whtich gets charged from the intervening lyrical variation of the story.[১৯৬]

যদিও মধ্যযুগে বিকশিত এবং বাংলা ভাষায় রচিত বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় *নাটগীত* লিপি– বড়ু চণ্ডীদাসের (১৩৭০-১৪৩৩) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* ত্রি-চরিত্রের ধারাকে অনুসরণ করে মণিপুরী *নটপালার* আখ্যানও ত্রি-চরিত্রের (রাধা, কৃষ্ণ এবং গোপী) কাঠামোয় বিন্যস্ত হয়েছে। তথাপিও এর অভিনয়-রীতিটি *নাটগীত* ধারাকে অনুসরণ করেনি বরং তা মধ্যযুগে *কথানাট্যের*'[১৯৭] ধারায় বিকশিত *নামকীর্তন, পদাবলী কীর্তন, লীলাকীর্তন, ঢপ কীর্তন* প্রভৃতি কীর্তন আঙ্গিকের বর্ণনাত্মক অভিনয়ের রীতি ও বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

কথানাট্যের ধারায় বিকশিত *বর্ণনাত্মক অভিনয়-রীতিতে* সাধারণত একজন কথক বা গায়েন গীত, গদ্য এবং কাব্যের আশ্রয়ে আখ্যান পরিবেশন করে থাকেন। এ সময়ে সহযোগী হিসেবে যন্ত্রী ও দোহারগণ যন্ত্রসঙ্গীত এবং গীত অংশে *ধুয়া* পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। তবে দীর্ঘ সময় ধরে একটানা বর্ণনাত্মক অভিনয়ের মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে কখনো কখনো উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংক্ষিপ্ত সংলাপাত্মক অভিনয় অথবা বিশেষ কোনো কোনো দৃশ্যের তাৎক্ষণিক গদ্যাভিনয় বা ইম্প্রোভাইজেশন যুক্ত হয়ে থাকে এবং গায়েন তাঁর বর্ণনাত্মক

১৯৬ K. Ayyappa Paniker, *Indian Narratology*, Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi, 2003, P. 37

১৯৭ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১

গীতাভিনয়ের বিশেষ বিশেষ অংশে নৃত্যের ব্যবহার করে বিষয়ের ভাবারোহী-বেগকে অধিকতর ঘনীভূত করে তোলেন।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় পর্যবেক্ষণকৃত কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গলের মণিপুরী *নটপালার* অভিনয়ে রীতি-পদ্ধতির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশকিছু ভিন্নতা সত্তে এর মূল সুরটিও বর্ণনাত্মক। তবে *প্রণমহি বঙ্গমাতা* গ্রন্থে গবেষক সাইমন জাকারিয়া *নটপালাকে* একটি 'নাটগীত' রীতির পরিবেশনা হিসেবে আখ্যায়িত করে বেশকিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে সাইমন জাকারিয়ার প্রদত্ত যুক্তিসমূহকেও এই প্রসঙ্গ-আলোচনায় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে *নটপালার* অভিনয়-রীতির বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। প্রসঙ্গটির শুরুতে 'নাটগীত'-এর অভিনয়-রীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রচলিত ব্যাখ্যার ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। *Acinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh* গ্রন্থে সৈয়দ জামিল আহমেদ 'নাটগীত' রীতিকে The Song-and-dance type নামে উল্লেখ করে বলেন– Those genres which are characterized by pre-dominance of dance rendered by performers enacting roles in the first person; they may render their dialogue in lyric or dance silently to the lyric rendered by a group of choral singers and musicians.[১৯৮] অন্য আরেকটি গ্রন্থে গবেষক 'নাটগীতের ব্যাখ্যায় আরও বলেন– "কথানাট্য" রীতির একক কুশীলবকৃত বর্ণনাত্মক অভিনয়ের বিপরীতে "নাটগীত" রীতির পরিবেশনায় একাধিক অভিনেতা/অভিনেত্রী নৃত্য, গীতি সংলাপ এবং কিছু কিছু গদ্য সংলাপের সাহায্যে কাহিনীর চরিত্রসমূহকে রূপদান করেন।[১৯৯] অপর একজন গবেষকের মতে 'নাটগীত' হচ্ছে– 'নৃত্য, অভিনয় ও গীত দ্বারা পরিবেশিত কোনো সাধারণ পালা।'[২০০] উদ্ধৃত উক্তিগুলো দৃষ্টে স্পষ্ট যে, নৃত্য এবং গীতি সংলাপ হচ্ছে এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, মধ্যযুগের বাঙলায় বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় একটি অভিনয়-রীতি হিসেবেই 'নাটগীত'-এর আবির্ভাব ঘটে। কৃত্তিবাস রচিত *রামায়ণ*, মানিক দত্তের *চণ্ডীমঙ্গল*, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতসহ বেশ কিছু কাব্যে 'নাটগীত' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর লিপি যে জয়দেব প্রণীত *গীতগোবিন্দের* ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট্য 'নাটগীত' ধারা অনুসরণ করেছিল সে বিষয়ে প্রায় সকল গবেষকগণ-ই একমত পোষণ করেছেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, এই ধারার ক্রম-জনপ্রিয়তার সূত্রেই বাংলায় 'নাটগীত' অভিনয়-রীতির বিকাশ লাভ করে। 'পালাকীর্তন', 'রাসনৃত্য' 'নাটগীত' ধারায় বিকশিত বাংলায় প্রচলিত দুটি কৃত্যমূলক পরিবেশনা।

---

১৯৮ Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh*, UPL, Dhaka, 2000, P. 341
১৯৯ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬
২০০ সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২০২

'নাটগীত' রীতির এই সকল ব্যাখ্যা সূত্রে মণিপুরী *নটপালা* প্রসঙ্গে গবেষক সাইমন জাকারিয়ার প্রদত্ত যুক্তি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বস্তুত অভিনয়ে নৃত্য ও সংলাপাত্মক গীত উপাদানের উপস্থিতি ও প্রায়োগের ধরন নিরিখে এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বিশেষত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর ত্রি-চরিত্রের ধারায় বিন্যস্ত আখ্যান-সাদৃশ্য বিবেচনায় *নটপালাকে* 'নাটগীত'-এর পর্যায়ভুক্ত করে *প্রণমহি বঙ্গমাতা* গ্রন্থসূত্রে ব্যাখ্যা করা করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

নটপালা মূলত মণিপুরীদের বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পরিবেশনা আঙ্গিক। এই পরিবেশনা আঙ্গিকের সাথে [অনেকাংশেই এই প্রবন্ধের সূচনায় আলোচিত] নাটগীত রীতির সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি কারণে,– এক. আদি নাটগীত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান নিয়েই মণিপুরী নটপালা পরিবেশিত হয়, দুই. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো মণিপুরীদের নটপালার পরিবেশনাও কৃত্যমূলক, তিন. নাটগীত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবেশনার মতো মণিপুরীদের নটপালা পরিবেশনাতেও থাকে গায়েন বা ইশালপার গীত ও দোহার বা পালাদের ধুয়া এবং নৃত্য, চার. রাধা-কৃষ্ণের বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয় মণিপুরী নটপালার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।[২০১]

এই পর্যায় উক্ত চারটি কারণের প্রথমটি সম্পর্কে বলা যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাসের '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* আখ্যান নিয়েই মণিপুরী নটপালা পরিবেশিত হয়' এমন যুক্তিকে সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* ত্রি-চরিত্রের ধারাটি অনুসৃত হলেও বস্তুত মণিপুরী *নটপালার* আখ্যানে যাঁর প্রভাব ব্যাপক তিনি বাংলার ঠাকুর নরোত্তম দাস। চৈতন্যদেবের পরমভক্ত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ এই ঠাকুর প্রণীত পদাবলীই *নটপালায়* সর্বাধিক প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে ভারতে শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্য বিশেষজ্ঞ দেবযানী চলিহার মন্তব্য ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে– মণিপুরী নট সংকীর্তন বাংলার ঠাকুর নরোত্তম দাসের *লীলা কীর্তনের* ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমলগঞ্জের *নটপালার* তরুণ পুং বাদক বিধান সিংহের মন্তব্যও দেবযানীর এই মতকে সমর্থন করে– 'নটপালাতে অনান্য অনেক কবির রচনা থাকলেও নরোত্তম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত পদাবলীই বেশি প্রাধান্য পায়। যে কোনো গান গাইতে হলেই নরোত্তম দাসকে গাইতে হয়।'[২০২] এমনকি বৈষ্ণবীয় প্রেম, ভক্তি ও রস-কীর্তনের ধারায় বর্তমানে 'গৌরচন্দ্রিকা' গানের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, সেটির প্রবর্তনও ঘটে এই নরোত্তম দাসের খেতরীয়র মহোৎসবের মাধ্যমে। তাছাড়া আখ্যানে ত্রি-চরিত্রের কাঠামোগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও ভাব-বস্তু ও দর্শনগত দিক থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* সাথে বৈষ্ণবধর্ম আশ্রিত নটপালার প্রভেদ বিস্তর। কেননা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* হচ্ছে রক্ত-মাংসে গড়া মানব মানবী রূপে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-মিলনের প্রতীকী কাব্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টিতে রাধা-কৃষ্ণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিগ্রহ, আর তাই রাধা-

২০১ সাইমন জাকারিয়া, প্রণমহি বঙ্গমাতা (চতর্থ পর্ব), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯০

২০২ পুং বাদক বিধান সিংহ-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ০৮/০৭/২০১৫, সময়, বিকাল ৩ ঘটিকা, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, ভানুগাছ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

কৃষ্ণের পদাবলী বা লীলা-আখ্যানকে দেখা হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীকী মিলনের ভক্তিমূলক কাব্য হিসেবে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* যেখানে শেষ চৈতন্যদেবের সেখানে শুরু।

আসলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম প্রধান সার্থকতা এই যে, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বড়ু চণ্ডীদাসের গান নয়। কি রাধা, কি কৃষ্ণ, কেউ এখানে আধ্যাত্মিক বিগ্রহ মাত্র নন; একটু স্থূল হলেও তাঁরা রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধি। জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক নয়, বরং সেদিনের প্রাকৃত জীবনে যে শত শত লম্পটের প্রণয়-জাল বিস্তার ও প্রণয়-বিলাস কবি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, আর যেমন দেখে থাকবেন বহু বহু সরলা গ্রাম্যবধূর প্রণয়-প্রবঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা, অতি সহজ ভাবে বড়ু চণ্ডীদাস তাই চিত্রিত করেছেন। আর তাতে এ কাব্য দেবলীলার কাব্য না হয়ে মানবলীলার কাব্য হয়ে উঠেছে।[২০৩]

সুতরাং বৈষ্ণবীয় কীর্তনের সাথে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* ভাব-দর্শনের দুস্তর প্রভেদ লক্ষণীয়। যদিও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* বৈষ্ণবীয়করণের মাধ্যমেই এই ধর্মায়তনে গৃহীত হয়েছে, পেয়েছে সর্বাত্মক গ্রহণযোগ্যতা। তথাপিও এঁরা কেবল বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যানেই আবদ্ধ থাকেনি, বরং অসংখ্য বৈষ্ণব পদকর্তার প্রণীত পদাবলীতে সমৃদ্ধ করেছে তাবদ বৈষ্ণব-মণ্ডলীকে। তবে এ কথা বলাও সঙ্গত যে, *গীতগোবিন্দ* থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* থেকে তৎপরবর্তী বাংলা এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রি-চরিত্রের কাঠামো ও কৌশলগত দিকটি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং মণিপুরী *নটপালার* কৌশলগত কাঠামোটি এই ধারাটিকেই গ্রহণ করেছে একথা স্বীকার্য, তবে তা যে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* জাগতিক প্রেম-বস্তুকে কিছুতেই গ্রহণ করেনি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কারণ দুটির সাথে ঐকমত্য পোষণ করা গেলেও চতুর্থ কারণটির পক্ষে যথাযথ যুক্তি এবং প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ছিল অনপুস্থিত। এক্ষণে মাঠ-পর্যবেক্ষণসূত্রে *নটপালার* 'বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়', নৃত্য ও এবং গীতাভিনয়ের রীতি-বৈশিষ্ট্য অন্বেষণপূর্বক চতুর্থ কারণটির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তবে অভিনয়-রীতির বিশ্লেষণ পূর্বে 'দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ' শীর্ষক মাঠ-পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যকে পুনরায় একবার স্মরণ করা যেতে পারে– এক. *নটপালা* সংশ্লিষ্ট কুশীলবদের (গায়েন, রাসধারী, দোহার, যন্ত্রী) ব্যাখ্যা ও বিশ্বাসমতে শ্রীগৌরাঙ্গ হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের যুগ্মাবতার– 'রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু' অর্থাৎ এই পালায় রাধা ও কৃষ্ণের অবস্থান অদ্বৈত বা অভিন্ন আত্মারূপে বিবেচিত। দুই. পূর্বরঙ্গের গৌরচন্দ্রিকায় রাগালাপে মূর্তি স্থাপনের প্রক্রিয়াটি শরীর-কেন্দ্রিক নয় অর্থাৎ মূর্তির প্রকাশ গায়েনের ভঙ্গি, চলন, সঞ্চলন আলংকারিক-কণ্ঠধ্বনি, পোশাক, দ্রব্যসম্ভার প্রভৃতি দ্বারা রূপায়িত হয় না, বরং রাগ, তাল, লয়ের আশ্রয়ে দেহের কোমল ছন্দের দোলায় কৃষ্ণের কল্পিত ভাব-দেহকে মূর্ত করে তোলা হয় বা দেহের ছন্দে ভক্তি-ভাবে রূপায়িত হয়। তিন. *নটপালার* পূর্বরঙ্গ, পরিবেশিত আখ্যানের নির্ধারিত অংশে এবং

২০৩ গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহত্যের রূপরেখা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৮

আখ্যান-অন্ত পর্বে যা কিছু পূর্ব-নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ চোলোম/নৃত্যের (পুংচোলম এবং করতাল-চোলম) প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় তা যন্ত্রীগণ কর্তৃক পরিবেশিত হয়। অপরপক্ষে আখ্যানের গীতাভিনয় অংশে গায়েন এবং দোহারের শরীরাঙ্গে যা কিছু নৃত্য পরিলক্ষিত হয় সেটি কেবলই সুর, তাল ও লয়ের অনুবর্তী দেহের ছন্দময় চলন বা দোলা মাত্র– বিষয়ের ভাবোদ্দীপনামূলক 'বর্ণনাত্মক নৃত্য' অথবা মুদ্রা বা অর্থপূর্ণ দেহের ভাষা ও শৈলীতে প্রদর্শিত 'শাস্ত্রীয় নৃত্যের' লক্ষণও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনপুস্থিত থাকে। সুতরাং মাঠ-পর্যবেক্ষণসূত্রে প্রাপ্ত এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'নাটগীত'-এর অভিনয়-রীতি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

প্রথমত, *নটপালায়* নৃত্যের ব্যবহার যে প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয় সেটি 'নাটগীত'-এর ব্যাখ্যাকৃত রীতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেকাংশেই তা বর্ণনাত্মক অভিনয়ের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। কেননা পূর্বেই লক্ষ করা গেছে যে, পরিশীলিত ও বিধিবদ্ধ নৃত্যের যা কিছু প্রদর্শিত হয় তা যন্ত্রীদলের (পুংবাদক ও করতাল বাদকের) যৌথ অংশগ্রহণে সম্পাদিত হয় এবং তা গায়েন পরিবেশিত বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের বিপরীতেই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ পুংচোলম এবং করতাল-চোলমের কৃত্যমূলক প্রদর্শন পূর্বরঙ্গের একাধিক বন্দনা, রাগালাপে মূর্তি স্থাপন, তিনতাল, বেড়িঘাঁটু প্রভৃতি, আখ্যানের নির্দিষ্ট অংশ এবং আখ্যান-অন্তের ফাগুখেলা, ফলশ্রুতি প্রভৃতি কৃত্যানুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আখ্যানের পূর্বনির্ধারিত কিছু কিছু অংশে যন্ত্রীদের বাদ্যযুক্ত নৃত্যের প্রদর্শন করা হলেও– প্রথমত তা পরিবেশনার কাঠামো ও কৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রদর্শিত হয় এবং দ্বিতীয়ত তা সংলাপাত্মক গীতের বিপরীতে নৃত্যাত্মক প্রদর্শন নয় বরং গীতাভিনয়ের যন্ত্রসঙ্গীত রূপে পরিবেশিত হয়। এ সময়ে যন্ত্রীগণ আসরে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্ধ-বৃত্তাকারে অবস্থান গ্রহণ করে (কখনো দাঁড়িয়ে আবার কখনো বিশেষ ভঙ্গিতে আসন গ্রহণ করে) যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে সংলাপাত্মক অভিনয়ের ভাবারোহী-বেগেকে ক্রমাগত তীব্র করে তুলতে সহায়তা করেন। সহজ করে বললে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এরকম যে, *নটপালায়* যা কিছু নৃত্যের প্রদর্শন তা কৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, আখানের গীতি-সংলাপের নৃত্যাত্মক অনুষঙ্গ হিসেবে চরিত্রের মনোগত অবস্থা– আশা, আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে না। সুতরাং 'নাটগীত' রীতির নৃত্য যে সকল যুক্তিতে ও বৈশিষ্ট্যগত কারণে অভিনয়ের উপাদান হিসেবে বিশেষত্ব লাভ করে *নটপালার* ক্ষেত্রে তা আদৌ কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয়ত, একাধিক কুশীলবের 'প্রথমপুরুষে' সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করা 'নাটগীত' রীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি দুইভাবে ঘটতে পারে– কুশীলব স্বয়ং নৃত্য সহ গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন অথবা অপর একদল দোহার কর্তৃক পরিবেশিত প্রথমপুরুষে সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ের বিপরীতে নৃত্যাত্মক প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রের প্রথমপুরুষে প্রদর্শনের বিষয়টি *নটপালাতে* ভিন্নভাবে কার্যকর হয় অথবা বলা যায় আদৌ কার্যকর হয় না। কেননা যে

পালাতে রাধা এবং কৃষ্ণ অদ্বৈতরূপে বিরাজমান, একদেহ এক আত্মারূপে বিবেচিত সেই পালাতে গায়েন এবং দোহারের (সহযোগী গায়েন) মধ্যে সম্পাদিত সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ে রাধা ও কৃষ্ণ দেহরূপের ভিন্নতায় প্রথমপুরুষে উপস্থাপিত/প্রদর্শিত হবে এমনটা ভাবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। মণিপুরী *রাসনৃত্যে* একদল কুশীলবের (দোহার/সূত্রধারী/রাসধারীদের) সংলাপাত্মাক গীতাভিনয়ের (বাচিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়) বিপরীতে অপর একদল কুশীলবের নৃত্যাত্মক-অভিনয়ের (আঙ্গিক ও আহার্য অভিনয়) মেলবন্ধনে রাধা, কৃষ্ণ এবং গোপীগণ যেভাবে স্ব স্ব চরিত্রে/মূর্তিতে/অবয়বে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পায়, *নটপালাতে* তা আদৌ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর কারণ দর্শনগত– গায়েনের ভাব, ভক্তি ও বিশ্বাসে রাধা এবং কৃষ্ণ যখন এক-দেহ এক-আত্মা (উদ্ধৃতি পূর্বেই উক্ত হয়েছে) অথবা গায়েনের দেহ-শৌর্যের (এনার্জি) বিন্যাসে নারী ও পুরুষ যখন অভিন্ন-দেহে ভক্তি-ভাবে কোমল ও বিনম্র হয়ে ওঠে তখন 'প্রথমপুরুষে' রাধা ও কৃষ্ণ দুটি চরিত্রের পৃথক এবং পূর্ণ/নির্দিষ্ট রূপায়ণ অকার্যকর হতে বাধ্য। আসরে গায়েন এবং দোহারের পারস্পরিক অংশগ্রহণে রাধা ও কৃষ্ণের সংলাপাত্মক গীত (প্রথমপুরুষে) পরিবেশিত হলেও উভয়ের দেহের ভঙ্গিমায়, চলনে, কণ্ঠের আলং-কারিক বিন্যাসে, শৌর্যের বিন্যাসে, এমনকি পোশাক এবং দ্রব্যসম্ভার ব্যবহারে কোথাও চরিত্র দুটিকে পৃথকভাবে রূপায়ণের প্রবণতা দৃষ্ট হয় না। সূতরাং 'নাটগীত' রীতির অভিনয়ে প্রথমপুরুষে সংলাপাত্মক গীতাভিনয় অথবা চরিত্রাভিনয়ের বৈশিষ্ট্যটি *নটপালার* আখ্যান পরিবেশনায় কার্যকর হয় এমন দাবির পেছনে যুক্তিযুক্ত কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ফলে উপরোক্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মণিপুরী *নটপালাকে* 'নাটগীত' রীতির পরিবেশনা হিসেবে আখ্যায়িত করার পিছনে যুক্তি সঙ্গত কোনো কারণ আছে বলে মনে করি না।

মাঠ পর্যবেক্ষণসূত্রে *নটপালার* অভিনয়ে বর্ণনাত্মক গীত ও কাব্য এবং সংলাপাত্মক গীত এই তিন ধরনের উপাদানের সমন্বয় আখ্যান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে বর্ণনাত্মক গীত এবং কাব্যের ব্যবহারই মুখ্য। তবে *নটপালার* বর্ণনাত্মক অভিনয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এটি যৌথভাবে পরিবেশিত হয়, অর্থাৎ বর্ণনাত্মক পদ-এর (গীত অথবা কাব্য) ক্রম-বিন্যাসকে গায়েন এবং দোহার যৌথ অংশগ্রহণে পরিবেশন করা হয়ে থাকে–

গায়েন : (বর্ণনাত্মক কাব্য)

চলিতে চলিতে রাই সূর্যকুণ্ড পাইলা।

সূর্যকে প্রণতি করি পুনহ চলিলা॥

দোহার : (বর্ণনাত্মক কাব্য)

দুদিকে বকুল সেবী মধ্যে পঞ্চতার।

তারও অন্তে সখি সঙ্গে রাধার বিস্তার॥

গায়েন : (বর্ণনাত্মক কাব্য)

সখীগণে বলে তবে শুনো-ধ্বনি রাই।

কৃষ্ণ দরশনে যেতে দুঃখ কেনে তাই॥

মোরা সবা সখি মিলে বনান্তর হইতে।

নানা জাতি পুষ্প তুলি বিছাবো পন্থেতে॥

সেই ফুলের উপর দিয়ে রাধে করহ গমন।

অবশ্য হইবে তোর বন্ধু দরশন॥

হেন রাই বিনোদিনী কৃষ্ণ সঙ্গ পাবো বলি...(বর্ণনাত্মক গীত..)

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, আখ্যানের বর্ণনাত্মক কাব্যাংশটি গায়েন এবং দোহারের যৌথ অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় এবং বর্ণনাত্মক অভিনয়ে যৌথ অংশগ্রহণের এই ধারাতেই অতঃপর বর্ণনাত্মক গীত অথবা সংলাপাত্মক গীত পরিবেশিত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, রাধা-কৃষ্ণের এই আখ্যানটি অন্তমিল ছন্দে বর্ণনাত্মক কাব্যে বিন্যস্ত হওয়ায় স্বভাবতই এর পরিবেশনা কাঠামোটি হয় অত্যন্ত নমনীয়, যা গায়েনের অভিনয়ে বহুমাত্রিক (গীত, গদ্য ও কাব্যাভিনয়) সম্ভাবনা সৃষ্টি করে এবং একই সাথে তা গায়েনের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত শিল্প-জ্ঞান ও শৈলী সাপেক্ষ একটি ব্যাপার হয়ে ওঠে। কেননা ছন্দ ও মাত্রার বিভাজন রীতি-পদ্ধতিতে রচিত নাটলিপির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে– অন্তমিলে বিন্যস্ত বর্ণনাত্মক কাব্য একদিকে যেমন গীতাভিনয়কে (সংলাপাত্মক অথবা বর্ণনাত্মক) সাবলীল করে তোলে, অপরদিকে তা সংলাপাত্মক কাব্যাভিনয়ে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। এমনকি নির্দিষ্ট কিছু দৃশ্য বা পালা অংশের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক তাৎক্ষণিক গদ্যাভিনয়ের যে বহুল প্রচলিত রীতিটি স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যে দৃষ্ট হয়, সেটিও বস্তুত বর্ণনাত্মক কাব্যে বিন্যস্ত আখ্যানের একটি নাটকীয় ফলশ্রুতি– The dramatic lyric can bring a certain objective quality to an otherwise highly subjective and personal form such as the lyric. The narrative too, as one nonstop flow, is likely to lose the listerner's attention, but the insertion of dialogue can make the narration lively.[২০৪] বলা যায় কাব্যের এই সকল নমনীয় গুণাবলিই বস্তুতপক্ষে *নটপালার* গায়েন ও দোহারের যৌথ অংশগ্রহণপূর্বক বহুমাত্রিক অভিনয়কে সম্ভবপর করে তোলে এবং প্রথমপুরুষে সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সাবলীল করে তোলে। এতে পরিবেশনার দীর্ঘ বর্ণনাত্মক অভিনয়ে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, তেমনি প্রথমপুরুষে সংলাপাত্মক গীত পরিবেশনার মাধ্যমে আসরে কৃষ্ণ মহাভাবের এক পরমানন্দীয় আবেশ ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। সুতরাং উপরোক্ত সকল আলোচনায় একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, *নটপালার* অভিনয়ের রীতিগত মূল

---

২০৪ K. Ayyappa Paniker, *Indian Narratology*, Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi, 2003, P. 33

ভিত্তিটি বর্ণনাত্মক বিশেষত বর্ণনাত্মক কাব্য এবং এই বর্ণনাধর্মিতার উপর ভিত্তি করেই অতঃপর সংলাপাত্মক গীতাভিনয় সম্পন্ন হয়।

পরিশেষে *নটপালার* সার্বিক বিশ্লেষণসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, উপাদান-বৈশিষ্ট্যের আলোকে অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান অন্বেষণ বা নির্ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে। আর এই ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণকে এক এবং অভিন্ন রূপে ভাব-দেহে মূর্ত করা অথবা 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ'- প্রক্রিয়াটির যে প্রায়োগিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে সেই বিষয়টিকে পরবর্তী আলোচনায় গ্রহণ করা যায়। কেননা এই প্রক্রিয়াটিতে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপযোগী ভাব ও দেহের কৌশলগত প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের প্রভূত সম্ভাবনা নিরিখে এটিকে একটি কার্যকর অনুশীলন উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। *নটপালার* বিশ্লেষণে আরও পরিলক্ষিত হয় যে, এই প্রক্রিয়ার গভীরে সচল দর্শনগত ভিত্তিটিই মূলত অভিনয়ের রীতি, বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক এবং কাঠামোর ওপর ব্যাপক ও সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে– যেহেতু রাধা-কৃষ্ণ একাত্মা, অদ্বৈতরূপে মর্ত্যে যুগ্মাবতার, সেহেতু দেহের প্রকাশেও পায় না ভিন্ন কোনো রূপের অবয়ব বরং 'ভাব-দেহে মূর্ত' হয়ে আসরে ভক্তের সম্মুখে হয় প্রাণবন্ত।

নটপালার আসরে গায়েন পরিবেশিত রাধা-কৃষ্ণের 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' বা 'ভাবের কল্পিত রূপায়ণ' প্রক্রিয়াটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, এটি কুশীলবকে যুক্তি ও কার্যকারণের বিপরীতে ভাব, ভক্তি ও বিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং একই সাথে কুশীলবকে দৈনন্দিন-অতিরিক্ত নৃত্যধর্মী সক্ষমতায় পূর্ণ (ড্যান্সিং কোয়ালিটি) একটি কাব্যময় দেহাবয়ব নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে। যেটি কৌশলগতভাবে সম্পূর্ণতই কুশীলবের (গায়েনের) ব্যক্তিগত দক্ষতা, সক্ষমতা এবং শিল্প-রুচি ও জ্ঞান সাপেক্ষ একটি ব্যাপার। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি প্রদর্শনমূলক তাই উৎকর্ষের শিখরে উন্নীত হওয়া সাপেক্ষেই কেবল একজন কুশীলব/গায়েন তাঁর ভক্তদের সম্মুখে *নটপালার* আসরে হাজির হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের– নাম এবং ভাব গায়েনকে উদ্দীপ্ত করে ঠিকই কিন্তু এই উদ্দীপনা সম্পূর্ণতই ব্যক্তির বর্ধনশীল দেহ-শৌর্যের ছন্দময় ভাষা ও শৈলীর উৎকর্ষময় অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সাপেক্ষ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই প্রক্রিয়ায় কোনো বিশেষ ও বিধিবদ্ধ শরীর-ভঙ্গির নির্মাণ বা চলন ব্যতিরেকেই একজন কুশীলব যখন একটি কাব্যময় দেহ-অবয়বে কৃষ্ণের বর্ণনা করেন তখন কিন্তু আদতে কৃষ্ণ-ভাবের কল্পিত দেহরূপ বা ভাব-দেহকেই ক্রমান্বয়ে মূর্ত করে তোলেন। আর এভাবেই কুশীলব/গায়েন নিজের দৈনন্দিন বা নিত্য শরীরকে অতিক্রম করে কাব্যময় দেহের ভাষায় কৃষ্ণের ভাব-দেহকেই মূর্ত করে তুলতে সক্ষম হন। ফলে কৃষ্ণ-ভাব ও ভক্তির পুরো বিষয়টি সুর, ছন্দ, তাল, লয়ের কাব্যময়তায় প্রদর্শনমূলক হয়ে ওঠে। ভক্ত বা বিশ্বাসীগণ কুশীলবের প্রদর্শিত এই কাব্যময় ভাব-দেহকেই অতঃপর কৃষ্ণ-জ্ঞানে প্রণতি জানায় বা ভক্তিতে, বিনয়ে অবনতশীল হয়ে ওঠে। একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' প্রক্রিয়াটি মূলত *আকারের*

বা নির্দিষ্ট কতিপয় ভঙ্গিগত আকৃতি নির্মাণের বিপরীতে গায়েনের শরীরে অসংখ্য ভাব-আকৃতির ছন্দময় প্রবাহ সৃষ্টি করে। ফলে দর্শক/ভক্ত/বিশ্বাসীগণ কোনো নির্দিষ্ট ভঙ্গির সীমাবদ্ধতায় বা মডেলরূপে রাধা-কৃষ্ণকে দেখতে পায় না বলেই সম্ভবত আসরে দেবতাদ্বয়ের অধিষ্ঠান এত গভীর বিশ্বাসে সত্যমূলক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে দুটি দিক রয়েছে– একদিকে গায়েনের ভাব ও ভক্তির একটি ব্যাপার, যেটি জাতি-সংস্কৃতির পরম্পরা ও চর্চায় 'বিশ্বাস' সূত্রে অর্জিত হয় এবং অপর দিকটি হচ্ছে ব্যক্তির দৈহিক উৎকর্ষ যা সুর, ছন্দ, তাল, লয়ের সমন্বয়ে তৈরি একটি নমনীয় শরীরের ধারণা, যেটি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ সূত্রেই অর্জিত হয়।

এদিকে দেশজ নাট্যকলার অন্তর্ভুক্ত কৃত্যমূলক পরিবেশনা এবং নগরকেন্দ্রিক নাট্য পরিবেশনার মধ্যে মূল পার্থক্যটি দর্শনগত– একটি হচ্ছে কৃত্যের অনুষঙ্গ (ধর্মীয় ও সামাজিক), এবং অপরটি বিনোদনের অনুষঙ্গ। কৃত্যমূলক পরিবেশনায় ভক্ত/দর্শক-কুশীলবের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মিত হয় ভক্তি, বিশ্বাস, আস্থা এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রে। পক্ষান্তরে বিনোদনমূলক পরিবেশনায় দর্শক-কুশীলবের পারস্পরিক সম্পর্কে ভক্তির বিষয়টি অকার্যকর এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বিষয়টিও এক্ষেত্রে নানান শর্ত সাপেক্ষে নির্মিত (আলো/অন্ধকার বিভাজন, আসন বণ্টন ইত্যাদি) হয়। তাছাড়া বর্ণনাত্মক অভিনয়ে নগরায়তনিক অভিনেতার দুটি সাধারণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়– এক. যথাযথ ভাব/ভক্তি/বিশ্বাস বিহীন আখ্যানোক্ত তথ্যের বিবরণ দান করা বা ঘটনার বিবৃতি প্রদানমূলক বর্ণনাত্মক অভিনয় করা এবং দুই. তাল, লয়, সুর, ছন্দে পরিপূর্ণ একটি কাব্যময় দেহ বা নৃত্যধর্মী বহুমাত্রিক সক্ষমতায় সংযুক্ত বা সম্পর্কযুক্ত করা ব্যতিরেকেই কেবল আবেগতাড়িত হয়ে বর্ণনা প্রদান করা। অর্থাৎ ভাব/ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে বহুমাত্রিক শরীর সক্ষমতার সমন্বয়হীনতাই নগরায়তনিক নাট্যকলার বর্ণনাত্মক অভিনয়ের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এরূপ প্রেক্ষাপটে 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' প্রক্রিয়াটি নগরায়তনিক বর্ণনাত্মক পরিবেশনায় অভিনেতার/গায়েনের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়নে বিশেষত অভিনেতার ভাব/ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে বহুমাত্রিক শরীর সক্ষমতার মেলবন্ধন রচনায় কার্যকর একটি অনুশীলন উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কেননা এই প্রক্রিয়াটি সুর, ছন্দ, তাল, লয়ের সাথে দেহের শৌর্য– তাণ্ডব ও লাস্য, শৌর্যের বহুমাত্রিক বর্ধন ও বিন্যাসের সমন্বয়ে একটি নৃত্যধর্মী কাব্যময় শরীর নির্মাণে শর্ত-সাপেক্ষ করে তোলে। অভিনেতা তাঁর শরীরের অর্জিত বহুমাত্রিক কাব্যময় সক্ষমতার সাথে নির্দিষ্ট/বিশেষ কোনো ভাব, ভক্তি বা বিশ্বাসের মিথস্ক্রিয়ায় অতঃপর বিষয় বা চরিত্রের ভাব-দেহকে মূর্ত করে তুলতে পারেন। তবে এই প্রক্রিয়াটিতে ভাব ও দেহের মধ্যে যে মিলন, সম্মিলন ও সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছে এটি ব্যক্তির শিল্পচিন্তা, জ্ঞান ও শৈলী সাপেক্ষ একটি ব্যাপার এবং যার অন্তস্থ প্রাথমিক উৎস হচ্ছে কল্পনা এবং মৌল ভিত্তি হচ্ছে ভাব (নটপালার ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণ)। সেক্ষেত্রে 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' বিষয়টি প্রকারান্তরে কুশীলবের/গায়েনের সৃষ্টিশীল কল্পনারই ভাব-দেহে রূপান্তর, মূর্তকরণ বা প্রদর্শনমূলক

একটি প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। সুতরাং গুরুত্ব ও সম্ভাবনার বিচারে নগরায়তনিক বর্ণনাত্মক পরিবেশনায় কুশীলব/অভিনেতার দেহের তাল, লয়, সুর, ছন্দের সাথে ভাবের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বহুমাত্রিক ও নমনীয় অভিনেতার (নটপালা অনুরূপ) অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি কার্যকর অনুশীলন উপাদান হিসেবে *নটপালার* 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' প্রক্রিয়াটিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

২.২.৩ মণিপুরী খেলা : থাঙ-তা

ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন

থাং-তা মণিপুরী (মেইতেই) জাতি-সংস্কৃতি ঐতিহ্যের বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় একটি খেলা। *থাং-তা* মূলত মনিপুরীদের প্রাচীন শিকার ও সমর কৌশল থেকে বিবর্তিত আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের শারীরিক কৌশল ও কসরৎ জাতীয় একটি খেলা, যা অনেকাংশে 'মার্শাল আর্ট' নামেও পরিচিতি লাভ করেছে। *থাং* অর্থ তলোয়ার এবং *তা* অর্থ হলো বর্শা। অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধমূলক লড়াইয়ের নিমিত্তে এই সকল অস্ত্র দিয়ে নানাবিধ শারীরিক কলা-কৌশল এবং কসরৎ প্রদর্শন করাই হচ্ছে এই খেলার মূল উপজীব্য। ইতিহাসসূত্রে জানা যায় যে, যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রাচীন মণিপুরীদের মাঝে তলোয়ার এবং বর্শার ব্যবহার ছিল ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এমনকি আকার এবং বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তলোয়ারের বহু ও বিচিত্র সব নাম রাখা হতো, যেমন– থাংজৌ, থাংগোন, থাংশাং, থাংপাক, থাংচেপ, কাবাকথাং, থাং খৌবোম্বা, তরুংথাং, তেনদোংথাং ইত্যাদি। আবার বর্শার ক্ষেত্রেও একাধিক নামের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়– যেমন, হাকথং তা, চাইনা তা, টারেন তা প্রভৃতি। *তা* বা বর্শার ব্যবহারে যে সকল নৈপুণ্য প্রদর্শন হতো সেটিকেও একটি সমরকলা হিসেবে দেখা হতো, যেমন– 'তা-খৌশাবা'। তবে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তলোয়ার ব্যবহার সম্পর্কে জানা গেলেও বর্শা ছিল মূলত শিকারের অস্ত্র। পরে বর্শাকেও লড়াই বা যুদ্ধের একটি অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাচীন মণিপুরীদের সমর কৌশল এবং অস্ত্র চালনায় পারঙ্গমতার কথা সর্বজন বিদিত ছিল– 'কথিত আছে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ইঙ্গ-মণিপুরী যুদ্ধের মহান বীর মেজর পাওনা ব্রজবাসী অসি চালনায় এতটাই দক্ষ ছিলেন যে, তার দিকে এক মুঠো রাই সরিষা ছুঁড়ে দিলে নাকি তিনি মাটিতে পড়ার আগেই সমস্ত সরিষা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতেন।'[২০৫] বস্তুত মণিপুরীদের এই প্রাচীন সমরকৌশল, অস্ত্রবিদ্যা এবং লড়াইয়ের যে গৌরবময় ঐতিহ্য, তারই ক্রম বিবর্তিত একটি রূপ হচ্ছে বর্তমান মণিপুরী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের *থাঙ তা* পরিবেশনা। তবে বর্তমানে এই খেলায় তলোয়ারের কলা-কৌশল প্রদর্শন ছাড়াও অন্য আরও বেশ কিছু কসরৎ ও কৌশলের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যেমন– নান-চাকু খেলা, মার্শাল-আর্ট প্রদর্শন, চোখ বন্ধ রেখে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শনমূলক কিছু খেলা প্রভৃতি।

থাঙ তা বর্তমানে মণিপুরী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি জনপ্রিয় খেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও এটিকে নৃত্যের একটি অনুষঙ্গ হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়। মণিপুরী গবেষক এ কে শেরাম এই খেলাটিকে *থাঙ তা জাগোই* বা *থাঙ তা নৃত্য* নামে অভিহিত করে এর সাথে প্রাচীন মার্শাল নৃত্য– *থাঙ হাইবা* এবং *তা-খৌশাবার* যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করেন– 'থাঙ হাইবা বা অসি চালনা এবং 'তাখৌশাবা বা বর্শা নিয়ে নানা শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন সাম্প্রতিক কালে শিল্পসম্মত কলাকৌশল হিসেবে মঞ্চে প্রদর্শিত হচ্ছে। এ নৃত্যের পদগতি ও

২০৫ এ কে শেরাম, *মণিপুরীদের ঐতিহ্যময় নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত*, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৩

মাত্রা গাণিতিক ছকে বাঁধা। 'মার্শাল আর্ট' নামে পরিচিত এসব নৃত্য-বিষয় ইদানীং প্রচুর দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছে।'[২০৬] গবেষক এ কে শেরামের এই মন্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় কপিলা বাৎসায়ন প্রণীত *ট্রাডিশনস্ অব ইন্ডিয়ান ফোক ড্যান্স* গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে এই নৃত্যকে 'মার্শাল নৃত্য' নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এটিকে মণিপুরীদের অতি প্রাচীন সাংস্কৃতিক উৎসব *লাইহারাওবা*র কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়–

> On the concluding day of the *Lai Haroba* festival, many martial dances are performed. They are known by the generic terms *Thang Haiba* and *Takshaw Saiba* or *Ta-Khoushaba*. The mood of quiet austerity is replaced by a virile fierceness: daggers, spears, swords, shields, maces are held. Movements are quick, swift and sharp. Crisp hops extensive open movements with reminiscent of fencing techniques is characteristic of others. The figure-of-eight movements in the air with war implements realling ancient stick techniques can be seen in yet other phases. The impression of a soft lyrical romantic curvilinear movement with flowing torsos is totally absent.[২০৭]

তবে প্রতিরোধমূলক লড়াইয়ের শারীরিক কসরৎ এবং কৌশলধর্মী *থাঙ তা* খেলার সাথে প্রাচীন উৎসব *লাইহারাওবা*র যোগসূত্র থাকলেও এটি প্রত্যক্ষভাবে কোনো দেব দেবী বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে পরিবেশিত হয় না। বরং বলা যায় যে, বর্তমানে এই খেলাটি সম্পূর্ণতই বিনোদনের উপাদান হিসেবে নানান উৎসব বিশেষত *রাস* উৎসবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। যদিও খেলাটির শুরুতে ভক্তি নিবেদনার্থে কতিপয় ভঙ্গি প্রদর্শন করা হয় যাতে দেবতা *ইমা লৈমারেন সিদবা* ও *ইপুধৌ পাখাংবা*কে স্মরণ করা হয় তথাপিও এই সকল ভক্তি নিবেদনে শিক্ষাগুরু, আদিগুরু এবং দর্শকই মুখ্য হয়ে ওঠে এবং প্রদর্শনীটি দর্শকের বিনোদনের উদ্দেশ্যেই পরিবেশিত হয়– 'এই খেলায় ধর্মের সাথে কোনো যোগাযোগ নাই, এইটা হলো আত্মরক্ষার জন্য। তবে রাস উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সাথে থাঙ তা খেলাটিও হয়ে থাকে।'[২০৮] খেলাটির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা না থাকলেও থাঙ বা তলোয়ারের সাথে মণিপুরীদের কিছু কিছু সামাজিক কৃত্যানুষ্ঠানের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়– যেমন, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠি পূজায় থাঙ-এর পূজা করা বা মৃতের সৎকারের পর থাঙ দিয়ে মাটিতে সাতবার দাগ দিয়ে মৃত্যুর দরজা বন্ধ করা ইত্যাদি।

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

---

২০৬ প্রাগুক্ত

২০৭ Kapila Vatsyayan, *Traditions of Indian Folk Dance*, Clarion books, New Delhi, 1987, P. 134

২০৮ থাঙ তা প্রদর্শনকারী এল. বিদ্যা'র সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকারটি ধারণ করা হয় ১৩/৭/২০১৫, ভানুবিল, মাঝের গাঁও, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ থেকে.

বক্ষ্যমাণ গবেষণার মাঠ পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে ১৩/৭/২০১৫ তারিখ কমলগঞ্জের আদমপুর বাজার সংলগ্ন ভানুবিলের মাঝেরগাঁও গ্রামের একটি মন্দির প্রাঙ্গণে প্রত্যক্ষণ করা হয় মণিপুরী খেলা *থাঙ তা*। খেলাটি মণিপুরী সংস্কৃতির একটি অনুষঙ্গ হলেও যেহেতু এটি প্রত্যক্ষভাবে দেব-দেবী বা ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানের সাথে সম্পৃকক্ত নয় সেহেতু এর দল গঠন, প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটিও ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়, যা পূর্বের আলোচিত *রাসনৃত্য* এবং *নটপালার* দল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার অনুরূপ নয়। এই খেলার দল গঠনে জাতি-সমষ্টির সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটলেও বস্তুত দল গঠনের প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির উৎসাহ এবং উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। মাঝেরগাঁওয়ের *থাঙ তা* মাস্টার/গুরু এবং প্রধান খেলোয়াড় এল. বিদ্যার (৪৫) সাথে আলাপন সূত্রে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, এই খেলার সাথে যারা যুক্ত হন তাঁরা একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকেই যুক্ত হন। এল. বিদ্যা যিনি পেশাগতভাবে একজন স্বর্ণকার, তিনিসহ অপর ৩/4 জন সদস্য মিলে এই দলটি গড়ে তোলেন এবং অত্র অঞ্চলে *থাঙ তা* খেলার প্রচলন অব্যাহত রেখেছেন। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এল. বিদ্যা জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বেশ সুনাম অর্জন করেন।

থাঙ তা খেলার প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে সম্পাদিত হয় এবং খেলাটির যাবতীয় কসরৎ ও কলা-কৌশলের চূড়ান্ত উৎকর্ষ অর্জিত হয় শরীর-শিক্ষণ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে পরিচালিত চলন, সঞ্চালনযুক্ত কতিপয় ভঙ্গি বা কসরৎ প্রদর্শনের মাধ্যমে। মাঠ পর্যবেক্ষণে শারীরিক কসরৎ এবং কৌশলের যা কিছু ভঙ্গি ও চলন পরিলক্ষিত হয় এর মৌল পজিশনটি বক্র হাঁটু বা বেন্ট হাঁটুতে দুই পায়ের ওপর সমান ভর ও ভারসাম্যে নির্মিত হয়, মণিপুরী মেইতেই ভাষায় যাকে বলে *ফিবাম*। মূলত এটিই হচ্ছে *থাঙ তা* খেলায় দেহের মৌল পজিশন, যা মেরুদণ্ড সোজা রেখে দেহের ডান ও বাম পাশে প্রসারিত বক্র হাঁটুতে (হাফ সিটিং পজিশন) দুই পায়ের ওপর বিন্যাস করা হয়। এল. বিদ্যার ব্যাখ্যায় *ফিবাম*ই হচ্ছে *থাঙ তা* খেলার শক্তির উৎস, যা দুই পায়ের পেশিশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নাভির নিচে শরীরের মধ্যবর্তী অংশের কেন্দ্র দ্বারা উৎসরিত হয়। পজিশনটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই পজিশনে থেকে আঘাত, প্রত্যাঘাত এবং আত্মরক্ষার্থে চারটি কৌণিক দিকের যেকোনো দিকে ত্বরিত মুভমেন্ট, প্রতিপক্ষের অবস্থানের ওপর সু-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বা ফোকাস স্থির রেখে দেহের গতিকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। পর্যবেক্ষণসূত্রে দেখা যায় যে, এই *ফিবাম* থেকেই অতঃপর সঞ্চালিত হয় দেহের নানাবিধ চলন ও ভঙ্গি যেমন– *খংচাৎ চাৎপা* (পদক্ষেপ বা স্টেপ, যা সামনে পিছনে ডানে ও বাঁয়ে সঞ্চালিত হয় এবং এর সাথে আক্রমণ অথবা প্রতিহতকরণের ভঙ্গিযুক্ত হাতের ব্যবহারও সঞ্চালিত হয়), *লৈবা* (চক্রবাক– খংচাৎ চাৎপা-এর চলনেই বৃত্তাকারে ঘোরা, এটিকে বাঘের সাথে লড়াইয়ের কৌশলগত ভঙ্গিও বলা হয়ে থাকে), *থিমবা* (এটি সম্পূর্ণ হাতের একটি ভঙ্গি, যা আঘাত করা, তলোয়ার বা বর্শার আঘাতে বিদ্ধ করার ভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করে), চার অক্ষরে কাটা (চারটি স্টেপে হাত ও শরীরের স্পাইরাল বা সর্পিল পদক্ষেপ, যা সামনের ও পিছনের

প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় আঘাত, প্রত্যাঘাত বা প্রতিরোধমূলক চলন ও সঞ্চলনকে যুক্ত করে) প্রভৃতি কৌশলগত চলন পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত *ফিবাম* থেকেই প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন কসরৎ ও কৌশলগত ভঙ্গি বা চলনের শুরু হয় এবং পুনরায় *ফিবাম* অবস্থানে এসে তা শেষ হয়, যা এই খেলার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আঘাত, প্রত্যাঘাত, প্রতিহতকরণ যাবতীয় কসরৎ এবং কৌশলসমূহের শুরু এবং শেষটি *ফিবাম* দ্বারা সম্পাদিত হয়।

থাঙ তা খেলায় *খংচাৎ চাৎপা* অথবা *চার অক্ষরের কাটা*– এ দুটি কসরৎ প্রভূত তাৎপর্য বহন করে। এই দুটি কসরৎ অনুবর্তী দেহের চলনে যে সকল গতি প্রদর্শিত হয় এবং এই গতি অনুবর্তী হাতের আঘাত ও প্রত্যাঘাতমূলক যে সকল কসরৎ প্রদর্শিত হয় তাতে স্পাইরাল বা সর্পিল চলন অনুরূপ গতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্পিল গতির এই চলন যেমন পদক্ষেপের মাধ্যমে ভূমিতে বিমূর্ত নক্সা রচনা করে তেমনি তলোয়ার হাতে ঘূর্ণনযুক্ত নানাবিধ কসরৎ বাতাসে সর্পিল গতি তৈরি করে। বস্তুত *থাঙ তা* খেলার এই মার্শাল আর্ট অংশের দেহের চলন *স্পাইরাল* বা সর্পিল গতি দ্বারা বিন্যস্ত হওয়ায় তা প্রতিপক্ষকে সামনে ও পিছন থেকে আঘাত, প্রত্যাঘাত এবং প্রতিরোধের কৌশল প্রদর্শনের কাজটিকে সহজ ও সাবলীল করে তোলে। এছাড়াও *থাঙ তা* মুভমেন্টে আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যেমন– বক্র হাঁটুতে মুভমেন্ট বা চলন অথবা স্টেপের কারণে দেহ-শৌর্য নিম্নমুখী প্রবণতায় বিন্যস্ত বা ব্যবহৃত হয়, যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে সকল মুভমেন্টের প্রণোদনা বা উৎস হিসেবে সক্রিয় হয়। ফলে একদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে দেহের অবস্থান, অপরদিকে গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন– শৌর্য এবং গতি এই দুয়ের সমন্বিত প্রয়োগ শেষাবধি খেলোয়াড়/কুশীলবের নির্ধারিত মুভমেন্টকে হালকা, নিয়ন্ত্রিত, নিপুণ শৈলী-সাপেক্ষ করে তোলে। সুতরাং সার্বিক বিচারে *থাঙ তা* খেলায় যা কিছু কসরৎ এবং কৌশল প্রদর্শিত হয় এর মূলে শৌর্য, সর্পিল গতি এবং বক্র হাঁটুতে মুভমেন্ট– এই তিনটি বিষয়ের এক মহা-মিলন বা সমন্বয়কে কৌশলগত ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

থাঙ তা খেলার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ হলো কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় মার্শাল আর্টের নানাবিধ কসরৎ-এর সাথে ভোজবাজিমূলক কৌশলের সমন্বিত প্রদর্শন। এই খেলায় ভোজবাজিতুল্য যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে– *নানচাকুর* নিপুণ কসরৎ-এর সাথে প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা নির্বাপণ করা। খেলাটিতে আসন করে বসে থাকা দলের একজন সদস্যের মাথার ওপরে ছোট্ট একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে চোখ বন্ধ অবস্থায় *নানচাকুর* প্রচণ্ড ঘূর্ণন আঘাতে মাথা এবং মোমবাতিটিকে অক্ষত রেখে কেবল অগ্নিশিখাটি নির্বাপণ করা, অথবা ধারালো তলোয়ারের নিপুণ কসরৎ-এর সাথে কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই পরপর আঘাতে হাতের তালুতে, বুকে বা পেটের ওপর রাখা ফল/সবজি (লাউ, পেঁপে, কুমড়া) কেটে ফেলা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়ের মাঠ পর্যবেক্ষণে মোমবাতির শিখা নির্বাপণের খেলাটি প্রত্যক্ষণ করা হয়। যে

কোনো সাধারণ দর্শকের জন্যই এই খেলাটি হতে পারে গভীর ও শ্বাসরূদ্ধকর একটি অভিজ্ঞতা, কেননা চোখ বন্ধ অবস্থায় (যেকোনো প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে চোখে কালো কাপড় বাঁধার পূর্বে চোখের ওপর গুঁড়ো মাটির আস্তর দিয়ে তার ওপর কাপড়টি বেঁধে নেওয়া হয়।) *নানচাকু*র প্রচণ্ড ঘূর্ণন আঘাতে মাথার ওপরে রাখা মাত্র দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি উচ্চতার একটি মোমবাতির প্রজ্বলিত শিখাটিকে নিভিয়ে ফেলা হয়। খেলাটি দর্শককে তীব্র উত্তেজনায় শঙ্কিত করে তোলে এই ভেবে যে, সামান্যতম অসতর্কতার কারণে ভয়ঙ্কর *নানচাকু*র প্রচণ্ড ঘূর্ণন গতির আঘাতটি প্রজ্বলিত শিখার পরিবর্তে মাত্র দুই/আড়াই ইঞ্চি নিচে সাহায্যকারীর মাথায় লাগতে পারে, এমনকি মোমবাতিটির আধার/ধারক বস্তুটিকেও আঘাত করতে পারে। কিন্তু সকল শঙ্কা আর উত্তেজনা জয় করে *নানচাকু*র ঘূর্ণন গতির আঘাত শেষ পর্যন্ত প্রজ্বলিত শিখাটিকেই নিভিয়ে দেয়। খেলাটির লক্ষ্যই যদি হয় প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা নির্বাপণ করা তবে তা যেকোনো একটি স্ট্যান্ডের ওপর মোমবাতিটি রেখেও করা যেতে পারতো। কিন্তু মোমবাতির ধারক হিসেবে একজন কুশীলবের অংশগ্রহণ খেলাটিকে যে কেবল উত্তেজনায় আকর্ষণীয় করে তোলে তা-ই নয়, প্রকারান্তরে তা খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত কসরৎ-এর কৌশলগত দক্ষতা এবং নিপুণ আঘাতে সুনির্দিষ্ট থাকার বিষয়গুলোকেও প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা সম্ভব হয় কী করে? এটা কি শুধুই একটি কৌশল, নাকি কৌশল অতিরিক্ত আরও কিছু গূঢ় রহস্য আছে এই খেলার গভীরে? উত্তরে এল. বিদ্যা বলেন– 'সব কথা তো খুলে বলা যাবে না, নিষেধ আছে, তবে চোখ বেঁধে আঘাত করার বিষয়টিতে হাতের একটা তাল আছে, মনের পজিশন আছে, নানচাকুর ঘোরানোর মধ্যে দিয়ে হাতের পজিশনের ধারণাটি ঠিক করে নেওয়া হয়।'[২০৯]

উক্তিটিতে 'হাতের তাল' এবং 'মনের পজিশন' কথা দুটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইঙ্গিত বহন করে, যা মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতার সীমাহীন সক্ষমতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে বা এ জাতীয় ধারণার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান 'চোখ' সাময়িকভাবে অকার্যকর থাকে সেহেতু এই খেলায় শরীর ও মনকে কেন্দ্রস্থিত করণের ধারণা, লক্ষ্য-স্থিরগত ধারণা, পরিমাপের ধারণা, স্থানিক ধারণা, দেহের অবস্থান বা পজিশনগত ধারণা, সময়, ছন্দ ও লয়গত ধারণা প্রভৃতি মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতার নিখুঁত সম্পাদনা বস্তুত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এবং সীমাহীন সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে *থাঙ তা* খেলার এই পুরো বিষয়টিতে মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতায় সৃষ্ট 'তৃতীয় নয়ন' বা 'অন্তরদৃষ্টি' ক্রিয়াশীল হয় এবং এই 'অন্তরদৃষ্টি' সূত্রেই অতঃপর সম্পাদিত হয় মোমবাতির প্রজ্বলিত শিখা নির্বাপণের কর্মটি। বস্তুত এ হচ্ছে সেই 'তৃতীয় নয়ন' বা 'অন্তরদৃষ্টি' যা দেহের অন্তরস্থ গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন 'মনোযোগকে' সক্রিয় করে তোলে– The strongest point of concentraton is centred in the spot between the eyebrows, slightly lower than where women place the *bindi*. It is from this spot that the 'inner eye' is

২০৯ থাঙ তা প্রদর্শনকারী এল. বিদ্যার সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকারটি ধারণ করা হয় ১৩/৭/২০১৫, ভানুবিল, মাঝেরগাঁও, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ থেকে

awakened.[২১০] এই মনোযোগসূত্রেই নির্দিষ্ট হয় ‘হাতের তাল’ এবং ‘মনের পজিশন’ যা বস্তুর (মোমবাতি) সাথে অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে অতিরিক্ত সংবেদনশীল সক্ষমতায় সক্রিয় করে তোলে। ফলে কান কেবল শ্রবণ ইন্দ্রিয়কেই নয় বরং দর্শন ও স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের ধারণাকেও সুনির্দিষ্ট করে তুলতে পারে– ঠিক যেভাবে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কান, নাক, তক এবং জিহ্বার ইন্দ্রিয়গত সংবেদশীলতা দ্বারা দর্শন-ইন্দ্রিয়কে কার্যকর করে তোলে। আর এভাবেই *থাঙ তা* খেলায় ‘কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা’র ইন্দ্রিয়গত সীমাহীন সংবেদনশীলতার প্রয়োগ কৌশলগতভাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ-সাপেক্ষ একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে আবির্ভূত হয়– ‘Try to see with your ears, try to hear with your eyes, is the central principle of Thang-ta.’[২১১]

থাঙ তা খেলার কৌশলগত বৈশিষ্ট্য অন্বেষণসূত্রে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা যায়– এক. গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা, যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে ক্রিয়াশীল শৌর্যকে বক্র হাঁটুতে সর্পিল গতি অনুবর্তী চলন বা মুভমেন্টের সাথে যুক্ত করে শরীরকে হালকা, নিয়ন্ত্রিত ও নিপুণ দক্ষতায় শৈলীবদ্ধ করে তোলা এবং দুই. ‘কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা’র ইন্দ্রিয়গত সীমাহীন সংবেদনশীলতাকে কৌশলগত চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা। গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিচারে এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে অভিনেতার প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণের উপাদান হিসেবে পরবর্তী আলোচনায় যুক্ত করা হলো।

২১০ Rustom Bharucha, *The Theatre of Kanhailal; Pebet & Memories of Africa,* Seagull, Calcutta, 1998, P.25
২১১ প্রাগুক্ত

মাঝেরগাঁও গ্রামে *থাঙ* তা খেলার পরিবেশন পর্যবেক্ষণে তিনটি পর্যায়ক্রম পরিলক্ষিত হয়– এক. একক কুশীলব/খেলোয়াড়ের খালি হাতে এবং তলোয়ার হাতে মার্শাল আর্টের নানাবিধ কসরৎ প্রদর্শন, দুই. একক কুশীলবের *নানচাকু*র ঘূর্ণনযুক্ত কসরৎ প্রদর্শনের সাথে মোমবাতির প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নির্বাপণে ভোজবাজিমূলক প্রদর্শন এবং তিন. দুই জন খেলোয়াড়ের একে অপরকে আক্রমণ, প্রতিআক্রমণে পরাস্তকরণের লক্ষ্যে তলোয়ার যুদ্ধের প্রদর্শন। 'দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ' শীর্ষক আলোচনায় *থাঙ* তা খেলায় নির্দিষ্ট কতিপয় ভঙ্গি, চলনযুক্ত কসরৎ ও কৌশল বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিশ্লেষণসূত্রে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিচারে দুটি বৈশিষ্ট্যকে অভিনেতার প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণে কার্যকর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন– এক. গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা, যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে ক্রিয়াশীল শৌর্যকে বক্র হাঁটুতে সর্পিল গতি অনুবর্তী চলন বা মুভমেন্টের সাথে যুক্ত করে শরীরকে হালকা, নিয়ন্ত্রিত ও নিপুণ দক্ষতায় শৈলীবদ্ধ করে তোলা এবং দুই. 'কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা'র ইন্দ্রিয়গত সীমাহীন সংবেদনশীলতাকে কৌশলগত চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা।

মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা *থাঙ* তা পরিবেশনা থেকে লব্ধ উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যকে নগরায়তনিক অভিনেতার শারীরিক এবং মনো-দৈহিক সক্ষমতার উন্নয়নে প্রভূত কার্যকর দুটি অনুশীলন উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা সর্পিল গতি অনুবর্তী চলন বা মুভমেন্টের বিষয়টিকে কেবল *থাঙ তা* খেলায় প্রদর্শিত ও নির্দিষ্ট কতিপয় ভঙ্গি বা চলনে সীমাবদ্ধ না রেখে একাধিক প্রদত্ত পরিস্থিতির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। অতঃপর তা অভিনেতাকে সম্ভাব্য দুই ধরনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে পারে– এক. সাধারণ অনুশীলন হিসেবে এটি যেমন অভিনেতার শরীরকে হালকা, নিয়ন্ত্রিত এবং নিপুণ শৈলীবদ্ধকরণ অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তেমনি দুই. এই অভিজ্ঞতা গতি-বৈচিত্র্যে পূর্ণ জটিল কোনো প্রদত্ত পরিস্থিতিতে অভিনেতার শারীরিক উপস্থিতি ত্বরিত ও তাৎক্ষণিক ক্রিয়াশীলতায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। অপরদিকে 'কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা'র বিষয়টি অভিনেতার ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীলতার প্রকাশ অভিজ্ঞতাকে সীমাহীন সক্ষমতায় উদ্দীপ্ত করতে পারে। কেননা অনুশীলনটিতে 'অন্তরদৃষ্টি' বা 'তৃতীয় নয়ন' হিসেবে *মনোযোগের* কেন্দ্রবিন্দুকে দুই ভ্রুর মাঝখানে স্থির না রেখে তা শরীরের একাধিক অঙ্গ বা অংশের সাথে যুক্ত করা বা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে কেন্দ্রস্থিতকরণের ধারণা, লক্ষ্য-স্থিরগত ধারণা, পরিমাপের ধারণা, স্থানিক ধারণা, দেহের অবস্থান বা পজিশনগত ধারণা, সময়, ছন্দ ও লয়গত ধারণা প্রভৃতির উন্নয়নপুর্বক মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতাকে সীমাহীন সক্ষমতায় উন্নীত করা সম্ভব। বস্তুত এই অনুশীলনটি ব্যক্তির পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গত যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সীমাহীন সম্ভাবনার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে পারে। সুতরাং গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিবেচনায় *থাঙ তা* খেলার অপরিহার্য এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে অভিনেতার প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদান হিসেবে পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২.৩ পর্যালোচনা

'মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা' শীর্ষক বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের 'ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– মণিপুরী' শিরোনামে মণিপুরী জাতি-সংস্কৃতির তিনটি (৩) পরিবেশনাকে বিশদ বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশ্লেষিত তিনটি পরিবেশনার মধ্যে দুটি কৃত্যনাট্য– 'রাসনৃত্য' ও 'নটপালা' এবং অপরটি মণিপুরী 'থাঙ তা' খেলা। অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে প্রতিটি পরিবেশনার ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন, দল ও সাংগঠনিক কাঠামো, সামাজিক ও ধর্মীয় কৃত্যের সাথে এর সম্পর্ক, প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা, বিবরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি নাট্য-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে মূলত যে বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেটি হলো 'পরিবেশন প্রক্রিয়া' এবং এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কুশীলব/দের শরীর ও মন তথা মনো-দৈহিক উপস্থিতি। পরিবেশনায় কুশীলবের মনো-দৈহিক উপস্থিতি পর্যবেক্ষণে অতঃপর যে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় তা হলো– ধর্মীয় বা সামাজিক কৃত্যের প্রদত্ত আনুষ্ঠানিকতায় কুশীলবগণের দৈনন্দিন ব্যক্তিত্ব থেকে আরোপিত/অভীষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন/রূপান্তর প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় একদিকে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান অনুসৃত ভঙ্গি-চলন ও সঞ্চালন, ভাব-রস, সুর-লয়-ছন্দ, বিষয়, রীতি, আখ্যান প্রভৃতি, অপরদিকে কুশীলবের দেহের ভারসাম্য, ভরকেন্দ্র, বর্ধন, শৌর্যের সমন্বিত প্রয়োগ কতটুকু ও কিভাবে ব্যক্তি কুশীলবের রূপান্তরে এবং প্রদর্শিত চরিত্রের রূপায়ণে কার্যকর হয় তা গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি পরিবেশনার বিশদ বিশ্লেষণসূত্রে বস্তুত এমন কিছু উপাদান প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়, যা অভিনেতার শারীরিক এবং মনো-দৈহিক প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদানের সূত্র, উৎস বা প্রেরণা হিসেবে ক্রিয়াশীল হতে পারে। আর এই লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণকৃত *রাসনৃত্য, নটপালা* এবং *থাঙ তা* পরিবেশনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় পাঁচটি *বৈশিষ্ট্য* চিহ্নিত করে অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৪র্থ অধ্যায়ের চূড়ান্ত আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে এগুলো হচ্ছে– এক. অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ, দুই. বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি, তিন. ভাব-দেহের মূর্তকরণ, চার. গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা এবং পাঁচ. কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা'।

রাসনৃত্যের 'অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ' বৈশিষ্ট্যটির কৌশলগত ও প্রায়োগিক দিকগুলো নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, *রাসনৃত্যের* ঘূর্ণন, স্পাইরাল বা সর্পিল, ফিগার এইট মোশন, প্রভৃতি দেহশৈলী রূপায়ণের মূলে সক্রিয় *অন্তঃপ্রবাহ*টি হচ্ছে কুশীলবের দেহস্থিত শৌর্যের সচেতন বিন্যাস বা নির্দিষ্ট কিছু মডেল নির্মাণ। অর্থাৎ দেহস্থিত শৌর্য– 'লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবেরই' সচেতনভাবে বিন্যস্ত কতিপয় প্যাটার্ন বা মডেলের *জ্যামিতিক বিমূর্ত* প্রকাশ ঘটে কুশীলবের দেহে। ফলে *অন্তঃপ্রবাহ* হিসেবে শৌর্যের প্যাটার্ন বা মডেল নির্মাণের কৌশলগত এবং প্রায়োগিক বিষয়গুলো নির্দিষ্ট

করা সাপেক্ষে এই বৈশিষ্ট্যটিকে প্রত্যক্ষ অনুশীলন উপাদান হিসেবে চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে মনে করা হয়েছে। কেননা অভিনেতা তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং কল্পনার সমন্বয়ে কেবল রাস নির্দেশিত প্যাটার্নগুলোই নয় বরং এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অন্য একাধিক মডেলের *জ্যামিতিক বিমূর্ত* প্যাটার্ন/শরীর নির্মাণ ও বিনির্মাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেন এবং শৌর্য ভিত্তিক তাঁর অভিজ্ঞতা তথা মনো-দৈহিক ভঙ্গিগত অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারেন ।

অপরদিকে 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন ভঙ্গির' প্রায়োগিক এবং কৌশলগত দিকসমূহ নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে, এটি মূলত দৈহিক অনুশীলন নির্ভর একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি 'বক্র হাঁটুতে টো নির্ভর দেহাবস্থান' অভিনেতার শরীরে বহুমুখী ভঙ্গি নির্মাণ, বিনির্মাণ ও সম্পাদনে খোলা, উন্মুক্ত, হালকা, নমনীয় এবং অভিমুখীন হওয়ার বোধ বা উপলব্ধিকে সক্রিয় করে তুলতে পারে। ফলে এই ভঙ্গিটি কেবল *রাসনৃত্য* নির্দেশিত *স্পাইরাল* বা *সর্পিল, ফিগার এইট মোশন, ঘূর্ণন, উল্লম্ফন* প্রভৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রেই নয় বরং অভিনেতা তাঁর কল্পনাশক্তির ওপর ভর করে একাধিক মনো-দৈহিক ভঙ্গির নির্মাণ, বিনির্মাণ করতে পারেন এবং দেহের সচল-স্থিতি, গতি, ভর ও ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চলন অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারে।

রাসনৃত্যের আঙ্গিক এবং আহার্য অভিনয়ের মাধ্যমে রাধা এবং কৃষ্ণ পৃথক চরিত্রে সুনির্দিষ্ট রূপে আবির্ভূত হলেও *নটপালার* ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যায়নি, বরং তা বিপরীতক্রমে অর্থাৎ অভিন্ন অদ্বৈত রূপে রাধা-কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। এই পালাতে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক এমনকি আহার্য অভিনয়ের কোনো স্তরেই রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র রূপায়ণে পার্থক্য নির্দেশক মডেল নির্মাণ করতে দেখা যায় না। ফলে *নটপালার* আসরে রাধা-কৃষ্ণ অভিন্ন, অদ্বৈত রূপে গায়েনের ভাব-দেহে মূর্ত হয়। কেননা *নটপালার* দর্শনগত ভিত্তিটিও এমন যে, রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্র/ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয়, মুখ্য 'ভাব' হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে– এক *আত্মা*, একই *ভাব* হিসেবে শাস্ত্র দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আর সে কারণেই *নটপালার* গায়েন ও দোহারের পরিবেশনায় রাধা-কৃষ্ণ অভিন্ন রূপে কেবল ভাব-দেহে মূর্ত হয়ে ওঠে। *নটপালার* সার্বিক বিশ্লেষণে তাই 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ'- বিষয়টিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই বিষয়টিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণের যুক্তিটিও ভাব-রসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কেননা আমাদের দেশজ বা কৃত্যমূলক নাট্যকলায় আখ্যানের ক্রিয়াগত যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং অগ্রগতি বস্তুবাদী যুক্তি ও কার্যকারণের বিপরীতে ভাব ও রস দ্বারা বিচার/নিষ্পত্তি করা হয়, অর্থাৎ ভাব-রসের প্রদর্শনই নাট্য-ক্রিয়ার মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। তাই কৌশলগত প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের প্রভূত সম্ভাবনার নিরিখে 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' প্রক্রিয়াটি নগরায়তনিক অভিনেতার জন্য হতে পারে একটি কার্যকর অভিজ্ঞতা। কেননা বর্ণনাত্মক অভিনয়ের কৌশলগত অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এই বৈশিষ্ট্যটিকে অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

কৌশলগতভাবে ‘ভাব-দেহের মূর্তকরণ’ বা ‘ভাবের কল্পিত রূপায়ণ’ প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, এটি কুশীলবকে দৈনন্দিন-অতিরিক্ত নৃত্যধর্মী সক্ষমতায় পূর্ণ (ড্যান্সিং কোয়ালিটি) একটি কাব্যময় দেহাবয়ব নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে। যেটি কৌশলগতভাবে সম্পূর্ণতই কুশীলবের (গায়েনের) ব্যক্তিগত দক্ষতা, সক্ষমতা এবং শিল্প-রুচি ও জ্ঞান সাপেক্ষ একটি ব্যাপার। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি প্রদর্শনমূলক তাই উৎকর্ষের শিখরে উন্নীত হওয়া সাপেক্ষেই কেবল একজন কুশীলব/গায়েন তাঁর ভক্তদের সম্মুখে *নটপালার* আসরে হাজির হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের– নাম এবং ভাব গায়েনকে উদ্দীপ্ত করে ঠিকই কিন্তু এই উদ্দীপনা সম্পূর্ণতই ব্যক্তির বর্ধনশীল দেহ-শৌর্যের ছন্দময় ভাষা ও শৈলীর উৎকর্ষময় অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সাপেক্ষ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই প্রক্রিয়ায় কোনো বিশেষ ও বিধিবদ্ধ শরীর-ভঙ্গির নির্মাণ বা চলন ব্যতিরেকেই একজন কুশীলব যখন একটি কাব্যময় দেহ-অবয়বে কৃষ্ণের বর্ণনা করেন তখন কিন্তু আদতে কৃষ্ণ-ভাবের কল্পিত দেহরূপ বা ভাব-দেহকেই ক্রমান্বয়ে মূর্ত করে তোলেন। আর মূর্ত করণের এই প্রক্রিয়াতে অতঃপর অভিনয় উপাদান হিসেবে সুর, ছন্দ, তাল, লয়ের সাথে দেহের শৌর্য– তাণ্ডব ও লাস্যের বহুমাত্রিক বর্ধন ও বিন্যাস এবং ভাব ও রসের সমন্বয়ে একটি নৃত্যধর্মী কাব্যময় শরীর বা ভাব-শরীর নির্মাণ করার সক্ষমতা অর্জন করাটাই বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের প্রধান শর্ত-সাপেক্ষ একটি বিষয় হয়ে ওঠে।

মণিপুরী *থাঙ তা* খেলার সার্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, যেমন– এক. গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা, যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে ক্রিয়াশীল শৌর্যকে বক্র হাঁটুতে সর্পিল গতি অনুবর্তী চলন বা মুভমেন্টের সাথে যুক্ত করে শরীরকে হালকা, নিয়ন্ত্রিত ও নিপুণ দক্ষতায় শৈলীবদ্ধ করে তুলতে পারে এবং দুই. ‘কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা’র ইন্দ্রিয়গত সীমাহীন সংবেদনশীলতাকে কৌশলগত চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা। উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যকে নগরায়তনিক অভিনেতার শারীরিক এবং মনো-দৈহিক সক্ষমতার উন্নয়নে প্রভূত কার্যকর দুটি অনুশীলন উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে কৌশলগতভাবে শারীরিক এবং মনো-দৈহিক অনুশীলনের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে এদেরকে একাধিক ও নানাবিধ পরিস্থিতির সাথে যুক্ত করে প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। যেমন– সর্পিল গতি অনুবর্তী চলন বা মুভমেন্টের বিষয়টিকে কেবল *থাঙ তা* খেলায় প্রদর্শিত ও নির্দিষ্ট কতিপয় ভঙ্গি বা চলনে সীমাবদ্ধ না রেখে জটিল, তরঙ্গসংকুল, প্রবহমান প্রভৃতি নানাবিধ পরিস্থিতির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। এই যুক্তকরণের ফলে অভিনেতা সম্ভাব্য দুই ধরনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে পারে– এক. সাধারণ অনুশীলন হিসেবে এটি যেমন শরীরের হালকা, নিয়ন্ত্রিত এবং নিপুণ শৈলীবদ্ধকরণ অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তেমনি দুই. এই অভিজ্ঞতা গতি-বৈচিত্র্যে পূর্ণ জটিল, প্রবহমান কোনো পরিস্থিতিতে অভিনেতার মনো-দৈহিক উপস্থিতিকে তরিৎ ও তাৎক্ষণিক ক্রিয়াশীলতায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। অপরদিকে ‘কান

দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা'র বিষয়টি অভিনেতার ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীলতার প্রকাশ অভিজ্ঞতাকে সীমাহীন সক্ষমতায় উদ্দীপ্ত করতে পারে। কেননা অনুশীলনটিতে 'অন্তরদৃষ্টি' বা 'তৃতীয় নয়ন' হিসেবে *মনোযোগের* কেন্দ্রবিন্দুকে দুই ভ্রুর মাঝখানে স্থির না রেখে তা শরীরের একাধিক অঙ্গ বা অংশের সাথে যুক্ত করা বা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে কেন্দ্রস্থিত করণের ধারণা, লক্ষ্য-স্থিরগত ধারণা, পরিমাপের ধারণা, স্থানিক ধারণা, দেহের অবস্থান বা পজিশনগত ধারণা, সময়, ছন্দ ও লয়গত ধারণা প্রভৃতির উন্নয়নপূর্বক মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতাকে সীমাহীন সক্ষমতায় উন্নীত করা সম্ভব। বস্তুত এই অনুশীলনটি ব্যক্তির পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গত যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সীমাহীন সম্ভাবনার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিবেচনায় *থাঙ তা* খেলার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দুটিকে অভিনেতার প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদান হিসেবে ৪র্থ অধ্যায়ের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

উল্লেখিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে– 'অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ' এবং 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' বৈশিষ্ট্য দুটি শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরস্পর বিপরীতধর্মী গুণের ধারণা প্রদান করে। একটি 'প্যাটার্ন' অর্থাৎ আকৃতি/রূপ/চরিত্র নির্মাণের ধারণা প্রদান করে কিন্তু অপরটি 'প্যাটার্নকে' খারিজ করে দিয়ে 'ভাবকে মূর্ত' করার ধারণা প্রদান করে। অপরদিকে 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি' এবং 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন' বৈশিষ্ট্য দুটি মূলত দৈহিক বা শারীরী শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। উভয় বৈশিষ্ট্যটিই দেহের খোলা, উন্মুক্ত, হালকা, নমনীয়, নিয়ন্ত্রিত শরীরের উপলব্ধি এবং সক্ষমতা প্রদান করতে পারে। তাছাড়া প্রদত্ত পরিস্থিতির সাথে যুক্ত করে এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে মনো-দৈহিক চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। তবে 'কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা' বৈশিষ্ট্যটি অভিনেতাকে সরাসরি ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে। অভিনেতার তাঁর ইন্দ্রিয়গত নানান সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে সংবেদনশীল অভিনেতার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা

তৃতীয় অধ্যায়

গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা

৩.১ : জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়

'বাংলাদেশ' ভূখণ্ডে বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে বিরাজমান জাতি-বৈচিত্র্য প্রবল না হলেও ৮৫ ভাগ মুসলমানের পাশাপাশি রয়েছে ১৫ ভাগ ধর্মীয় সংখ্যালঘু– হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ। আবার এই ১৫ ভাগ ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে সংখ্যাগত দিক থেকে ক্ষুদ্রতম হলেও শরীরের রঙ ও গড়ন-বৈচিত্র্য, জীবন-দর্শন, ভাব-দর্শন, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান– মোটকথা সার্বিক জীবনাচারে স্পষ্টত ভিন্নরকম চর্চায় অভ্যস্ত কতিপয় জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, যাদেরকে রাষ্ট্রীয় অভিধায় 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' অথবা কোনো কোনো ব্যক্তি, সংগঠন এবং সংস্থার দাবি-মতে 'আদিবাসী'/'উপজাতি' হিসেবে চিহ্নিত/গণ্য করা হয়। ভাষা ও সংস্কৃতিতে স্ব-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই সকল জাতিসত্তার মানুষদের বসবাস মূলত দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল এবং সীমান্ত সংলগ্ন সমতল অঞ্চল ও জেলা জুড়ে বিস্তৃত। এদের মধ্যে প্রাচীন ও স্বকীয় রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক চর্চা, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহনকারী একটি জাতি হচ্ছে গারো বা মান্দি।

অন্যান্য জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার ন্যায় গারো জাতিতাত্ত্বিক নাট্য-প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্রটিও এই জাতির নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, কৃষি ব্যবস্থা ও বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই গারোদের সংস্কৃতি-সামগ্রিকতার গড়নটি ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং বিকশিত হয়েছে বহু পুরাণকথা, কিংবদন্তি, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, কৃত্য, সংস্কার প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপাদান। আর এই সকল সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ যখন নৃত্য, গীত, বাদ্য, সুর, ছন্দ, কথা ও কাব্য-আশ্রয়ে পরিবেশিত হয়ে একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক ভাব ও জীবনদর্শন প্রকাশের উপায় হয়ে ওঠে, নাট্য-গবেষক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ তখন এর মধ্যে দিয়েই অন্বেষণ করেছেন নৃ-গোষ্ঠীর নাট্যমূলক উপাদান। কিন্তু প্রকৃতি নির্ভর আদিধর্ম ও ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি এবং পরিবেশনা ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ গারোদের জীবনে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন শুরু হয় বৃটিশ যুগের মিশনারি চার্চ কর্তৃক খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের ব্যাপক কর্মযজ্ঞে যুক্ত হবার মাধ্যমে। নব্য আত্তীকৃত ধর্ম-দর্শন গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম-দর্শন, বিশ্বাস, কৃত্যাচার, উৎসব-অনুষ্ঠানকে শয়তানের কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে–

শুরু হয় আত্মবিস্মৃতির লীলা। আদি সাংসারেক ধর্মের স্থলে খ্রিষ্টানধর্ম জাঁকিয়ে বসায় আদি উৎপাদন ব্যবস্থায় আসে পরিবর্তন। জুম চাষ পরিত্যক্ত হয় প্রায় সম্পূর্ণত। সাধারণ কৃষিকর্ম থেকে সরে আসে নতুন ধর্মে দীক্ষিত পরবর্তী প্রজন্ম। তারা মিশনারির সহায়তায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকুরি নামক সোনার হরিণ শিকার আরম্ভ করে অধিক সংখ্যায়। জুম চাষের হাল-হাতিয়ারের সঙ্গে পরিত্যক্ত হতে থাকল সামাজিক আচার সংস্কৃতি বেশ-ভূষা। অর্থাৎ গারো নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল সংখ্যালঘু সাংসারেক গারোদের মধ্যে।[১]

ধর্মান্তর যজ্ঞের ব্যাপকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের মধ্যে 'শতকরা প্রায় ৯৯ জন অধিবাসী গারো খ্রিষ্টান।'[২] ধর্মান্তরের বিষয়টি এতই সর্বাত্মক যে, কয়েক হাজার গারো জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মধুপুর গড়াঞ্চলের চুনিয়া গ্রামে পরিবেশনা পর্যবেক্ষণকালে কেবল একটি মাত্র *সাংসারেক* ধর্মানুসারী পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়, যে পরিবারের প্রধান কর্তার নাম *জনিক নকরেক*, যাঁর বয়স ২০১৪ সাল নাগাদ ১১০ বছর এবং যিনি অদ্যাবধি আদি *সাংসারেক* ধর্মকেই জীবনাচারের অবলম্বন করে রেখেছেন। অতঃপর নিঃসঙ্গ *সাংসারেক* জনিক নকরেকের ন্যায় *সাংসারেক* ধর্মানুসারীদের *ওয়ানগাল্লা* উৎসবে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতাটিও হয়ে ওঠে অনেকাংশে নিঃসঙ্গ, নিরাভরণ এবং সাদামাটা। *ওয়ানগাল্লা* গারোদের সর্বজনীন উৎসব হলেও প্রতিবেশী সবাই গারো-খ্রিষ্টান হওয়ায় *সাংসা*রেকদের আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে তাই আশানুরূপ সমাগম ঘটতে দেখা যায়নি, পার্শ্ববর্তী পরিবারের হাতেগোনা কয়েকজনের উপস্থিতিতে পশু (শূকর) উৎসর্গ, পানাহার এবং খানিকটা বাদ্য-বাজনার মাধ্যেমেই সম্পাদিত হয় উৎসব– *ওয়ানগাল্লা*। তরুণ গারো কবি ও লেখক পরাগ রিচিল (৩৫) এ প্রসঙ্গে বলেন– 'আসলে খ্রিষ্টানরা সাধারণত সাংসারেকদের অনুষ্ঠানে আসতে চায় না। তাছাড়া বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে আদিধর্ম অনুসারীদের সংখ্যা বর্তমানে শতকরা এক ভাগেরও বেশি অবশিষ্ট নেই।'[৩] ফলে ধর্মান্তর-প্রক্রিয়ার পরিণাম হচ্ছে এই যে, প্রকৃতিনির্ভর ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক চর্চায় অভ্যস্ত গারোরা তাদের সেই ঐতিহ্যবাহী অতীতকে ইতিহাসের পাতায় রেখে দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক চর্চায় ক্রমশই নিজেদেরকে সাবলীল করে তুলছে। অর্থাৎ চার্চকেন্দ্রিক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবনাচারই অবশেষে গারোদের জীবন-সংগঠনের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে–

গারোদের ধর্মীয় ও সামাজিক জগতে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রভাব অনেক বেশি দেখা যায়। তারা পূর্বপুরুষদের দেবতাগণকে ও উপদেবতাগণকে ত্যাগ করেছে। তাঁদের নিকট আর পাঁঠা বলি ও মোরগ বলি উৎসর্গ করে না। অসুখ বিসুখ হলে দেবতাগণের তুষ্টি বিধানের জন্য পূর্বপুরুষদের মতো আর ব্যতিব্যস্ত হয়

১ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩ তরুণ গারো কবি ও লেখক পরাগ রিচিল-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকারটি ধারণ করা হয় ২০১৫ সালের ২ জানুয়ারি, মধুপুর গড়, গ্রাম চুনিয়া, প্রবীণ সাংসারেক জনিক নকরেক-এর বাড়ি।

না। এখন গারোরা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, প্রভু যীশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে।[৪]

নব-আত্তীকৃত (বৃটিশ শাসনামল থেকে) এই ধর্মীয়-সংস্কৃতি গারোদের বোধ বিশ্বাস এবং উপলব্ধিতেই কেবল পরিবর্তন এনেছে তা নয়, বরং সার্বিকভাবে তা পরিবেশনামূলক আচার অনুষ্ঠানেও এনেছে সুস্পষ্ট পরিবর্তন যা গারোদের নৃত্য, গীত ও নাট্যমূলক পরিবেশনা ঐতিহ্যেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। কেননা যে সর্বজনীন গুরুত্বে *বড়দিন* উদ্‌যাপিত হয়, আদিধর্মের প্রধান দেবতা *তাতারা রাবুগার* স্মরণে উৎসর্গমূলক উৎসব-অনুষ্ঠান এখন আর ততটা সর্বজনীনতায় উদ্‌যাপিত হয় না। এই পরিবর্তন যেন প্রকৃতি থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করা বা ভূমি থেকে শিকড় উৎপাটনের মতোই একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা আজও *ওয়ানগাল্লা* উদ্‌যাপিত হয়, যেমন– গবেষকের দেখা শহরায়তনিক পরিমণ্ডলে উদ্‌যাপিত একটি *ওয়ানগাল্লা* উৎসব, যেটি ২০১৪ সালের অক্টোবার মাসে ঢাকাস্থ *বনানী বিদ্যা নিকেতনে* আয়োজন করা হয়। বনানীর সেই উৎসবটি যেন কিছুতেই পূর্বপুরুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের দেবতা *সালজং*-এর উদ্দেশে জুমের ফসল উৎসর্গের কৃত্যানুষ্ঠান হয়ে ওঠে না, বরং ঢাকাস্থ গারো-খ্রিষ্টানদের উপস্থিতিতে সেই উৎসবটি যেন অনেকাংশেই পূর্বপুরুষদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক অনুকরণ হয়ে উঠেছিল। গারোদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে চলমান এই পরিবর্তনকে গারোদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নব্য আত্তীকৃত একটি ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে চার্চকেন্দ্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের (ইস্টার সান-ডে, বড়দিন, সাপ্তাহিক প্রার্থনা প্রভৃতি) সমান্তরালে পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠানের সাথেও কম-বেশি যুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। এটিই হচ্ছে পরিবর্তিত এক বাস্তবতা যেখানে বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের প্রায় ৯৯ শতাংশই ধর্মান্তরিত গারো-খ্রিষ্টান। সংস্কৃতি রক্ষার নামেই হোক বা গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় হোক অথবা জাতিগতভাবে আত্ম-মর্যাদা ও আত্ম-অনুসন্ধানের কারণেই হোক বস্তুত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ এই গারো-খ্রিষ্টানদেরই একটি অংশ এবং লুপ্তপ্রায় *সাংসারেক* ধর্মাবলম্বীগণ- এঁরাই বর্তমানে আদিধর্মভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী গারো-সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠান, নৃত্য, গীত ও নাট্যমূলক অনুষ্ঠানের চর্চা ও প্রচলন অব্যাহত রেখে চলেছে। সুতরাং এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে গারো জাতিতাত্ত্বিক নাট্য-নিরীক্ষাকে অর্থবহ করার স্বার্থেই বক্ষ্যমাণ আলোচনায় গারোদের আদিধর্ম ও সমাজভিত্তিক সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা অত্যন্ত জরুরি মনে করি। আর এই বিবেচনা থেকেই ইতিহাসে গারোদের ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতত্ত্বে জন-প্রবাহ, ভাষা ও ভাষা পরিবার, প্রকৃতি ও ধর্ম, উৎসব-আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে গারো জাতিতাত্ত্বিক নাট্যের উৎস ও স্বরূপ সন্ধান করা যেতে পারে। তবে গারো জাতিসত্তার পরিচয় প্রসঙ্গ-আলোচনা ও পর্যালোচনার শুরুতেই একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, ‘এ

৪ রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিল, *গারোদের আদি ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর ও ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.) *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৪

সম্প্রদায়ের আদি ইতিহাস নিয়ে নৃ-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। ফলে এদের নামকরণ ও ইতিহাস নিয়ে নানারকম বিভ্রান্তি রয়েছে।'[৫] কেননা নানান মত ও মন্তব্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এদের ইতিহাস ও নামকরণ বিষয় ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাই এদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা পেতে এবং এদের ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান, নামকরণ, ধর্ম-কর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিচয় লাভ করতে ইতিহাস, পুরাণ এবং জনপ্রবাহ এই তিনটি প্রেক্ষাপট আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত যে কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে 'গারো' এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ১১৬,০০০ জন গারো এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ১০২,০০০ জন গারো জনসংখ্যার কথা বলা হলেও গবেষক থিওফিল নকরেক-এর মতে– প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বাংলাদেশে গারোদের জনসংখ্যা প্রায় ২০০,০০০ জনের অধিক।'[৬] মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-সংগঠনে বিশ্বাসী গারোরা বর্তমানে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, গাজীপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন উপজেলা যেমন– হালুয়াঘাট, ধোবাউরা, কমলাকান্দা, সুসং দুর্গাপুর, ফুলবাড়ী, ধরমপাশা, তাহেরপুর, বিশ্বম্বরপুর, নলিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি, বক্সীগঞ্জ, ভালুকা, মধুপুর, ঘাটাইল, শ্রীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গোত্র বা দলবদ্ধভাবে বাস করছে। এই জাতিসত্তাটি বিশ্ব-মানব সভ্যতায় 'গারো' নামে পরিচিত হলেও তাদের ভাষায় নিজেদেরকে 'আচ্ছিক' বা 'আচ্ছিক মান্দি' বলতে পছন্দ করে। *আচ্ছিক* কথার অর্থ পাহাড় এবং *মান্দি* হচ্ছে মানুষ অর্থাৎ *আচ্ছিক মান্দি* বলতে সেই মানুষদের বোঝায় যারা পাহাড়ে বাস করে। তবে ভৌগোলিক এবং 'পরিবেশগত কারণে এই নৃ-গোষ্ঠী 'আচ্ছিক' ও 'মান্দি' দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে।'[৭] বাংলাদেশে বসবাসকারী গারোদের অধিকাংশই সমতলবাসী বিধায় নিজেদেরকে কেবল 'মান্দি' নামে ডাকতেই বেশি পছন্দ করে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে গারোরা অতীতকাল থেকেই বাংলাদেশের সীমান্ত এবং তৎ-সংলগ্ন নির্জন বন-জঙ্গলময় অনুচ্চ-পাহাড়, সমতল এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলোকেই উপযুক্ত আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেয়। এক সময়ে এই সকল অঞ্চলের অধিকাংশই ছিল গহিন বন ও জঙ্গল দ্বারা বেষ্টিত, ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে যা গড়াঞ্চল নামে পরিচিত ছিল এবং অপর কিছু অঞ্চলে ছিল অনুচ্চ পাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশের উর্বর সমতল ভূমি। নীহাররঞ্জন রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব* গ্রন্থে বৃহত্তম ময়মনসিংহ এবং ঢাকার গাজীপুরসহ বেশকিছু অঞ্চলকে 'গৈরিক পার্বত্য গজারী-বনময় একখণ্ড পুরাভূমি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, এক সময়ে অরণ্যবাসী হিসেবে পরিচিত গারোদের জীবনাচারের পুরোটাই *পরিচালিত* হতো ভূমি ও প্রকৃতির নির্ভরশীলতায়, কেননা ভূমির সাথে গারোদের

---

৫ রহমত উল্লাহ, *গারো সম্প্রদায় : বাংলাদেশেরে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০
৬ থিওফিল নকরেক, *গারো সংস্কৃতির জীবনবাদ ও পর্যালোচনা*, নন্দিতা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২২
৭ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী-নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫

বিশ্বাসগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য। গারোরা বিশ্বাস করে যে– 'মাটির মানুষ মাটির সাথে মিশে কাজ করবে, বেঁচে থাকবে, রোজগার করবে এটাই স্বাভাবিক এই বিশ্বাস থেকেই মান্দি কৃষকেরা কাদামাটি খেলা উপভোগ করে। মান্দিরা আরো বিশ্বাস করে পৃথিবীতে যে যাই করুক না কেন সবকিছুরই সাক্ষী মা মাটি। মাটির কাছে লুকোবার কিছু নেই। তার পবিত্রতা রক্ষা ও ধারণ করা কৃষক এবং মাটিসেবী সকল মানুষের দায়িত্ব।'[৮] তাই 'বনভূমিকে ঘিরেই মান্দিদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতো।'[৯] ভূ-প্রকৃতির ওপর এই সর্বময় আস্থা ও নির্ভরশীলতার কারণেই বস্তুত গারোদের ধর্ম, দর্শন, সমাজ-সংগঠন, কৃত্যমূলক উৎসব অনুষ্ঠানের তথা সার্বিক জীবন-আচারের কেন্দ্রিয় অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে কৃষি ও শিকার। স্বভাবতই প্রকৃতির নিয়ম ও আবর্তন অনুসরণ করেই পরিচালিত হয় বা নিয়ন্ত্রিত হয় গারোদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বৃত্তটি। *আসিরকা* এবং *ওয়ানগাল্লা* হচ্ছে তেমনই দুটি সর্বজনীন উৎসব যা গারোদের সমগ্র জীবনাচারকে একটি বৃত্তাবর্তনে আবদ্ধ করে এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অতঃপর বিকশিত হয় বহু ও বিচিত্র নৃত্য, গীত তথা নাট্যমূলক পরিবেশনা। জুম চাষের প্রারম্ভে অর্থাৎ জুম খেতে চাষ শুরুর পূর্বে শুরু হয় *আসিরকা* উৎসব–

> The first of these ceremonies is held at the time of the beginning of the sowing season. The jungles are cleared by felling trees and, immediately prior to burning them, a ceremony called Agalamaka or Achiroka is performed. This is done to invoke aid of the gods to bring rains to the fields and guard them against evil.[১০]

এবং এরই ধারাবাহিকতায় ফসল কাটা বা জুম তোলার পর বিপুল আয়োজনে উদ্‌যাপন করা হয় *ওয়ানগাল্লা* উৎসব, দেবতা *সালজংকে* উৎসর্গ করে অতঃপর নৃত্য, গীত আর বাদ্যের তালে তুমুল হয় সে উৎসব, পূর্ণ হয় বৃত্তের আবর্তন–

> The culmination of the ceremonies around jhumming is the Wangla Festival. It is the biggest of all festivals of the Garos coinciding with the harvest of all the jhum crops, including the plucking of cotton. It is grand and splendorous, a coming together not only of individual families or single villages but of two or three or more villages.[১১]

---

৮ বাঁধন আরেং, *মান্দি কৃষ্টি-সংস্কৃতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৪

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১০ Kapila Vatsyayan , *Traditions of Indian Folk Dance,* Clarion Books, New Delhi, 1987, P. 117

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

এভাবে ভূ-প্রকৃতির ওপর অগাধ বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতা গারোদের সামগ্রিক জীবনাচারকে প্রকৃতির সাথে এক ও অভিন্ন বৃত্তে আবদ্ধ করে, ফলে জীবনের যাপন ও উদ্‌যাপন প্রক্রিয়াটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত উৎসবমুখর– নৃত্য, গীত, বাদ্য, গল্প, গাথায় নাট্যমূলক।

ঐতিহাসিক কালে গারোদের ভৌগোলিক অবস্থান ও বসবাস বিষয়ে যে সকল বয়ান প্রচলিত রয়েছে তার একটি বড় অংশ জুড়েই রয়েছে গারো পাহাড় এবং তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন সমতল ভূমি। রাষ্ট্রভিত্তিক সীমানা বিভাজনের ফলাফল স্বরূপ গারো পাহাড় বর্তমানে ভারত ভূখণ্ডের হলেও অতীতে এই পাহাড়ের সাথে পার্শ্ববর্তী ভৌগোলিক সীমার বিস্তার ও ভূ-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল, সিলেটের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রায় সকল গবেষকেরই এইরূপ ধারণা যে, সুদীর্ঘ কাল ধরেই গারো পাহাড় ও 'পাহাড়ের পাদদেশে গারোদের সভ্যতা গড়ে ওঠে।'[১২] তাই ঐতিহাসিক কালের নানান পর্বে গারোদের সম্পর্কে যা কিছু জানা যায় তার অধিকাংশই সংঘটিত হয় এই অঞ্চলকে ঘিরে, গমন-আগমন এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তির সাথে সংঘাত ও সম্পর্ক সূত্রে। গারো গবেষক মণীন্দ্রনাথ মারাক দীনেশ চন্দ্র সেনের *মৈমনসিংহ গীতিকার* দোহাই দিয়ে দেখিয়েছেন যে, '১২৮০ খ্রি. সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ যোদ্ধা কোচ রাজবংশীয় বৈশ্য গারো নামক রাজার অধিকৃত সুসঙ্গ দুর্গাপুর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।'[১৩] অপর এক গারো গবেষক সুভাষ জেংচাম এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করেন ভিন্নভাবে– 'জানা যায় সুসং দুর্গাপুর এলাকায় গারোরা নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল। ঐ সময়কালে তাহারা বিভিন্ন দলনেতার নেতৃত্বে সুসং দুর্গাপুরে রাজত্ব করে। অবশেষে শেষ গারো রাজা বাইস্যা মান্দা তাঁহার বিশ্বাসঘাতক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মন্ত্রী সোমেশ্বর পাঠকের হাতে ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। রাজা বাইস্যার নিহত হওয়ার সংগে সংগেই এতদঞ্চলে গারোদের সৌভাগ্যসূর্যও অস্তমিত হইয়া যায়।'[১৪] উক্তি দুটিতে ঘটনার সাদৃশ্য থাকলেও বিবরণে রয়েছে বড় ধরনের অসঙ্গতি, কেননা গারো রাজা এবং সোমেশ্বরের কাহিনীটি *মৈমনসিংহ গীতিকার* প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হলে তা কোনোভাবেই মধ্যযুগের প্রারম্ভে ঘটেছে বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ *মৈমনসিংহ গীতিকার* উদ্ভব ও বিকাশ সতেরো শতকের পূর্বে নয় বলেই গবেষকগণ মত প্রকাশ করেন– 'সতেরো শতকে প্রধানত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্থানীয় লোককাহিনী অবলম্বনে ধর্মভাবমুক্ত এক ধরনের বর্ণনামূলক সাহিত্য রচিত হতে থাকে, যা এখন আমাদের কাছে "ময়মনসিংহ গীতিকা" নামে সুপরিচিত।'[১৫] কিন্তু সুভাষ জেংচাম এই ঘটনাটিকে গীতিকার প্রেক্ষাপটে দেখেননি, তাছাড়া উভয় গবেষকের মধ্যে সালগত ঐক্য বিরাজমান অর্থাৎ ঘটনাটি ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। তাই সালগত

---

১২ রহমত উল্লাহ, *গারো সম্প্রদায় : বাংলাদেশেরে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১

১৩ মণীন্দ্রনাথ মারাক, গারো নামের ইতিবৃত্ত, *জানিরা সংকলন* (প্রথম খণ্ড), জুন ২০১৪, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোনা, পৃ. ১৭

১৪ সুভাষ জেংচাম, *বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬

১৫ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৫

ঐক্য বিবেচনায় নিলে এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে গারোদের বাংলাদেশে আবাস ও অবস্থান বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ সময় বিশেষত প্রাচীনযুগকে নির্দেশ করে। কারণ যে ক্ষমতার 'সৌভাগ্যসূর্য' ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে অস্তমিত হয়, ধরে নেওয়া যায় যে এর সূচনা হয়েছিল আরও সুদীর্ঘ বছর পূর্বে। আবার মধ্যযুগের অন্তে এসেও দেখা যায় যে, মোগল এবং ইংরেজ শাসনামলে গারোরা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করছে এবং এজন্য তাঁরা গারো পাহাড়ের গহিন অরণ্যকেই প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে–

> আসামের সঙ্গে গারো পাহাড়ের সংযুক্তির পর (বর্তমানে মেঘালয়), বাংলাদেশে গারো বসতি অপেক্ষাকৃত কমই পড়ে, বিশেষ করে পার্বত্য গারোদের। সে সময় গারোরা গভীর অরণ্যাবৃত পার্বত্যাঞ্চলে বসবাস করতেই বেশি পছন্দ করতো। কেননা শিকার, বুনো ফলমূল ইত্যাদি তাদের জীবিকার একটা বিশেষ অবলম্বন ছিলো। অবশ্য আরও একটা কারণও ছিলো। মোগল ও ইংরেজদের শাসনমুক্ত ও তাদের পৌনঃপুনিক সামরিক অভিযান থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে ওরা দুর্গম-দুর্ভেদ্য পার্বত্যাঞ্চলে নিজেদের ভৌগোলিক বলয়েই স্বাধীন জীবন যাপন করতো।[১৬]

সুতরাং ঐতিহাসিক কালের এই দুটি দৃষ্টান্ত বস্তুত গারো পাহাড় এবং তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রিক গারোদের সুদীর্ঘ অবস্থান ও আবাসন সম্পর্কে নিঃসংশয় করে।

প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত এই গারো পাহাড়টির ভৌগোলিক অবস্থান ১৫° থেকে ২৬° উত্তরে এবং ৪৯° থেকে ৯৯° পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়টির উত্তরে রয়েছে গোয়ালপাড়া, দক্ষিণে জামালপুর এবং ময়মনসিংহ, দক্ষিণ-পূর্বে সিলেট এবং পূর্বে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। পাহাড়টির বিভিন্ন শৃঙ্গের গড় উচ্চতা প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার ফুট এবং সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট এবং এর একটি চূড়া *কৈলাশ পর্বত* নামে পরিচিত যা গারোদের নিকট পবিত্রতম একটি স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। কেবল অরণ্য-সম্পদ আর পাদদেশের উর্বর সমতল ভূমি বেষ্টিতই নয়, বিস্তৃত এই পাহাড়টি বেশ কিছু নদীরও উৎপত্তিস্থল, যেমন– ঝিনারী, কৃষ্ণাই, দুধনাই, গান্নল, ভোগাই, নিতাই, রংরা, মহাদেও, গণেশ্বরী, সোমেশ্বরী ইত্যাদি। এদের মধ্যে ঝিনারী, কৃষ্ণাই এবং দুধনাই নদী গারো পাহাড়ের অংশ আরাবেল্লা পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে উত্তর অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবেশ করে এবং পরে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলে যায়। এবং গারো পাহাড়ের মধ্যাঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়ে ভোগাই, নিতাই, রংরা, গণেশ্বরী, মহাদেও, সোমেশ্বরী প্রভৃতি নদী দক্ষিণ অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ভৌগোলিকগত দিক থেকেও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, প্রকৃতির অপার সম্পদে পূর্ণ গারো পাহাড় এবং এর পার্শ্ববর্তী সমতল, অরণ্য, নদী অববাহিকার বিশাল অঞ্চল জুড়ে ঐতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছে নৃ-গোষ্ঠী গারো সম্প্রদায়ের নানা গোত্রের মানুষ। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ভারত উপমহাদেশের বিভক্তিতে যে সীমারেখা নির্ধারিত

১৬ আলি নওয়াজ, *গারো উপজাতি ও তাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৬৬

হয় তাতে গারো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব প্রান্তীয় কতিপয় সীমান্তবর্তী জেলার অরণ্য, নদ-নদীর অববাহিকা, অনুচ্চ পাহাড় এবং সমতল অংশের মধ্যে কম-সংখ্যক গারো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই স্বল্প সংখ্যক গারোই ঐতিহাসিক কাল থেকে গারো পাহাড় কেন্দ্রিক গারো সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে বর্তমানে 'বাংলাদেশের' অধিবাসী হিসেবে বসবাস করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত গারোরা যে ভাষায় নিজেদের মধ্যে ভাবের প্রকাশ বা আদান-প্রদান করে থাকে তা *মান্দিভাষা* নামে পরিচিত। *মান্দিভাষা* পুরুষানুক্রমে মৌখিকরীতিতে বিকশিত। অদ্যাবধি এই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা বা *মান্দি* বর্ণে লেখ্যরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি, তবে বাংলা এবং ইংরেজি অক্ষরে *মান্দিভাষা* লেখার প্রচলন রয়েছে। ফলে গারোদের ইতিহাস, পুরাণকথা, কাব্য-গাথা, শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি কোনো কিছুই তাদের নিজস্ব অক্ষরে লিখিত নয় বা নিজেদের ভাষায় সংরক্ষিত নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা অথবা ইংরেজি অক্ষরে লিখিত হলেও অধিকাংশ বিষয়ই যেমন– শাস্ত্র, পুরাণকথা, কাব্য-গাথা প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত রয়েছে। তবে *মান্দিভাষা* মৌখিক পরম্পরায় বিকশিত হলেও এর একটি সুদীর্ঘ ও প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। ঐতিহাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃ-বিজ্ঞানীগণ সকলেই একটি বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, ভাষা পরিবারের সদস্য হিসেবে 'গারোরা মঙ্গলীয় শ্রেণিভুক্ত তিব্বতী-বর্মণ জনোগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।'[১৭] তিব্বতী-বর্মণ হচ্ছে চীনা-তিব্বতী ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী। মূলত 'চীনা-তিব্বতী ভাষা পরিবার দুটি ভাগে বিভক্ত (ভারত বর্ষের বাইরে আরও একটি ভাগ রয়েছে যার নাম 'য়েনিসি') চাইনিজ বা চীনা, এবং টিবেটো-বর্মণ বা তিব্বতী-বর্মি। তিব্বতী-বর্মি আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত– একটি টিবেটো-হিমালয়ান ও অপরটি আসাম-বার্মিজ। আসাম-বার্মিজ আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। যেমন বোডো, নাগা, কুকী-চীন, কাচিন, বার্মিজ ইত্যাদি।'[১৮] গবেষক রবিন্স বার্লিং-এর ধারণাও এই মতকে সমর্থন করে, তিনি টিবেটো-বর্মণ ভাষা-গোষ্ঠীকে পাঁচটি প্রধান শাখা পরিবারে ভাগ করেছেন– এক. টিবেটান, দুই. বার্মিজ, তিন. নাগা, চার. কুকি, মণিপুরী, মিজো, এবং পাঁচ. লালং, চুটিয়া, রাবা, টিপুরা, আতং, কচ্, কাচারী এবং মান্দি। তিনি মনে করেন– 'মান্দি, কচ্, রাবা, কাচারী, (বা বোরো), চুটিয়া, লালং, এবং টিপুরা ইত্যাদি ভাষাসমূহ টিবেটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর যে উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ততার নাম 'বোডো'। [...] বাংলাদেশের মধুপুর গড় এলাকায় বসবাসকারী মান্দিদের মধ্যেও এই (বোডো) ভাষার প্রচলন এখনো রয়েছে।'[১৯] ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আগমন ও পরিচয়ের সূত্রটিও টিবেটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠী বা পরিবারে অংশ হিসেবে গারোদের অবস্থানকে সমর্থন করে– 'মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে। এইসব মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়াছে সন্দেহ নাই,

---

১৭ থিওফিল নকরেক, *গারো সংস্কৃতির জীবনবাদ ও পর্যালোচনা*, নন্দিতা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৯

১৮ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী; ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৩

১৯ বার্লিং, *মান্দিরা কোথা হতে এসেছে*, অনুঃ কিবরিয়াউল খালেক, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাঃ), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৬

কিন্তু ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে ইহাদের স্পর্শ গভীরভাবে কোথাও লাগে নাই, একমাত্র আসাম, উত্তরে হিমালয়শায়ী নেপাল-ভোটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশশায়ী প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকদের ছাড়া।'[২০] নীহাররঞ্জন রায়ের এই অভিমত সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যখন তিনি আরও বলেন–

> এ তথ্য নিঃসংশয় যে, হর্ষবর্ধনের (৬৪৬ বা ৬৪৭) মৃত্যুর পর পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে চীন-তিব্বত-কামরূপের লোলুপ দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিব্বতরাজ স্রং-ৎসন-গ্যাম্পো (৬০০-৬৫০) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আবর্তে বহুখ্যাত তিব্বতী বৌদ্ধ যোগদান করিয়াছিলেন। এই নরপতি আসাম ও নেপালের এবং ভারতবর্ষের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। মনে হয় এই দাবি একেবারে নিরর্থক নয়।[২১]

উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য এই কারণে যে, তিব্বতরাজের অভিযান কী কী কারণে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল বা আক্রমণ পরবর্তী সময়ে বিজয়ী রাজা এ অঞ্চলে কী উপায়ে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেছিলেন বা আদৌ তা করেছিলেন কি না, তার বিস্তারিত জানা না গেলেও এটি সহজ অনুমেয় যে, এই ঐতিহাসিক কালেই আসাম, নেপাল, ভুটানসহ বাংলার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব প্রান্তদেশীয় পার্বত্য অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন সমতল অঞ্চলের লোকদের সাথে তিব্বতীয় অঞ্চলের 'জন' বা 'ভাষা' ভিত্তিক পরিচয় ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে একাধিক মোঙ্গোলীয় জন যে প্রাচীনকালে বাঙালীর জনপ্রবাহে রক্তধারা মিশাইয়াছে, একথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুত বাঙলা ও আসামের প্রাচীন ইতিহাসে ঐ অঞ্চল একাধিক সমরাভিযান ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাঙলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।'[২২] সম্ভবত এভাবেই ঐতিহাসিক কালের নানা পর্বে গমন-আগমন সূত্রে বর্মী ও তিব্বতীয়দের সাথে এতদঞ্চলের পরিচয় ঘটে থাকবে এবং নানাবিধ ঘটনাসূত্রে টিবেটো-বর্মণ ভাষাগোষ্ঠীগুলো ক্রমান্বয়ে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে এমন ধারণা অসঙ্গত নয় বলেই মনে করি। এক্ষেত্রে কপিলা বাৎসায়নের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য –

> Unlike the Khasis, the Garos trace their ancestry to Tibet : their language also belongs to the Tibeto- Burman group of languages: Linguistic affinities would also prove that they have a close relationship with the Bodo race of Assam. Possibly the Garos of Assam came from Tibet to Bhutan and thence by following the course of the river Sonkos and her tributaries to Dhubri (now headquarters of Goalpara district). They then perhaps crossed the Brahmaputra at different points and populated the southern parts of Goalpara and the

২০ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০২ সন, পৃ. ৩৪
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬
২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

> northern and western parts of the Garo Hills and then spread throughout the Garo Hills and parts of the Kamarupa district.

সুতরাং বাঙলা এবং ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে গারোদের অবস্থান যে ঐতিহাসিক কালেরই নানা পর্বে সম্পাদিত হয়েছিল এ বিষয়ে বোধ করি বিশেষ আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অপরদিকে গারো গবেষক মণীন্দ্রনাথ মারাক গারো জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীনত্ব এবং পৌরাণিক সম্পর্ক নির্ণয়ে *কিরাত* জাতিকে গারো জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন, প্রামাণ্যস্বরূপ মহাভারতে *কিরাতার্জুনযুদ্ধের* প্রসঙ্গ ও রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে কিরাতের উল্লেখ যেমন– "ব্রহ্মপুত্র তরি করিহ প্রবেশ। মন্দর পর্বত যাইও কিরাতের দেশ॥" দৃষ্টে এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় গারোদের কিরাত জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অপরদিকে গবেষক সুভাষ জেংচাম প্রণীত *বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়* গ্রন্থে *মহাভারতের* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এমন গারো যুবকদের 'কিরাত সৈন্য' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি এও বলা হয় যে, 'কুরুবংশীয় আর্য রাজাদের পরম মিত্র কামরূপের অনার্যরাজ নরকাসুরের রাজত্বকালে গারো রমণীরা (কিরাত রমণী) কামাখ্যা দেবীর প্রধান পূজারিণী পদে অধিষ্ঠিত হইতেন বলিয়া কথিত আছে।' এবং এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, 'ভারতবর্ষে গারোদের আগমন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ধরিয়া নেওয়া যায়।'[২৩] গবেষকদ্বয়ের এই যুক্তি সর্বাংশে মেনে নেওয়া কঠিন। কেননা এই যুক্তির পেছনে নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনপুস্থিত, তদুপরি অসুর বংশের সাথে গারোদের যে সখ্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা গারোদের ভাষা-পরিবারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। কেননা 'জন' ও 'ভাষাতত্ত্বের' দৃষ্টিকোণ থেকে যাদেরকে 'অসুরভাষী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ইতিহাসে ও নৃতত্ত্বে তাদের অবস্থান বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড়, ও পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত এবং এরা আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বা অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের সদস্য। সুতরাং অসুরদের ধর্ম-কর্ম বা পূজা-অর্চনার সাথে গারোদের যুক্ত হওয়ার অর্থ নিঃসন্দেহে দুটি ভিন্ন ভাষা-পরিবারের মধ্যে মিলন ও মিশ্রণের ইঙ্গিত প্রদান করে, কিন্তু গবেষকদ্বয়ের রচনাতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। ভাষা পরিবার এবং জনপ্রবাহ সম্পর্কে যে সকল খতিয়ান পাওয়া যায় তাতে উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব প্রান্তদেশীয় পার্বত্য অঞলের অরণ্যবাসীদের সাথে খানিকটা মঙ্গোলীয় ভাষা পরিবারের নানান 'জন'দের ধারা, উপধারার মিলন মিশ্রণের তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু অস্ট্রিকদের সাথে মঙ্গোলীয় জনদের মিলন-মিশ্রণের বিষয়টি অদ্যাবধি স্বীকৃত নয়। ফলে পৌরাণিক বলয়ে গারোদের উপস্থিতি এবং পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আগমনসূত্রে এদের প্রাচীনত্বের পক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হলো তা ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রমাণিত নয়। তাছাড়া নীহাররঞ্জন রায়ের অকাট্য যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের পূর্ব ও উত্তরাংশের দেশগুলিতে মঙ্গোলীয় প্রভাব কিছুতেই ঐতিহাসিক কালের পূর্বে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা ভূখণ্ডে বা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায়

---

২৩ সুভাষ জেংচাম, *বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫

গারোদের বসতি স্থাপন কোন ঐতিহাসিক কালে সম্পাদিত হয়েছিল– এর কোনো সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে বাংলার ভৌগোলিক সীমায় গারোদের আগমন ও অবস্থান বিষয়ে কারো কারো মত এমন যে– 'আনুমানিক নবম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর সীমানা বরাবর গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমভূমি এলাকায় গারোরা বসতি স্থাপন শুরু করে এবং বিভিন্ন দলনেতার নেতৃত্বে বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে।'[২৪] যদিও 'নবম থেকে দশম শতাব্দীতে' বাংলাদেশ সীমানায় গারোদের বসতি স্থাপন বা আগমনের প্রেক্ষাপটটি কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা নির্ণীত নয়, বরং সময়সূত্রটি অনুমানের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়েছে। তথাপিও তিব্বতরাজ স্রং-ৎসন-গ্যাম্পোর (৬০০-৬৫০) আসাম ও নেপাল জয় এবং ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সুসং দূর্গাপুরের গারো রাজার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ দুটির বিবেচনায় এই অনুমানের যথার্থতা সম্পর্কে অনেকটাই নিঃসংশয় থাকা যায়।

জাতি হিসেবে 'গারো' নামকরণ বিষয়ে রয়েছে একাধিক মত এবং সকল মতের ব্যাখ্যাও ভিন্ন। তবে গারোদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এমত যে, 'গারো' নামটি গারোদের দ্বারা নয় অন্যদের দেওয়া একটি নাম–

> গারোরা অন্যদের নিকট গারো জাতি (উপজাতি) বলে পরিচিত হলেও তারা নিজেদের আচিক জাতি বলে থাকে। আচিক শব্দের অর্থ টিলা, সাধারণ অর্থে পাহাড়। সুতরাং আচিক জাতির অর্থ পাহাড়ি বা পার্বত্য জাতি গারে হে। সুতরাং গারোদের নিজেদের আচিক বা পাহাড়ি জাতি বলা যুক্তিযুক্ত হয়নি। ব্যঙ্গ হলেও অন্যদের দেওয়া এই গারো নামই গারোদের জন্য যুক্তিযুক্ত হয়েছে।[২৫]

মণীন্দ্রনাথ মারাকের এই মন্তব্যসূত্রে অতঃপর গারো নামকরণ বিষয়ে যে সকল মত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। যদিও এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত নামকরণের দিশা লাভে যথেষ্ট সহায়তা করেছে ব্যাপারটা এমন নয়, তথাপিও এই সকল মত গারোদের আগমন, বিচরণ এবং অবস্থানের একাধিক সম্পর্ক-সূত্র ও ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে।

কারো অভিমত এমত যে, গারো পাহাড়ের নামানুসারেই 'গারো' জনগোষ্ঠীদের নাম করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে, 'গারো জনগোষ্ঠীর নামানুসারেই গারো পাহাড়ের নাম ; এবং গারো পাহাড়ের নামানুসারে গারোদের নামকরণ।'[২৬]

'গারোদের কথকতা হতে জানা যায় যে, গারোরা এই উপমহাদেশে আসার আগে তিব্বতের গারু নামক এলাকায় (কেউ কেউ বলে প্রদেশ) বসবাস করছিল। এই এলাকা হতেই তারা এই উপমহাদেশে এসেছে।

---

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
২৫ মণীন্দ্রনাথ মারাক, *গারো নামের ইতিবৃত্ত*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৬
২৬ আইয়ুব হোসেন, চারু হক (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৩

কিন্তু গারোরা নিজেদের পূর্ব আবাসভূমির কথা ভুলতে পারে নাই। তাই তারা নতুন দেশে এসেও, পূর্ব আবাসভূমির স্মরণে নিজেদের গারো বলে পরিচয় দিত।'[২৭]

গারোদের মধ্যে একটি বড় শাখা ছিল 'গারাগানচিং।'[২৮] এরা গারো পাহাড়ের কাছাকাছি নিতাই ও সোমেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকতো এবং গোত্রটি তাদের পরিচয় তুলে ধরতে 'গারাগানচিং' হতে শুধু 'গারা' শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময়ে এই গারা শব্দটি 'গারো শব্দে রূপান্তরিত হয়। ফলে গারো কথাটি 'গারাগানচিং'-দের কাছ থেকে এসেছে।

তিব্বত থেকে আগমনকালে নেতৃত্বদানকারী 'গারু' নামের নেতার নাম অনুসারে গারো নামকরণ হয়েছে– এমন মত প্রকাশ করেন কেউ কেউ।

তিব্বত থেকে একদল লোক উত্তর প্রদেশের *গারোয়াল* জেলায় বসতি স্থাপন করে। সেখানে গারোয়াল পাহাড়ে কিছুকাল বসবাস করে। এই গারোয়াল অঞ্চল থেকেই গারো নামের উৎপত্তি।

গারো কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন কালে সঙ্গল নামে একজন গারো রাজা ছিলেন। যিনি প্রাচীন গৌড়ের অধিপতি ছিলেন এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিকের তথ্য মতেও সঙ্গল রাজার সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, এই গারো সঙ্গল রাজার রাজধানী গৌড়ের নামানুসারে গারো নামের উদ্ভব হয়েছে।

'গারোদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, 'তুরার' পূর্ব নাম ছিল 'দুরা', 'দুরা হলো শক্তির দেবতা। এই তুর ছিং দুরা দেবতার বাসভূমি। দুরার অপর নাম গয়রা। এই গয়রা দেবতার নাম হতেই গারো নামের উৎপত্তি হয়েছে।'[২৯]

অপরদিকে কপিলা বাৎসায়ন মনে করেন– The word Garo is derived from the word, Jura or Dhura (those residing in hills) or possibily after the name of one of their leaders called Gara.[30]

নামকরণের উপরোক্ত মতামত পরিণামে গারো জাতির নামকরণ এবং পরিচয়সূত্রকে অধিক বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। 'দুরা' কি শক্তির দেবতা নাকি 'পাহাড়ি মানুষ', 'গারা' কি গোত্র নামের অংশবিশেষ নাকি কোনো নেতার নাম অথবা গারোদের নামানুসারে গারো পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে নাকি গারো পাহাড়ে বসতি স্থাপনের কারণে জাতির নাম 'গারো' হয়েছে? প্রভৃতি নানাবিধ অমীমাংসিত প্রশ্ন এই সংকটকে আরও জটিল করে তোলে। তথাপিও এই অমীমাংসিত জটিল বিষয়টির আপাত ইতি টানা যায় মেজর এ প্লেফেয়ারের নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে–

---

২৭ মণীন্দ্রনাথ মারাক, *গারো নামের ইতিবৃত্ত,* মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.), *গারো জাতিসত্তা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৪

২৮ মণীন্দ্রনাথ মারাক, *গারো উপজাতি গারো সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ পরিষদ, ময়মনসিংহ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার প্রতিবেদন, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৬

২৯ মণীন্দ্রনাথ মারাক, *গারো নামের ইতিবৃত্ত*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৫

৩০ Kapila Vatsyayan , *Traditions of Indian Folk Dance,* Clarion Books, New Delhi, 1987, P. 116

> The origin of the "Garo" has been the subject to some conjure. In the southern portion of the hills there exists a division of the tribe who call themselves Gara Ganching. These people are not far removed from the Mymensingh district, from which direction the Garos were first approached by Europeans or Bengalis. It is therefore not unlike that this division of the tribe first received their appellation of Gara, that the name was extended to all the inhabitants of hills and that in time it became corrupted from "Gara" to "Garo".[৩১]

বস্তুত ধর্মের আনুষ্ঠানিক করণীয় তথা কৃত্যমূলক অনুষঙ্গগুলোর রীতি-পদ্ধতি ও কাঠামোর মধ্যেই নিহিত থাকে জাতিতাত্ত্বিক নাট্য বা পরিবেশনা শিল্পকলার বীজ। গারোদের ক্ষেত্রেও যা কিছু নাট্যমূলক তার সূত্রটিও প্রত্যক্ষভাবে আদিধর্মের নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতি ও কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা জাতিতাত্ত্বিক নাট্য প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মত এরকম যে, 'কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর যে সকল পৌরাণিক উপকথা, সংস্কার, লোকাচার, ও আত্মিক বিশ্বাসের অভিজ্ঞান সেই জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কৃত্য বা উৎসবে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বিভিন্ন নৃত্য-গীত ও নাট্যমূলক শিল্পরীতিরূপে প্রচলিত তাই এক কথায় নৃগোষ্ঠী নাট্য।'[৩২] তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসরত গারোদের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যের উপাদান, অনুষঙ্গ অন্বেষণ এবং নিরীক্ষার বিষয়ে 'ধর্ম' প্রসঙ্গটি জটিল ধাঁধায় আবদ্ধ করে। কেননা '১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাধানাথ ভৌমিকের প্রথম শিক্ষিত গারো খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে ধর্মান্তরের যে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়'[৩৩], তার প্রবল স্রোতে আদিধর্মে বিশ্বাসী বা পূর্বপুরুষদের ধর্ম অনুসারী গারোদের খুঁজে পাওয়া আজ প্রায় অসম্ভব (হয়তো হাতে গোনা অল্প কিছু সংখ্যক গারো *সাংসারেক*-এর সন্ধান পাওয়া যেতেও পারে)। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ধর্মীয় পরিচয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের সিংহভাগ গারো খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। স্বভাবতই এদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি এবং উদ্‌যাপন পদ্ধতি ও কাঠামোগত প্রক্রিয়াগুলো আবর্তিত হয় মহান চার্চকে কেন্দ্র করে যা অন্যান্য খ্রিষ্টান ধর্মভিত্তিক জাতি-সংস্কৃতির সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। ফলে আদিধর্মের বা পূর্বপুরুষদের দেবতারা আজ আর ধর্মান্তরিত গারোদের দেবতা নয় বা ঐসকল দেবতার উদ্দেশে পালনীয় বা করণীয়গুলোও আজ আর তাদের করণীয় নয় অথবা তাদের ধর্মীয় দর্শনেরও অংশ নয়। তথাপিও গারোদের দলবদ্ধ অংশগ্রহণে উদ্‌যাপিত হয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব অনুষ্ঠান, পরিবেশিত হয় *ওয়ানগাল্লা, রে-রে, খাবি, সেরেনজিং* প্রভৃতি নাট্যমূলক পরিবেশনা। আর এই প্রক্রিয়ায় অতীত ঐতিহ্যের কৃত্যমূলক আচার-অনুষ্ঠানের যা কিছু এখনো উদ্‌যাপিত/পালিত হয়ে থাকে তা গারো-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয়-সংস্কৃতির অংশ না হলেও

৩১ Major A. Playfair, *The Garos*, D. J Publication, Tura, Meghalaya, 2011, P. 8

৩২ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪

৩৩ রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিল, *গারোদের আদি ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর ও ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.) *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১০

সম্ভবত এটাই হচ্ছে গারো সমাজের অন্তঃস্রোতে প্রবহমান সংঘবদ্ধ ও সচেতন অভিব্যক্তি যা সামগ্রিক জীবনাচারের সাংস্কৃতিক উপাদানের অংশ হিসেবে পূর্বপুরুষদের প্রথাগত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, ভক্তি, বিশ্বাসের পরম্পরা রক্ষার্থে সর্বদাই থেকেছে সচল এবং সক্রিয়। ধর্মান্তরিত হয়েও কিছু সংখ্যক গারো-খ্রিষ্টান এভাবেই পূর্বপুরুষদের ধর্ম, উৎসব, আচার, অনুষ্ঠানের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে ভক্তি ও বিশ্বাসে থেকেছে আন্তরিক। বস্তুত এঁরাই স্বতন্ত্র একটি জাতিসত্তা হিসেবে অথবা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে গারোদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির 'প্রকাশ', ''প্রদর্শন' এবং 'পরিবেশন' পরম্পরা অব্যাহত রেখেছে–

> [কারণ] প্রথমদিকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল উপজাতি সংস্কৃতি মানেই ধর্মপালনের পরিপন্থি কতগুলি রীতিনীতি। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা ভালোমন্দ নির্বিচারে ঐতিহ্যবাহী লোকাচারসমূহ বর্জন করিতে গারোদিগকে উৎসাহিত করে। ফলে অনেক ভালো জিনিস, অনেক ভালো নিয়ম, অনেক ভালো আচার অনুষ্ঠান গারো সমাজ হইতে চিরবিদায় নেওয়ার পথে। অবশ্য অনেক পরে সেই ভুল ভাংগিয়াছে। ধর্মপালনের অজুহাতে গারো কৃষ্টি সংস্কৃতির অনেক ভালো জিনিসকে যে ইতোমধ্যে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এই চেতনাবোধ পরবর্তীতে কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল উদারমনা খ্রিষ্টান মিশনারিদের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু ইতোমধ্যে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তথাপি কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টান মিশনারির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগে গারোদের আদি বাদ্যযন্ত্রাদির সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবহার আর সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক তৎপরতার পুনর্জাগরণের প্রয়াস চালানো হইতেছে।[৩৪]

তাহলে গারোদের আদিধর্ম কী? এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো একটি সংজ্ঞাসূত্রে নির্ণয় বা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ও আনুষ্ঠানিক ধর্মের ন্যায় গারোদের ধর্ম-দর্শন একেশ্বরবাদী নয় বরং গারোদের আদিধর্মে রয়েছে বহু দেব-দেবীর স্থান, যাদের প্রায় সকলেই স্ব স্ব মহিমায় ও কর্মে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। কারো কারো মতে প্রকৃতির-ই নানান রূপ ও গুণের ওপর দেবত্ব আরোপ করে গারোদের সকল দেব-দেবী আবির্ভূত হয়েছে। আবার কারো মত এরূপ যে গারোদের সকল দেবদেবী 'আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'[৩৫] *দি গারোস্* গ্রন্থে মেজর প্লেফেয়ারের মতে গারোদের আদিধর্ম *সর্বপ্রাণবাদ* বা অ্যানিমিজম থেকে বিকশিত–

> Like all animistic religions, that of the Garos consists of the belief in a multitude of beneficent and malevolent spirits. To some is attributed the creation of the world, to others the control of natural phenomenena; and the destinies of man from birth to death are governed by a host of divinities whose

৩৪ সুভাষ জেংচাম, *বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬১
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

anger must be appeased by sacrifice, and whose good offices must be entreated in like manner.[36]

প্লেফেয়ারের এই *অ্যানিমিজম* ধারণাকে গ্রহণ না করে রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিল গারোদের আদিধর্মকে বহুদেবত্ববাদের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি গারো দেবতা তাতারা রাবুগা, সুসিমে, ব্রারা এবং দগ্নি, পিং পাং, সালজং, গায়েরা, কালকামে প্রভৃতি দেবগণের কর্ম ও গুণাগুণ দৃষ্টে বলেন– 'গারোদের আদিধর্মকে সত্যিকার Animism বলা যায় না, সত্যিকারভাবে তা হল Polytheism.[৩৭] তবে সুভাষ জেংচাম গারোদের আদিধর্ম আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রকৃতির মাঝেই নানান শক্তির উৎস অন্বেষণ করেছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন–

> প্রকৃতির মাঝে যেসব প্রবল শক্তির উপস্থিতি তারা গভীরভাবে অনুভব করে থাকে সেসব প্রবল শক্তিগুলোকেই তারা দেবদেবী জ্ঞানে গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশেই পূজা-অর্চনার বিধান রাখা হয়েছে। সেসব দেবদেবীর কোন কোনটাকে তারা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে, আবার কোন কোনটাকে রোগব্যাধির আধার এবং একই সঙ্গে আরোগ্য দাতা হিসেবেও কল্পনা করে রোগমুক্তির কামনায় তাদের উদ্দেশে পূজা দিয়েছে, নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছে। সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, বজ্র, বৃষ্টি প্রভৃতির মাঝে তারা প্রকৃতির প্রবল শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেছে এবং সেভাবে তাদেরকে গ্রহণ করে আরাধনা করেছে।[৩৮]

আবার কেউ কেউ গারোদের ধর্মকে *সাংসারেক* হিসেবে আখ্যায়িত করেন– 'গারো ধর্মের নাম 'সাংসারেক'। এই সাংসারেক ধর্ম বলতে বুঝায় অতিপ্রাকৃতিক বস্তুর উপর বিশ্বাস। গারোদের অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাসের নমুনা মোটামুটি হলো সর্ব-প্রাণবাদ (animism)। টোটেমিজম (পূর্বপুরুষ পূজা) এবং মহাপ্রাণবাদ (mana) ইত্যাদি। সর্বপ্রাণবাদ বলতে বুঝায় কতকগুলো spirit এর (অতিপ্রাকৃতিক বস্তুর) উপর বিশ্বাস।'[৩৯]

গারোদের আদিধর্ম প্রসঙ্গে প্রদত্ত এই সকল মতামতের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা থাকলেও বস্তুত গারো ধর্মে 'বহুদেবত্ববাদ', 'অ্যানিমিজম' বা 'আধ্যাত্মিকতা'– সকল মত ও পথেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায় গারোদের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায়। ড. লুৎফর রহমানের মতে– 'গারোদের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকেই গড়ে উঠেছে তাদের স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস।'[৪০] আবার এই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকেই বহু-দেবদেবী পৃথিবী, প্রকৃতি ও মানবের সৃষ্টি এবং গুণাবলীকে করেছে মহিমান্বিত–

---

৩৬ Major A. Playfair, *The Garos*, D. J Publication, Tura, Meghalaya, 2011, P. 88

৩৭ রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিল, *গারোদের আদি ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর ও ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.) *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১০৮

৩৮ সুভাষ জেংচাম, *গারো সমাজ ও সংস্কৃতি*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১৪.

৩৯ মাহবুবুল হাসান, *গারো উপজাতি একটি অনক্ষর সমাজব্যবস্থা*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪২

৪০ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫

আদিতে পৃথিবী বলে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু নিঃসীমকাল ঘোর-অন্ধকার আর পানি। আলো, বাতাস, মাটি, গাছ-পালা প্রাণী-জগৎ কিছুরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই রকম এক পরিস্থিতিতে প্রধান দেবতা *তাতারা-রাবুগা* পৃথিবী সৃষ্টির বাসনা করেন এবং তার সহকারী দেবতা 'নন্ত-নপান্ত'কে এই কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। 'নন্ত-নপান্ত' খুশি মনে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং স্ত্রী লোকের ছদ্মবেশে সঙ্গী 'মাচির' সাহায্যে জগৎ সৃষ্টির কর্মে লিপ্ত হয়।

তাতারা-রাবুগা জগৎ সৃষ্টির জন্য 'নন্ত-নপান্ত'কে একমুঠো বালি দেয়, কিন্তু এই বালি দিয়ে কিছুতেই পৃথিবীর আকার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা পানিতে বালি ধুয়ে যাচ্ছিল বার বার। তখন তিনি তার আর এক সহকারীকে পানি নিচ থেকে একমুঠো মাটি আনতে বলেন। কিন্তু পানির গভীরতা অনেক থাকায় মাটি আনাও সম্ভব হলো না। এরপর 'নন্ত-নপান্তর' আদেশে অপর এক সঙ্গী 'চিফং-নকমা বালফং-গিটেল' নামের একটি প্রাণীকে মাটি আনতে পাঠানো হয়, কিন্তু পানি গভীরতা দেখে সেও ভয় পায় এবং খালি হাতেই ফিরে আসে। অতঃপর 'নন্ত-নপান্ত' আরেক সঙ্গী 'চিচিং-বারচিং' নামের ছোট্ট একটি প্রাণীকে মাটি আনতে পাঠায় এবং এবারে সে সফল হয়, একমুঠো মাটি নিয়ে ফিরে আসে। এই কাদামাটি দিয়েই তখন 'নন্ত-নপান্ত' পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

কিন্তু সৃষ্ট পৃথিবী হাঁটা-চলার উপযুক্ত নয়, কেননা পৃথিবীর উপরিভাগ ছিল নরম অর্থাৎ তা কাদামাটিতে পূর্ণ। এই অবস্থায় 'নন্ত-নপান্ত' প্রধান দেবতার সহয়তা কামনা করেন এবং তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে *তাতারা-রাবুগা* পৃথিবীতে চন্দ্র, সূর্য, আলো, বাতাস সৃষ্টি করেন। এরপর থেকেই ক্রমান্বয়ে সূর্যের তাপে, আলো-বাতাসে পৃথিবীর উপরিভাগ শক্ত আর কঠিন হতে থাকে।

পৃথিবী সৃষ্টির পর অতঃপর *তাতারা-রাবুগা* লেজবিহীন বানর জাতীয় একটি প্রাণী সৃষ্টি করেন, যার প্রধান কাজ ছিল প্রচণ্ড শব্দে আওয়াজ দিয়ে পৃথিবীকে সচল ও সজাগ রাখা। এরপর তিনি হনুমান এবং বাদামি রঙের অন্যান্য প্রজাতির বানর সৃষ্টি করেন। জলচর প্রাণীদের মধ্যে তিনি ব্যাঙ সৃষ্টি করেন, তাদেরও কাজ ছিল প্রচণ্ড আওয়াজের মাধ্যমে আকাশে মেঘের আগমন বার্তা ঘোষণা করা। এরপর তিনি গভীর পানিতে মাছ সৃষ্টি করেন। এসব কিছু করে *তাতারা-রাবুগা* দেখলেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগে কোনো পানি নেই সব কিছু শক্ত আর কঠিন হয়ে উঠেছে। তখন তিনি পৃথিবীতে নদীর প্রবাহ তৈরি করে আকাশে 'নরে-চিরে-কিমরে-বকরে' নামে বৃষ্টির দেবীকে প্রেরণ করেন এবং আকাশে বৃষ্টির আগমন বার্তা ঘোষণা করার জন্য বজ্রের দেবতা 'গয়েরা'কেও পাঠালেন।

কিন্তু এতকিছু সৃষ্টি করেও *তাতারা-রাবুগা* দেখলেন যে পৃথিবীতে প্রাণী থাকলেও কোনো মানুষের অস্তিত্ব নেই। এরপর তিনি সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সৃষ্টি কথা ভাবলেন। এই ভাবনা অনুযায়ী তিনি দেব-দেবীদের ডেকে তার

ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন এবং পৃথিবীতে প্রথম মানব ও মানবীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ধারণের জন্য দেবী 'সুস্মি'কে পৃথিবীতে পাঠালেন।

এদিকে *তাতারা-রাবুগার* আদেশে 'নন্ত-নপান্ত' প্রাচ্যের 'আমিতিং-আফিলজাং' নামক কোনো এক স্থানে আদি পিতা-মাতা বা প্রথম মানব-মানবী 'শানী' ও 'মুনিকে' সৃষ্টি করেন। তাদেরই সন্তানের নাম হলো 'গানচেং' এবং 'দু'জং'– 'এই "গানচেং" এবং "দু'জং"ই হলো গারো জাতির পূর্বপুরুষ।'[৪১] শুরুতে মানব-মানবীর খাদ্য আহারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। প্রকৃতি থেকেই ফল, মূল, পশু-পাখির মাংস খেয়েই ক্ষুধা নিবারণ করা হতো। প্রকৃতির অপার সম্পদে পূর্ণ এই পৃথিবীতে অতঃপর যিনি প্রথম চাষাবাদ শুরু করেন তার নাম 'বনজাসকো' এবং তার স্ত্রীর নাম 'জানোগানদো'। এরা দুজনই প্রথম বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে ফসল আবাদ শুরু করে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার কৌশল আয়ত্ত করেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে পৃথিবী সৃষ্টিতে বহুদেবতার অংশগ্রহণ, পরম যত্নে প্রকৃতি ও মানবের সৃজন এবং প্রকৃতির ওপর মানবের নির্ভরতার বিষয়গুলি স্পষ্টতই দৃশ্যমান। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হয় যা পরবর্তী সময়ে গারো আদিধর্মের কৃত্যানুষঙ্গের প্রধান রীতি বা প্রথা হিসেবে চর্চিত হয়, আর সেটি হচ্ছে দেবতাকে 'ভোগ' দেওয়া বা 'উৎসর্গ' করা। আদি ও পূর্বপুরুষদের মধ্যে *বনজাসকো* এবং *জানোগানদো* কৃষিকাজের শেষে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করার যে রীতি প্রচলন করেছিলেন বস্তুত এই সূত্র ধরেই গারোদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় দেবতাকে 'উৎসর্গ' করা বা ভোগ দেওয়ার বিষয়টি প্রধান একটি রীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়– '[that] main features of Garo religious observances are the sacrifice of animals and birds, and drinking, to which dancing is often added.'[৪২] অর্থাৎ 'উৎসর্গ' গারো সমাজের সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী পালনীয় কৃত্য এবং নৃত্য, গীত, বাদ্য, কথা, কাব্য হচ্ছে এই কৃত্য পালনের অবিচ্ছেদ্য এবং প্রায়োগিক উপাদান। অর্থাৎ বিষয়টিকে এভাবে বলা যায়– ভয় থেকে মঙ্গল কামনার্থে হোক অথবা ভক্তি শ্রদ্ধায় নিবেদনার্থেই হোক– জন্ম থেকে মৃত্যু বা বীজ হাতে ফসল বোনার প্রথম আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রতিটি স্তরেই রয়েছে দেবতাদের উদ্দেশে পশু/পাখি উৎসর্গ করা অথবা ফসল/খাদ্য/আহার্য বস্তু ভোগ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক রীতি ও পদ্ধতি। রীতিটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় বরং সমষ্টির অংশগ্রহণে নৃত্য গীত বাদ্যের তালে, ছন্দে, নাট্যমূলক পরিবেশনায় অথবা পানাহারে সম্পূর্ণ হয় এই সকল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা। ফলে 'শ্রম, আনন্দ এবং কৃত্য এখানে একীভূত, অন্যান্য আদিম নৃগোষ্ঠীর মতো গারোদের নাট্যমূলক অনুষ্ঠানাদি কার্যত তাদের প্রাত্যহিক কর্মেরই অনুষঙ্গ। জুম চাষের জমি প্রস্তুত কিংবা নতুন ফসল ঘরে তোলার পূর্ব মুহূর্তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

৪১ বিধি পিটার দাংগ, *গারো সৃষ্টিতত্ত্ব*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৮২
৪২ Major A. Playfair, *The Garos*, D. J Publication, Tura, Meghalaya, 2011, P. 98

পরিবেশিত নৃত্য-গীত-নাট্যের ব্যবহারিক অর্থ মূলত তাই। কাজেই আনন্দ ও শক্তির উৎস রূপেই তা বিবেচ্য।'[৪৩] এভাবেই গারোদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদ্‌যাপিত কৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং পালা ও পুরাণকথার নাট্যমূলক পরিবেশনা ইত্যাদি। ফলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই ঐতিহাসিক কাল থেকেই গারো সমাজ-সংস্কৃতিতে 'কৃত্য', 'উৎসব' এবং 'বিনোদন' অভেদাত্মক 'ক্রিয়া' বা 'শিল্প' রূপেই বিবেচ্য হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে *ওয়ানগাল্লা, বাসাল চুগান, খাবিচত্তা, গান্না, মিইকিয়া, রং চু গাল্লা, আচুয়া কৃত্তা, নকফান্থে নকদংগা আ, নকদং গা আ, মিশ্চি সক্চি, দেনংবিল সিয়া, আঃসংখাসিথাত্তা, জা অক্কা, দাক্ গিপ্পা আমুয়া, আকৃত্তা, মাং অন্না* প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলো যেমন একাধারে ধর্মীয় কৃত্য-রীতি-প্রথার অনুষঙ্গ, অপরদিকে তা আবার সর্বজনীন/সমষ্টির উৎসবেরও অনুষঙ্গ। জানা যায় অতীতে (গারো-খ্রিষ্টান যুগের পূর্বে) এই সকল ধর্মীয় কৃত্য ও প্রথাগত উৎসব অনুষ্ঠানের সাথে নৃত্য, গীত ও নাট্যের প্রচলন ছিল বহু ও বিচিত্র। *নৃগোষ্ঠী–নাট্য : গারো* গ্রন্থে *ওয়ানগাল্লা* উৎসবকে কেন্দ্র করে 'ছাপ্পান্ন প্রকার নৃত্যের'[৪৪] কথা উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া গীত প্রধান পরিবেশনা যেমন– আজিয়া, রে-রে, খাবি, দরুআ প্রভৃতি এবং পুরাণকথা ও পালা/আখ্যান নির্ভর পরিবেশনা 'ওয়াল জাং এবং শেরেন জিং গারোদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশনা ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এ পর্যায়ে 'কৃত্য', 'উৎসব' এবং 'বিনোদন'-এর অভেদাত্মক 'ক্রিয়া' বা 'শিল্প' রূপের উদাহরণ স্বরূপ আং-খি দং থাত্তা (কাঁকড়া উৎসর্গ) উৎসব বর্ণনা করা যেতে পারে :

> গৃহের সম্মুখের বারান্দায় আদা, কচু ও অন্যান্য কৃষিজাত ফসল, সমস্ত পুরানো কৃষি যন্ত্রপাতি যাহা দ্বারা সারা বৎসর চাষাবাদ করা হইয়াছে তাহার নিকট ভাত ও মাছের তরকারি সাজাইয়া রাখা হয়। 'চ্যাং নামক মাছ ইহার জন্য প্রয়োজন, অভাবে অন্য মাছ দেওয়া যাইতে পারে। মন্ত্র পাঠের পর পুরোহিত দুইটি কাঁকড়া এইগুলির সম্মুখে উৎসর্গ করে ও দশ বারোটি জীবন্ত কাঁকড়া ঘরের ভিতরে ছাড়িয়া দেয়।
>
> কেবলমাত্র নক্‌মার গৃহে এই সমস্ত পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; পূজা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দামা, রাং এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো ও যে সমস্ত জায়গায় পূজার আয়োজন করা হইয়াছিল সেই সমস্ত জায়াগায় মদ ঢালিয়া দেওয়া হয়, ইহাকে 'রুগালা' বলে। ইহার নক্‌মা জনসমক্ষে 'চু' অর্থাৎ মদ লইয়া আসে। সর্বপ্রথম এক গ্লাস মদ পুরোহিতকে পান করিতে দেওয়া হয়। তাহার মদ পান শেষ হলে গ্রামবাসীরা মদ পানের অনুমতি লাভ করে। নক্‌মা গ্রামবাসীকে তাহাদের প্রয়োজনীয় মদ সরবরাহ করিয়া থাকে। পুরুষেরা যথেষ্ট পান করিবার পর নারী ও শিশুরা 'চু' পান করিতে পারে। মদের পালা শেষ হইলে পুরোহিত 'গান্দো' (গারো পুরুষদের ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের যন্ত্র) 'খফিং'

---

৪৩ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

(লাল রঙের পাগড়ি) 'জাকসিল' (অনন্ত জাতীয় এক প্রকার গহনা), 'জাকছাপ' (মনিবন্ধের গহনা) ইত্যাদিতে সজ্জিত হইয়া 'মিল্লাম' (গারো তরবারী) ও 'স্ফী' (ঢাল) গ্রহণপূর্বক নক্‌মার গৃহের চুল্লির নিকট নৃত্য আরম্ভ করে। তাহার পর উল্লেখিত পোশাক, অলঙ্কার ও অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নক্‌মা এবং পরে গ্রামবাসী নৃত্য করে। নৃত্য পরিবেশনের পর যে অনুষ্ঠান পালিত হয় তাহাকে 'ওয়াম্থি থক্কা' বলে। ইহার পর নারীরা তাহাদের উত্তম পোশাক ও অলঙ্কার সজ্জিত হইয়া নক্‌মার গৃহে নৃত্য আরম্ভ করে।

নক্‌মার গৃহের সমস্ত পূজা মদপান ও নৃত্যগীত সাঙ্গ হইলে পুরোহিত গ্রামবাসীদের লইয়া নিজ গৃহে যায়। সেখানে 'রংদিক দং থাত্তার' পর 'ওয়াম্থি থক্কা' ও নারীদের নৃত্য পরিবশিত হয়।[৪৫]

মোটকথা এই হচ্ছে গারো জাতিতাত্ত্বিক নাট্যের স্বরূপ যা কখনই ধর্ম থেকে বিনোদনকে আবার সামাজিক ক্রিয়া থেকে কৃত্যকে বিচ্ছিন্ন করেনি। প্রকৃতির উদ্দেশে হোক বা দেবতার উৎসর্গে হোক সকল প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানেই রয়েছে নৃত্য, গীত, বাদ্য, গল্প-গাথা আর কাব্যের উপস্থিতি। আর এভাবেই প্রকৃতির নির্ভরতায় আদিধর্মের অনুসরণে পুরুষানুক্রমের মৌখিক পরম্পরায় সহস্র বছর ধরে প্রবহমান থেকেছে গারো জাতি-সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির নাট্যমূলক উপাদানসমূহ। গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গুহা-চিত্রে, পাথুরে নক্সায়, স্থাপত্যকলা এমনকি কালি ও কলমের আঁচড়ে স্মৃতি সংরক্ষণের প্রচলন অত্যন্ত বিরল। সম্ভবত এই অভাবটিকেই সর্বাত্মকভাবে পূরণ করেছে পরিবেশনা শিল্পকলার মাধ্যমে। বলা যায় জীবন, পরিবেশ এবং কর্মের প্রায় সকল প্রকার আচরণকেই কখনো ধর্মের, কখনো কৃত্যের আবার কখনো বা সামাজিক উৎসব বা বিনোদনের অনুষঙ্গ করে রেখেছে– বীজ বপন, ফসল কাটা, ফসল (তুলা, যব) সংগ্রহ, ঘুঘু লড়াই, কাপড় কাচা, পালক বিতরণ, ফসল শুকানো, গোসল করা, ফল কুড়ানো, শিং বাজানো, আগাছা পরিষ্কার করা, মদ পান করা, স্ত্রী হরণ, প্রেমিকাকে অনুসরণ করা, প্রেমে পড়া, শিকার করা, তলোয়ারের লড়াই করা, গোপনে ধূমপান করা, সালাম বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, কোলে করে শিশু সন্তানের লালন পালন, বানরের ভুট্টা ভক্ষণ বা ফসল নষ্ট করা, উঁচু থেকে শস্য সংগ্রহ, ঘোড়ার মূর্তিসহ নারীদের যুদ্ধবেশ ধারণ করা, জামাই ধরা, পাখি তাড়ানো, ধান ভানা, চাম্বল ফল নিক্ষেপ, চাম্বল ফল ঘুরানো প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের অসংখ্য আচার আচরণকে কখনো নৃত্যের ছন্দে, কখনো গীত-বাদ্যে আবার কখনো গল্প-গাথা-কাব্য বা পালার মাধ্যমে সজীব প্রাণবন্ত দেহ-ক্যানভাসে অঙ্কন করেছে, প্রদর্শন করেছে এবং পরম্পরাসূত্রে প্রবহমান রেখেছে শত শত বছর ধরে।

গারো সম্প্রদায় তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাহিত্য সঙ্গীত চর্চা করত। তাদের জীবন সঙ্গীত ছাড়া যেন নিরামিষের মত লাগতো। সঙ্গীতের পাশাপাশি নৃত্য করা তাদের যেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রায় সঙ্গীতেই

---

৪৫ বিধি পিটার দাংগ (সম্পাদক), *জানিরা, উপজাতীয় গবেষণা সাহিত্য সাময়িকী*, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮১, বিরিশিরি, পৃ. ৮-৯

> নৃত্যের ছোঁয়া আছে। সংস্কৃতির অঙ্গন তাদের জীবনকে এমনভাবে জড়িয়ে রাখে যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জীবন সংস্কৃতিময়। গারোদের বাদ্যযন্ত্র তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পূজা-পার্বণ, জন্ম-মৃত্যু, শ্রাদ্ধ-শান্তি অনুষ্ঠান যাই করুক না কেন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। বাদ্যযন্ত্রকে তারা পবিত্র জ্ঞান করে। তাইতো বাদ্যযন্ত্র তারা হস্তান্তর করতে চায় না। গারোদের জীবনে সংস্কৃতির উপাদানগুলো অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ।[৪৬]

গারো 'জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়' শীর্ষক এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার অন্তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা যায়। এক. যদিও গারোরা একটি নির্দিষ্ট এবং প্রাচীন ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাদের এ ভাষার লেখ্য রূপ না থাকায় অতীত-ঐতিহ্য এবং ইতিহাস প্রসঙ্গটি নিজের রচিত গ্রন্থ/শাস্ত্র/পুরাণ/কাব্য প্রভৃতি সূত্র দ্বারা নির্ণীত না হয়ে অপর বা তৃতীয় সূত্র/উৎস বা ইতিহাসের তথ্য দ্বারা নির্ণীত হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। তাছাড়া ইতিহাসে পর্যাপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বয়ানের অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশের গারোদের আগমন, অবস্থান, নামকরণ প্রভৃতি নানান বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি 'গারো' নামকরণ বিষয়ে প্রচলিত জটিলতারও কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। দুই. গারোদের আদিধর্ম প্রকৃতি নির্ভর এবং বহুদেব-দেবী আশ্রিত হলেও এর কোনো লিখিত শাস্ত্র অথবা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নেই অথবা সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান-অনুশাসন যা অদ্যাবধি গারো সমাজ অনুসরণ করে চলেছে তা নিজেদের ভাষায় রচিত কোনো শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ নয় বা শাস্ত্র দ্বারা নির্দেশিত নয়। বরং ধর্মের আনুষ্ঠানিক বিধি-বিধান এবং এর দর্শনগত রূপটি পুরুষানুক্রমে মৌখিকরীতির পরম্পরায় বিবর্তিত হয়েছে। ফলে আদিধর্ম হিসেবে গারোদের ধর্মীয় বিধি-বিধান কখনোই একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করা যায় না। কারণ প্রবহমানতা এবং পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে মৌখিক রীতি বা প্রথার মূল শক্তি এবং এর দুর্বলতাও বটে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অনপুস্থিতি, অবর্তমানে অথবা অনাগ্রহতায় এই প্রথার উৎস-অবস্থান শুধুই স্মৃতিনির্ভর হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া প্রজন্মের হাত বদলের সাথে সাথে রীতি বা প্রথাগত চর্চায় যুক্তি-বিযুক্তি, আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটি সর্বদাই থাকে সচল ও সক্রিয়। ধারণা করা যায় এই দুর্বলতাকেই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল মিশনারি চার্চ। কেননা বাংলা অঞ্চলে যখন মিশনারি চার্চের সর্বাত্মক প্রভাব এবং ধর্মান্তরিত করার মহাযজ্ঞ শুরু হয় তখন এর প্রতিরোধে শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থবিহীন মৌখিক ধারার আদির্ধম সম্পূর্ণতই ব্যর্থ হয়েছিল। সম্ভবত এটিই অন্যতম একটি কারণ যখন বৃটিশযুগে গারো সমাজ বহুবিধ দুর্যোগ ও সংকটে নিমজ্জিত হয়েছিল তখন সেই সংকট মুহূর্তে আদিধর্মের দেবতারা নয়, ঈশ্বর যিশু অতি সহজেই গারোদেরও মহান ত্রাণকর্তা/প্রভু হয়ে উঠতে পেরেছিল।

---

৪৬ থিওফিল নকরেক, *গারো সংস্কৃতির জীবনবাদ ও পর্যালোচনা*, নন্দিতা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৫৫

এই দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এটি প্রত্যক্ষভাবে গারো জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার রূপ-রীতি, বিকাশ ও বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। কেননা যদি প্রকৃতির আবর্তন নির্ভর জীবনাচারের প্রতি আস্থাই না থাকলো অথবা যদি আদিধর্মের দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসই না রইল তবে প্রতি বছর জুম কেন্দ্রিক ফসল বোনার পূর্বে *আসিরকা* এবং ফসল তোলার পর *ওয়ানগাল্লা* উৎসবে *সালজং দেবতার* উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তি-বিশ্বাসজাত নৃত্য, গীত তথা নাট্যমূলক পরিবেশনার বিষয়টিও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। আর তখন এই উৎসবকে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির 'আনুষ্ঠানিক প্রদর্শন' অতিরিক্ত অন্য কিছু দাবি করা যায় না। এই দাবি যে মোটেই অযৌক্তিক নয় তার প্রমাণ মেলে মধুপুরের, চুনিয়া গ্রামের ৫১ বছর বয়সী একজন গারো নৃত্য প্রশিক্ষক মেবুল দারু (মোনালিসা)-এর উক্তিতে–

> আসলে আমরা এই যে ওয়ানগালা, আমি নিজের চোখে দেখি নাই। আমার দাদীর কাছে গল্প শুনতাম যে, এরকম হতো। যখন থেকে আমি বুঝমান তারপর থেকে ওয়ানগালা দেখি নাই, শুনেছি। আগের মতো হয় না। কারণ ঐটা ৩ দিনব্যাপী ছিল। সন্ধ্যা থেকে পরের দিন সারাদিন। তারপরে সারাদিন তার পরের দিন শেষ হইতো। সারারাত খাওয়ার পরে আজিয়া রে-রে আনন্দ ফুর্তি করতো।[৪৭]

এই যদি হয় বর্তমানে চুনিয়া গ্রামের *ওয়ানগাল্লার* অবস্থা তবে অন্য কোথাও, অন্য কোনো গ্রামে অপর কোনো গারো-খ্রিষ্টানদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় যদি পূর্বপুরুষদের আদিধর্মের উৎসব–*ওয়ানগাল্লা* অথবা অন্যকোনো উৎসব, নৃত্য বা গীতের আয়োজন করা হয়েও থাকে তাহলে এই সকল আয়োজনকে স্পষ্টতই গারো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদান অনুষঙ্গকে নব্য আত্তীকৃত খ্রিষ্টান ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে মেলবন্ধনের প্রবণতা হিসেবে দেখাই সঙ্গত মনে করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তবুও গারোদের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অনেক নাট্যমূলক উপাদান, অনুষঙ্গ আজ আর চর্চিত হয় না এমনকি চর্চা করার সুযোগও আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় প্রসঙ্গটির উপসংহারে এসে গবেষক লুৎফর রহমানের মন্তব্যটিকে প্রণিধানযোগ্য মনে করছি এবং এই মন্তব্যের সাথে সর্বাংশে ঐকমত্যও পোষণ করা যায়–

> একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্য অনেক নৃগোষ্ঠী অপেক্ষা গারো নৃগোষ্ঠী একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সমাজ বিকাশের ধারায় এই সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। যদি ধারাবাহিক বিকাশের মধ্যদিয়ে গারো সমাজ ও সংস্কৃতি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হতে পারত তাহলে এদের সংস্কৃতিতে আধুনিকতার মাত্রা যোগ হওয়া ছিল স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। নিজস্ব রসরুচির আশ্রয়ে গড়ে ওঠা গারো সংস্কৃতির শত সহস্র বছরের চলমানতায় খ্রিষ্টধর্ম এবং চার্চ একটি মধ্য খণ্ডন এবং তা ইংরেজ শাসন ও শোষণের অনিবার্য ফলও বটে। উক্ত

---

৪৭ মেবুল দারু (নৃত্য প্রশিক্ষক)-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকারটি ধারণ করা হয় মধুপুর গড়, চুনিয়া গ্রাম থেকে, তারিখ ২/১/২০১৫

মধ্য খণ্ডনের ফলে গারো সমাজ আজ অস্তিত্বহীন প্রায়। এই নৃগোষ্ঠীর প্রধান প্রধান অভিজ্ঞানসমূহ এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না মোটেই।[৪৮]

জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ের পূর্বোক্ত সকল আলোচনার আলোকে উক্তিটিকে বিবেচনা করলে ভাষা, জন বা জনপ্রবাহ, ধর্মীয় এবং সামাজিক কৃত্য, উৎসব, অনুষ্ঠান দৃষ্টে গারোদের স্বতন্ত্র ও স্বকীয় সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু গারো সমাজ ও সংস্কৃতিতে 'মধ্য খণ্ডন' নামে যে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট তৈরি হলো এবং আদি সংস্কৃতি ও পরিবেশনা ঐতিহ্যকে অ-স্বীকৃতির যে সর্বাত্মক অভিঘাত সৃষ্টি হলো সে কারণে গারোদের সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক উপাদান, অনুষঙ্গকেই আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের এই বিষয়টি বিবেচনা রেখেই অতঃপর 'ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– গারো' শীর্ষক আলোচনায় গারো নাট্য-নিরীক্ষার অবতারণা করা হলো।

---

৪৮ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬

৩.২ : ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– গারো

পদ্ধতিগতভাবে বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি ক্ষেত্র-সমীক্ষা নির্ভর বিধায় অন্য দুটি (মারমা ও মণিপুরী) জাতিতাত্ত্বিক নাট্য-নিরীক্ষার মতো গারো সংস্কৃতি ঐতিহ্যিক পরিবেশনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও মাঠ পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ধাপে টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়-অঞ্চলের চুনিয়া গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, নেত্রকোনার বিরিশিরি, সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের পাদদেশের টিলা সমৃদ্ধ ফুলবাড়ি এলাকা, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউরা ও তার পার্শ্ববতী এলাকাসমূহে ক্ষেত্র-সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয় সেই সকল গারো পরিবেশনা পর্যবেক্ষণে যেগুলো আদিধর্মে বিশ্বাসী গারো *সাংসারেক* কর্তৃক চর্চিত বা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের মধ্যে '৯৯ ভাগ-ই গারো-খ্রিষ্টান' এই তথ্যটি জানা সত্ত্বেও বিশ্বাস ছিল অন্তত এখনো যারা আদিধর্মে বিশ্বাসী রয়েছেন তাদের পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলসমূহে অবস্থান পরবর্তী অভিজ্ঞতাটি এমন যে, কেবল মধুপুরের *চুনিয়া গ্রামের* একটি *সাংসারেক* গারো পরিবারের উদ্‌যাপিত *ওয়ানগাল্লা* উৎসব এবং অপর একজন *সাংসারেক গারো* কবিরাজের তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোথাও (ক্ষেত্র সমীক্ষার উল্লিখিত অঞ্চল) *সাংসারেক* গারোদের পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ এই সকল অঞ্চলে আর কোনো *সাংসারেক গারো* অবশিষ্ট নেই, যদি বিচ্ছিন্নভাবে দু-চার জন *সাংসারেক* গারোর সন্ধান পাওয়া যায়ও তবে এই কতিপয় নিঃসঙ্গ *সাংসারেক গারোর* উদ্যোগে ধর্মীয় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের দলগত অথবা সার্বজনীন কোনো অনুষ্ঠান সংগঠিত করার বা উদ্‌যাপনের সামর্থ্য এবং সক্ষমতা দুটোর কোনোটিই আজ আর অবশিষ্ট নেই বলে স্থানীয়সূত্রে নিশ্চিত করা হয়। এরূপ বাস্তবতায় অবশেষে ক্ষেত্র সমীক্ষার উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে গারো-খ্রিষ্টান কর্তৃক উদ্‌যাপিত/আয়োজিত বেশকিছু পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা হয়– তিনটি *ওয়ানগাল্লা* উৎসব (এর মধ্যে একটি উৎসব ঢাকাস্থ গারো কমিউনিটির উদ্যোগে বনানী বিদ্যানিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়) এবং উৎসব অন্তর্গত নৃত্য, একাডেমী/স্কুল/সংগঠন পরিচালিত গারো নৃত্য (৭টি), প্রণয়-আখ্যান ভিত্তিক গারো-নাট্য– *শেরেনজিং*, গীত-প্রধান পরিবেশনা *রে-রে, খাবি, সাম্বিল মিসারা* পরিবেশনা এবং একটি তান্ত্রিক ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতি সহ সর্বমোট ১৫টি পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়াঞ্চল

২০১৫ সালের ৩ জানুয়ারি চুনিয়া গ্রামের *সাংসারেক* জনিক নকরেক (১১০)-এর গৃহাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব *ওয়ানগাল্লা*। পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে, অত্যন্ত সাদামাটা এবং প্রাণহীন ছিল

সেই উৎসব। এর কারণ হিসেবে *সাংসারেক* গারো এবং গারো-খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাগত দূরত্ব এবং অনেকাংশে অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই মূলত চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত এই উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি অংশ ছিল গারো-খ্রিষ্টান এবং অপর অংশটি মধ্যবিত্ত বাঙালি (মুসলিম)। সার্বিক পরিস্থিতি এতটাই প্রাণহীন ছিল যে উৎসবের অপরিহার্য অংশ ঐতিহ্যবাহী 'দামা' ও 'ক্রাম' বাজানো এবং তালের সাথে নৃত্য প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষেরও দেখা মেলেনি। ফলে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে 'দামার' আওয়াজে কেবল ধর্মীয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা, চু বা মদ পান, শূকর উৎসর্গ করা এবং সকলে মিলে ভোজন করার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয় *ওয়ানগাল্লা* উৎসব। ফলে গারো নাট্য-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে পর্যবেক্ষণকৃত চুনিয়া গ্রামের *ওয়ানগাল্লা* উৎসব পর্যবেক্ষণসূত্রে পর্যাপ্ত এবং কার্যকর উপাত্ত না থাকায় এটিকে পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরা সম্ভব হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার অংশ হিসেবে অতঃপর চুনিয়া গ্রামের গারো নৃত্য প্রশিক্ষক মেবুল দারু (মোনালিসা)-এর তত্ত্বাবধানে গারো তরুণীদের পরিবেশিত কয়েকটি নৃত্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। তিনি একটি স্কুলের মাধ্যমে গারো ছাত্র-ছাত্রীদের ঐতিহ্যবাহী গারো নৃত্যের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। মেবুল দারুর তত্ত্বাবধানে পর্যবেক্ষণকৃত নৃত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে– *ঘুঘু পাখির নৃত্য, তুলা সংগ্রহের নৃত্য, তারা দেখার নৃত্য, ধানের চারা লাগানো নৃত্য, ধান কাটার নৃত্য, ধান ভানা ও শুকানোর নৃত্য* প্রভৃতি। 'দামা'র সাধারণ একটি তাল অনুসারে হাতের মুদ্রা এবং পায়ের ছন্দের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট একটি বা দুটি বর্ণনাত্মক ভঙ্গি পুনঃপুন প্রদর্শিত হয়ে থাকে এবং প্রদর্শনকালে দিক পরিবর্তন করার মাধ্যমে তা কোরিওগ্রাফিক্যাল হয়ে ওঠে। যেমন- ধানের চারা বা বীজ লাগানোর নৃত্যে একহাতে লাঠি বা ধারালো কোনো যন্ত্র হাতে মাটিতে গর্ত করার ভঙ্গি বর্ণনা করে অপর হাতের একটি আঙুলের সাহায্যে সেই গর্তে বীজ ফেলার ভঙ্গিটি চার মাত্রার ছন্দযোগে পুনঃপুন প্রদর্শন করা হয় এবং নৃত্যটি দলবদ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে করা হয়। বস্তুত হাতের ভঙ্গিমা বা মুদ্রায় ও পায়ের ছন্দে নির্মিত নৃত্য-ভাষাটি পরিণামে গারোদের কৃষিভিত্তিক নানাবিধ কর্মকাণ্ড, দেহের ভঙ্গি এবং চলনেরই শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। ফলে এই নৃত্যকে এক অর্থে *বর্ণনাত্মক-নৃত্য*ও বলা চলে, অর্থাৎ *তুলা সংগ্রহ* বা *তারা দেখা* প্রভৃতি বিষয় ভিত্তিক নাচে হাতের সাধারণ কিছু বর্ণনাধর্মী ভাষায়/মুদ্রায় এবং পায়ের ছন্দের সমন্বয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে গারো নৃত্যে (পর্যক্ষেণকৃত নৃত্যসমূহে) হাত ও পায়ের ব্যবহারই মুখ্য কোমর, টরসো এবং মাথার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত, এমনকি নেই বললেই চলে। তাছাড়া শিল্পী তাঁর মুখমণ্ডলে বিষয়ের অর্থপূর্ণ বা ইঙ্গিতপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশের পরিবর্তে শান্ত ও নির্লিপ্ত অভিব্যক্তিতে নৃত্য পরিবেশন করেন। আপাত দৃষ্টিতে বলা যায় এ সকল নাচে প্রকৃতি ও জুম চাষের নানা বিষয় এবং কর্মকাণ্ডকেই প্রতীকী দেহভাষায় মূর্ত করা হয় বা বর্ণনা করা হয়, তবে প্রশিক্ষক মেবুল দারুর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয় যে, এই নাচ বর্তমানে কৃত্যের অংশ বা অনুষঙ্গ হিসেবে নয়, বরং নানাবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা প্রতিযোগিতামূলক

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথা নৃত্যের অভিব্যক্তিতে গারো সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করাই এর মূল লক্ষ্য। নৃত্যের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষকের সরল উক্তি– 'আমি কিন্তু নৃত্যশিল্পী না। আমাদের ছোটবেলা থেকে বাবা একটু সংস্কৃতিমনা ছিলেন। আগের যে সকল বয়স্ক বুড়াবুড়ি যারা আগে থেকে নাচতে পারতো তাদের এখানে এনে আমাদের মেয়েদের ছেলেদের প্রাকটিস করাতো আর কি। নাচ তো অনেক আছে, নাচের বিভিন্ন নাম আছে তবে স্টেপ আর শরীরের ভঙ্গি আমার মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি।'[৪৯] প্রশিক্ষক মেবুল দারুর তত্ত্বাবধানে প্রদর্শিত নৃত্যের পর্যবেক্ষণ এবং তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার সূত্রে একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, গারো তরুণীদের প্রদর্শিত এই সকল নৃত্যে অতীতের স্মৃতি ও শ্রুতির যোগসূত্র থাকলেও বর্তমানে এই নাচ সম্পূর্ণতই গারো সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রদর্শিত হয়, জাতিগত ধর্ম-সংস্কার-আচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা অনুষঙ্গ হিসেবে নয়।

এ অঞ্চলের অপর একটি পরিবেশনা– তান্ত্রিক ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই ওঝার নিকট থেকে জানা যায় যে, পরিবর্তিত ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে অধিকাংশ গারো-খ্রিষ্টান আর আদিধর্মের দেব-দেবীর বিশ্বাসে তান্ত্রিক চিকিৎসায় আগ্রহী নয়। তথাপিও যাঁরা খ্রিষ্টান হয়েও পূর্বের রীতি-নীতিকে এখনো কিছুটা আঁকড়ে আছেন এরকম কিছু পরিবারেই কেবল তাকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই চিকিৎসাতে বিশেষ পদ্ধতিতে সুতা দ্বারা নির্মিত একটি বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাঠ দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত একটি স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখা সুতার বস্তুটি বাতাসের বেগ ছাড়াই এর গতি-বিধি পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে অসুখের ধরন ও চিকিৎসার উপায় বলে দেওয়া হয়। ওঝার প্রদর্শিত চিকিৎসা পদ্ধতিটিও বর্তমান গবেষণায় কার্যকর নয়, কারণ জাদুবিদ্যামূলক এই পদ্ধতিতে সুতায় নির্মিত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীকস্বরূপ নির্মিত বস্তুটির ব্যবহার ব্যতীত ধ্যান, দম (প্রাণায়াম), কণ্ঠ সম্পৃক্ত বিশেষ কোনো আচার-আচরণ, ভঙ্গি অথবা দশা বা ভরকেন্দ্রিক প্রদর্শন ছিল সম্পূর্ণ অনপুস্থিত।

নেত্রকোনার বিরিশিরি ও ফুলবাড়ি অঞ্চল

পরবর্তী ক্ষেত্র সমীক্ষা নেত্রকোনার বিরিশিরি এবং কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের পাদদেশের ফুলবাড়ি এলাকায় সম্পাদন করা হয়। এ পর্যায়ের শুরুতে বিরিশিরি কালচার একাডেমি প্রাঙ্গণে কিছু গারো নৃত্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। আঙ্গিক এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এই সকল নৃত্যের সাথে মধুপুর চুনিয়া গ্রামে পর্যবেক্ষণকৃত গারো নৃত্যের প্রভূত সাদৃশ্য বর্তমান। তাছাড়া এই নৃত্যগুলোও জাতিগত ধর্ম-সংস্কার, আচার-আচরণের অনুষঙ্গরূপে চর্চিত হয় না বরং গারো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দর্শক বিনোদনের নিমিত্তে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

---

৪৯ মেবুল দারু (নৃত্য প্রশিক্ষক)-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকারটি ধারণ করা হয় মধুপুর গড়, চুনিয়া গ্রাম থেকে, তারিখ ২/১/২০১৫

অতঃপর ফুলবাড়ি এলাকায় পর্যবেক্ষণ করা হয় গারোদের ঐতিহ্যবাহী প্রণয়াখ্যান ‘শেরেনজিং পালা’। সম্ভবত ঐতিহ্যবাহী গারো সংস্কৃতিতে প্রচলিত বিভিন্ন আখ্যানের মধ্যে এটি-ই সর্বাধিক প্রাচীন। আখ্যান বর্ণিত কিছু কিছু চরিত্রের নামকরণ ও তাদের বিচরণক্ষেত্র, কাহিনী বর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থান এবং যে সকল পথের উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোকে এটিকে অভিবাসনকারী গারোদের প্রাচীন কাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ– ‘মঙ্গোলয়েড শাখার এই নৃগোষ্ঠীর তিব্বত হয়ে বঙ্গদেশে আগমন এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ইতিবৃত্ত এই কাহিনী অর্থাৎ এ হচ্ছে এদেশে অভিবাসনকারী গারো নৃগোষ্ঠীর আগমন ও তৎপরবর্তী বিকাশের ইতিহাস আশ্রয়ী কাহিনী। মোটকথা গল্পের নায়ক-নায়িকা যে যে অঞ্চলে তাদের জীবনলীলা ও প্রেমলীলা সম্পন্ন করেছে গারো নৃগোষ্ঠী সেই সকল জনপদেই বসবাস করে।’[৫০]

দুই অনাথ শিশুকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হয় প্রণয়ধর্মী আখ্যান *শেরেনজিং*-এর নাট্য-বৃত্ত। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ শিশুকন্যা শেরেনজিং এবং পিতা-মাতার মৃত্যুতে গহিন জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা অনাথ শিশু পুত্র ওয়ালজান উভয়ের-ই আশ্রয় ঘটে শেরেনজিং-এর মাসির ঘরে। মাসির ঘরে ক্রমেই বড় হয়ে ওঠা শেরেনজিং এবং ওয়ালজানের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমান্বয়ে তা প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু মেসো ও মাসি এই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নিষিদ্ধ করে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ এবং একই সাথে অপর আর এক যুবকের সাথে শেরেনজিং-এর বিবাহ চূড়ান্ত করা হয়। এদিকে ওয়ালজান শেরেনজিংকে নিয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু পথিমধ্যে ধরাও পড়ে যায়। এই ঘটনার পর ওয়ালজানকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং আগে থেকে ঠিক করে রাখা পাত্রের সাথে শেরেনজিং-এর বিবাহ সম্পাদন করা হয়। কিন্তু এত কিছু করেও উভয়ের প্রেমকে দমানো যায় না। ওয়ালজান কৌশলে শেরেনজিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং পুনরায় তারা পালিয়ে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গহিন বনে বসবাস করতে থাকে।

রীতি-বৈশিষ্ট্যে *শেরেনজিং* সংলাপাত্মক গীত ও গদ্য-প্রধান পরিবেশনা। উন্মুক্ত আয়তনে পরিবেশিত *শেরেনজিং পালার* সকল চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থানে গ্রিনরুম ব্যবহার করা হয় (পর্যবেক্ষণকৃত পালাটির ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী একটি গৃহের বারান্দাকে গ্রিনরুম হিসেবে ব্যবহার করে)। এই পালার নাট্যবৃত্ত প্রদর্শিত হয় চরিত্রের সংলাপাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দৃশ্যের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতির মাধ্যমে। তবে পালার দল-প্রধান শুরু থেকেই চরিত্রের সংলাপাত্মক গীত ও গদ্যাংশে প্রম্পট করেন (বিশেষ করে দলে নব-অন্তর্ভুক্ত– নায়ক ও নায়িকার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রম্পট করতে দেখা যায়) এবং যন্ত্রীদল গীতাভিনয়ের যন্ত্রসঙ্গীতে সহায়তা করে থাকেন। কখনো কখনো গীত ও গদ্যের সহায়তায় কাহিনীর বর্ণনা করা হলেও মূলত সংলাপাত্মক গীত এবং গদ্যই হচ্ছে *শেরেনজিং পালার* মুখ্য অভিনয় উপাদান। তবে এই পালায় গীতের ব্যবহার বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আখ্যানের গীতাভিনয়ের মৌখিক পদ-অংশগুলো একটি মাত্র *স্থায়ী* সুরে বিন্যস্ত– স্থানীয়ভাবে যা *শেরেনজিং*

৫০ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮৪

গীত নামে পরিচিত। আখ্যান গীতের প্রতিটি পদ ৩৬ মাত্রার দীর্ঘ আবর্তনে বিন্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে *ধুয়া, অন্তরা, সঞ্চারী*বিহীন কেবল একটিমাত্র *স্থায়ী* সুরের পুনঃপুন পরিবেশনায় নায়ক ও নায়িকাসহ অন্য সকল চরিত্রের কথপোকথন বা সংলাপাত্মক গীত অভিনীত হয়ে থাকে। *ধুয়ার* সাথে *স্থায়ী* পদের পার্থক্যটি প্রায়োগিক– বাংলার দেশজ নাট্যকলায় *ধুয়া* বা *ধ্রুবপদ* দোহার বা পাইল কর্তৃক গীত হয় যা আবর্তনমূলক অর্থাৎ আখ্যানের ৮/১৬/২৪ অথবা ৩২ মাত্রার আখ্যান-পদ গীত হবার পর পুনরায় দোহার কর্তৃক *ধুয়া* গীত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এই *শেরেনজিং পালায় ধুয়া* অনপুস্থিত এমনকি *ধুয়া* পরিবেশনের সুযোগও অনপুস্থিত। কেননা একজন কুশীলব সংলাপের প্রথমাংশ হিসেবে ৩৬/৪০.. মাত্রায় বিন্যস্ত একটি পদ গীত-আকারে পরিবেশন করলে, প্রতি-উত্তরে ৩৬/৪০.. মাত্রার একই সুরে সংলাপের দ্বিতীয়াংশটি (পদ) অপর চরিত্র কর্তৃক গীত হয় এবং এই ক্রমানুসারেই সমস্ত গীতাভিনয়টি পরিবেশিত হয়।

শেরেনজিং গীত নামে এই একটি মাত্র *স্থায়ী* সুরে যেমন আখ্যানের সকল পদ গীত হয়, তেমনি এই পালায় সকল কুশীলব একটিমাত্র নির্দিষ্ট প্যাটার্নের দেহ-ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। চার মাত্রায় বিন্যস্ত নির্দিষ্ট একটি তাল অনুসরণ করে (ডান পায়ে দুই মাত্রা এবং বাম পায়ে দুই মাত্রা এই ক্রম অনুসারে) বিশেষ প্যাটার্নের এই নৃত্য বা দেহ-ছন্দ পরিবেশিত হয়ে থাকে। *শেরেনজিং-এ* নৃত্যের ব্যবহারে বিশেষ একটি নিয়ম বা রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে অভিনয় আয়তনে সকল চরিত্রের (একক অথবা দলগত) প্রবেশ ও প্রস্থানমূলক ক্রিয়া প্রদর্শনে বিশেষ প্যাটার্নের এই নৃত্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ নৃত্যের মাধ্যমে গ্রিনরুম থেকে অভিনয় আয়তনে প্রবেশ করা এবং নৃত্যের ব্যবহারেই গ্রিনরুমে প্রস্থান করা হয়। নৃত্যের এইরূপ ব্যবহার প্রকারান্তরে চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থানকে রীতি হিসেবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে এবং একই সাথে পরিবেশনার কৌশল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেননা প্রবেশ ও প্রস্থানের এই বৈশিষ্ট্যটির কারণে দৃশ্যের শুরু এবং শেষ নির্দিষ্ট হয়, তাছাড়া নৃত্যের এই প্যাটার্নটি দৃশ্যের অগ্রগতিতে ক্রিয়া এবং চরিত্রের সার্বক্ষণিক ছন্দ (রিদ্‌ম) হিসেবেও কার্যকর হয়।

শেরেনজিং নৃত্যের পদ-সঞ্চালনে বিশেষ একটি পদ্ধতি বা সূত্র অনুসরণ করা হয় এবং এই পদ্ধতিটি *ওয়ানগাল্লা*সহ অন্যান্য গারো নৃত্যেও কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক হাঁটা-চলায় হোক অথবা নৃত্য ও নাট্যমূলক পরিবেশনার বিশেষ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ চলনে হোক সকল ক্ষেত্রেই উল্লম্বভাবে বিভাজিত দেহের ডান এবং বাম অংশের মধ্যে ভর ও ভারসাম্যের সম্পর্ক সুরক্ষা করেই চলন বা মুভমেন্ট পরিচালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সহজ করে বললে ব্যাপারটি এ রকম দাঁড়ায় যে, ডান পায়ের সাথে বাম হাত অথবা ডান হাতের সাথে বাম পায়ের সম্পর্কসূত্রে শরীরের উভয় অংশের ভর ও ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে হাঁটা-চলা/চলন সম্পাদিত হয়। হাঁটা-চলা বা চলনের এই মৌল সূত্রটি নৃত্য ও নাট্যমূলক বিশেষ ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। কিন্তু গারো জাতিতাত্ত্বিক *শেরেনজিং* এবং

ওয়ানগাল্লাসহ বেশ কিছু নৃত্যে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। শেরেনজিং নৃত্য পুনঃপুনভাবে চার মাত্রার পদ সঞ্চালনে সম্পাদিত হয়। তবে এর বিশেষত্ব হচ্ছে এটি ডান পায়ের সাথে ডানহাত বা শরীরের ডান অংশ এবং বাম পায়ের সাথে বাম হাতের বা শরীরের বাম অংশের ব্যবহার করা হয়। ফলে চার মাত্রার নৃত্যটি দেহের ডান অংশে (পা এবং হাত একসাথে) দুই মাত্রা এবং বাম অংশে (পা এবং হাত একসাথে) দুই মাত্রা এই ক্রমানুসারে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ নৃত্যের ছন্দে শরীরের ডান এবং বাম অংশ পৃথক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে সঞ্চালিত হয়।

শেরেনজিং পালার সংলাপাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্রে গ্রিনরুম থেকে উন্মুক্ত অভিনয় আয়তনে কুশীলবের প্রবেশ ও প্রস্থানরীতির অনুসারে চরিত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করা, চরিত্রের সংলাপাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দৃশ্যের পরিবর্তন এবং অগ্রগতি সৃষ্টি করা, প্রম্পটারের ব্যবহার, যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার প্রভৃতি রীতি-বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে 'শেরেনজিং পালার' সাথে বাংলার *যাত্রা* আঙ্গিকেরও সাদৃশ্য নির্ণয় করা যায়। অথাপিও এই পালার সংলাপাত্মক গদ্যাংশে চরিত্রের ভাব/ভঙ্গি/শৌর্যের প্রদর্শনে স্পষ্টতই গারোদের দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিক জীবন অনুরূপ ভাব-ভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।

শেরেনজিং প্রেম ও প্রণয়ের ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যান হলেও অতীতে এই আখ্যানটি সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গভীর ভাব ও ভক্তিতে পরিবেশিত হতো বলে জানা যায়। সংস্কৃতিমনা এবং গারো সংস্কৃতি বিষয়ক লেখক এবং গবেষক কারো কারো সাথে আলাপচারিতায় জানা যায় যে, বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের মধ্যে ফুলবাড়ি অঞ্চলের এই একটি মাত্র দলই বর্তমানে অবশিষ্ট আছে, যে দলের সকল সদস্য ধর্মীয় পরিচয়ে গারো-খ্রিষ্টান তথাপিও নানাবিধ প্রতিকূলতায় ঐতিহ্যবাহী এই পালার পরিবেশনা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত রেখেছেন। গারোদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে এই *শেরেনজিং পালার* প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ গারো-খ্রিষ্টান সমাজের সু-নজর ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় বর্তমানে এটি প্রায় বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ফুলবাড়িয়ার *শেরেনজিং পালার* প্রবীণ সদস্যদের সাথে আলাপনসূত্রে বেশ কিছু সংকটও এক্ষেত্রে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, যেমন– সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে দলের কলেবর বা আকারটি অনেক বড়, কিন্তু নিয়মিত বায়না বা আমন্ত্রণ না থাকায় দলের অনেক কুশীলব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে অথবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ কুশীলবগণ বৈবাহিকসূত্রে অন্যত্র চলে যায়। তাছাড়া খ্রিষ্টান ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই পালার গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় পুরো দলের কার্যক্রম মাঝে মাঝেই স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে পালা পরিবেশনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী কুশীলবের সংকট অতি সাধারণ ও নিত্যকারের একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে নায়ক-নায়িকার চরিত্রাভিনয়ে তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে অনাগ্রহ ও অনীহা দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং পরিবেশনায় তীব্র সংকট সৃষ্টি করে। কেবল বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি কর্তৃক আমন্ত্রণ পাওয়া বা কোনো গবেষকের গবেষণার বিষয়

হওয়া অথবা সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনের আমন্ত্রণ সাপেক্ষেই দলটির পুনঃসংগঠিত হওয়ার এবং 'পালা' পরিবেশনের সুযোগ মেলে। দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে এই সকল প্রতিকূল ও সংকটময় পরিস্থিতি কার্যত পালার প্রদর্শন বা অভিনয়ের ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে। ফুলবাড়ি এলাকায় প্রদর্শিত পালার পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়– কয়েকজন অভিজ্ঞ কুশীলবের অনুপস্থিতি এবং নায়ক 'ওয়ালজান' চরিত্রে একজন কুশীলবের প্রথম/সদ্য-অন্তর্ভুক্তি এবং দীর্ঘ বিরতির পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দলটি পুনঃসংগঠিত হওয়ার কারণে *পালা* পরিবেশনায় কৌশলগত সমন্বয়হীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নানাবিধ শৈথিল্যের প্রবণতা। পরিণামে পালটি দর্শকের আগ্রহে যথেষ্ট অভিঘাত সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'শেরেনজিং পালার' ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা পূর্বকালের গারোদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি, গঠন-কাঠামো প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে এই আখ্যানের মাধ্যমে, যা গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়ক হয়ে ওঠে। আর এই বিবেচনা থেকে পালাটির 'আখ্যান' ও 'চরিত্র' বিশ্লেষণ এবং অভিনয়ের রীতি-পদ্ধতি, উপাদান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও বিশদ বিশ্লেষণেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে এই বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক নয়, কেননা গারো নাট্য-নিরীক্ষার মাধ্যমে নগরায়তনের অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতিতে কার্যকর অনুশীলন উপাদান অন্বেষণের বিষয়টি এ জাতীয় আলোচনা থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নানান সংকটে জর্জরিত দলটির দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামোর কারণে এই পালা পর্যবেক্ষণসূত্রে কুশীলবদের মনো-দৈহিক উপস্থিতিতে শৌর্য, ভাব ও রসের ব্যবহার, চরিত্রের নির্মাণ ও পরিবেশন প্রক্রিয়া অথবা ছন্দ, তাল, লয়ের প্রয়োগে এমন বিশেষ কোনো প্রক্রিয়া, বৈশিষ্ট্য বা উপাদান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি যা পরে বিশদ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সুতরাং রীতি-বৈশিষ্ট্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সংকট ও সম্ভাবনার বহুবিধ বিষয় বিবেচনায় নিলে *শেরেনজিং-এর* আলোচনা এবং পর্যালোচনা বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তথাপিও এই জাতীয় পর্যালোচনা বক্ষ্যমাণ গবেষণার লক্ষ্য পূরণে কার্যকর নয় বিধায় এই পরিবেশনাটিকে পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ময়মনসিংহের ধোবাউরা অঞ্চল

তৃতীয় ধাপে ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় সংলগ্ন সমতল ভূমি– ধোবাউরা এলাকায় ক্ষেত্র সমীক্ষার কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এই এলাকায় রয়েছে গারোদের দুয়াল গোত্রের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বসবাস। টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষেত্র সমীক্ষা সম্পাদনের অভিজ্ঞতা থেকে দুয়াল গোত্র সম্পর্কে এরকম একটি উপলব্ধি হয় যে, ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও দুয়াল গোত্রের মানুষ আদিধর্ম এবং

ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিও অনুগত থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরতভাবে। বস্তুত খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে গারোদের আদিধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রবণতাটিও এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে এই গোত্রের দুজন ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা যায়– গারো কবি, লেখক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক মতেন্দ্র মানকিন এবং *রে-রে, আজিয়া* ও *খাবি*সহ বেশ কিছু গীত-প্রধান পরিবেশনার সংগ্রাহক ও রচয়িতা নগেন্দ্র মান্দি। এদের রচনা এবং কর্মে সর্বদাই ঐতিহ্যবাহী গারো সংস্কৃতিকে তুলে ধরার বা চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করার আন্তরিক চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। বলা যায় এঁরাসহ এই গোত্রের আরও বেশকিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ আছেন যাদের সংঘবদ্ধ সক্রিয়তার কারণে ঐতিহ্যবাহী গারো ধর্ম ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশনা আজও ধোবাউরার দুয়াল গোত্রের মানুষের মাঝে অব্যহতভাবে চর্চিত হয়ে আসছে।

ধোবাউরা অঞ্চলে শতাধিক শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও প্রবীণের অংশগ্রহণে এবং আরও শতাধিক দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে *ওয়ানগাল্লা* উৎসব পর্যবেক্ষণ করা হয়। বস্তুত এই উৎসব-সূত্রেই গারো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যেমন– তাৎক্ষণিক কথোপকথনযুক্ত গীত-প্রধান পরিবেশনা *রে-রে*, বিশেষ এক ধরনের পাহাড়ি ফল (সাম্বেল) যুক্ত নৃত্য *সাম্বেল মিসারা*, মৃতের আত্মার সাথে গীত-প্রধান কথোপকথনযুক্ত পরিবেশনা *খাবি*সহ *ওয়ানগাল্লা* সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু নৃত্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে ধোবাউরার *ওয়ানগাল্লায়* প্রদর্শিত সকল নৃত্যই ছিল সুসংগঠিত। বস্তুত জুম-কন্দ্রিক প্রকৃতি ও জীবনাবর্তনের নানাবিধ প্রসঙ্গ এই নৃত্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। তথাপিও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মাঠ সমীক্ষায় পর্যবেক্ষণকৃত সকল গারো-নৃত্যের বিষয় ও আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে– এক. গারো নৃত্যের বিষয়গুলো সাধারণত প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন কর্ম ও আচরণভিত্তিক হয়ে থাকে এবং দেহের ছন্দে ও হস্ত মুদ্রায় অতঃপর বিষয়গুলোর প্রকাশ হয়ে ওঠে বর্ণনাধর্মী, যেমন– ধানকাটা, পরিশ্রান্ত জুম নর-নারীদের ঝরনাতলায় গোসল করা, ফল আহরণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম ও আচরণগুলো পায়ের চলন ছন্দের সাথে সমন্বয় করে হাতের প্রতীকী মুদ্রায় বর্ণনা করা হয়। দুই. গারো নৃত্যে হাতের ছন্দবদ্ধ মুদ্রাতেই বিষয়ের ভাব ও অর্থ বর্ণিত হয়, এক্ষেত্রে কোমর, টরসো ও মাথার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্ট হয় না। এবং তিন. নৃত্যে পায়ের চলন বা সঞ্চালন ছন্দ চার মাত্রায় বিন্যস্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ছন্দ একটি ভিন্ন বা অ-প্রচলিত প্যাটার্নে সঞ্চালিত হয়। অ-প্রচলিত এই প্যাটার্নে ডান পায়ের সাথে শরীরের ডান অংশ এবং বাম পায়ের সাথে শরীরের বাম অংশ যুক্ত হয় (শেরেনজিং নৃত্য প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে)। এভাবে চার মাত্রার চলনটি ডান পায়ের সাথে দুই মাত্রার ছন্দ এরপর বাম পায়ের সাথে দুই মাত্রার ছন্দ যুক্ত হয় এবং এই ক্রমানুসারে নৃত্যের সামগ্রিক ছন্দ বিন্যস্ত ও প্রদর্শিত হয়।

সুতরাং প্রক্রিয়া, কৌশল এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে গারো নৃত্যে দুটো বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা যায়– এক. নৃত্যে বর্ণনাত্মক মুদ্রার ব্যবহার এবং দুই. দুই-দুই মাত্রায় যথাক্রমে ডান ও বাম পায়ের সঞ্চলন। এক্ষেত্রে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ 'নৃত্যে বর্ণনাত্মক মুদ্রার ব্যবহারের' বিষয়টি মারমা জাতিতাত্ত্বিক নৃত্যে 'বর্ণনাত্মক নৃত্য' উপাদান হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই বর্তমান আলোচনায় 'বর্ণনাত্মক নৃত্য' বিষয়টির পুনঃ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ 'দুই-দুই মাত্রায় যথাক্রমে ডান ও বাম পায়ের সঞ্চলন' বৈশিষ্ট্যটিকে গারো নৃত্যের বিশেষ একটি রীতি/প্যাটার্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা গেলেও অভিনেতার প্রস্তুতিতে কার্যকর অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণে বিশেষ কোনো যুক্তি ও কার্যকারণ দৃষ্ট হয় না। এই সকল যুক্তি বিবেচনায় ধোবাউরার *ওয়ানগাল্লায়* প্রদর্শিত নৃত্য বিশেষত *বর্ণনাত্মক নৃত্যকে* মূল আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরা হয়নি। তবে এক্ষেত্রে গারোদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী নৃত্য হচ্ছে– *সাম্বিল মিসারা*। *সাম্বিল মিসারা ওয়ানগাল্লা* উৎসবের অংশ হলেও এই নৃত্যের আঙ্গিক ও প্রদর্শন প্রক্রিয়ায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, প্রক্রিয়া ও কৌশল পরিলক্ষিত হয় যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। *সাম্বিল মিসারা* একক নৈপুণ্য প্রদর্শনমূলক নৃত্য। বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শনমূলক এই নৃত্য আঙ্গিকটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির শরীর ছন্দের সক্ষমতা ও কৌশলগত দক্ষতা প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। ফলে *সাম্বিল মিসারায়* কুশীলবের শরীর ছন্দের সক্ষমতা ও কৌশলগত দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণসূত্রে এমন কতিপয় গুণ চিহ্নিত করা সম্ভব যা নাগরিক আয়তনে অভিনেতার শারীরিক প্রস্তুতিতে বিশেষ ও কার্যকর অনুশীলন উপাদান হিসেবেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাই সম্ভাবনাময়তার বিবেচনায় *সাম্বেল মিসারাকে* পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই অঞ্চলে *ওয়ানগাল্লা* উৎসব এবং উৎসব অন্তর্ভুক্ত নৃত্য শেষে অতঃপর দুটি গীত-প্রধান পরিবেশনা– *খাবি* এবং *রে-রে* পর্যবেক্ষণ করা হয়। *খাবি* হচ্ছে মৃত্যু পরবর্তী কৃত্যের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্ব বা আনুষ্ঠানিকতা যা কেবল পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পালন করা হয়ে থাকে। (উল্লেখ্য যে, *খাবি* পর্যবেক্ষণ বলতে এক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কেবল গীত-প্রধান অংশকে বোঝানো হয়েছে)। নিম্নে সাক্ষাৎকার লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে গারোদের মৃত্যুকেন্দ্রিক উৎসব এবং উৎসব অন্তর্গত *খাবি* পরিবেশন প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন যৌথভাবে মতেন্দ্র মানকিন (৫৫) এবং নগেন্দ্র মান্দি (৪৯) এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়– ১০ এপ্রিল ২০১৫ গ্রাম : দীঘলবাগ, পো : ঘোষগাঁও, থানা : ধোবাউরা, ময়মনসিংহ থেকে।

গারো পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মাকে স্মরণ করার যে সকল আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে তার মধ্যে 'ওয়াচি চু-গান' এবং 'বাসাল চু-গান' নামের দুটি উৎসব অন্যতম। কৃষিভিত্তিক মৌসুম-আবর্তনের সাথে যুক্ত দীর্ঘ কৃত্যমূলক এই প্রক্রিয়াটির শুরু হয় আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষে ফসল কাটার (আউশ ধান) পর 'ওয়াচি চু-গান' বা বর্ষাকালীন চু-গান উদ্‌যাপনের এর মাধ্যমে এবং শেষ হয় মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে পুনরায় নতুন

ফসল কাটার পর চূড়ান্ত উৎসব 'বাসাল চু-গান' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে। বস্তুত চলমান বছরে পরিবারের মৃত সদস্যের আত্মাকে স্মরণ করতে স্মৃতি ফলক হিসেবে বাঁশ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দুটি ঘট নির্মাণ এবং স্থাপন করার মধ্য দিয়েই শুরু হয় 'ওয়াচি চু-গান'-এর আনুষ্ঠানিকতা। মৃত সদস্যের নারী অথবা পুরুষ বোঝাতে বিশেষ রীতি এবং বিধান অনুসারে ঘট দুটিকে সাজানো হয়ে থাকে। একটি ঘট স্থাপন করা হয় ঘরের অভ্যন্তরে যাকে বলা হয় 'মাংগ্রেং' এবং অপর ঘটটি স্থাপন করা ঘরের বাইরে উঠান বা অঙ্গনে যার নাম 'মাংগ্রাং' আর এটিই হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আত্মার 'বর্তমান বাসগৃহ' বা 'খ্রাম'। *খ্রাম-কে* কেন্দ্র করে অতঃপর পরিবারের স্বজনদের উপস্থিতিতে ঐ মৌসুমের প্রথম/নতুন ধানের ভাত, বাচ্চা মুরগির মাংস, ফল-ফলাদি, সবজি নানান পদের খাদ্য-খাবার উৎসর্গ করা হয়। রীতি অনুযায়ী প্রতি বেলা মৃতের পরিবারে রান্না করা যাবতীয় খাবারের প্রথম অংশ *খ্রাম*-এ উৎসর্গ করে অতঃপর পরিবারের আহার সম্পন্ন হবে। কৃত্যের অংশ হিসেবে উৎসবের দ্বিতীয় দিনে মৃতের স্মৃতি ফলক *মাংগ্রেং* নিয়ে শোভাযাত্রা করে বাড়ি বাড়ি গমন করা হয়, বিশেষ করে ঐ একই বছরে পার্শ্ববর্তী যে সকল বাড়িতে মৃত্যু হয়েছে প্রত্যেক বাড়িতেই শোভযাত্রাটি উপস্থিত হয়। এ সময় প্রত্যেক বাড়ির পক্ষ থেকে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই মদ, পিঠা, ফল-মূল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে *মাংগ্রেংটিকে* পূর্বের নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া হয় এবং পরবর্তী উৎসব পর্যন্ত প্রতিদিনের খাবার প্রদান করাসহ পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধাযোগে আত্মার সেবা যত্ন করে যেতে হয়।

অবশেষে মাঘ মাসের শুক্লা পক্ষে শুরু হয় আত্মা স্মরণের শেষ ও বৃহৎ উৎসব– *বাসাল চু-গান*। এই উৎসবে *খ্রাম* অর্থাৎ মৃতের 'বর্তমান বাসগৃহ' ভেঙে ফেলে নদীতে বিসর্জনের মাধ্যমে মৃতের আত্মাকে বিদায় জানানো হয়। আত্মা স্মরণের এটিই প্রধান ও সর্ববৃহৎ উৎসব, কেননা এ সময়ে পূর্ণ হয় কৃষিভিত্তিক প্রকৃতির আবর্তন, ঘরে ঘরে উঠে যায় নতুন ফসল তাই *বাসাল চু-গান* উৎসবেও মৃতের উদ্দেশে খাদ্য খাবার উৎসর্গের ধুম পড়ে যায়। তবে এবারে স্বজনসহ প্রতিবেশী সকলে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী পশু– গরু/শূকর/ছাগল উৎসর্গ করে থাকে। রীতি অনুযায়ী *খ্রাম* ভাঙা বা আত্মাকে বিদায়ের আগের দিন রাতে পুরো এলাকায় যে সব বাড়ি থেকে একই বছর মানুষ মারা গেছে সকল বাড়িতে মদ পান এবং *রে-রে* গানের আসর বসে। পরদিন পুনরায় মাংগ্রেং নিয়ে বের হয় শোভাযাত্রা ঘুরে বেড়ায় ঐ বছরের সকল মৃত্যের বাড়িসহ অন্যান্য বাড়িতে। শোভযাত্রা ফিরে আসার পর ঐ দিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় এই কৃত্যের শেষ আনুষ্ঠানিকতা। এ সময়ে গ্রামবাসী যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী পশু নিয়ে আসে এবং উৎসর্গ করে বেঁধে রাখা হয় *খ্রামে*র চারপাশে। নানা নৃত্য, গীত বাদ্যে ক্রমান্বয়ে উৎসব– *বাসাল চু-গান* তুমুল হতে থাকে। রাতে *খ্রাম*-এর 'আত্মাকে' মৃতের স্বজনদের পক্ষ থেকে একজন 'নর' অনুরোধ করে যেন শেষ বারের মতো সে (আত্মা) একবার গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু আত্মা কিছুতেই রাজি হয় না বরং উল্টো অভিযোগ করা হয় এই বলে যে, দীর্ঘদিন তাকে এভাবে বাইরে রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়

বাদলে ফেলে রাখা হয়েছে তাই সে কিছুতেই আর মানুষের গৃহে প্রবেশ করবে না। এভাবে ক্রমান্বয়ে অনুরোধ আর অনুযোগের পাল্টাপাল্টিতে বিষাদময় হয়ে ওঠে স্বজনের গৃহাঙ্গন। নর আর আত্মার কথোপকথনের এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় পাল্টাপাল্টি গীত পরিবেশনার মাধ্যমে এবং এই গীত পরিবেশনাকেই বলা হয় *খাবি*। *খাবি* পরিবেশনায় মৃত 'আত্মার' পক্ষ থেকে একজন এবং পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে একজন 'নর' অংশগ্রহণ করেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে এই অভিযোগ-অনুরোধের পালা। অবশেষে গৃহ-প্রবেশে 'আত্মা' রাাজি হয় এবং গৃহে প্রবেশের পর পুনরায় নানান আহারাদি উৎসর্গ করা হয় এবং একই সাথে চলতে থাকে নৃত্য-গীত এবং পানাহার। পরদিন সকালে সূর্য ওঠার আগেই *খ্রামটি* পোড়ানো হয় এবং নদীতে বিসর্জনের মাধ্যমে আত্মাকে চিরবিদায় জানানো হয়। আত্মাকে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এদিন সকাল থেকেই অবশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানসমূহ রূপান্তরিত হয় আনন্দ উৎসবে। উৎসর্গকৃত পশু হত্যা, মদ্যপান, ভোজন এবং *রে-রে* গানের মধ্য দিয়ে মহা-আনন্দঘন *বাসাল চু-গান* সর্বজনীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।

খাবি গীত-প্রধান পরিবেশনা। 'আত্মা' পক্ষের একজন এবং 'নর' পক্ষ থেকে একজন গীত-যুক্ত কথোপকথনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। *খাবিতে* কুশীলবদের নৃত্য বা আঙ্গিকাভিনয় গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং অভিযোগ আর অনুরোধের পাল্টাপাল্টিতে বিষয়ের গভীরে পৌছানোটাই এই পরিবেশনার মূল লক্ষ্য। আত্মার সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে 'আত্মা' ও 'নর'-এর গীত নির্ভর কাঠামো– এর সুর, তাল ও লয় পূর্ব নির্ধারিত এবং সংলাপাত্মক কথোপকথনে গীত হয়। অর্থাৎ কথোপকথনের সুরটি নির্দিষ্ট একটি কাঠামোয় বিন্যস্ত এবং এই কাঠামোতে অবিচল থেকেই উভয় চরিত্র (আত্মা এবং নর) সংলাপাত্মক গীতে অবতীর্ণ হয়।

নির্দিষ্ট একটি সুর-কাঠামো ব্যবহার করে মৌখিকরীতিতে তাৎক্ষণিক উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ বা কথোপকথনে অবতীর্ণ হওয়ার অপর একটি গীত-প্রধান পরিবেশনা হচ্ছে *রে-রে*। *রে-রে* গারো সমাজের সর্বাত্মক ও সর্বজনীন একটি পরিবেশনারীতি– জন্ম থেকে মৃত্যু, ধর্ম থেকে প্রকৃতির যাবতীয় কৃত্য, উৎসব অনুষ্ঠানেই *রে-রে*-এর উপস্থিতি অনিবার্য। মাত্র একটি পূর্বনির্ধারিত সুর-কাঠামোতে অবিচল থেকেই দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তি/দল/গ্রুপ/গোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে তাৎক্ষণিক সংলাপ বা কথোপকথনে লিপ্ত হয়ে থাকে, আর এক্ষেত্রে সংলাপের বিষয় হয়ে থাকে 'তখন ও তৎক্ষনাৎ চাওয়া' যে কোনো কিছু। তবে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে *খাবি* ও *রে-রে* তাৎক্ষণিক সংলাপ নির্ভর মৌখিকরীতির পরিবেশনা হলেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। *খাবি* হচ্ছে শুধু মৃত্যুকেন্দ্রিক একটি পরিবেশনা, যদিও তাৎক্ষণিক তথাপিও এর বিষয় এবং সুর-কাঠামো পূর্বনির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট। তাছাড়া *খাবির* 'আত্মা' এবং 'নর' চরিত্রের কথোপকথনে আগ্রহী সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, পরম্পরাগতভাবে দক্ষ এবং অভিজ্ঞজনই কেবল এই গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফলে কুশীলব, বিষয় এবং সুর-কাঠামো প্রভৃতি নির্দিষ্ট থাকায় যুগ যুগ ধরে পরিবেশিত *'খাবি'র* সার্বিক গঠন-কাঠামো অনেকাংশেই নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হয়ে উঠেছে একথা বলা যায়। অপরদিকে *রে-রে*

পরিবেশনায়ও সুর-কাঠামো নির্দিষ্ট, তবে এই সুর-কাঠামোর মধ্যে সম্পাদিত সংলাপাত্মক কথোপকথন সম্পূর্ণতই তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতায় সম্পাদিত হয়। তাছাড়া সংলাপাত্মক গীত প্রধান এই রে-রে পরিবেশনার 'বিষয়' নির্বাচনও বহু, বিচিত্র ও তাৎক্ষণিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানব-মানবীর পরিচয় থেকে প্রেম অথবা প্রকৃতি থেকে পুরাণ সবকিছুই হতে পারে *রে-রে* বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া উৎসব-অনুষ্ঠাকে কেন্দ্র করে অথবা 'চু' খাওয়াকে কেন্দ্র করে অনানুষ্ঠানিক কোনো সাধারণ আড্ডা সর্বত্রই আগ্রহী অংশগ্রহণকারীগণ তাৎক্ষণিক এই *রে-রে* গীত কথোপকথনে যুক্ত হতে পারেন। *রে-রে*-এর গঠন-কাঠামো এবং পরিবেশন প্রক্রিয়ার কাঠামোগত বৈচিত্র্য ও নমনীয় গুণাবলী বিবেচনায় *রে-রে* পরিবেশনাকে পরবর্তী আলোচনায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

সুতরাং পরিবর্তিত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গারো জাতিতাত্ত্বিক যে সকল পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে প্রকারভেদে এগুলো হচ্ছে– এক. ঐতিহ্যবাহী গারো উৎসব ওয়ানগাল্লা এবং এই উৎসব সংশ্লিষ্ট নৃত্য, দুই. আখ্যানধর্মী পরিবেশনা 'শেরেনজিং পালা' এবং তিন. গীত-প্রধান পরিবেশনা 'খাবি' ও 'রে-রে'। বক্ষ্যমাণ গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে এই সকল পরিবেশনার মধ্য থেকে গীত-প্রধান পরিবেশনা *রে-রে* এবং গারো নৃত্য *সাম্বিল মিসারা* এই দুটি পরিবেশনাকে পরবর্তী বিশদ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

৩.২.১ : রে-রে

ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন

একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবে *রে-রে* গীত গারো জনগোষ্ঠীর সকল পর্যায়ের ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব, আচার, অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়ে আসছে সুদীর্ঘ কাল ধরে। বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই *রে-রে* বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত *দোয়াল/দুয়াল* এবং *ব্রাক* গোত্রের গারোদের মধ্যেই সর্বাধিক প্রচলিত। তবে *রে-রে* বহুল প্রচলিত হলেও এর ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন বিষয়ে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই। এর প্রথম কারণ হচ্ছে *রে-রে* সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্য উপাত্ত অত্যন্ত সীমিত। স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি গ্রন্থ এবং পত্রিকা ব্যতীত *রে-রে* সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। আবার যা কিছু তথ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণাত্মক নয় সংস্কৃতি ঐতিহ্যের উপাদান হিসেবে বিবৃতিমূলক। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে *রে-রে*-এর প্রয়োগ প্রসঙ্গে যা কিছু জানা যায় তা প্রধান অ-প্রধান সকল উৎসব অনুষ্ঠান, যেমন– *ওয়ানগাল্লা, ওয়াচি চু-গান, বাসাল চু*-গান প্রভৃতি উৎস-সূত্রেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কেননা *রে-রে* পরিবেশন প্রক্রিয়া এবং গঠন-কাঠামোটি উন্মুক্ত এবং অনানুষ্ঠানিক– অর্থাৎ *রে-রে* পরিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ, কাল-তিথির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সজ্জিত আসর বা নির্দিষ্ট মাপের কোনো অভিনয় আয়তনের, এমনকি এর কুশীলবও পূর্বনির্ধারিত নয়, আর বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের তখন ও তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। ফলে *রে-রে* কোনো নির্দিষ্ট উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অনুষঙ্গ বা মাধ্যম হিসেবে নয় বরং গারো সংস্কৃতিতে প্রচলিত সকল উৎসব অনুষ্ঠান এমনকি প্রাত্যহিক জীবনেরও একটি অনুষঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত হয়– '[দুয়ালদের] পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা, পালা-পার্বণ এবং নানা অনুষ্ঠানে 'রে-রে' গীত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা নিয়ে আসছে। তারা গৃহকাজে, মাঠের কাজে অথবা ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলানো জন্য যে কোনো সময় রে-রে বানিয়ে শুনাতে পারে।'[৫১] সুতরাং পরিবেশন প্রক্রিয়া ও গঠন-কাঠামোর এরূপ সর্বব্যাপী, উন্মুক্ত ও অনানুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সম্ভবত গীত-প্রধান তাৎক্ষণিক সংলাপযুক্ত *রে-রে* জনপ্রিয় একটি শিল্পরূপ হয়েও বিশদ বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে মনে করা যায়। তথাপিও *রে-রে*'র ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তনের প্রাচীনসূত্রটিও যে গারোদের কৃষিভিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠানের গভীরে কোথাও প্রোথিত রয়েছে একথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

গারোদের ধর্মীয় অথবা সামাজিক কৃত্য, উৎসব, অনুষ্ঠানের সার্বিক কাঠামো এবং এর সম্পাদন প্রক্রিয়া পৃথক তিনটি অনুক্রমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ/সম্পাদিত হয়ে থাকে– প্রথমত, আদি দেব-দেবীর প্রতি পশু-পাখি, খাদ্য-খাবার, দ্রব্য সামগ্রী 'উৎসর্গ'করণের মাধ্যমে ভক্তি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা, দ্বিতীয়ত, গোত্রবদ্ধ/সমষ্টিগত

৫১ মতেন্দ্র মানকিন, *গারো দুয়াল গোত্রের সংস্কৃতি*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৩০

অংশগ্রহণে নৃত্য-গীত-বাদ্যের মাধ্যমে 'উৎসর্গ'করণ কৃত্যের উদ্‌যাপন নিশ্চিত করা এবং তৃতীয়ত, সম্মিলিতভাবে চু-পান করার মাধ্যমে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মনো-দৈহিক পরিমণ্ডলে তীব্র আবেশ বা পরমানন্দীয় আবেশের স্তরে উন্নীত হওয়া।

অপরদিকে মাঠ পর্যায়ের একাধিক পরিবেশনা পর্যবেক্ষণসূত্রে আরও দেখা যায় যে, গারো উৎসব অনুষ্ঠানে গীত-এর প্রয়োগ (*শেরেনজিং* পালায় চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থান, *খাবি*-তে আত্মা ও নরে'র গীত সংলাপ এবং *রে-রে'র* তাৎক্ষণিক কথোপকথনে গীতের প্রয়োগ) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এর সুর-বিন্যাস বা কাঠামোটি বৈচিত্র্যহীন। যেমন– *শেরেনজিং পালা, খাবি* এবং *রে-রে'র* সুর-কাঠামোর মধ্যে মৌল সাদৃশ্য হচ্ছে এগুলো *ধুয়া, অন্তরা, সঞ্চারী, বিস্তার* প্রভৃতি ক্রম বা পর্যায় ব্যতীত একটি মাত্র *স্থায়ী* ও দীর্ঘ ছন্দের পুনঃপুন আবর্তনে গীত হয়। অর্থাৎ আখ্যান বা বিষয়ের সংলাপাত্মক অথবা বর্ণনাত্মক প্রদর্শন এই একটি মাত্র সুর-কাঠামোতেই বিন্যস্ত হয়ে থাকে। বলা যায় এটি গারো জাতিতাত্ত্বিক সঙ্গীতকলার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা প্রতিবেশী বাঙালিদের সুর-কাঠামোর সাথে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে। তবে পুনরাবৃত্তিমূলক সুর/গীতের (*ধুয়া*) বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সুর বা ছন্দের পুনরাবৃত্তি আগ্রহী ভক্ত/ বিশ্বাসী/ দর্শনার্থীদের দলগত/কোরাস অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে বা সমষ্টির অংশগ্রহণকে সহজ ও সাবলীল করে তোলে (১ম অধ্যায়ের মারমা জাতিতাত্ত্বিক নাট্যের আলোচনাসূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। ফলে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, একটি মাত্র *স্থায়ী* ও দীর্ঘ ছন্দের সরল সুর-কাঠামোর ক্রমাগত পুনরাবৃত্তির কারণেই সম্ভবত গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এবং পরিণামে তা গারোদের সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। আর এভাবে কৃত্য, উৎসব, অনুষ্ঠান সম্পাদন প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীবদ্ধ গীত-বাদ্যের নাচন এবং পানাহারে পরমানন্দীয় আবেশের স্তরে উন্নীত হওয়ার সূত্রেই *রে-রে* গীত হয়ে ওঠে পারস্পরিক কথন, আবেগ– অভিযোগ, অনুযোগ আর প্রেমময় অভিব্যক্তি প্রকাশের অনন্য শিল্পমাধ্যম– 'ওয়ানগাল্লায় সালজং, সোআৎসা, খ্রাং, রংদিকমিত্তে, নক্‌নিমিত্তের পূজা সম্পন্ন হলে খামাল (কামাল) ও নক্‌মার নৃত্যের পর প্রচুর মদ্যপান করে সকল গারো পূজারী। প্রচুর পরিমাণে মদ্যপানের ফলে একসময়ে তারা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে আরম্ভ হয় 'রে-রে' নৃত্য-গীত।'[৫২]

রে-রে কথোপকথনের বিষয় বহুমাত্রিক হলেও প্রেম, প্রণয় ও মিলন ভিত্তিক *পিরিতি রে-রে* সর্বাধিক জনপ্রিয়, তবে পৌরাণিক কিছু কিছু বিষয় যেমন *রামায়ণী রে-রে, মহাভারতী রে-রেও* প্রচলিত রয়েছে। সাধারণত যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দলগতভাবে *রে-রে* গীত পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বিষয়ের বৈচিত্র্য বিবেচনায় ছয় প্রকার *রে-রে'র* প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়– এক. রঙের খেলা– এ জাতীয় *রে-রে* গীতের অন্তর্নিহিত ভাব-অভিব্যক্তিতে প্রেম, বিরহ, আনন্দ, দুঃখ, ভালোবাসা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। দুই. পিরিতি–

৫২ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৫

পিরিতি *রে-রে*'র বিষয় প্রেম, প্রণয়, ভালোবাসা হলেও রূপক-সাংকেতিকতার আশ্রয়ে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকারের মাছের নাম নিয়ে *রে-রে* গীত পরিবেশন করাই এর মূল বৈশিষ্ট্য। তিন. সিমাসা– ধাঁধা যুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি বা উত্তর প্রতি-উত্তরের গাওয়া হয় সিমাসা *রে-রে*। চার. থাস্কি– এক ধরনের ইশারা, আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে হাস্যরসাত্মক, টিটকারি বা উপহাস জাতীয় বিষয়ে গীত হয় এই থাস্কি *রে-রে*'তে। পাঁচ. রামায়ণী রে-রে– রামায়ণের বিষয় যুক্ত পরিবেশনা হচ্ছে রামায়ণী রে-রে এবং ছয়. মহাভারতী রে-রে– মহাভারতের বিষয় যুক্ত পরিবেশনা হচ্ছে মহাভারতী রে-রে। নিম্নে ক্ষেত্র সমীক্ষাকালীন গারো গীতালু নগেন্দ্র মান্দা কর্তৃক সংগৃহীত এবং রচিত কয়েক প্রকার *রে-রে*-এর নমুনা তুলে ধরা হলো–

রঙের খেলা রে-রে

(১).মেয়াসা :

হো ...হো.............
চুগান মেলচা রিবাইনিং
পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ
(চামি হাই দাকনা বন্দনা)২
খালনা নাম্মি রেরেখো
মান্দি মাননা দনসেংনা।

চুগানের দিকে এসো দেখে
(চলো প্রিয় বন্দনা করি)২
মন খুলে রে-রে গাই
সব কাজ রেখে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(২). মিচিকসা :

হো.. হো...
খালনা নাম্মি রেরেখো
(মান্দি মাননা দনসেংনা)২
খা.সি রকরক দাকিনিং
সুলখো সালনা রসিনা

মন খুলে রে-রে গাই
(সবাইকে নিয়ে)
সুমধুর মন ছুঁয়ে
সুর টেনে রসিয়ে
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৩). মে :

হো....................
খা.সি রকরক দাকিনিং
(সুলখো সালনা রসিনা)২
জব্রংবা নেংনেঙা
গিচাগিবা বিবালনা

মন ছুঁতে ছুঁতে

(সুর টানি রসিয়ে)২
ভ্রমর তো আসে
ফুলের কাছে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৪) মি : হো....................
জব্রংবা নেংনেঙা
(গিচাগিবা বিবালনা)২
নাং যৌবন সিললাখো
মান হননা জাওয়ানা

ভ্রমর আসে
(লাল ফুলের কাছে তাই না)২
তোমার সুন্দর য়ৌবন
কাউকে দিও না।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৫). মে : হো....................
আঙ যৌবন সিললাখো
হননাজা জাওয়ানা
রাম কুন্দুলিয়া বান
আঙা মানা আগান না

আমার সুন্দর যৌবন
কাউকে দিব না
রাম কুন্দুলিয়া বান
আমার আছে জানা।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৬). মি : হো....................
মিংসা মিংসা দাকিনিং
নাঙনা বাকি আগাননা
আঙ দঙা ওস্তাদ
বিচা সিঙি রাখুনা।

একবার দেখাও
বাকিগুলো পরে দেখি
আমার আছে ওস্তাাদ
জিজ্ঞেস করে দেখি।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৭). মি : হো....................
ওস্তাদনি গানদানিন
(সিয়াঙজকরো নারিনা)২
মান্দি নামজা দনগানি
মান বাঙি আগানা।

ওস্তাদের জন্যই তো
(মরে গেল নারি না)২

লোকে খারাপ বলবে
বেশি বলো না।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৮). মে : হো.....................
মান্দি নামজা দনগানি
(মান বাংয়ি আগানা)২
মাদানা মিংসংয়ি
রেরে খালনা রিবারা
আগান চামি খিন্নানা।

লোকে খারাপ বলবে
(বেশি বলো না)২
আচ্ছা তার চাইতে
বলো কী মনে করে
এসেছো রে-রে গাইতে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৯). মি : হো.....................
রেরে খালনা রিবারা
(আগান চামি খিন্নানা)
রিবারারো মিংসংয়ি
নাংখো নকচা রিমাংনা।

রে-রে খেলতে এসেছি
(ভলো প্রিয় শুনি)
আমার মনে তো ছিল
তোমাকে ঘরে টানি।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(১০). মে : হো.....................
রিবো চামি রিবোরি
রিবো নাসিং নককনা
রং গোওগ্রিকিনিং
ওয়ালখো ওয়ালসা দংআংনা

চলো প্রিয়া চলো
চলো তোমাদের বাড়ি যাই
দেখা হলো যখন
রাতটা কাটিয়ে যাই।
হা রে রে.. হা রে রে ....
=সমাপ্ত=

রামায়ণী রে-রে

(১). মেসা : হো...............
শক্তিসেল বাননা
(জজং লক্ষ্মণ গিদিলজক)২
আ. বাজু বিভীষণ

দও বা.কি-ই দাগানজক।

শক্তিশালী বানটা
(লক্ষ্মণ তুলতে বললো)২
সাথী বিভীষণ
এখন ছুড়বে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(২). মিচিকসা : হো....................
সাল নাবা জক.কোন
জজং লক্ষ্মণ সিগানজং
সামবা বলবা দংজারো
দও বা.কি-ই দাকগানজক।

সূর্য উঠে আসলেই লক্ষ্মণ মারা যাবে।
ঔষধ পত্র নেই
এখন কী হবে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৩). মে : হো....................
শক্তিসেল বাননা
লক্ষ্মণ দংজক গিদিলি
রিবাজক হনুমান
পাল মা.খো হিচিলি।

শক্তিশালী বাণের চোটে
লক্ষ্মণ পড়ে থাকলো
আসলো হনুমান
পাহাড় উঠিয়ে আনলো
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৪). মি : হো....................
রিবাজক হনুমান
(পাল মা.খ হিচিলি)২
রাবণ রাজা নামগিজা
হানথাং জিক.খ দনিনিং
জাওয়া জিকনি বাইসালি।

হনুমান আসলো
(পাহাড় উঠিয়ে নিয়ে)২
রাবণ খারাপ মানুষ
নিজের স্ত্রীকে রেখে
অপরের স্ত্রীর সাথে সময় কাটায়।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৫). মি : হো....................
হানথাং জিক.খ দনিনিং
(জাওয়া জিকনি বাইসালি)২
চড় হন্না হনুমান

রাবণ দঙা জদজিলি।

নিজের স্ত্রীকে রেখে
(অপরের স্ত্রীর সাথে থাকে)২
চড় দিল হনুমান
রাবণ সরে বাঁচে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৬). মে : হো.....................
চড় হন্না হনুমান
(রাবণ দঙা জদজিলি)২
একহাতে বায়ওনা
দুই হাতের বাইসালি

চড় দেয় হনুমান
(রাবণ সরে পড়ে)২
একহাতে বাইতে যেও না
দুই হাতে যা বায়।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৭). মি : হো.....................
একহাতে বায়ওনা
(দুই হাতের বাইসালি)২
নকনি জিকখো দনিনিং
জাওয়া জিকনিং রি.রিকি-ই
নককোও দাক্কা কাওচালি
হন্না জাংগিল ব্রিকসেন
কুলাগড়া পানচালি

একহাতে বাইয়ো না
(দুই হাতে যা বাওয়া দরকার)২
নিজের স্ত্রীকে রেখে
অন্যের স্ত্রীর দিকে ছুটে
ঘরে অশান্তি আনে
পিঠ চুলকাতে দেয়
কুলাগড়ার পানচালির কাছে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৮). মে : হো.....................
হন্না জাংগিল ব্রিকসেন
(কুলাগড়া পানচালি)২
আংনিং রেরে খালগিবা
সংজারি প্রহরী।

দিয়েছে পিঠ চুলকাতে
(কুলাগড়ার পানচালির কাছে)২
আমার সাথে যে রে-রে খেলে
গ্রাম রক্ষার প্রহরী।
হা রে রে.. হা রে রে ....

=সমাপ্ত=

মহাভারতী রে-রে

(১) মেসা : হো.. হো...........
দ্রোণ-কর্ণ ভীষ্ম বীর
জাককো রা.জক ধনু খো
দৌপদীখো মানজায়নিং
গোওনা রিক.কা অর্জুন খো।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(২) ছেলে : হো....................
দ্রোণ-কর্ণ ভীষ্ম বীর
হাতে নিল ধনু তুলে
দ্রৌপদীকে না পেয়ে
অর্জুনের দিকে ছুড়বে বলে
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৩). মিচিকসা : হো.........
দ্রৌপদীখো মানজায়নিং
(গোওনা রিক.কা অর্জুন খো)২
কৃষ্ণ হংয়া সারথি
নাংদিলনা মানিনজা
অর্জুন ধনঞ্জয় খো।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৪) মেয়ে : হো..........
দ্রৌপদীকে না পেয়ে
(তাড়া করলো অর্জুনকে)
কৃষ্ণ হলো সারথি
লাগাতে পারেনি
অর্জুন ধনঞ্জয়কে।।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৫). মে : হো....................
নাংদিলনা মানিনজা
(অর্জুন ধনঞ্জয় খো)২
বাদাগিবা বানচা
গোওয়া অভিমন্যুখো।

লাগাতে পারেনি
অর্জুন ধনঞ্জয়কে ধনঞ্জয়কে
কেমনে কী করে
দিল মেরে অভিমন্যুকে
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৬). মি : হো....................
বাদাগিবা বানচা
(গোওয়া অভিমন্যুখো)২

সপ্ত-রথী মিলি-ই
চক্র ভূহ্য বানচা
গোওয়া অভিমন্যুখো
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৭). ছেলেঃ হো............
কখন কিভাবে
(মারলো অভিমন্যুকে অভিমন্যুকে)
সপ্তরথ মিলে
চক্র বুহ্য বাণ দিয়ে
মেরেছে অভিমন্যুকে
হা রে রে.. হা রে রে ....

(৮). মে : হো....................
চক্র ভূহ্য বানচা
(গোওয়া অভিমন্যুখো)২
আগান দাদা খিনানা
মহাভারত কিচ্ছা খো।

(৯). মেয়ে : হো............
চক্র বুহ্য বাণটা
(মেরেছে অভিমন্যুকে অভিমন্যুকে)
বলো দাদা শুনি
মহাভারত গল্পটা
হা রে রে.. হা রে রে ....

(১০). মি : হো....................
আগান গানি খিনানদি
(মহাভারত কিচ্ছা খো)২
নামমি দাকি সালখোনা
সিকবা সিখাং মলা খো।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(১১). ছেলে : হো....................
বলবো শোনো
(মহাভারত গল্পটা গল্পটা)
ভালো করে টানি
ভূমিকাটা।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(১২). মি : হো.............
নামমি দাকি সালখোনা
(সিকবা সিখাং মলা খো)২
আগান দাদা খিনানা
বা.দাকগিবা বানচা
মিসি-ই ফিয়া
সুতপুত্র কর্ণখো।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(১৩). ছেলে : হো..........
ছেলেভালো করে টানি
(ভূমিকাটা ভূমিকাটা)
বলো দাদা শুনি
কেমন বাণ দিয়ে
ঘায়েল করেছে
সুতপুত্র কর্ণকে।
হা রে রে.. হা রে রে ....

(১৪). মি : হো....................
আনজলিক বানচা
মিসি-ই ফিয়া কর্ণখো
নাংনা সিকিয়াংয়িজক
মহাভারত রেরে খো।

আনজলিক বাণটা
ঘায়েল করেছিল কর্ণকে
তোমাকে শিখিয়ে যাচ্ছি
মহাভারত রে-রে–টা।
হা রে রে.. হা রে রে ....

দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ

গারো সংস্কৃতিতে প্রচলিত সকল সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ যেমন– পুরাণ, উপকথা, গীত, নৃত্য, নাট্য, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি মৌখিকরীতিতে পরম্পরাসূত্রে বিকশিত। কারণ গারোদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও নিজস্ব ভাষা-লিপি বা লেখ্যরূপ না থাকায় লিখিত আকারে সংরক্ষণ বা চর্চার কোনো সুযোগ নেই (যদিও বাংলা বা ইংরেজি অক্ষরে গীত, পুরাণ, উপকথা, প্রবাদ-প্রবচন রচনার কিছু প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে)। ইতিপূর্বের আলোচনায় লক্ষ করা গেছে যে, প্রাচীনকাল থেকে মৌখিক পরম্পরায় বিকশিত নৃত্য, গীত, বাদ্যযুক্ত সকল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ গারোদের সামগ্রিক জীবন ও কর্মের উদ্‌যাপনকেই উপলক্ষ করে পরিবেশিত হয়েছে অর্থাৎ ধর্ম বা সমাজের প্রয়োজনেই নেচেছে গেয়েছে অথবা বাদ্য বাজিয়েছে, কেবল বিনোদনের ভাষা বা মাধ্যম হিসেবে নয়। তাছাড়া প্রকৃতি, জীবন ও কর্ম উদ্‌যাপনের এই প্রক্রিয়াটি ছিল সামষ্টিক অংশগ্রহণমূলক অর্থাৎ সমাজের সকলের অংশগ্রহণে সম্পাদিত হতো প্রতিটি ধর্মীয় বা সামাজিক কৃত্যানুষ্ঠান। তাই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান নির্ভর থাকেনি বরং দীর্ঘ এক অনানুষ্ঠানিক অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারিবারিক বা গোত্রসূত্রে অথবা সমষ্টির প্রয়াসে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের দক্ষতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের শরীরে প্রবাহিত হয়েছে– 'রে-রে গানে গানে হয়, এইটায় পুরুষ বলছে মহিলাকে এবং উত্তর দিচ্ছে। এটাই তো কথায় হলে হবে না। তখন এইটার ভেতরে কৌশল আছে, এই কৌশল হইলো আবেগ মোটামুটি এইটা আবেগও বলা যায় এবং তাদের প্রাকটিসও আছে। আবহমান কাল থেকে প্রাকটিসটা হয়, কইরা আসতেসে আরকি।'[৫৩] অর্থাৎ *রে-রে'র* শিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি এভাবেই আবহমান কাল থেকে চর্চিত হয়ে আসছে, তবে তা আনুষ্ঠানিক গুরু-শিষ্যের ধারায় নয় অনানুষ্ঠানিক অনুকরণ প্রক্রিয়ায়।

সুতরাং বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে, একটি সমষ্টিগত প্রয়াস ও পরিচর্যায় ক্রিয়াশীল দীর্ঘ এবং অনানুষ্ঠানিক অনুকরণমূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কারণেই সম্ভবত গারো সমাজে শিক্ষক/গুরু অথবা বায়নাসূত্রে গায়েন বা গীতালুর নেতৃত্বে দল বা সংগঠনের ধারণা সর্বদায়ই উপেক্ষিত থেকেছে (যদিও 'দলের' ধারণা শেরেনজিং পালার ক্ষেত্রে খানিকটা কার্যকর হতে দেখা গেছে)। তবে বর্তমানে গারোদের সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্কুল/সংগঠন/সংস্থা/একাডেমির তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গুরু/শিক্ষক/প্রশিক্ষকের অধীনে নৃত্য, গীত, বাদ্যসহ সাংস্কৃতিক উপাদানের নানাবিধ বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদানের রেওয়াজও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তা আদিধর্মের দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক কৃত্যের উদ্‌যাপন উপলক্ষে নয়, গারোদের প্রাচীন আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানাবিধ উপাদান অনুষঙ্গের সংরক্ষণ ও সুরক্ষার নিমিত্তে এই সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিরিশিরির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির নাম উল্লেখ করা যায়, এই

৫৩ নগেন্দ্র মান্দি (৪৯), সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ১০ এপ্রিল ২০১৫ গ্রাম : দীঘলবাগ, পো : ঘোষগাঁও, থানা : ধোবাউরা, ময়মনসিংহ

প্রতিষ্ঠানের গৃহীত সকল কার্যক্রমের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী গারো সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক উপাদান অনুষঙ্গ, রীত-পদ্ধতির চর্চা, প্রয়োগ ও প্রদর্শনমূলক কর্মকাণ্ড বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

আদি ও প্রথাগত অনানুষ্ঠানিক অনুকরণমূলক প্রক্রিয়া, গুরু-শিষ্যের প্রথাগত আনুষ্ঠানিক অনুকরণমূলক প্রক্রিয়া এবং একাডেমি/ স্কুল/ সংগঠন প্রদত্ত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে *রে-রে*-এর 'দল ও সংগঠন, প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের' বিষয়টি পর্যালোচনা করা হলে শেষোক্ত দুটি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার কোনো বৈশিষ্ট্যই *রে-রে* পরিবেশনায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে *রে-রে* একটি উন্মুক্ত এবং অনানুষ্ঠানিক পরিবেশনা– প্রথমত, এটি বায়নাসূত্রে গায়েন বা গীতালুর নেতৃত্বে/পরিচালনায় সংগঠিত কোনো দল কর্তৃক পরিবেশিত নয়। দ্বিতীয়ত, এর কুশীলব নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত নয় অংশগ্রহণকারী একাধিক ব্যক্তি এই পরিবেশনার কুশীলব হতে পারেন। তৃতীয়ত, এটির পরিবেশনায় নির্দিষ্ট মাপের সীমানা-চিহ্নযুক্ত সজ্জিত আসর/মঞ্চ বা আয়তনের প্রয়োজন হয় না। গৃহ অভ্যন্তর থেকে উঠান, উঠান থেকে ময়দান যে কোনো স্থানেই কোনো প্রকার নির্দিষ্ট সীমানা রেখা ছাড়াই হতে পারে এই গীতের পরিবেশনা এবং চতুর্থত, এর পরিবেশনায় নির্দিষ্ট কোনো সময়কাল/তিথি বা ক্ষণের প্রয়োজন নেই বরং পরিবেশ পরিস্থিতি নিরিখেই এই গীত পরিবেশনের সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে *রে-রে* গীতের সংগ্রাহক, এবং কুশীলব নগেন্দ্র মান্দির সাথে সাক্ষাৎকারের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায়–

> – বছরের কোন কোন সময় রে-রে হয়ে থাকে?
>
> বছরের যখন আমারা এই আসরের মধ্যে পড়ি তখনই রারাই হয় ।
>
> –কোন আসর?
>
> যখন মনে চায়, এই যে মদ খাচ্ছি তখন।
>
> –না, এটা তো অন্য উপলক্ষ
>
> হয়, হয় এভাবেও হয়। বা যে কোনো বিয়ার ব্যাপারে। বিয়ার সময় আবার রং-চু গাল্লার সময়। তারপর হইলো ওয়ানগাল্লার সময়, একটা আসর হইলেই হয়।

সুতরাং *রে-রে* পরিবেশন প্রক্রিয়াটি এতটাই অনানুষ্ঠানিক যে একাধিক গারো সদস্য পরস্পরের বিপক্ষে/মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে *রে-রে* গীত শুরু করতে পারেন। তাছাড়া এই গীত শিক্ষণ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণই সমষ্টির অংশগ্রহণ সাপেক্ষ একটি ব্যাপার, অর্থাৎ পারিবারিক বা গোত্রসূত্রে সকলের সাথে অংশগ্রহণসূত্রে ক্রমান্বয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারাটাই এই প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য। সুতরাং জাতিতাত্ত্বিক অন্য অনেক পরিবেশনার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত বা সংগঠিত কোনো একটি দলের বা একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে প্রথাগত আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশন সূত্রে দক্ষ হয়ে ওঠার ধারণাটি এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ *রে-রে*-এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অকার্যকর।

পরিবেশন ও বিশ্লেষণ

"ও... হো হো... / নাআ বানি সংনি সা, ফাম্থি দাসাল সকবা সা, ফাম্থি দাআ সকসা, হুউটনাসা সিঙ্গামা, মানাআ সকবা আ/ হা..রে... রে....হা....রে....রে। এই হইলো প্রশ্ন, মানে– তুমি যে যুবক, কেন আসছো এইখানে, হ্যাঁ? দেখতে তো সুন্দর দেখা যায়। কেন আসছো?"–

রে-রে গীতের প্রচলিত সুর-কাঠামোর মধ্যে তাৎক্ষণিক সৃষ্ট কথামালা দিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে একজন গারো কুশীলবের করা উক্ত প্রশ্নটির উত্তরে অবশ্য গবেষককে সহাস্য নীরব থাকতেই হয়েছিল, কেননা *রে-রে* সুর এবং গারো ভাষা দুটোই যে ছিল অজানা। তবে এই প্রশ্নের সূত্র ধরে আলাপনের গভীরতা যতই বৃদ্ধি পায় ততই গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা *রে-রে* সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রবল হতে থাকে। বোঝার চেষ্টা করা হয় উন্মুক্ত অনানুষ্ঠানিক এবং অত্যন্ত সরল পরিবেশনা *রে-রে*-এর মধ্যে কী এমন কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে যা গবেষণার লক্ষ্য পূরণে কার্যকর হতে পারে।

প্রথমত, মৌখিক পরম্পরায় সৃষ্ট 'নির্দিষ্ট' কাঠামো এবং উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণে 'তাৎক্ষণিক' সৃষ্ট অভিব্যক্তি এই দুটি বিপরীতধর্মী গুণগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়ার ফলাফল হচ্ছে *রে-রে*। মৌখিক পরম্পরায় সৃষ্ট 'নির্দিষ্ট' কাঠামো বলতে *রে-রে* সুর-কাঠামোকে বোঝানো হয়েছে, যেটি পরম্পরাগতভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত বিশেষ এক ধরনের সুর। অপরদিকে 'তাৎক্ষণিক' অভিব্যক্তি হচ্ছে আসরে উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণে মুখে মুখে রচিত সংলাপ– কথামালা বা লিপি/নাটলিপি অথবা একটি এজেন্ডা বা বিষয় এবং এর অন্তর্নিহিত ভাব-আবেগের প্রকাশ। অর্থাৎ বিশেষ ধরনের একটি সুর-কাঠামোয় অবিচল থেকে তাৎক্ষণিক সৃষ্ট সুরেলা কথামালা বা সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্তির বিপরীতে ব্যক্তি অথবা দলের বিপরীতে দলের মধ্যে ভাব-আবেগ বিনিময়ের ক্রমাগত প্রয়াস ও প্রচেষ্টাতেই পূর্ণতা পায় *রে-রে* আসরের কাঙ্ক্ষিত এজেন্ডা বা বিষয়। যেহেতু এর সংলাপ রচিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে তাই এ প্রক্রিয়াটি কার্যত ব্যক্তির জ্ঞান ও সৃজনশীল সক্ষমতা নির্ভর একটি শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। ফলে ব্যক্তির/দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সৃজনশীল চিন্তার প্রকাশ ও প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় বা এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্রিয় করে তোলার এই প্রক্রিয়াতেই নিহিত রয়েছে *রে-রে* পরিবেশনার কৌশলগত গুরুত্ব।

দ্বিতীয়ত, *রে-রে*'র সুর-কাঠামোটি নমনীয়, দীর্ঘ এবং *স্থায়ী* অর্থাৎ একটি মাত্র দীর্ঘ ও *স্থায়ী* সুরে এই কাঠামোটি বিন্যস্ত, অন্যান্য গীত/গানের ন্যায় স্থায়ী/ধুয়া, অন্তরা, সঞ্চারী প্রভৃতি পর্যাক্রম এক্ষেত্রে দৃষ্ট নয়। দীর্ঘ সুরের এই নমনীয় কাঠামোতে কুশীলবের তাৎক্ষণিক সৃষ্ট কথামালা যুক্ত হওয়ায় তা একটি *দীর্ঘ* ছন্দে

পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সৃষ্ট সুর এবং ছন্দের মাত্রা বিভাজনে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে *রে-রে* গীতের "হো/ও... হো... হো..." ধ্বনীযুক্ত সুর, এই অংশটি সাধারণত ৪ মাত্রায় গাওয়া হয়ে থাকে। সুরের মধ্যবর্তী এবং মূল পর্যায়ে রয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট কথামালা বা ছন্দ যা দীর্ঘ ৩২ থেকে ৪০ মাত্রার মধ্যে বিন্যস্ত হতে দেখা যায়। *রে-রে* গীতের সুর-কাঠামোর নমনীয়তা বলতে যা কিছু বলার বা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে বস্তুত এর কার্যকরিতা এই অংশেই পরিলক্ষিত হয়। কেননা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট ছন্দের মাত্রা নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিভাজিত থাকে না বা থাকাটা সম্ভবও নয়। এই সংখ্যা কখনো ৩২/৩৪/৩৮ অথবা এর কম বা বেশি হয়ে থাকে। কুশীলবগণ *রে-রে* সুরের মূল-কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে তাৎক্ষণিকভাবে ছন্দ রচনা করেন বলে মাত্রা অনুসারে তা কখনো দীর্ঘ-ছন্দ বা দীর্ঘ গীত-সংলাপ হতে পারে আবার তা লঘু ছন্দ বা লঘু গীত-সংলাপও হতে পারে। আবার সকল ছন্দময় *পদ* বা সংলাপের ক্ষেত্রে যে সর্বদাই অন্তমিল ছন্দের রীতি রক্ষিত হয়ে থাকে তাও নয়, যেমন– "আঙ যৌবন সিললাখো/ হননাজা জাওয়ানা/রাম কুন্দুলিয়া বান/আঙা মানা আগান না। অর্থাৎ, আমার সুন্দর যৌবন/কাউকে দিব না/রাম কুন্দুলিয়া বান/আমার আছে জানা।" তৃতীয় ও শেষ স্তরে রয়েছে " হা... রে... রে, হা... রে... রে" ধ্বনিযুক্ত ৬ মাত্রার একটি সুর। "হা... রে... রে, হা... রে... রে" ধ্বনিযুক্ত এই অংশটি কার্যত ছন্দবদ্ধ প্রতিটি একক সংলাপের সমাপ্তি বা এর সম্পূর্ণতা নির্দেশ করে, তাছাড়া *রে-রে* নামকরণের বিষয়টিও সুরের এই অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। ফলে সুর এবং ছন্দের মাত্রা বিভাজনের এই তিনটি পর্যায়ের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ হয় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট এক একটি ছন্দবদ্ধ *পদ* বা সংলাপাত্মক-গীত। অতঃপর পর্যায়ক্রমিকভাবে পক্ষে-বিপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক সংলাপাত্মক-গীত (ছন্দ) পরিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত এজেন্ডা বা বিষয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে ভাব-আবেগ বিনিময় করেন– সম্পূর্ণ হয় একটি *রে-রে* পরিবেশনা।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে *রে-রে*'র কৌশলগত তাৎপর্য এবং গুরুত্ব হিসেবে দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে– এক. *রে-রে* ব্যক্তির (কুশীলবের) তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের বিষয়টিকে শর্তাধীন করে তোলে প্রথা ও পরম্পরাগতভাবে নির্দিষ্ট একটি সুর-কাঠামো। ফলে মুক্ত চিন্তার সাথে আবদ্ধ কাঠামোর এই সেতুবন্ধ কার্যত কুশীলব/দের তাৎক্ষণিক পরিবেশনাকে সর্বদা চ্যালেঞ্জিং ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলে। এক্ষেত্রে কৌশলগত চ্যালেঞ্জটা সুরে যতটা নয় তার চেয়ে অধিক হচ্ছে সুরের সাথে ছন্দের সমন্বয় করা– 'না এখানে সুরে কোনো সমস্যা নাই, সমস্যাটা ছন্দ মিলানো। ওখানটায় মনোযোগ দিতে হয়। আগে শুনতে হয়, কি হইতাছে লগে লগে আমার ছন্দ মিলাইয়া উত্তর দিতে হবে। এইডা হইলো আসল।'[৫৪] সুতরাং প্রদত্ত সুর-কাঠামোর মধ্যে অবিচল থেকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চিন্তা ও ভাষাযোগে ছন্দবদ্ধ (সম্পূর্ণরূপে এবং সকল ক্ষেত্রে পয়ার বা

৫৪ নগেন্দ্র মান্দি (৪৯), সাক্ষাৎকার থেকে উদ্বৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ১০ এপ্রিল ২০১৫ গ্রাম : দীঘলবাগ, পো : ঘোষগাঁও, থানা : ধোবাউরা, ময়মনসিংহ

অন্তমিল ছন্দ নয়) কথামালা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের তাৎক্ষণিক সক্ষমতা অর্জন করতে পারাই হচ্ছে এই পরিবেশন প্রক্রিয়ার একটি কৌশলগত সক্ষমতা।

দুই. *রে-রে* গীতকে কেবল একটি পরিবেশনা-রীতি হিসেবে না দেখে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অর্থাৎ '*রে-রে প্রক্রিয়া*' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। বলা যায় জাতিসংস্কৃতির গভীর থেকে উদ্ভাবিত এই প্রক্রিয়াই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের গারো কিশোর-তরুণ-তরুণী থেকে প্রবীণ-প্রবীণার মনোদেহে সুর, ছন্দ, তাল লয়ের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতাকে সচল রেখেছে যুগ যুগ ধরে। কারণ এই প্রক্রিয়া একজন কুশীলবের সুর-ছন্দ, সৃজনশীল চিন্তা এবং তাৎক্ষণিক ভাষার/ছন্দের সৃজন এই তিনটি গুণাবলীর সমন্বিত দক্ষতাকে সম্ভব করে তোলে। কৌশলগত দিক থেকে এই প্রক্রিয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রে-রে গীতের প্রদত্ত সরল এবং *স্থায়ী* সুর-কাঠামোকেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ *রে-রে* হচ্ছে একটি সরল এবং *স্থায়ী* সুরের পুনঃপুন আবর্তনমূলক পরিবেশনা, আর সুরের পুনঃপুন আবর্তন শর্তহীনভাবে অন্যদেরকে (দর্শক/অংশগ্রহণকারী) সুরের আবর্তনে সাথে যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানায় বা যুক্ত হতে উৎসাহিত করে। ফলে স্নায়বিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাপমুক্ত থেকে যেকোনো নবাগত গারো সদস্যের পক্ষেও *রে-রে* দলের সাথে যুক্ত হয়ে প্রদত্ত সুর-কাঠামোর সাথে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন এবং *রে-রে* আসরে বিনির্মিত শিল্পরূপ, রস ও ভাবাবেগের সাথে ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার আশ্রয়ে কথামালা রচনায় সচেষ্ট হতে পারেন। আর এভাবেই *রে-রে* প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে সুর, ছন্দ ও তাৎক্ষণিক সৃজনশীল ভাষা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে একজন পূর্ণাঙ্গ, পবিত্র ও দক্ষ কুশীলব হয়ে উঠতে পারেন।

সুতরাং উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে গারোদের সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশনা ঐতিহ্যের *রে-রে*'কে শুধুমাত্র একটি জনপ্রিয় রীতি হিসেবে বিবেচনা না করে বরং একে কুশীলবের সুর-সক্ষমতা, তাৎক্ষণিক ভাষা/ছন্দের নির্মাণ দক্ষতা, সৃজনশীল স্বতঃস্ফূর্ততার উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর একটি প্রক্রিয়া বা *রে-রে প্রক্রিয়া* হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর এই বিবেচনা থেকেই *রে-রে প্রক্রিয়াকে* নগরায়তনিক অভিনেতার কৌশলগত প্রস্তুতি বা অনুশীলনের কার্যকর উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে সুর, ছন্দ ও তাৎক্ষণিক সৃজনশীল ভাষা-ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। তবে '*রে-রে-প্রক্রিয়া*' গ্রহণ করা বলতে এক্ষেত্রে গারো ভাষা ও সুর যুক্ত *রে-রে* পরিবেশনাকে গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং প্রক্রিয়া গ্রহণ করা বলতে *রে-রে*'র *স্থায়ী* সুর-কাঠামোর কৌশলগত বৈশিষ্ট্য ও প্যাটার্নটিকেই কেবল গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। আর এই কৌশলের অধীনে যেকোনো একটি স্থায়ী সুরের (নির্বাচিত অথবা উদ্ভাবিত) আশ্রয়ে অতঃপর তাৎক্ষণিক বিষয়-ভিত্তিক ছন্দ সৃজনের (বাংলা ভাষায়) মাধ্যমে সংলাপাত্মক কথোপকথনে অবতীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়ায় নগরায়তনিক অভিনেতাদের যুক্ত করে তাদের সুর, ছন্দ এবং তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতা বৃদ্ধির অনুশীলনকে

কার্যকর করা যেতে পারে। সুতরাং কৌশল এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অধিক চ্যালেঞ্জিং এই *রে-রে প্রক্রিয়াকে* অভিনেতার প্রস্তুতিতে একটি কার্যকর অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

৩.২.১ : সাম্বিল মিসারা

সাম্বিল মিসারা (The Pamelo Dance) অন্য নামে *চাম্বিল নৃত্য* গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পরূপ। ব্যতিক্রম এই কারণে যে এটি একটি পুরুষ প্রধান নৃত্য, মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ অনপুস্থিত। বৈশিষ্ট্যগত কারণেই এই নৃত্য দলীয় অথবা একক উভয়ভাবে পরিবেশনযোগ্য (দলীয় বলতে একাধিক কুশীলবের যুগপৎ অংশগ্রহণ করা বোঝায়, সমন্বিত কোরাস বা বৃন্দ-অংশগ্রহণ করা নয়) এবং কৌশলগত কারণে একে ক্রীড়া-কসরৎধর্মী বিনোদনমূলক শিল্পরূপ হিসেবেও গণ্য হয়ে থাকে। আবার কারো মতে *সাম্বিল মিসারা* একক চরিত্র বিশিষ্ট নৃত্য বিধায় একে 'একক অভিনয়' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়– 'সাম্বিল মিসারা এক চরিত্র বিশিষ্ট গারো নৃত্যের একমাত্র দৃষ্টান্ত। একে সম্ভবত একক অভিনয় বলাই শ্রেয়।'[৫৫] বস্তুত পূর্বকালে *সাম্বিল* নামের এক প্রকার পাহাড়ি ফল নিয়ে যে নৃত্যের প্রচলন শুরু হয় তাই *সাম্বিল মিসারা* নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্যান্য নৃত্যের ন্যায় এই নৃত্যেও গারোদের ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ নির্ভর জীবনাচারের প্রতিফলন ঘটে– 'চাম্বিল হলো এরকম পাহাড়ের ফল। এই ফলটা এই যখন পাকে তখন দল বেঁধে টিয়া, হরিণ ওরা এইগুলা খায়, বানরগুলাও খায়। তখন তারা নাচেও আর কি, দুই পা তুইলা, দুই হাত তুইলা তারা নাচে। এইভাবে অনুকরণ কইরা এই চাম্বিল নৃত্যটা হইতাছে আর কি।'[৫৬]

সাম্বিল মিসারার উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে দেব-দেবী অথবা ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষযোগ রয়েছে এমন কোনো তথ্য-উপাত্তের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে *সাম্বিল মিসারার* উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা এরকম যে, পূর্বকালে গারোদের পাহাড় ও প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ জীবনাচারের অংশ হিসেবে প্রাণিকুলের বিশেষত বানরদের সাম্বিল ফল খাওয়াকে কেন্দ্র করে উল্লাসসূচক নানাবিধ চলন, ভঙ্গি ও ছন্দের প্রতিফলন ঘটে এই নৃত্যে। বলা যায় এটি সম্পূর্ণতই ক্রীড়া, কৌশল এবং বিনোদনমূলক এক প্রকার ধর্ম-নিরপেক্ষ নৃত্য। তথাপিও যতটুকু জানা যায় তাতে অধিকাংশক্ষেত্রে উৎসব-অনুষ্ঠানের একটি বিনোদনমূলক উপাদান হিসেবে বিশেষত এই 'নৃত্য গারোদের ওয়ানগাল্লায় পরিবেশিত হয়ে থাকে।'[৫৭] এরূপ বাস্তবতায় অর্থাৎ ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে *সাম্বিল মিসারা'র* কোনো প্রকার যোগসূত্র না থাকায় এবং শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর বানরের বুনো ফল ভক্ষণ সংশ্লিষ্ট বয়ান ব্যতীত অন্য কোনো ঐতিহাসিক যোগসূত্রের সন্ধান না থাকায় সঙ্গত কারণেই এই নৃত্যের 'ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন' প্রসঙ্গ আলোচনার পরিসর সীমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া গারোদের অন্যান্য নৃত্যের ন্যায় এর 'দল-সংগঠন ও প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ' প্রক্রিয়ার কাঠামোটি সমষ্টির অংশগ্রহণমূলক নয়। পূর্বে এই নৃত্যের চর্চায় পরম্পরা রক্ষিত হতো বলে দাবি করা হলেও বর্তমানে

---

৫৫ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৮

৫৬ কামিলুস মানকিন (১৬)-এর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ১০ এপ্রিল ২০১৫ গ্রাম : দীঘলবাগ, পো : ঘোষগাঁও, থানা : ধোবাউরা, ময়মনসিংহ

৫৭ লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৭

এটি মুষ্টিমেয় কিছু আগ্রহী তরুণদের চর্চার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে, ক্ষেত্র সমীক্ষাসূত্রে এই নৃত্যের রীতি-বৈশিষ্ট্য, ভঙ্গি, চলন ও ছন্দের বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণে স্পষ্টতই গারোদের অন্যান্য নৃত্যাঙ্গিক থেকে ভিন্ন এক ধরনের শিল্পরূপ ও নৈপুণ্যের প্রদর্শন রূপে দৃষ্ট হয়। ফলে *সাম্বিল মিসারা'র* 'পরিবেশন ও বিশ্লেষণের' প্রসঙ্গটিকেই এ পর্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এই আলোচনার সূত্রে অতঃপর 'ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন' এবং 'দল-সংগঠন ও প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণের' বিষয়সমূহ সম্পর্কিত করা হয়েছে।

পরিবেশন ও বিশ্লেষণ

সাম্বিল মিসারা গারোদের অন্যান্য নৃত্যের ন্যায় নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণমূলক নয়। এটি সর্বাংশেই একক দক্ষতা এবং কৌশল-নির্ভর একটি পরিবেশনা। যদিও এই নৃত্যের উৎসমূল দীর্ঘ অতীতে প্রোথিত বলে দাবি করা হয়, তথাপিও এই নৃত্য গারোদের ধর্মীয় বা সামাজিক কৃত্য উদ্‌যাপনের প্রধান বা অ-প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে যৌথ, সম্মিলিত বা সামষ্টিক চর্চার অংশ হয়ে ওঠেনি কখনো, বরং এটি সর্বদাই একক ক্রীড়া-কসরৎমূলক বিনোদনের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, প্রদর্শিত হয়েছে নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠানে। ফলে *সাম্বিল মিসারার* শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি কার্যত সমাজের কিছু সংখ্যক আগ্রহী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় অপর কিছু সংখ্যক আগ্রহী তরুণের মধ্যে দক্ষতা ও কৌশলগত জ্ঞান আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্ষেত্র সমীক্ষায় কামিলুস মানকিন (১৬) নামের এক কিশোর প্রদর্শিত *সাম্বিল মিসারা* নৃত্য পর্যবেক্ষণ করা হয়, যিনি এই দক্ষতা অর্জন করেন হেমেন্দ্র চিছাম নামের একজন স্কুল শিক্ষকের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (উল্লেখ্য যে, ধোবাউড়া এলাকায় *সাম্বিল মিসারা* পারদর্শী অপর দু-একজন কিশোর/তরুণের মধ্যে কামিলুস একজন। অন্য কুশীলবদের ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে কেবল এই একজন কুশীলবের প্রদর্শিত নৃত্য পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়)। কিন্তু শিক্ষক হেমেন্দ্র চিছামের *সাম্বিল মিসারা* প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহ-প্রসূত একটি পদক্ষেপ বলে স্থানীয়সূত্রে জানা যায়। ফলে গারোদের পরিবর্তিত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এই নৃত্যের প্রশিক্ষণ ও চর্চার বিষয়টি পেশাগত দল বা সংগঠনের অধীনে অথবা গুরু-শিষ্যের প্রথা ও পরম্পরাগত সম্পর্কসূত্রে অনুকরণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত রয়েছে এমনটা দাবি করা যায় না।

সাম্বিল মিসারা প্রদর্শন পদ্ধতির অংশ হিসেবে একটি গামছা (সাধারণত ভিজা গামছা হয়ে থাকে) কোমরে বেঁধে নেওয়া হয়। এরপর দুই থেকে সোয়া-দুই ফুট লম্বা একটি রশির এক দিক কোমরের গামছার সাথে বেঁধে রশির অপর মাথায় সাম্বিল ফল বাঁধা হয়। তবে বর্তমানে এই বুনো ফলটির দুষ্প্রাপ্তির কারণে এক টুকরো কাপড়ে বালু দ্বারা ফল-সদৃশ একটি গোলাকার পোঁটলা তৈরি করে সাম্বিল ফলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বালু দিয়ে বানানো গোলাকার পোঁটলাটিকে ওজনে খানিকটা ভারী হতে হয় কেননা এর ফলে রশির ঘূর্ণন-গতি, নৈপুণ্য এবং এর ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হয়। রশিটি কোমরের পিছনে বেঁধে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয় যেন একটি লেজ সদৃশ বস্তুরূপে কল্পনা করা যায়। প্রথমে রশিটিকে হাত দিয়া ঘুরিয়ে নিতে হয় অতঃপর কোমরের ঘূর্ণনের সাথে যুক্ত/সমন্বয় করে সাম্বিল (বালুর পোঁটলা) ফলের ঘূর্ণন গতিশীল ও স্থির রাখা হয়। এর ফলে লেজের ঘূর্ণন-গতির হ্রাস বা বৃদ্ধি ও ভারসাম্য সুরক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণতই কোমরের নমনীয়তা ও ঘূর্ণন সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সাম্বিল মিসারা নৃত্যে কুশীলবের শরীরে দুটি পৃথক কৌশলগত দক্ষতা বা সক্ষমতার সমন্বয় ঘটতে দেখা যায়– একটি হচ্ছে সাম্বিল ফল সংযুক্ত রশির ক্রমাগত ও নিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণনের ক্রীড়ারূপ নৈপুণ্য প্রদর্শনের সক্ষমতা, যে গুণাবলীর কারণে *সাম্বিল মিসারা* কেবল নৃত্য নয় ক্রীড়া-শিল্প হিসেবেও অভিহিত হয়ে থাকে। এবং অপরটি হচ্ছে বাদ্যের তালে তালে বানরের ভঙ্গি-অনুকরণ সদৃশ ছন্দবদ্ধ চলন ও উল্লম্ফন প্রদর্শনের সক্ষমতা, যে কারণে লেজের ঘূর্ণন কসরৎ সত্ত্বেও এই আঙ্গিকটি নৃত্য-শিল্প হিসেবেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। বস্তুত এই দুটি কৌশলতগত সক্ষমতা আবার ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি ছন্দ আর কৌশলের সমন্বয়ে কার্যকর হয়ে কুশীলবের দেহ-ছন্দের সামগ্রিক প্রদর্শনকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তথা প্রাণবন্ত করে তোলে। এসকল ছন্দ আর কৌশলগুলো হচ্ছে– রশি/লেজযুক্ত সাম্বিল ফলের ঘূর্ণন, বিশেষ ও নমনীয়তায় কোমরের পূর্ণ আবর্তন বা ঘূর্ণন, বানরের ভঙ্গি-সদৃশ চলন ও উল্লম্ফন এবং প্রথাগত বাদ্যের তাল ও ছন্দ অনুবর্তী দেহ-ছন্দের সমন্বয়করণ প্রভৃতি। সাম্বিল ফলের ঘূর্ণন ছন্দটি সার্বক্ষণিকভাবে এক দিক অনুসরণ করে আবর্তিত হয়, যা ঘড়ির কাটার অনুবর্তী অর্থাৎ ডান থেকে বাম আবর্তনে চলমান থাকে। এই সকল কৌশল এবং ছন্দের প্রয়োগে কুশীলবের শরীরে অতঃপর যে মৌল পজিশন বা অবস্থান নির্মিত হয় সেটি হালকা বক্র-হাঁটুতে দুই পায়ের ওপর সমান ভর রেখে দেহের ভারসাম্যকে সুরক্ষা করে এবং এই অবস্থানে নিতম্ব থাকে বাইরের দিকে অগ্রসরমাণ যা কোমরের ঘূর্ণন ছন্দের সাথে সাম্বিল ফলের ক্রমাগত ঘূর্ণনকে সহজ করে তোলে। ফলে এই নৃত্যে কুশীলবের নির্মিত সামগ্রিক দেহ-ভঙ্গিটি অনেকাংশেই বক্র-হাঁটুতে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বানরের ভঙ্গি-অনুরূপ হয়ে ওঠে। এই দেহ-ভঙ্গিগত মৌল অবস্থানে থেকে সাম্বিল ফলের/লেজের ক্রমাগত ঘূর্ণনসূত্রে সৃষ্ট ছন্দের সাথে দেহ-ছন্দের সমন্বয় করেই অতঃপর যুক্ত করা হয় নানাবিধ চলন ও উল্লম্ফনযুক্ত নৃত্য, যা প্রকারান্তরে বানরের ফল ভক্ষণ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ ভঙ্গির প্রতীকী রূপায়ণ হয়ে ওঠে। আর এভাবেই সাম্বিল ফলের ক্রমাগত ঘূর্ণনের মাধ্যমে ক্রীড়ারূপ নৈপুণ্য প্রদর্শনের সমান্তরালে ঘূর্ণন-ক্রিয়ার গতি ও ছন্দের সাথে সমন্বয় করে প্রথাগত বাদ্যের তালে নানাবিধ চলন, উল্লম্ফন প্রদর্শন করায় *সাম্বিল মিসারার* সামগ্রিক পরিবেশনাটি বিশেষ শিল্প-উৎকর্ষে দর্শক উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

সাম্বিল মিসারার উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে ছন্দ-ভিত্তিক তিনটি বিশেষ গুণ চিহ্নিত করা যায়, যে তিনটি গুণের সমন্বয়ে একজন কুশীলব/অভিনেতা তাঁর দেহের ছন্দ ও 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' বৃদ্ধি করে শরীরকে প্রাণবন্ত প্রদর্শন উপযোগী করে তুলতে পারেন। ছন্দ-ভিত্তিক গুণ তিনটি হচ্ছে– এক. বিশেষ দক্ষতায় কোমরের ঘূর্ণন (ডান থেকে বাম ক্রমানুসারে) ছন্দে লেজের ঘূর্ণন গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। দুই. কোমর ঘূর্ণনের গতি, ছন্দ, তাল লয় ও আবর্তন প্রক্রিয়া বিবেচনায় রেখে নানাবিধ ভঙ্গি, চলন, উল্লম্ফন সংযুক্ত করা। এবং তিন. কোমরের ঘূর্ণন ছন্দের সাথে যুক্ত করা ভঙ্গি বা চলনসমূহকে বাদ্যযন্ত্রের নির্দিষ্ট তাল ও মাত্রার সাথে সমন্বয় করে নৃত্যে রূপান্তর করা। এই তিনটি গুণ যে কেবল দেহের ছন্দ ও 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' বৃদ্ধিতেই কার্যকর হয় তা নয় বরং

কুশীলবের নৃত্যকালীন মনোযোগের কেন্দ্র অথবা বৃত্ত নির্ধারণ করে সেই বৃত্তে স্থির থাকা এবং বৃত্তের পরিধিকে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে অভিনেতা তাঁর মঞ্চ/আসর উপস্থিতিকেও নিবিষ্ট মনে প্রাণবন্ত করে তুলতে সহায়তা করে। কামিলুস মানকিনের নৃত্য পর্যবেক্ষণ এবং পরে আলাপনসূত্রে *সাম্বিল মিসারায়* তাঁর মনোযোগের বৃত্তকে চারটি স্তরে ব্যাখ্যা করা যায়– এক. কেন্দ্রীয় বৃত্ত– প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর (কুশীলবের) পূর্ণ-মনো-সংযোগ কেন্দ্রস্থিত হয় কোমরের সাথে নিতম্বের সম্পর্কসূত্রে ঘূর্ণন-বৃত্তের ওপর। মনোযোগের কেন্দ্রীয় বৃত্তটির গুরুত্ব সর্বাধিক এই কারণে যে, কোমরের ঘূর্ণন ও গতি-ছন্দের সুরক্ষা এবং স্থিরতার ওপরই নির্ভর করে পরবর্তী নৈপুণ্যের প্রকাশ ও প্রদর্শনের সফলতা। দুই. এরপর কুশীলব তাঁর মনোযোগের পরিধিকে কোমরের ঘূর্ণন-বৃত্ত থেকে খানিকটা বৃদ্ধি করে সংযুক্ত লেজের (সাম্বিল ফল) ঘূর্ণন-বৃত্ত পর্যন্ত স্থির/বৃদ্ধি করেন। অর্থাৎ কোমরের সাথে নিতম্বের সম্পর্কসূত্রে নির্মিত বৃত্তটির পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে কোমরের সাথে লেজের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মনোযোগের দ্বিতীয় বৃত্তটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, লেজের ঘূর্ণন-গতি ও লয় নিয়ন্ত্রিত হওয়া/করার সাপেক্ষেই মূলত নির্দিষ্ট কিছু ভঙ্গি, চলন এবং উল্লম্ফনকৃত ছন্দ যুক্ত করে মনোযোগের কেন্দ্র ও পরিধিকে তৃতীয় স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হয়। তিন. মনোযোগের তৃতীয় বৃত্তের পরিধিতে কার্যত কুশীলব তাঁর সম্পূর্ণ দেহ ও দেহ-ছন্দকে যুক্ত করে থাকেন। অর্থাৎ কামিলুস মানকিন এই স্তরে তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র ও পরিধিকে লেজের ঘূর্ণন-বৃত্ত থেকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ দেহ এবং দেহের চলন, সঞ্চালন, উল্লম্ফন প্রভৃতি ছন্দের সাথে যুক্ত করেন। চার. অতঃপর চতুর্থ স্তরে তাঁর মনোযোগের বৃত্তটি দেহকে অতিক্রম করে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি– আসর/মঞ্চ এবং উপস্থিত দর্শককে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অত্যন্ত সাবলীলতার সাথে *সাম্বিল মিসারা* প্রদর্শন করেন।

সাম্বিল মিসারা প্রসঙ্গ আলোচনা ও বিশ্লেষণসূত্রে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বিশেষ নৃত্যগুণ সক্ষমতা অর্জন করাই কার্যত ক্রীড়ারূপ এই নৃত্য-শৈলীর প্রদর্শন ও শিল্প-সম্ভাবনাকে শর্ত সাপেক্ষ করে তোলে। কিন্তু শর্ত পূরণের বিষয়টি নির্ভর করে অনুশীলনের মাধ্যমে ছন্দ-ভিত্তিক নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণের সক্ষমতা অর্জন এবং কৌশল বাস্তবায়নের ওপর। অর্থাৎ কোমরের ঘূর্ণন, লেজের ঘূর্ণন, বিশেষ কিছু ভঙ্গি, চলন, সঞ্চালন, উল্লম্ফন এবং সুর, তাল, লয় ও ছন্দ প্রভৃতির পৃথক ও সমন্বিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই সক্ষমতা অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং সাম্বিল মিসারা নৃত্যের বিশ্লেষণসূত্রে চিহ্নিত উল্লেখিত 'গুণাবলী' ও 'কৌশল'সমূহকে নির্দিষ্ট জাতিগত সাংস্কৃতিক উপাদান অতিরিক্ত জাতি-নিরপেক্ষ অভিনেতা/কুশীলবের 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' বৃদ্ধির একটি উপায় বা মাধ্যম হিসেবেও গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি করে। এক্ষেত্রে *সাম্বিল মিসারাকে* শুধুমাত্র গারো সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ না করে বিশেষ একটি 'প্রক্রিয়া' বা 'সাম্বিল-প্রক্রিয়া' হিসেবে গ্রহণ করা যায়। *সাম্বিল প্রক্রিয়াকে* নগরায়তনিক অভিনেতার প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিনেতার অভিজ্ঞতায় ঘূর্ণন-ছন্দের উৎকর্ষ, কোমর ঘূর্ণনের সাথে দেহ অন্তর্গত ছন্দ এবং তাল-লয়ের সম্পর্ক নির্ণয়, বিশেষায়িত ভঙ্গি, চলন, উল্লম্ফনের সাথে ঘূর্ণন-ছন্দ, গতির লয় ও স্থিতির নিয়ন্ত্রণ, মনোযোগের কেন্দ্রীয় বৃত্ত

নির্ধারণ, বৃত্তে মনোযোগ স্থির করণ, একাধিক বৃত্ত বা বৃত্তের পরিধি হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন মগ্নতায় স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া প্রভৃতি গুণ আরোপ করা সম্ভব। সম্ভাবনার এই সকল গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় রেখে গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা *সাম্বিল মিসারাকে* একটি *সাম্বিল প্রক্রিয়া* হিসেবে অভিনেতার প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

৩.৩ : পর্যালোচনা

'গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা' শীর্ষক বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের 'ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– গারো' শিরোনামে গারো জাতি-সংস্কৃতির দুটি (২) পরিবেশনাকে বিশদ বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশ্লেষিত দুটি পরিবেশনার মধ্যে একটি হচ্ছে গারোদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মৌখিক ধারার অন্তর্গত গীত প্রধান এবং তাৎক্ষণিক উক্তি-প্রত্যুক্তিতে নাট্যমূলক পরিবেশনা *রে-রে* এবং অপরটি হচ্ছে গারোদের প্রাচীন নৃত্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত ক্রীড়ারূপ নৈপুণ্য প্রদর্শনমূলক পরিশেনা– *সাম্বিল মিসারা* বা *চাম্বিল নৃত্য*।

অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে প্রতিটি পরিবেশনার উৎস, বিবর্তন, দল ও সাংগঠনিক কাঠামো, সামাজিক ও ধর্মীয় কৃত্যের সাথে এর সম্পর্ক, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, পেশাগত অবস্থান প্রভৃতি ব্যাখ্যা, বিবরণ ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও গারোদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও লেখ্যরূপ না থাকায় ইতিহাস ঐতিহ্যের কোনো কিছুই বলতে গেলে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া নির্বাচিত দুটি পরিবেশনাই গারোদের প্রধান অথবা অ-প্রধান ধর্মীয় কৃত্য, উৎসব-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ না হওয়ায় এদের ইতিহাস, উৎস, বিকাশ ও বিবর্তন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তথাপিও সামগ্রিক আলোচনায় যে বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেটি হলো 'পরিবেশন প্রক্রিয়া'। যেমন, *রে-রে* হচ্ছে মুখে মুখে রচিত তাৎক্ষণিক সংলাপ ভিত্তিক গীত-প্রধান একটি প্রক্রিয়া। কার্যত এই প্রক্রিয়টি ব্যক্তির (কুশীলব) তাৎক্ষণিক জ্ঞান ও সৃজনশীল সক্ষমতায় কার্যকর হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত একটি বিষয় বা এজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রাণন্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। তবে *রে-রে*'র কার্যকারিতা ব্যক্তির তাৎক্ষণিক জ্ঞান ও সৃজনশীলতার ওপর নির্ভরশীল হলেও প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণতই সমষ্টির প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়, ফলে এটি সর্বাত্মকভাবে একটি এজমালি শিল্প-আঙ্গিক হয়ে ওঠে।

অপরদিকে *সাম্বিল মিসারা* হচ্ছে একটি অনুশীলন নির্ভর একক নৈপুণ্য প্রদর্শনমূলক প্রক্রিয়া। পূর্বকাল থেকেই মৌখিক পরম্পরা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নৃত্যটির অনুশীলন প্রক্রিয়া প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের শরীরে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। তবে মৌখিক পরম্পরা অনুসৃত হলেও *সাম্বিল মিসারার* শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ অনুশীলন ও পরিবেশন প্রক্রিয়ায় সমষ্টির অংশগ্রহণ অপরিহার্য নয় বা সমষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কোনো সুযোগও নেই। নৃত্যটি ব্যক্তির একক নৈপুণ্য প্রদর্শন নির্ভর হওয়ায় প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং পরিবেশন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে ওঠে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ শিক্ষক/প্রশিক্ষক/গুরু/অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তির সাথে গারো সমাজের সদস্য/ছাত্র/শিষ্যের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক। যদিও গারো সমাজের পরিবর্তিত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অন্য অনেক গারো পরিবেশনার ন্যায় সাম্বিল মিসারার ক্ষেত্রেও শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ,

অনুশীলন ও পরিবেশন প্রক্রিয়ায় প্রাচীন প্রথা ও পরম্পরা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি, তথাপিও এই প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রেই কার্যকর হয়।

কাঠামোগত দিক থেকে *রে-রে* ও *সাম্বিল মিসারার* পরিবেশন প্রক্রিয়া সর্বাংশেই উন্মুক্ত ও নমনীয়তায় বিন্যস্ত। উন্মুক্ত এ কারণে যে উভয়ের প্রদর্শনে স্থান ও কালের (রে-রে'র ক্ষেত্রে পাত্রের) বাধ্যবাধকতা যেমন অনপুস্থিত তেমনি কাঠামোগত বিন্যাসে শুরু-মধ্য-শেষ-এর আবদ্ধ ধারণাটিও এক্ষেত্রে অকার্যকর। উভয় পরিবেশনার প্রারম্ভ পর্যায়টি মৌখিক পরম্পরায় নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি অনুসারে পরিবেশিত হলেও মধ্য ও শেষ-এর ধারণা সম্পূর্ণতই কুশীলব/দের ইচ্ছা, আগ্রহ এবং কুশীলব/দের সাথে দর্শকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অনানুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তাছাড়া, *রে-রে* প্রক্রিয়ায় তো বটেই, *সাম্বিল মিসারাতেও* রয়েছে তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতার উপস্থিতি– কোমরের ঘূর্ণনের সাথে লেজের ঘূর্ণনের গতি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে বানরের চলন সদৃশ নানা ভঙ্গি, উল্লম্ফন, সঞ্চালন সংযুক্ত করার বিষয়টি সম্পূর্ণতই কুশীলবের ব্যক্তিগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীলতায় সম্পাদিত হয়। আর এই ক্ষেত্রে লেজের ঘূর্ণন অব্যাহত রেখে যে সকল ভঙ্গি প্রদর্শিত হয় তার নিয়ন্ত্রণ ও বৈচিত্র্য সুরক্ষার দায়টিও সম্পূর্ণ কুশীলবের ওপর বর্তায় এবং একই সাথে নৃত্যকালীন সময়ের ধারণাটিও ব্যক্তি ও উপস্থিত দর্শকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কৌশল ও গুণগত উৎকর্ষ অর্জনকল্পে উভয় পরিবেশনা-ই সংশ্লিষ্ট কুশীলব/দের বিশেষ ও নির্দিষ্ট কতিপয় দক্ষতা আর সক্ষমতাকে শর্তাধীন করে তোলে। যেমন– *রে-রে'র* কার্যকারিতা কুশীলবের তাৎক্ষণিক জ্ঞান, উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতায় প্রকাশ পায়, অপরদিকে *সাম্বিল মিসারার* নৈপুণ্য প্রদর্শন কুশীলবের শারীরিক-ছন্দ ও নৃত্যগুণ সক্ষমতায় হয়ে ওঠে সাবলীল। অর্থাৎ *রে-রে* যতখানি মন ও মননের, *সাম্বিল মিসারা* ঠিক বিপরীতক্রমে শরীর-ছন্দের দক্ষতা ও সক্ষমতার। *রে-রে* পরিবেশনা যেমন কুশীলবের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতায় প্রাণবন্ত হয়, বিপরীতক্রমে *সাম্বিল মিসারায়* কুশীলবের ছন্দভিত্তিক কতিপয় গুণ ও কৌশলযুক্ত নৈপুণ্য প্রদর্শনের (কোমরের ঘূর্ণন-ছন্দ ও গতি, লেজের ঘূর্ণন-ছন্দ ও গতি এবং কোমরের সাথে লেজের ঘূর্ণন গতি ও নিয়ন্ত্রণসূত্রে নানাবিধ ভঙ্গি, চলন, উল্লম্ফনযুক্ত) মাধ্যমেই নির্মিত হয় এর শিল্প-উৎকর্ষ। ফলে গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা *রে-রে* একদিকে যেমন কুশীলবের দেহাভ্যন্তর বা আন্তর জগতের (তাৎক্ষণিক জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার) প্রকাশ-ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেয়, *সাম্বিল মিসারা* অপরদিকে কুশীলবের দেহাঙ্গিকের ছন্দ, তাল, লয় সহযোগে নৃত্যগুণ সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে। ফলে *রে-রে* ও *সাম্বিল মিসারাকে* শুধুমাত্র দুটি জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা হিসেবে না দেখে কৌশলগত দিক থেকে এদেরকে দুটি 'প্রক্রিয়া'– অর্থাৎ 'রে-রে প্রক্রিয়া' এবং 'সাম্বিল প্রক্রিয়া' হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। 'প্রক্রিয়া' গ্রহণ বলতে এক্ষেত্রে গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানাবিধ কৃত্য, আচার-অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ

হিসেবে গারো ভাষা, সুর ও ছন্দ সমৃদ্ধ, সামষ্টিক বা ব্যষ্টিক চর্চার অংশ হিসেবে 'রে-রে' এবং 'সাম্বিল মিসারা'র প্রদর্শনী গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে না। বরং জাতিসংস্কৃতি ঐতিহ্যের এ দুটি পরিবেশনা থেকে সুনির্দিষ্ট কতিপয় কাঠামো, পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। 'রে-রে প্রক্রিয়া' এবং 'সাম্বিল প্রক্রিয়া' এক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র/পৃথক অনুশীলন উপাদান হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। যাতে করে নগরায়তনিক অভিনেতা/কুশীলবের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় কাঠামোবদ্ধ সুর-ছন্দের আশ্রয়ে সংলাপাত্মক কথোপকথনে উদ্বুদ্ধ হওয়া, তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত বিষয় বা এজেন্ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতায় বাস্তবায়ন করা, 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' বৃদ্ধি করা এবং মনোযোগ-বৃত্তে স্থির থাকা প্রভৃতি গুণের উন্নয়নকল্পে কার্যকর অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং 'রে-রে প্রক্রিয়া' এবং 'সাম্বিল প্রক্রিয়া'র অন্তর্গত গুণাবলী, কৌশল ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশ্লেষণে নানাবিধ নাট্য-গুণের উপস্থিতি বিবেচনায় এই দুটি প্রক্রিয়াকে অভিনেতার প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে চতুর্থ অধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

চতুর্থ অধ্যায় :

পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণ

চতুর্থ অধ্যায় : পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণ

৪.১ : অনুশীলন উপাদানের পুনঃ আলোচনা

বক্ষ্যমাণ গবেষণার পরিধি ও সময়ের বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় রেখে ‘জাতিতাত্ত্বিক নাট্য-নিরীক্ষার’ অংশ হিসেবে মারমা, মণিপুরী এবং গারো এই তিনটি নৃ-গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে অভিসন্দর্ভের শিরোনামে সংযুক্ত জাতিতাত্ত্বিক ‘নাট্য-নিরীক্ষা’ বিষয়টিকে দুটি পর্যায়ে সম্পাদন করা হয়। ‘নিরীক্ষার’ প্রথম পর্যায়ে ‘জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়’ অন্বেষণসূত্রে নির্ধারিত তিনটি নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা-ধর্ম-দর্শন, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক মূল্যবোধ এবং জীবনাচারের করণীয়/পালনীয় অনুষঙ্গ– উৎসব, নৃত্য, গীত, আচার-অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, তান্ত্রিক রীতি-নীতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের এই পথ ধরেই ঐতিহাসিক কাল থেকে নানাবিধ সংঘাত-সম্পর্কে অথবা গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণের প্রক্রিয়ায় জাতিগত ‘নাট্য’ বা ‘নাট্যমূলক’ পরিবেশনা যে সকল রীতি-গঠন-কাঠামোয় ক্রমান্বয়ে বিশিষ্ট ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই সূত্রগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। ‘ক্ষেত্র-সমীক্ষার’ ভিত্তিতে তিনটি জাতি-সংস্কৃতি থেকে নির্বাচিত মোট ১২টি পরিবেশনাকে অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ের ‘নাট্য-নিরীক্ষায়’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নির্বাচিত এই সকল পরিবেশনার মধ্যে রয়েছে– মারমা সংস্কৃতির তান্ত্রিক চিকিৎসা ও ধ্যান পদ্ধতি– ‘দম’, ‘চক্রামন’ ও ‘ইচ্ছা ছায়া’, পালানাট্য– ‘পাঙখুং’, এবং ঐতিহ্যবাহী মারমা নৃত্য– ‘থালা নৃত্য’, ‘বাঘ নৃত্য’ ও ‘জ্যা নৃত্য’। মণিপুরী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী রাধা-কৃষ্ণ আখ্যানধর্মী পরিবেশনা ‘রাসনৃত্য’, ‘নটপালা’ এবং একটি সমরকৌশলধর্মী ক্রীড়া পরিবেশনা– ‘থাঙ তা’। গারো সংস্কৃতির গীতযুক্ত তাৎক্ষণিক সংলাপ ভিত্তিক ‘রে-রে’ পরিবেশনা এবং নৃত্যধর্মী ‘সাম্বিল মিসারা’ প্রভৃতি। নাট্য-নিরীক্ষার এই পর্যায়ে কার্যত নির্বাচিত ১২টি পরিবেশনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয় এবং ‘ক্ষেত্র, উৎস ও বিবর্তন’, ‘দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ’, এবং ‘পরিবেশন ও বিশ্লেষণ’ এই তিনটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশনা অন্তর্গত বেশ কিছু নাট্যমূলক ‘উপাদান’ চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত উপাদানগুলোকে একদিকে যেমন জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনার (নৃত্য, নাট্য, নাট্যমূলক) অন্তর্গত ‘বৈশিষ্ট্য’, ‘প্রক্রিয়া’, অথবা ‘কৌশল’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অপরদিকে গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং কার্যকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপাদানগুলোকে অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক/উপযোগী অনুশীলন উপাদান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। মূলত গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য বিবেচনায় রেখেই জাতিতাত্ত্বিক ‘নাট্য-নিরীক্ষার’ সূত্রে অনুশীলন উপাদান অন্বেষণ করা হয় এবং শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় অভিনেতার দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক তথা মনো-দৈহিক প্রস্তুতিতে এই সকল উপাদানের কৌশলগত কার্যকারিতা ও প্রায়োগিক সম্ভাবনা যাচাই করা হয়। অন্বেষণলব্ধ অনুশীলন উপাদানগুলোর মধ্যে– ৭টি মারমা পরিবেশনা থেকে ১০টি উপাদান–

১. ইচ্ছা ছায়া, ২.চক্রামন, ৩. দম, ৪. ঘূর্ণন প্রক্রিয়া, ৫. টরসো, ৬. বক্র হাঁটু, ৭. লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব, ৮. পূণঃপূণ গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া, ৯. বর্ণনাত্মক নৃত্য, ১০. নৃত্যধর্মী সক্ষমতা। ৩টি মণিপুরী পরিবেশনা থেকে ৫টি উপাদান– ১১. অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ, ১২. বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি, ১৩. ভাব-দেহের মূর্তকরণ, ১৪. গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা, ১৫. কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা। এবং ২টি গারো পরিবেশনা থেকে ২টি উপাদান– ১৬. রে-রে প্রক্রিয়া, ১৭. সাম্বিল প্রক্রিয়াসহ মোট ১৭টি অনুশীলন উপাদান চিহ্নিত করা হয়।

গৃহীত ১৭টি অনুশীলন উপাদানের 'তুলনামূলক পর্যালোচনা' শীর্ষক বক্ষ্যমাণ আলোচনার পূর্বে পরিবেশনাসমূহের অন্তর্গত যে সকল বৈশিষ্ট্য, প্রক্রিয়া এবং কৌশলগত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় অনুশীলন উপাদানগুলো নির্বাচন করা হয় সে বিষয়ে পুনরায় আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১. ইচ্ছা ছায়া : একটি মারমা তান্ত্রিক ধ্যান ভিত্তিক পরিবেশনা। বিশেষ একটি ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে ('প্রদত্ত পরিস্থিতি'– কাপড়, রঙিন জরি, ফুল, মোমবাতিসহ নানাবিধ কৃত্য-উপকরণের ব্যবহারে আলোর স্বল্পতায় নির্জন কক্ষে নির্মিত দুটি বিশেষ আসনে এই ধ্যান পালন করা হয়ে থাকে) প্রদর্শিত এই ধ্যানের প্রক্রিয়াগত বিশ্লেষণ থেকে দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়– এক. এই ধ্যান পরিবেশনা সাধক এবং সেবা গ্রহণকারী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, যোগাযোগ এবং বোঝাপড়ায় পবিত্র সম্পর্ক-সেতু রচনা করে। কার্যত গভীর বিশ্বাস এবং আস্থার ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায় একের প্রতি অন্যের 'সোপর্দ' বা 'সমপর্ণ' করতে পারাটাই এই সাধন-প্রক্রিয়ায় সফলতার পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বা যোগাযোগের বিষয়টি কেবলমাত্র ফরমায়েশি বাহ্যিক আচরণে সীমিত থাকে না বরং বিষয়টি পবিত্র এবং আবেশায়িত 'প্রদত্ত পরিস্থিতির' প্রণোদনায় সম্পর্কের বহুমাত্রিক গভীরতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা তৈরি করে। এবং দুই. পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপনের কারণে মানসিক অথবা ভাবগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গুণগত পরিবতর্নকে 'সত্যমূলক' বিশ্বাসে মেনে নিতে সহায়তা করে– অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির জোরেই ব্যক্তি (সেবা গ্রহণকারী) তাঁর মনো-দৈহিক পরিবর্তনকে (অর্থাৎ মাথা ব্যথা ভালো হয়ে গেছে বা এটি গোলাপ ফুল নয় জবা ফুলের সুবাস) 'সত্যমূলক' (make believe) বিশ্বাসে মেনে নিতে সক্ষম হয়। প্রবল 'ইচ্ছা শক্তি' দ্বারা পরিচালিত এই ধ্যান প্রক্রিয়াটি বস্তুর রং/রূপ/আকার/আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে না ঠিকই, তবে 'সত্যমূলক' বিশ্বাসে বস্তুর গুণগত অথবা ভাবগত পরিবর্তন বা রূপান্তরকে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে (বিস্তারিত ১ম অধ্যায়ে)। সুতরাং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এবং এর কার্যকারিতা বিবেচনায় 'ইচ্ছা ছায়া'-কে শুধুমাত্র জাতি-সংস্কৃতি নির্ভর একটি 'ধ্যান' হিসেবে গ্রহণ না করে একটি অনুশীলন 'প্রক্রিয়া' হিসেবে গ্রহণেরও সুযোগ তৈরি করে। এই ধ্যান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যত সাধক ও সেবাগ্রহণকারী বা

কুশীলব/অভিনেতা প্রত্যেকেই তাদের আন্তঃসম্পর্কের উন্নয়নকল্পে ‘পারস্পরিক আস্থা ও যোগাযোগ স্থাপন’ এবং ‘সত্যমূলক বিশ্বাসে’ মেনে নেওয়ার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

২. চক্রামন : মারমা তান্ত্রিক ধ্যান-সাধনায় এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশনা। ‘চক্রামন’ ধ্যানটি ব্যতিক্রম কারণ এটি চলার গতিতে অর্থাৎ হাঁটার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রক্রিয়া অনুসারে নির্দিষ্ট একটি দূরত্ব বা ‘লক্ষ্য’ নির্ধারণ করে অতঃপর, অটল ও নিবিষ্ট মনে বিশেষ ভঙ্গিতে চলন বা হাঁটার মাধ্যমে নির্ধারিত গন্তব্যে (লক্ষ্যে) পৌঁছে পুনরায় শুরুর গন্তব্যে ফিরে আসে এবং এইভাবে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকবার হাঁটার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয় প্রক্রিয়াটি (বিস্তারিত ১ম অধ্যায়ে)। এই ধ্যানের প্রায়োগিক কৌশল এবং প্রক্রিয়াগত বিশ্লেষণ থেকে দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করা হয়। প্রথমত এই ধ্যান ব্যক্তি/সাধককে স্থিরচিত্তে, নিবিষ্ট মনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের বা *ক্রিয়া সম্পাদনের* অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ফলে চক্রামন ধ্যানের এই বৈশিষ্ট্যটিকে ক্রিয়ায় (অভিনয়ে) একাত্ম থেকে ব্যক্তির (চরিত্রের) নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করার অভিজ্ঞতার সমান্তরালে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি অন্য সকল ধ্যানের মতোই সাধারণ, কেননা তা জাগতিক চিন্তা-ভাবনা, তাড়না, অস্থিরতা মুক্ত একটি স্থির ও নিবিষ্ট মনের প্রবহমানতা নিশ্চিত করে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত ক্রিয়াশীলতায় পরিণামে ব্যক্তিকে (কুশীলব/অভিনেতাকে) স্থিরচিত্তে, নিবিষ্ট মনে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের অভিজ্ঞতাকে সহজাত করে তোলে।

৩. দম : মারমা জাতি-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে একটি তান্ত্রিক চিকিৎসার পরিবেশন পদ্ধতিতে ‘দম’ ব্যবহারের প্রক্রিয়াটিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়। নগরায়তনিক নাট্যমূলক পরিবেশনায় ‘দম’-এর প্রচলিত কিছু ব্যবহার রয়েছে, যেমন– আবেগের প্রকাশে, শরীর শিথিলায়নে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণায়ামে দমের ব্যবহার প্রভৃতি। কিন্তু মারমা তান্ত্রিক চিকিৎসার পরিবেশন পদ্ধতিতে ‘দম’-এর ব্যবহার ব্যক্তি/কুশীলবকে রূপান্তর/পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় করে (বিস্তারিত ১ম অধায়ে)। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় *দমের* কৌশলপূর্ণ ব্যবহার মনকে *পবিত্র স্থিরতায়* কেন্দ্রস্থিত করে *বুদ্ধ-শক্তি* (বিশেষ/পবিত্র শক্তি) অর্জনে সহায়তা করে। ফলে ‘দম’ অনুশীলনের প্রক্রিয়াটি একদিকে যেমন বস্তুজগতের পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় কার্যকর হয়, অপরদিকে এ প্রক্রিয়াটি প্রবহমান/ অস্থির/ বিক্ষিপ্ত মানসিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে *পবিত্র স্থিরতায়* কেন্দ্রস্থিত হতে সহায়তা করে। ফলে ‘দম’ অনুশীলনের এই প্রক্রিয়া অনুসরণে কুশীলব/অভিনেতা একদিকে যেমন– ভাব এবং বস্তুজগতের পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতা (অপদেবতা– অস্থির/বিক্ষিপ্ত মানসিক প্রবাহ) মোকাবিলায় সফল হতে পারে, অপরদিকে এ প্রক্রিয়াটি প্রবহমান/অস্থির/বিক্ষিপ্ত মানসিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত নিবিষ্ট মানসিক স্তরে (চেতনা প্রবাহ– *পবিত্র স্থিরতায়* মনোযোগী) কেন্দ্রস্থিত হতে পারে।

৪. ঘূর্ণন প্রক্রিয়া : মারমা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের *থালা নৃত্যের* ঘূর্ণন শৈলী থেকে 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া' গ্রহণ করা হয়েছে। দুই হাতের পর্যায়ক্রমিক এবং সমান্তরাল ঘূর্ণন-শৈলীর প্রদর্শন *থালা নৃত্যের* প্রধান বৈশিষ্ট্য। কার্যত কুশীলবের দেহস্থিত 'ভরকেন্দ্র', 'ভারসাম্য' ও 'ঘূর্ণন কৌশল'-এর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমন্বিত প্রকাশ সক্ষমতাই এই নৃত্যের শৈলী প্রদর্শনকে প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্য করে তোলে। ফলে থালা নৃত্যের' ঘূর্ণন-শৈলীর সামগ্রিক গুণাগুণ বিচার পরবর্তী এই প্রক্রিয়াটিকে কেবল একটি নান্দনিক 'কৌশল' হিসেবে না দেখে অভিনেতার শরীর ও মনের সমন্বিত অর্থাৎ মনো-দৈহিক প্রস্তুতিরও 'কৌশল' হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কেননা এই 'কৌশল' কেবল হাতের তালুতে রাখা থালার ঘূর্ণন নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তা নয় বরং হাতের এই ঘূর্ণন-শৈলী একদিকে যেমন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ- কব্জি, কনুই, ঘাড়, কাঁধ, মেরুদণ্ড, কোমর, হাঁটু এবং পদযুগলসহ শরীরে পেশির বিন্যাসগত উত্তেজনাকে (মাসকিউলার টেনশন) যুক্ত করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে তা আবার নৃত্যের ছন্দে চলমান শরীরের ভারসাম্য সুরক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মারমা সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত *জ্যা* নৃত্যের পরিবেশন প্রক্রিয়া এবং কৌশল বিশ্লেষণের মাধ্যমে– 'টরসো', 'হালকা বক্র হাঁটু' এবং 'লাস্য ও লাস্যময় তাণ্ডব' এই তিনটি উপাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এই তিনটি উপাদানের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো (বিস্তারিত প্রথম অধ্যায়ে)।

৫. টরসো (torso) : বলতে বুঝায় মাথা, ঘাড়, হাত ব্যতীত এবং কোমর থেকে উপরে শরীরের মূল অংশ, যাকে ট্রাংকও বলা হয় অথবা এ অঙ্গটিকে একটি আয়তকার আকৃতির বাক্স হিসেবেও কল্পনা করা যায়। ধ্রুপদী নৃত্য থেকে নিরীক্ষাধর্মী অথবা সমসাময়িক বিভিন্ন নাচে দেহের ভাষা ও শৈলী প্রকাশে টরসোকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে মারমা *জ্যা-নৃত্যে* তাল, লয়, ছন্দ অনুবর্তী *টরসোর* সাথে *বক্র হাঁটু* এবং হস্তভঙ্গি/মুদ্রার সমন্বিত সঞ্চালন/মুভমেন্ট যে শৈলী রূপায়ণ করে তা প্রত্যক্ষণে ধ্রুপদী নৃত্যের নিকটাবর্তী অনুভূতি জাগ্রত করে। সাধারণত শরীরের উল্লম্ব রেখাকে (head to toe vertical line) ভেঙে বা রেখা থেকে বাইরে বের হয়ে এসে বিশেষ কোনো মুভমেন্ট অথবা শৈলী প্রদর্শন করতে হলে স্বাভাবিকভাবে *টরসোর* উপরই সর্বাধিক নির্ভরশীল হতে হয়। *জ্যা-নৃত্যের* কতিপয় শৈলী প্রদর্শনে পরিষ্কারভাবে *টরসোর* এ জাতীয় ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কেবল *টরসো* নয় বরং হস্ত, পদ ও কোমরের সাথে *টরসোর* সমন্বিত কোমল সঞ্চালন শৈলীর প্রয়োগ মারমা জাতিতাত্ত্বিক অন্যান্য নৃত্যশৈলী থেকে *জ্যা-নৃত্যকে* বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে। কার্যত টরসোর ব্যবহার বহুমাত্রিক অঙ্গ-শৈলী ও সঞ্চালন এবং একাধিক ভরকেন্দ্র ও ভারসাম্যের সাথে কুশীলবের/অভিনেতার/ ভূমিস্থিত দৃঢ় উপস্থিতি ও সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত/সমন্বিত করে।

৬. হালকা বক্র হাঁটু : 'বক্র হাঁটু' এমন একটি পজিশন যা ভরকেন্দ্রের সাথে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ (কোমর থেকে উপরে) এবং ভূমিস্থিত নিম্নাঙ্গের (কোমর থেকে নিচে) মধ্যে বিশেষ সমন্বয়-সম্পর্ক তৈরি করে, পরিণামে যা শরীরকে ভূমির সাথে সুদৃঢ়-স্থিত করে রাখে। তাছাড়া সামান্য বা হালকা 'বক্র হাঁটু'র পজিশনটি দেহের মেরুদণ্ডকে উল্লম্ব সরলরেখায় প্রতিস্থাপনেও সহায়তা করে। হাঁটু সামান্য ভাঙার ফলে শরীরে ঊর্ধ্বাঙ্গ এবং নিম্নাঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত স্বাভাবিক ভরকেন্দ্রটি অস্থির (unstable) হয়ে ওঠে, ফলে তা শরীরের ভারসাম্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। ভারসাম্যের এই অস্থির অবস্থাকে মোকাবিলার প্রথম কাজটিই হলো 'হিপ' বা কোমরের পিছনের নিম্নাংশকে সামনের দিকে অর্থাৎ পিছন থেকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ভরকেন্দ্রকে স্থির করা। এটি ভরকেন্দ্রকে স্থির করার পাশাপাশি মেরুদণ্ডের দৈনন্দিন বা স্বাভাবিক বক্র আকৃতির অবস্থান থেকে উল্লম্ব ও সরলরৈখিক পজিশনে প্রতিস্থাপনেও সহায়তা করে। 'হালকা বক্র হাঁটু'র এই ব্যবহার *জ্যা-নৃত্যের* একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এটি মণিপুরী নাচের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, 'বক্র হাঁটুতে' স্থির থেকে শরীর সঞ্চালন করা যেকোনো প্রকার নৃত্য অথবা শরীর অনুশীলনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর একটি কৌশল। কেননা এই কৌশল দৈনন্দিন অতিরিক্ত বিশেষ অথবা ঝুঁকিপূর্ণ কিছু পরিবেশনায় কুশীলবের পায়ের সাথে শরীরের সমন্বিত সঞ্চালন সক্ষমতা এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

৭. লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব : জ্যা নৃত্যে 'হালকা বক্র হাঁটু', 'টরসো' এবং হস্তমুদ্রার সমন্বিত সঞ্চালনে সৃষ্ট যে 'লীলা চঞ্চলা' মধুর, কোমল ও বলিষ্ঠ দেহশৈলী প্রদর্শিত হয় এর অন্তর্নিহিত শক্তি-স্রোত হচ্ছে *লাস্য* শৌর্যের (এনার্জি) সক্রিয় প্রবহমানতা। যদিও এই নৃত্যে 'সবল' ও 'বলিষ্ঠ' দেহভঙ্গির উপস্থিতি বিদ্যমান, তথাপিও তা *তাণ্ডব* শৌর্যের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং একে বলা যায় 'লাস্যময়-তাণ্ডব'। কেননা *জ্যা* আখ্যান অন্তর্গত *রাজকুমারী* এবং *রাজকুমারের* নৃত্যে দুটি বিপরীত লিঙ্গ– 'পুরুষ' এবং 'নারী' চরিত্রের (কুশীলবের) উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও উভয়ের নৃত্যশৈলীতে বা দেহ-ক্যানভাসে চরিত্রের স্ব স্ব লিঙ্গানুগ বৈশিষ্ট্য (পুরুষত্ব এবং নারীত্ব) চরিত্রায়ণ/প্রতীকায়নের বিপরীতে বিশেষ একটি বিনম্র ভাব-শরীর নির্মাণের প্রবণতা সক্রিয় থাকে– যা সদাই নিবেদনমূলক এবং ভক্তিতে কোমল। ফলে এই নৃত্যে রাজকুমার– 'পুরুষ' এবং রাজকুমারী– 'নারী' কেউই তাদের পারস্পরিক অথবা পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের রূপায়ণে *তাণ্ডবে* উন্মত্ত হয় না, বরং যা কিছু 'সবল' ও 'বলিষ্ঠ' দেহভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় তাও *লাস্যের* কোমলতায় 'চঞ্চলা' হয়ে ওঠে। *জ্যা* নৃত্যে *লাস্যের* এইরূপ প্রয়োগ-বিন্যাস বিবেচনায় রেখে একে *লাস্যময়-তাণ্ডব* নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাই *জ্যা নৃত্যে* কুশীলবের শরীর ও মন তথা মনো-দৈহিক ভঙ্গিমায় নির্মিত/রূপায়িত সকল ছন্দ, গতি, চলন, সঞ্চালনে শৌর্যের প্রয়োগ হয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থাৎ লাস্যের ব্যবহার মুখ্য হলেও তাণ্ডবের ক্ষেত্রে তা *লাস্যময়-তাণ্ডব* রূপে কার্যকর হয়। ফলে 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' শৌর্যের প্রত্যক্ষ প্রবাহে প্রাণবন্ত হয় দেহের 'টরসো' ও 'বক্র হাঁটুর' মধু-মিলন এবং এ থেকে সৃষ্ট বহুমাত্রিক অঙ্গ-শৈলী ও সঞ্চালন পরিণামে কুশীলবের নৃত্য-দেহে নিপুণ ও নিয়ন্ত্রিত 'লীলা

চঞ্চলা' ভাব-শরীর (ভাব দ্বারা তাড়িত) নির্মাণ করে। কেননা এই প্রক্রিয়ায় পরস্পর বিপরীত দুটি শক্তি– *লাস্য* ও *তাণ্ডব*-এর সমন্বিত গতি/স্রোত দেহের নানাবিধ ভঙ্গি ও শৈলী সঞ্চালনে সক্রিয় হয়ে ওঠে, একই সাথে সমন্বিত শৌর্যের প্রবহমান স্রোতকে সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কুশীলব/অভিনেতা দেহ-অঙ্গে বহু ও বিচিত্র বিন্যাসের সম্ভাবনা তৈরি করে।

৮. পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া : কৃত্যনাট্য *পাঙখুং*-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে *পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়াকে* চিহ্নিত করা হয়। বিশ্লেষণসূত্রে দেখা গেছে পাঙখুং-এর নির্দিষ্ট কিছু সুর-ছন্দ ও শরীরভঙ্গির একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও পুনঃপুন 'আর্বতন' ও 'সম্পাদন'-এর কারণে দর্শক/কুশীলব উভয়ে প্রদর্শিত ঘটনার সাথে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়ে এক 'পরমানন্দীয় আবেশে' আচ্ছন্ন হয় এবং কৃত্যনাট্য– *পাঙখুং*-এর শিল্প-রস আস্বাদন করে (বিস্তারিত ১ম অধ্যায়ে)। এই প্রক্রিয়ায় সুর, ছন্দ ও তালের পুনরাবৃত্তি ঘটে কার্যত সময়ের বিস্তার ও বিন্যাসের মাধ্যমে অর্থাৎ সময়ের পুনঃপুন আবর্তনের মাধ্যমে কুশীলব ও দর্শক ক্রমান্বয়ে এক পরমানন্দীয় আবেশের দুনিয়ায় বা দশাগ্রস্ত অবস্থায় উন্নীত হয়। 'পরমানন্দীয় আবেশ' হচ্ছে এমন এক ভাব-জগতের অভিজ্ঞতা যা ব্যক্তি/কুশীলব/অভিনেতাকে তাঁর প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন মনো-দৈহিক সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে দেয় 'ভিন্ন'/'নতুন' কোনো মনো-দৈহিক বাস্তবতায়। কেননা ট্রান্স– দশা বা ভর হচ্ছে এমন এক নিবিষ্ট-সক্ষমতা যা একটি নির্দিষ্ট কর্মে/ভাবের গহিনে লীন হতে সহায়তা করে। ফলে প্রক্রিয়াটি কুশীলব/অভিনেতাকে 'পরমানন্দীয় আবেশে' নিমগ্ন থেকে ক্রিয়া সম্পাদনের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে।

৯. বর্ণনাত্মক নৃত্য : *পাঙখুং* নৃত্যে দেহ-ছন্দের দোলায় নির্মিত সাধারণ ভাবোদ্দীপনা দ্বারা আখ্যানোক্ত ঘটনা, দৃশ্য এবং চরিত্রদের প্রকাশ করা হয় না, অথবা সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশক সংকেতাবদ্ধ মুদ্রাতেও এর প্রকাশ পায় না বরং এই নৃত্য নির্মিত হয় দেহ-ছন্দের সুরেলা ও সরল অর্থপূর্ণ বর্ণনাত্মক অভিব্যক্তিতে। *ভাবোদ্দীপক নৃত্যের* সাথে *বর্ণনাত্মক* নৃত্যের মৌলিক পার্থক্য এই যে, প্রথমটি কেবল দেহের ছন্দে সৃষ্ট ভাবের প্রকাশে হয় উপভোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট হয় দেহের ভাষায় সৃষ্ট বর্ণনাধর্মিতায়। অর্থাৎ *বর্ণনাত্মক নৃত্য* দেহের ইঙ্গিতময় এবং অর্থপূর্ণ বর্ণনাত্মক ভঙ্গি বা ভাষার উপর ভর করে ভাবের গভীরে পৌঁছায়। এই নৃত্য কেবল ভাবের উদ্দীপনাকেই সহায়তা করে তা নয় বরং তা নির্দিষ্ট একটি বিষয় (ফসল কাটা, জুম চাষ করা ইত্যাদি) অথবা ঘটনার ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনাকে সুনির্দিষ্ট করে তোলে (বিস্তারিত ১ম অধ্যায়ে)। ফলে কৌশল এবং প্রক্রিয়াগতভাবেই দেহের ভাষায় এবং ছন্দে বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা *পাঙখুং* নৃত্যে কুশীলবের সুরেলা ছন্দময় শরীর সক্ষমতার উন্নয়নে বিশেষ কার্যকর হয়ে ওঠে। মনের গহিনের সুর, ছন্দকে দেহের সুর ও ছন্দে রূপান্তর করা বা দেহের ভাষায় বর্ণনা করতে পারার সক্ষমতা অর্জন করাই প্রকারান্তরে *পাঙখুং* নৃত্যের কুশীলব/ অভিনেতার নৃত্যগুণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে।

১০. নৃত্যধর্মী সক্ষমতা : মারমা নৃত্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত *বাঘনৃত্যের* কুশীলব মংমং মারমার প্রদর্শিত শরীর-শৈলী বিশ্লেষণসূত্রে *নৃত্যধর্মী সক্ষমতা* বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করা হয়। 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' বলতে এক্ষেত্রে অনুশীলন-পূর্বক নৃত্যের প্রথাগত দক্ষতা অথবা প্রদর্শন-নৈপুণ্য অর্জনের কথা বলা হচ্ছে না বরং অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরে এমন নমনীয় (Flexible) গুণের সক্ষমতা অর্জনের কথা বলা হচ্ছে যাতে আন্তরসত্যের উন্মোচন ও প্রদর্শনে একজন অভিনেতা হতে পারে তাৎক্ষণিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়ন্ত্রিত। কেননা অভিনেতার দায়িত্ব হচ্ছে অন্তর জগতে ক্রিয়াশীল চিন্তা, ভাব-আবেগ, অনুভূতি-উপলব্ধিকে নিপুণ দক্ষতায় শারীরিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা বা শরীর-ক্যানভাসে চিত্রায়িত করা। *বাঘনৃত্যে* কুশীলবের প্রদর্শিত শরীর বা 'পারফরমিং বডি' নিরিখে শরীরগত সক্ষমতার এই গুণ বা 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা'র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মংমং মারমা বাঘের আচরণ, ভঙ্গি রূপায়ণে দু'ই হাতের বাহু এবং পায়ের রানের মাংসপেশির কৌশলপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাথা, ঘাড়, পিঠ ও কোমরে এমন কিছু নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গি প্রদর্শন করেন যা বাঘের (চরিত্রের) শারীরিক অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলে। যদিও এই নৃত্যে প্রদর্শিত বাঘের আচরণগত সকল ভঙ্গি পূর্বনির্ধারিত, নির্দিষ্ট এবং নির্বাচিত। তথাপিও যন্ত্রীদের প্রদর্শিত সুর, ছন্দের সাথে কুশীলবের সবল ও বলিষ্ঠ দেহ-ভঙ্গির ক্রমাগত নির্মাণ, বিনির্মাণ ও প্রদর্শনে যে সকল বাঘরূপ-দেহশৈলী নির্মিত হয় তা স্পষ্টতই কুশীলবের শরীরে 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা'কে প্রতিষ্ঠিত করে। কার্যত মংমং মারমা সামজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত 'বাঘ' বিষয়ক 'ধারণা'কে (যেমন– বাঘ হিংস্র, ক্ষিপ্র, আয়েশি ইত্যাদি) 'অনুকরণ' অভিজ্ঞতায় গ্রহণ করে নির্বাচিত কিছু আচরণ, ভঙ্গি ও ছন্দকে শারীরিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেন। এভাবেই *বাঘনৃত্যে* কুশীলব তাঁর দেহ-শৈলীতে/ভাষায় বাঘের অঙ্গ-ভঙ্গি, আচার-আচরণের ছন্দময় অভিব্যক্তি প্রকাশের সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে শরীর-ক্যানভাসের বিচিত্র সব সুরেলা ভঙ্গির নির্মাণ-বিনির্মাণের সক্ষমতা এবং নমনিয়তার ধারণাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে।

১১. অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ : *মণিপুরী* জাতি-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী *রাসনৃত্যের* নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং এর প্রায়োগিক কৌশল বিশ্লেষণসূত্রে দেখা যায় যে, এই নৃত্যের ঘূর্ণন, স্পাইরাল বা সর্পিল মুভমেন্ট, ফিগার এইট মোশনসহ সকল নান্দনিক নৃত্যভঙ্গি রূপায়ণের মূলে সক্রিয় থাকে কুশীলবের দেহস্থিত শৌর্যের এক অবিরাম প্রবাহ (বিস্তারিত ২য় অধ্যায়ে)। অর্থাৎ দেহস্থিত শৌর্যের (লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের) সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাসে সৃষ্ট কতিপয় বিমূর্ত প্যাটার্ন বা মডেলই কার্যত শিল্পীর পবিত্র ভাব-দেহে অর্থপূর্ণ শিল্পভাষায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে দেহে মূর্ত হওয়া নৃত্যভঙ্গির গভীরে সক্রিয় থাকা স্নায়বিক এবং পেশিগত শৌর্যের সমন্বিত স্বতঃস্ফূর্ততা, গতিময় চঞ্চলতা এবং সক্রিয়তাকেই কৌশলগত বিশ্লেষণে দেহের *অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডব* রূপে চিহ্নিত করা হয়। তবে এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেহশৌর্যের দুটি রূপ 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব'-এর প্রথাগত ব্যাখ্যা এবং এর কৌশলগত প্রয়োগ *রাসনৃত্যে*

সম্পূর্ণত কার্যকর হয় না। বরং 'লাস্য এবং লাস্যময় তাণ্ডব' রূপে সক্রিয় শৌর্যের বিশেষ এবং সচেতন চিন্তাপ্রসূত বিন্যাসের কারণেই *রাসনৃত্যের* ভঙ্গি, চলন, সঞ্চালন, প্যাটার্ন অথবা মুদ্রাগুলো ধ্রুপদী নৃত্য পরিবারে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। ফলে মণিপুরী নৃত্যের *অন্তঃপ্রবাহ*–শৌর্যের বিমূর্ত মডেল নির্মাণের বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয় যে– কুশীলবের/নৃত্যশিল্পীর দেহের ভাষায় অঙ্কিত/রচিত/মূর্ত হওয়া ভঙ্গি, চলন বা প্যাটার্ন ঠিক ততটুকুই বিশেষ, সুনির্দিষ্ট অথবা *জ্যামিতিক বিমূর্ত* হতে সক্ষম হয়, ঠিক যতটুকু বিশেষ অথবা সুনির্দিষ্ট হতে সক্ষম হয় নৃত্যশিল্পীর আন্তর-দেহে শৌর্যের বিন্যাস বা প্যাটার্ন/*মডেল*-এর রূপায়ণ। এক্ষেত্রে মণিপুরী নৃত্যের অন্তঃপ্রবাহ– শৌর্যের *মডেলসমূহ* কখনো কৃষ্ণভাব ও ভক্তিতে ভূমি-অনুবর্তী সমর্পিত/নিবেদিত শরীরে, কখনো পেঁচিয়ে থাকা ঘূর্ণয়মান সর্পিল ভঙ্গিমায় আবার কখনো *চালি* বা *চালি অরৈবীর* চলন, উল্লম্ফন অথবা ঘূর্ণনে মূর্ত হয়ে ওঠে। শৌর্যের প্যাটার্ন বা মডেল নির্মাণের কৌশলগত এবং প্রায়োগিক গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সম্ভাবনা বিবেচনায় অতঃপর রাসনৃত্যের *অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ*-এর বিষয়টিকে একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া হিসেবে অভিনেতার মনো-দৈহিক ও দৈহিক প্রস্তুতির অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১২. বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি : মণিপুরী *রাসনৃত্যের* কৌশলগত বিশ্লেষণ থেকে অপর একটি বৈশিষ্ট্য– *বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গিটির* ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বস্তুত এটি *রাসনৃত্যের* ভঙ্গি, চলন ও সঞ্চালনের কৌশলগত একটি বৈশিষ্ট্য। ভূমি অনুবর্তী হালকা বেন্ট ও বক্র হাঁটু নির্ভর দুই পায়ে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে টো বা অগ্রতলায় সঞ্চলন কিভাবে রাসনৃত্যে কুশীলবের ভঙ্গিগত চলন ও সঞ্চালনে গতি-বৈচিত্র্য ও নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা তৈরি করে তার কৌশলগত দিক নির্ণয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্র হাঁটুতে টো নির্ভর অবস্থান ও সঞ্চলন ব্যক্তির শরীরে খোলা, উন্মুক্ত, নমনীয়, হালকা এবং অভিমুখীন হওয়ার ধারণা বা উপলব্ধিকে সহজ করে তোলে এবং দেহে বহুমুখী গতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অপরদিকে বক্র হাঁটু মানবদেহের স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র এবং ভারসাম্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায়। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শ্রোণীচক্র (pelvis) হাঁটুর অবস্থান সহ দেহের ভঙ্গিগত বিন্যাস ও গতির সাথে স্নায়বিক ও পেশি শৌর্যের মধ্যে কৌশলগত এক মহা 'সমন্বয়' সৃষ্টি করে। এই 'সমন্বয়ের' মাধ্যমেই অতঃপর দেহের চলমান গতির সাথে পরিবর্তিত ভরকেন্দ্র ও ভারসাম্যের মধ্যে একটি সার্বক্ষণিক সচল-স্থিতি বজায় রাখা সম্ভব হয়। 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গির' নির্ণীত উক্ত কৌশলগত দিকগুলিই কার্যত *রাসনৃত্যের* ভূমি-অনুবর্তী সমর্পিত দেহভঙ্গিমা, মৌল দেহাবস্থান, চলন ও সঞ্চালন, চালি-সংযুক্ত বিভিন্ন ভঙ্গির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। অতঃপর এই প্রায়োগিক কৌশলের সাথে দেহস্থিত শৌর্য এবং ভাব-রসের সমন্বয়ে কুশীলবের দেহের ভাষায় মূর্ত হয় *রাসের* ধ্রুপদী নৃত্য শৈলী। 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গির' গুরুত্ব ও তাৎপর্য

বিবেচনায় এই বৈশিষ্ট্যটিকে অতঃপর দেহের সচল-স্থিতি, গতি, ভর ও ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চলন অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১৩. ভাব-দেহের মূর্তকরণ– 'ভাব' হচ্ছে মণিপুরী *নটপালার* সেই প্রাণশক্তি যা আসর থেকে আসরে ভক্ত মাঝে ছড়িয়ে দেয় কৃষ্ণ-ভক্তির রসধারা। তবে কুশীলবগণ যে কেবলই কৃষ্ণ-ভক্তির রসধারায় অবগাহন করে অনিয়ন্ত্রিত ভাব-স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন বিষয়টি তাও নয়, বরং শাস্ত্রীয় রাগ, তাল, সুর, ছন্দ এবং দেহের শৈলীবদ্ধ চলন, সঞ্চলন ও ভঙ্গির বন্ধনে ঐ ভাব-স্রোতকে করেন নিয়ন্ত্রিত, নিবেদিত সর্বোপরি শিল্পিত (বিস্তারিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে)।

নটপালায় কুশীলবের নিয়ন্ত্রিত ও নিবেদিত ভাব প্রকাশের প্রায়োগিক কৌশল ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণপূর্বক 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। *নটপালা* পরিবেশনারীতির নির্ধারিত শাস্ত্রীয়-ক্রমের একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে 'রাগ-আলাপে মূর্তি স্থাপন করা'। রাগ-আলাপে মূর্তি স্থাপনের বিষয়টি প্রতীকী এবং এর মৌল ভিত্তি ভাব অথবা এটিকে ভাব দ্বারা সঞ্চালিত একটি প্রক্রিয়াও বলা যায়। এই প্রক্রিয়াসূত্রেই দেবতা ব্রহ্মা– বিষ্ণু– কৃষ্ণ– গৌরাঙ্গের বিমূর্তরূপ মর্তে মানবের 'ভাব-দেহে' মূর্ত হয় বা প্রতীকায়িত হয়। প্রক্রিয়াটিকে একদিকে যেমন প্রকৃতি ও পরমের প্রতীকী মিলন রূপে ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভক্ত/বিশ্বাসীগণ দৃশ্যমান ও জাগতিক বাস্তবতার বাইরের পরম ও পবিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে থাকেন। অপরদিকে *কৃষ্ণের অবয়ব* গঠনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে কৃষ্ণের কল্পিত ভাব-আকৃতি বা ভাব-দেহকেই গায়েন তাঁর দেহের ভাষায় কোমল ছন্দে ভক্তি-ভাবে মূর্ত করে তোলেন। কিন্তু অবয়ব গঠনের এই প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, কৌশলগতভাবে রাধা-কৃষ্ণকে সুস্পষ্ট কোনো আকারে রূপায়িত করে না। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় গায়েন সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কোনো শারীরিক ভঙ্গি, আচার-আচরণ, চলন-সঞ্চলনের মাধ্যমে (শারীরিক চরিত্রায়ণ) রাধা-কৃষ্ণকে (নারী ও পুরুষ/প্রেমিক-প্রেমিকা) নির্মাণ করেন না। এমনকি গায়েনের বাহ্যিক আচরণে, কণ্ঠের ধ্বনিগত অলংকরণে অথবা শৌর্যের (লাস্য ও তাণ্ডব) বিন্যাস ও প্রকাশে রাধা ও কৃষ্ণ পৃথক ও ভিন্ন দুটি চরিত্রের দেহ-অবয়বে প্রদর্শিত হয় না। বরং রাগ, তাল এবং গীত-ছন্দের দোলায় গায়েনের শরীরে এমন একটি 'ভাব-দেহ' মূর্ত হয় যার ফলে রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়ে অভিন্ন, অদ্বৈত, অভেদাত্মক রূপে বিনির্মিত/প্রদর্শিত হয়। সামগ্রিকভাবে মূর্তি নির্মাণের এই প্রক্রিয়াটি গায়েনের শরীরে দৈনন্দিন-অতিরিক্ত এমন এক ভাবোদ্দীপক 'ব্যক্তিত্ব' আরোপ করে, যেটি সহজেই দর্শক/ভক্তদের মাঝে মহা-পবিত্রতম ও পূজনীয় ব্যক্তিত্বরূপে (রাধা ও কৃষ্ণ পৃথক দুটি চরিত্র হিসেবে নয়) গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ফলে *নটপালার* আসরে প্রদর্শিত 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' বা ভাবের কল্পিত রূপায়ণ প্রক্রিয়াটি কুশীলব/ অভিনেতা/ গায়েনের দক্ষতা ও সক্ষমতায় সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। কেননা এটি কুশীলবকে দৈনন্দিন-অতিরিক্ত নৃত্যধর্মী সক্ষমতায় পূর্ণ (ড্যান্সিং কোয়ালিটি) একটি কাব্যময় দেহাবয়ব নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং কুশীলবকে বস্তুবাদী যুক্তি ও

কার্যকারণের বিপরীতে ভাব, ভক্তি ও বিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কৌশলগতভাবে যা সম্পূর্ণতই কুশীলবের (গায়েনের) ব্যক্তিগত দক্ষতা, সক্ষমতা এবং শিল্প-রুচি ও জ্ঞান সাপেক্ষ একটি ব্যাপার হয়ে ওঠে। তাছাড়া *নটপালার* বিশ্লেষণে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রক্রিয়াটি এক বা একাধিক চরিত্রকে শরীরের ভঙ্গি/ভাষায় সুনির্দিষ্ট 'ব্যক্তিত্বরূপে' প্রদর্শনের (চরিত্রায়ণের) প্রচলিত অভিজ্ঞতার বিপরীতে কুশীলবকে দেহের কাব্যময় সুরেলা ভাষা, সুর ও ছন্দের আশ্রয়ে চরিত্রের ভাব-দেহের প্রদর্শনে সক্রিয় করে তোলে। উপরোক্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় অতঃপর 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' প্রক্রিয়াটিকে গায়েন/কুশীলব/অভিনেতার বর্ণনাত্মক অভিনয়ের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর একটি অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১৪. গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা : মণিপুরী সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে *থাঙ তা* খেলা। মার্শাল আর্টধর্মী এই খেলায় প্রদর্শিত সকল প্রকার কসরৎ বেশ কিছু নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়, যার মধ্যে *খংচাৎ চাৎপা* অথবা *চার অক্ষরের কাটা* কসরৎটির তাৎপর্য বিবেচনায় এটিকে অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয় (বিস্তারিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। *থাঙ তা* খেলার এই কসরৎ-এর মাধ্যমে দেহের চলনে যে সকল গতি প্রদর্শিত/নির্মিত হয় এবং এই গতি অনুবর্তী হাতের আঘাত ও প্রত্যাঘাতে যে সকল ঘূর্ণন প্রদর্শিত হয় তাতে স্পাইরাল বা সর্পিল অনুরূপ গতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্পিল গতির এই চলন যেমন পদ-ক্ষেপণের মাধ্যমে ভূমিতে বিমূর্ত নক্সা রচনা করে তেমনি তলোয়ার হাতে ঘূর্ণনযুক্ত নানাবিধ কসরৎ বাতাসে সর্পিল গতি তৈরি করে। বস্তুত *থাঙ তা* খেলার এই মার্শাল আর্ট অংশের দেহের চলন *স্পাইরাল* বা সর্পিল গতি দ্বারা বিন্যস্ত হওয়ায় তা প্রতিপক্ষকে সামনে ও পিছন থেকে আঘাত, প্রত্যাঘাত এবং প্রতিরোধের কৌশল প্রদর্শনের কাজটিকে সহজ ও সাবলীল করে তোলে। এছাড়াও *থাঙ তা* মুভমেন্টে আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যেমন– বক্র হাঁটুতে মুভমেন্ট বা চলন অথবা স্টেপের কারণে শৌর্য নিম্নমুখী প্রবণতায় বিন্যস্ত বা ব্যবহৃত হয়, যা দেহের স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে মুভমেন্টের প্রণোদনা বা উৎস হিসেবে সক্রিয় হয়। ফলে একদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে দেহের অবস্থান, অপরদিকে গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন– শৌর্য এবং গতি এই দুয়ের সমন্বিত প্রয়োগ শেষাবধি খেলোয়াড়/কুশীলবের নির্ধারিত মুভমেন্টকে হালকা, নিয়ন্ত্রিত, নিপুণ শৈলী-সাপেক্ষ করে তোলে। সর্বোপরি দেহের গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণের মাধ্যমে কুশীলবের দেহের নমনীয়তা, ত্বরিত-সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা এবং বহুমুখী গতির ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। তাই কুশীলবের শরীরে বহুমুখী গতি, চলন ও নিয়ন্ত্রণের কৌশলগত সক্ষমতা ও গুণাবলীর বিবেচনায় 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা' বিষয়টিকে অভিনেতার অনুশীলন উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১৫. কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা : এই বৈশিষ্ট্যটি *থাঙ তা* খেলায় কুশীলবের ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীলতাকে এক সীমাহীন সম্ভাবনা এবং কৌশলগত সক্ষমতায় সম্পৃক্ত করে। বস্তুত *থাঙ তা* খেলায়

এটি একটি বিশেষ কৌশল, যেখানে কুশীলবকে বিশেষ পদ্ধতিতে চোখ বন্ধ রেখে নির্দিষ্ট কোনো একটি বস্তুতে (চোখ বন্ধ করে প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা নির্বাপণ করা) সুনিপুণ দক্ষতায় সফলভাবে আঘাত করতে হয় (বিস্তারিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। ফলে কৌশলটির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এতে 'হাতের তাল' (লয়, গতি ও ঘূর্ণন) এবং 'মনের পজিশন' (আন্দাজ)-এর মধ্যে এক নিগূঢ় নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কের বন্ধন সূচিত হয়, যা কুশীলবকে সম্পূর্ণতই একটি মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতার সীমাহীন সক্ষমতার ধারণার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান 'চোখ' সাময়িকভাবে অকার্যকর থাকে সেহেতু এই খেলায় শরীর ও মনকে কেন্দ্রস্থিতকরণের ধারণা, লক্ষ্য-স্থিরগত ধারণা, পরিমাপের ধারণা, স্থানিক ধারণা, দেহের অবস্থান বা পজিশনগত ধারণা, সময়, ছন্দ ও লয়গত ধারণা প্রভৃতি বিষয়গুলো অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের– বিশেষত 'শ্রবণ'-ইন্দ্রিয়ের দৈনন্দিন অতিরিক্ত সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে *থাঙ তা* খেলার এই পুরো বিষয়টিতে মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতায় সৃষ্ট 'তৃতীয় নয়ন' বা 'অন্তরদৃষ্টি' ক্রিয়াশীল হয় এবং এই 'অন্তরদৃষ্টি' সূত্রেই অতঃপর সম্পাদিত হয় খেলার অংশ হিসেবে প্রজ্বলিত একটি মোমবাতির শিখা নির্বাপণ কসরৎ। বস্তুত এ হচ্ছে সেই 'তৃতীয় নয়ন' বা 'অন্তরদৃষ্টি' যা দেহের অন্তরস্থ গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন 'মনোযোগকে' সক্রিয় করে কুশীলবের ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীল সক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে। কেননা অনুশীলনটিতে 'অন্তরদৃষ্টি' বা 'তৃতীয় নয়ন' হিসেবে দুই ভ্রু'র মাঝখানে এবং কিছুটা ওপরে *মনোযোগের* কেন্দ্রবিন্দুর সাথে শরীরের একাধিক অঙ্গ বা অংশের সাথে যুক্ত করা হয় এবং এর মাধ্যমে কেন্দ্রস্থিতকরণের ধারণা, লক্ষ্য-স্থিরগত ধারণা, পরিমাপের ধারণা, স্থানিক ধারণা, দেহের অবস্থান বা পজিশনগত ধারণা, সময়, ছন্দ ও লয়গত ধারণাকে সমন্বয় করে কসরৎটিকে (চোখ বন্ধ করে প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা নির্বাপণ করা) সাবলীলতায় সম্ভব করে তোলে। তাই অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে দেহের অন্তরস্থ গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন 'মনোযোগকে' সক্রিয় করে কুশীলবের ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীল সক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করার কৌশল হিসেবে *থাঙ তা* খেলার 'কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা' বৈশিষ্ট্যটিকে অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১৬. রে-রে প্রক্রিয়া : গারো জাতি-সংস্কৃতির অন্তর্গত মৌখিক ধারায় বিকশিত তাৎক্ষণিক সংলাপ নির্ভর গীত-প্রধান পরিবেশনা *রে-রে* থেকে 'রে-রে প্রক্রিয়া' গ্রহণ করা হয়। বস্তুত মৌখিক পরম্পরায় বিকশিত 'নির্দিষ্ট' একটি কাঠামো এবং উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণে 'তাৎক্ষণিক' সৃষ্ট অভিব্যক্তি এই দুটি বিপরীতধর্মী গুণগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত প্রক্রিয়ার ফলাফল হচ্ছে *রে-রে* (বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায়ে)। এক্ষেত্রে মৌখিক পরম্পরায় সৃষ্ট 'নির্দিষ্ট' কাঠামো বলতে *রে-রে* সুর-কাঠামোকে বোঝানো হয়েছে, যেটি পরম্পরাগতভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত বিশেষ এক ধরনের সুর। অপরদিকে 'তাৎক্ষণিক' অভিব্যক্তি হচ্ছে আসরে উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণে মুখে মুখে রচিত সংলাপ– কথামালা বা লিপি/নাটলিপি অথবা একটি এজেন্ডা বা বিষয় এবং এর অন্তর্নিহিত ভাব-আবেগের প্রকাশ। অর্থাৎ বিশেষ ধরনের একটি সুর-কাঠামোয় অবিচল থেকে

তাৎক্ষণিক সৃষ্ট কথামালা বা সংলাপাত্মক গীতের মাধ্যমে ব্যক্তির বিপরীতে ব্যক্তি অথবা দলের বিপরীতে দলের মধ্যে ভাব-আবেগ বিনিময়ের ক্রমাগত প্রয়াস ও প্রচেষ্টাতেই পূর্ণতা পায় *রে-রে* আসরের কাঙ্ক্ষিত এজেন্ডা বা বিষয়। যেহেতু এর সংলাপ রচিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে তাই এ প্রক্রিয়াটি কার্যত ব্যক্তির জ্ঞান ও সৃজনশীল সক্ষমতা নির্ভর একটি শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। ফলে ব্যক্তির/দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তাৎক্ষণিকভাবে সৃজনশীল চিন্তার প্রকাশ ও প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি বিষয় বা এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেই নিহিত রয়েছে *রে-রে* প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

রে-রের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিবেচনায় এই গীতটিকে কেবল একটি জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা-রীতি হিসেবে না দেখে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অর্থাৎ '*রে-রে প্রক্রিয়া*' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্লেষণসূত্রে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, জাতি-সংস্কৃতির গভীর থেকে উদ্ভাবিত এই প্রক্রিয়াটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের গারো কিশোর-তরুণ-তরুণী থেকে প্রবীণ-প্রবীণার মনোদেহে সুর, ছন্দ, তাল লয়ের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতাকে সচল রেখেছে যুগ যুগ ধরে। কেননা প্রক্রিয়াটি *রে-রে* কুশীলবের সুর ও ছন্দ, সৃজনশীল চিন্তা এবং তাৎক্ষণিকভাবে ভাষার/ছন্দের সৃজন এই তিনটি গুণাবলীর সমন্বিত দক্ষতাকে ক্রমান্বয়ে সম্ভব করে তোলে। এটি সম্ভব হয় কারণ জাতিগতভাবে দীর্ঘ চর্চায় 'নির্দিষ্ট' একটি সরল এবং *স্থায়ী* সুরের পুনঃপুন আবর্তনমূলক পরিবেশনা শর্তহীনভাবে অন্যদেরকে (দর্শক/অংশগ্রহণকারী) সুরের আবর্তনের সাথে যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানায় বা যুক্ত হতে উৎসাহিত করে। ফলে স্নায়বিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাপমুক্ত থেকে যেকোনো নবাগত গারো সদস্যের পক্ষেও *রে-রে* দলের সাথে যুক্ত হয়ে প্রদত্ত সুর-কাঠামোর সাথে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন এবং *রে-রে* আসরে বিনির্মিত শিল্পরূপ, রস ও ভাবাবেগের সাথে ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার আশ্রয়ে কথামালা রচনায় সচেষ্ট হতে পারে। আর এভাবেই *রে-রের* সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে সমষ্টিগতভাবেই গারো সদস্যগণ সুর, ছন্দ ও তাৎক্ষণিক সৃজনশীল ভাষা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির প্রকাশে পূর্ণাঙ্গ, পবিত্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হন। সুতরাং কুশীলবের সুর ও ছন্দ, সৃজনশীল চিন্তা এবং তাৎক্ষণিক সংলাপ/ছন্দ সৃজনের কৌশলগত গুণাবলীর উপস্থিতি বিবেচনায় *রে-রে প্রক্রিয়াকে* অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১৭. সাম্বিল প্রক্রিয়া : গারো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত বিশেষ ধরনের একটি নৃত্য *সাম্বিল মিসারা* থেকে 'সাম্বিল প্রক্রিয়া'র ধারণাটিকে গ্রহণ করা হয়। পাহাড়ি বুনো সাম্বিল ফল- কে বিশেষ পদ্ধতিতে কোমরে বেঁধে ফলটির ঘূর্ণনসহ নৃত্যের প্রদর্শন করা হয় বলে নৃত্যটি *সাম্বিল মিসারা* নামে পরিচিতি পায় (বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায়ে)। *সাম্বিল মিসারার* বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ছন্দ-ভিত্তিক তিনটি বিশেষ গুণ এই নৃত্যের প্রাণবন্ত প্রদর্শনীর মূলে ক্রিয়াশীল। গুণ তিনটি হচ্ছে– এক. বিশেষ দক্ষতায় কোমরের ঘূর্ণন (ডান থেকে বাম

ক্রমানুসারে) ছন্দে লেজের (কোমরে বাঁধা রশির মাথায় ফলটি ঝুলানো থাকে, দেখে লেজ সদৃশ মনে হয়) ঘূর্ণন গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। দুই. কোমর ঘূর্ণনের গতি, ছন্দ, তাল লয় ও আবর্তনের সাথে দেহের নানাবিধ ভঙ্গি, চলন, উল্লম্ফন সংযুক্ত করা। এবং তিন. কোমরের ঘূর্ণন ছন্দের সাথে যুক্ত করা ভঙ্গি, চলন, উল্লম্ফনগুলোকে বাদ্যযন্ত্রের নির্দিষ্ট তাল ও মাত্রার সাথে সমন্বয় করে নৃত্যে রূপান্তর করা। মূলত এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে *সাম্বিল মিসারা* নৃত্যটি হয়ে ওঠে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত। এই তিনটি গুণ শরীর নির্ভর হওয়ায় কার্যত 'সাম্বিল প্রক্রিয়াটি'ও কুশীলবের শরীরের বহুমাত্রিক ছন্দ, গতি, এবং কোমরের বিশেষ ঘূর্ণন সক্ষমতাকে সম্ভব করে তোলে। আর এই বিবেচনা থেকেই *সাম্বিল মিসারা* নৃত্যকে একটি 'প্রক্রিয়া' হিসেবে অর্থাৎ 'সাম্বিল প্রক্রিয়া' হিসেবে অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৪.২ : তুলনামূলক পর্যালোচনা

দর্শকের সম্মুখে আমরা ওস্তাদি/দক্ষতা (skill) প্রদর্শন করি না, প্রদর্শন করি পরম ভক্তি (holy devotion)। দক্ষতা হচ্ছে অন্তর্গত প্রণোদনা (Impulse) যা আমাকে রূপান্তরে সহায়তা করে। তাই আমাদের কাছে দর্শক/ভক্তকূল হচ্ছে পবিত্র অংশীদার।

– গায়েন রাশকান্ত সিংহ, ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের তিনটি জাতি-সংস্কৃতির অন্তর্গত ১২টি পরিবেশনার বিশদ বিশ্লেষণ থেকে সর্বমোট ১৭টি অনুশীলন উপাদান নির্বাচন করা হয়। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে মারমা, মণিপুরী এবং গারো জাতিতাত্ত্বিক ১২টি পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য, প্রক্রিয়া ও কৌশলগত দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ১৭টি অনুশীলন উপাদান নির্বাচন পরবর্তী এদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য যাচাই করা হয়। তথাপিও বর্তমান অধ্যায়ের 'পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণ' শীর্ষক আলোচনার প্রারম্ভে আলোচিত এই ১৭টি অনুশীলন উপাদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রধান দিকগুলো পুনরায় উল্লেখ করা হয়।

১২টি পরিবেশনার মাঠ পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিশ্লেষণসূত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য, প্রক্রিয়া এবং প্রায়োগিক কৌশল দেহ ও মন তথা মনো-দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, কল্পনা ও মনোযোগে, ভাব-আবেগের নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগ প্রকাশে, শরীরের শৌর্য, ছন্দ, লয়গত ধারণায়, নৃত্যধর্মী সক্ষমতায়, দমের কার্যকারিতায়, ক্রিয়ায় নিমগ্ন/ধ্যানস্ত থাকায়, তাৎক্ষণিক সৃজন, উদ্ভাবন ও অভিব্যক্তির প্রকাশে, সুর-ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশেষ কার্যকর উপাদান হিসেবে প্রতীয়মান হয়, বস্তুত সেই বিষয়গুলোকেই অনুশীলন উপাদান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তবে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে হোক অথবা প্রায়োগিক কৌশল বা প্রক্রিয়াগত কারণেই হোক নির্বাচিত ১৭টি অনুশীলন উপাদানের মধ্যে বেশ কয়েকটিতে প্রভূত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার বৈশিষ্ট্যগত কারণেই বেশ কিছু উপাদান কুশীলবের মনো-দেহ, কল্পনা, মনোযোগকে নানান সম্ভাবনায় সক্রিয় করে তোলে। এ পর্যায়ে নির্বাচিত ১৭ উপাদানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলোকে নির্দেশ ধরে উপাদান অন্তর্গত সাধারণ বৈশিষ্ট্য, কৌশল, কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনার নিরিখে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

প্রায়োগিক কৌশল এবং প্রক্রিয়াগত দিক থেকে গারোদের *সাম্বিল মিসারা* নৃত্যের 'সাম্বিল প্রক্রিয়া', মারমাদের *থালা নৃত্যের* 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া' এবং মণিপুরীদের *থাঙ তা* খেলার 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা' এই তিনটি উপাদানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এগুলো কুশীলবের দেহে ঘূর্ণন বা ঘূর্ণন কৌশলকে কার্যকর করে তোলে। *সাম্বিল মিসারা* যেমন কুশীলবের কোমরের ঘূর্ণন কৌশলে কার্যকর হয়, তেমনি *থালা নৃত্যে* ঘূর্ণন কৌশল কার্যকর হয় দুই হাত এবং বাহুতে। অন্যদিকে *থাঙ তা* খেলায় কুশীলবের হাত এবং পা

পেঁচানো/স্পাইরাল বা সর্পিলময় নানাবিধ ঘূর্ণন ও গতিময় প্যাটার্নকে যুক্ত করে। ফলে তিনটি উপাদানেরই প্রায়োগিক এবং কৌশলগত উপযোগিতা কুশীলবের দেহের গতি ও ছন্দের ঘূর্ণন সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু এই তিনটি উপাদানের মধ্যে 'সাম্বিল প্রক্রিয়া' ও 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া' উপাদান দুটির মধ্যে গুণগত মিল বা সখ্য অন্যটির তুলনায় অধিক। যদিও 'সাম্বিল প্রক্রিয়া' কোমরের ঘূর্ণনকে কার্যকর করে এবং 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া' করে হাত ও বাহুকে, তথাপিও উভয় উপাদানই মুখ্যত দৈহিক অর্থাৎ দেহে গতি, লয়, ও ছন্দের ঘূর্ণন সক্ষমতাকেই নিশ্চিত করে। কিন্তু 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা' উপাদানটি দেহের গতি, লয় ও ছন্দের সাথে কুশীলবের মনো-দেহকেও সম্পৃক্ত করে। প্রথম দুটি উপাদানে কুশীলবের মনোযোগের বৃত্ত কেন্দ্রস্থিত হয় যথাক্রমে কোমর এবং হাতের ঘূর্ণন শৈলীতে। এই ঘূর্ণন প্রদর্শন প্রক্রিয়ায় কুশীলবকে দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্যমান কোনো প্রতিপক্ষের ওপর কেন্দ্রস্থিত বিশেষ মনোযোগ আরোপের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ করা' উপাদানের ক্ষেত্রে কুশীলবকে সার্বক্ষণিকভাবে এক/একাধিক প্রতিপক্ষকে (দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান) বিবেচনায় রেখেই হাত ও পায়ের গতি, ছন্দ এবং ঘূর্ণনে নানাবিধ কৌশল/প্যাটার্ন (স্পাইরাল/সর্পিল) নির্মাণ করতে হয়। আর এই ক্ষেত্রে কুশীলবের মনোযোগের কেন্দ্রটি প্রত্যক্ষ্যভাবে দেহের বিশেষ কোনো একটি বা একাধিক অঙ্গের ওপর আরোপিত না থেকে দেহের বাইরে অন্যকোথাও বা দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্যমান কোনো প্রতিপক্ষের ওপর নিবিষ্ট থাকে। ফলে গতি, ছন্দ ও ঘূর্ণনে সৃষ্ট নানাবিধ কৌশল/প্যাটার্ন (স্পাইরাল/সর্পিল) বা মুভমেন্ট কার্যত কুশীলবের মনো-দৈহিক সচেতনতায় সক্রিয় থাকে। যদিও তিনটি উপাদানই কুশীলবের শরীরের বহুমাত্রিক গতি, ছন্দ, এবং ঘূর্ণন সক্ষমতাকে সম্ভব করে তোলে, তথাপিও কৌশল ও কার্যকারিতার বিবেচনায় মণিপুরী *থাঙ* তা খেলার 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ' উপাদানটিকে অপর দুটি উপাদান থেকে পৃথক করা যায়। সুতরাং তিনটি উপাদানের মিল বা অ-মিল দৃষ্টে 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণকে' পৃথক অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এবং গারো নৃত্যের 'সাম্বিল প্রক্রিয়া' ও মারমা নৃত্যের 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া' উপাদান দুটির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য, কৌশল এবং প্রক্রিয়াসমূহকে একটি অনুশীলন উপাদান– 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া'তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

মারমা *জ্যা* নৃত্যের 'হালকা বক্র হাঁটু' ও 'টরসো' এবং মণিপুরী *রাসনৃত্যের* 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি' এই তিনটি উপাদানের প্রায়োগিক ও কৌশলগত প্রক্রিয়া দেহের বহুমুখী চলন ও ভঙ্গিগত বিন্যাস সক্ষমতায় ক্রিয়াশীল হয়। অর্থাৎ তিনটি উপাদানেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো কুশীলবের দেহে ভঙ্গি, চলন, সঞ্চালন, গতি, ছন্দ এবং এর নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতাকে নিশ্চিত করে। 'টরসো' যেমন শরীরের উল্লম্ব রেখাকে ভেঙে বা উল্লম্ব রেখা থেকে বের হয়ে এসে বিশেষ কোনো ভঙ্গি বা শৈলী প্রদর্শনের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে, তেমনি 'হালকা বক্র হাঁটু' কুশীলবের দেহের দৈনন্দিন ভর ও ভারসাম্যকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে

এবং বক্র হাঁটুযুক্ত পায়ে বহুমুখী চলন ও সঞ্চালন সক্ষমতা এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি'তে ব্যক্তির শরীরে খোলা, উন্মুক্ত, নমনীয়, হালকা এবং অভিমুখীন হওয়ার ধারণা বা উপলব্ধিকে সহজ করে তোলে এবং দেহে বহুমুখী গতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। আবার তিনটি উপাদানই কৌশলগতভাবে কুশীলবকে ঝুঁকিপূর্ণ বা বিকল্প ভরকেন্দ্র ও ভারসাম্যের সাথে যুক্ত করে এবং এর সমাধানে সক্রিয় করে তোলে। ফলে তিনটি অনুশীলন উপাদানেরই প্রায়োগিক কৌশল কার্যত দেহের ভঙ্গি চলন, সঞ্চালন, গতি, ছন্দ, ভর, ভারসাম্য এবং এর নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। সুতরাং 'হালকা বক্র হাঁটু', 'টরসো' এবং 'বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চালন নির্ভর দেহভঙ্গি' এই তিনটি উপাদানের প্রায়োগিক কৌশল, কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনায় প্রভূত সাদৃশ্য বিবেচনায় 'বক্র হাঁটু ও বহুমুখী সঞ্চলন প্রক্রিয়া' নামে একটি অনুশীলনী কাঠামোর অধীনেই পৃথক তিনটি উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ আলোচিত তিনটি অনুশীলন উপাদানের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য, প্রক্রিয়া, গুণাবলী সন্নিবেশ করে এবং প্রায়োগিক কৌশল অক্ষুণ্ন রেখেই 'বক্র হাঁটু ও বহুমুখী সঞ্চলন প্রক্রিয়া' অনুশীলন উপাদানটিকে কার্যকর করা সম্ভব।

শৌর্যের প্রয়োগ, বিন্যাস ও কার্যকারিতা এবং অনুশীলনের গুণগত তাৎপর্য বিচারে মারমা *জ্যা* নৃত্যের 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' এবং মণিপুরী *রাসনৃত্যের* 'অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ'– উপাদান দুটি বিশেষ কোনো পার্থক্য নির্দেশ করে না। বরং দুটি উপাদানেই শৌর্যের দুটি রূপ লাস্য এবং তাণ্ডব-এর প্রচলিত ও প্রথাগত প্রয়োগের বিপরীতে *লাস্যময়-তাণ্ডব* রূপের বিশেষ একরকম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। *জ্যা* এবং *রাসনৃত্যের* বিশ্লেষণসূত্রে প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে, উভয় নৃত্যে দেহের ভাষা ও ভঙ্গি প্রদর্শনে যে সকল বিশিষ্ট শৈলী বা রূপ লাভ করে এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' শৌর্যের বিন্যাস এবং বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণের সক্ষমতা। *জ্যা* নৃত্যে কুশীলবের লীলা চঞ্চলা, মধুর, কোমল ও বলিষ্ঠ দেহশৈলী প্রদর্শনের মূলে সক্রিয়রূপে যাকে 'অন্তর্নিহিত শক্তি-স্রোত' হিসেবে ব্যাখ্যা/চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটাই হচ্ছে *রাসনৃত্যে* কুশীলবের 'অন্তঃপ্রবাহ' যা *নৃত্যের* ঘূর্ণন, স্পাইরাল বা সর্পিল মুভমেন্ট, ফিগার এইট মোশনসহ বিভিন্ন নান্দনিক দেহভঙ্গি ও শৈলী রূপায়ণে কার্যকর হয়। শৌর্যের এই বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রায়োগিক রূপটিকেই বস্তুত 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' নামকরণে (মারমা *জ্যা* নৃত্যে 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' এবং মণিপুরী *রাসনৃত্যে* 'অন্তঃপ্রবাহ– লাস্য এবং লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ') পৃথক দুটি অনুশীলন উপাদান হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কৌশলগত দিক থেকে দুটি উপাদানই দেহের অন্তর্গত পেশিশক্তি ও স্নায়বিক শক্তির সমন্বিত প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হয়। কিন্তু শৌর্যের সক্রিয়তার বিষয়টি কুশীলবের ইচ্ছাশক্তি এবং কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। ফলে ইচ্ছাশক্তি এবং কল্পনার আশ্রয়ে শৌর্যের 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' রূপের *বিমূর্ত* প্যাটার্ন/মডেল নির্মাণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতেই কুশীলবের মনো-দৈহিক ভঙ্গিগত অভিজ্ঞতা শৈলীবদ্ধ ও প্রদর্শনমূলক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কুশীলবের দেহ অন্তর্গত 'শক্তি-স্রোত' বা 'অন্তঃপ্রবাহে'র

‘লাস্যময়-তাণ্ডব’ আশ্রিত প্যাটার্ন বা মডেল নির্মাণ ও বিনির্মাণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে কার্যকর হয় *জ্যা* ও *রাসনৃত্য* অন্তর্গত এই দুটি অনুশীলন উপাদান। সুতরাং দুটি উপাদানেরই প্রায়োগিক কৌশল ও কার্যকারিতা অভিন্ন এবং বলা যায়– যেখানেই রয়েছে কুশীলবের দেহের ভাষা, ভঙ্গি ও শৈলীগত বিশেষ কোনো রূপের প্রদর্শন, সেখানেই রয়েছে দেহের অন্তস্থ শৌর্যের বিমূর্ত প্যাটার্ন বা মডেল নির্মাণে মনের সচেতন প্রবহমানতা। উপাদান দুটির এইরূপ সাদৃশ্য বিবেচনায় ‘লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ’ এই একটি অনুশীলনী কাঠামোর অধীনেই *জ্যা* নৃত্যের ‘লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব’ উপাদানটিকে অন্তর্ভুক্ত করে উভয় অনুশীলন উপাদানের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য, কৌশলগত প্রক্রিয়া এবং গুণগত কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখা যেতে পারে।

মারমা *পাঙখুং* নাট্যের ‘বর্ণনাত্মক নৃত্য’ এবং *বাঘ নৃত্যের* ‘নৃত্যধর্মী সক্ষমতা’ অনুশীলন উপাদান দুটিই কুশীলবের শরীর ছন্দের নমনীয়তা এবং নৃত্যগুণ সক্ষমতায় কার্যকর হয়। *বাঘনৃত্যে* যেমন নৃত্যের প্রথাগত দক্ষতা অথবা প্রদর্শন-নৈপুণ্য অর্জনের বিপরীতে শরীরে বহুমুখী গতি ও ভঙ্গিগত নমনীয়তার গুণ এবং সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে কুশীলবকে তাৎক্ষণিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়ন্ত্রিত হতে সহায়তা করে। অপরদিকে প্রয়োগিক কৌশল ও প্রক্রিয়াগতভাবেই *পাঙখুং* নাট্যের ‘বর্ণনাত্মক নৃত্য’ দেহের সুরেলা ছন্দ ও ভাষায় আখ্যান অন্তর্গত বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা প্রদর্শনের সক্ষমতায় বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে ওঠে। ফলে উভয় অনুশীলন উপাদানই কুশীলবের মনের কল্পনাজাত সুর, ছন্দময় রূপকল্পকে দেহের সুর ও ছন্দময় ভাষায় রূপান্তরের/বর্ণনাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশের সক্ষমতা অর্জনে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। সুতরাং গুণগত সাদৃশ্যের বিচারে ‘বর্ণনাত্মক নৃত্য’ এবং ‘নৃত্যধর্মী সক্ষমতা’ দুটিকে পৃথক অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ না করে– ‘নৃত্যধর্মী সক্ষমতা’ অনুশীলনী কাঠামোর অধীনেই মারমা *পাঙখুং* নাট্যের ‘বর্ণনাত্মক নৃত্যের’ বৈশিষ্ট্য ও কৌশলগত প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব এবং স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেই অনুশীলনটিকে কার্যকর করা যেতে পারে।

মারমা জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির অন্তর্গত ইচ্ছা ‘ছায়া’, ‘চক্রামন’ এবং ‘দম’– এই তিনটি উপাদান ধ্যান ভিত্তিক এবং তিনটি উপাদানেরই গুণগত বৈশিষ্ট্য কুশীলবের মনোযোগের ওপর কার্যকর হয়। তবে এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রক্রিয়া এবং প্রায়োগিক কৌশলগত দিক থেকে তিনটি উপাদানই পৃথক ও স্বতন্ত্র। যেমন পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, ও বোঝাপড়ার সম্পর্কে ‘ইচ্ছা ছায়া’র ধ্যান প্রক্রিয়াটি কুশীলবের মনো-দেহের এবং বস্তুর গুণগত পরিবর্তনকে ‘সত্যমূলক’ বিশ্বাসে মেনে নিতে সহায়তা করে। আবার ‘চক্রামন’ ধ্যান প্রক্রিয়া কুশীলবকে স্থিরচিত্তে, নিবিষ্ট মনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের (ক্রিয়া সম্পাদনের) অভিজ্ঞতা প্রদান করে। অপরদিকে তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতির ‘দম’ চর্চা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতায় সৃষ্ট অস্থির/ বিক্ষিপ্ত মানসিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে *পবিত্র স্থিরতায়* মনকে কেন্দ্রস্থিত করতে সহায়তা করে। ফলে এই তিনটি অনুশীলন

উপাদান ধ্যান ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও কৌশল ও প্রক্রিয়াগত দিক থেকে প্রতিটি উপাদান কুশীলবের মনো-দেহে পৃথক এবং ভিন্ন কিছু গুণ আরোপ করে। সুতরাং অনুশীলনের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি উপাদানই পৃথক গুরুত্বে গ্রহণের দাবি রাখে।

মারমা জাতিতাত্ত্বিক নাট্য পাঙখুং অন্তর্গত 'পুণঃপুণ গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়ায়' *সুর*, ছন্দ ও তালের পুনঃপুন আবর্তনমূলক প্রদর্শনের মাধ্যমে কুশীলবগণ ক্রমান্বয়ে এক পরমানন্দীয় আবেশের দুনিয়ায় বা দশাগ্রস্ত অবস্থায় উন্নীত হয়। ফলে অনুশীলন উপাদান হিসেবে এই প্রক্রিয়াটির গুণগত তাৎপর্য হচ্ছে এটি এক প্রকার *পরমানন্দীয় আবেশের* আশ্রয়ে পূর্ণ মনোসংযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি ক্রিয়ায় নিমগ্ন/একাত্ম বা লীন হতে কার্যকর হয়। প্রক্রিয়াটির গুণগত কার্যকারিতার সূত্রেই মূলত ব্যক্তি/কুশীলব/অভিনেতা প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন মনো-দৈহিক সীমানা অতিক্রম করে 'ভিন্ন'/'নতুন' পরমানন্দীয় মনো-দৈহিক বাস্তবতায় উন্নীত হতে সক্ষম হয়।

মণিপুরী *নটপালা* অন্তর্গত 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' উপাদানটি কুশীলবের দেহে ভাব-রসের মূর্তকরণ বা প্রকাশের প্রক্রিয়ায় কার্যকর হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক চরিত্রকে শরীরের ভঙ্গি/ভাষায় সুনির্দিষ্ট 'ব্যক্তিত্বরূপে' প্রদর্শনের (চরিত্রায়ণের) প্রচলিত অভিজ্ঞতার বিপরীতে কুশীলবকে দেহের কাব্যময় সুরেলা ভাষা, সুর ও ছন্দের আশ্রয়ে চরিত্রের ভাব-দেহের প্রদর্শন অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। ফলে অনুশীলন উপাদান হিসেবে 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' প্রক্রিয়াটির বিশেষ গুরুত্ব এবং তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এটি চরিত্রের প্রথাগত প্রদর্শন নিরপেক্ষ ভাব ও রস সমৃদ্ধ বর্ণনাত্মক দেহের ক্রিয়াশীলতায় গায়েন/কুশীলব/অভিনেতাকে সাবলীল করে তোলে।

মণিপুরী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত 'কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা' অনুশীলন উপাদানটি কার্যত কুশীলবের মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। কেননা এই প্রক্রিয়ায় কুশীলবের মনো-দৈহিক সংবেদনশীলতায় 'তৃতীয় নয়ন' বা 'অন্তরদৃষ্টি' ক্রিয়াশীল হয়। অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি চোখ বন্ধ রেখে কান দিয়ে শোনার (আন্দাজ/অনুমান/মনের অবস্থান বা পজিশন) ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও সক্রিয় করে কুশীলবকে ভিন্নরকম এক সংবেদনশীল শরীরে (মনো-দৈহিক) রূপান্তর করে। ফলে অনুশীলন উপাদান হিসেবে 'কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা' প্রক্রিয়াটি কুশীলবের 'তৃতীয় নয়ন' বা 'অন্তরদৃষ্টির' মাধ্যমে গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন 'মনোযোগকে' সক্রিয় করে কুশীলবের ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীল সক্ষমতাকে কার্যকর করে তোলে। অধিকন্তু এই প্রক্রিয়াটি কুশীলবের মনোযোগকে কেন্দ্রস্থিত করা এবং মনোযোগ বিন্দুকে দেহ অতিক্রম করে চারপাশের নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তু/প্রতিপক্ষের ওপর নির্দিষ্ট করা এবং ত্বড়িত সাড়া প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করা প্রভৃতি নানাবিধ ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনশীলতাকে সম্ভব করে তোলে।

গারো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের *রে-রে* অন্তর্গত অনুশীলন উপাদান 'রে-রে প্রক্রিয়া'টি মূলত সুর ও ছন্দ নির্ভর নির্দিষ্ট একটি গীত-কাঠামো অনুসরণ করে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট গীতি-সংলাপ (সংলাপাত্মক গীত) বা সুরেলা উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে একটি বিষয়ের প্রদর্শন/পরিবেশনের সক্ষমতাকে কার্যকর করে। ফলে এই প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্টভাবে কুশীলবের দুটি বিশেষ ধরনের গুণগত সক্ষমতাকে সম্ভব করে তোলে– প্রথমত, এই প্রক্রিয়া কুশীলবকে সুর, ছন্দ নির্ভর একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় সম্পৃক্ত/সংযুক্ত থেকে সুরযুক্ত তাৎক্ষণিক কথোপকথন বা সংলাপে অবতীর্ণ হতে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয়ত, কুশীলবের তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতা ও সহজাত বুদ্ধিমত্তার আশ্রয়ে কথোপকথনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়কে সাবলীল ও স্বতস্ফূর্ত করে। তাছাড়া কৌশলগত দিক থেকে এই প্রক্রিয়াটি তাৎক্ষণিক সৃষ্ট গদ্য সংলাপ বা দৈনন্দিন কথোপকথন নির্ভর প্রচলিত নাট্য-প্রক্রিয়ার বিপরীতে সুর ও ছন্দের কাঠামো অনুসরণ করে তাৎক্ষণিক সৃষ্ট গীত-সংলাপ বা সুরেলা কথোপকথনের দক্ষতাকে সম্ভব করে তোলে। ফলে অনুশীলন উপাদান হিসেবে *রে-রে প্রক্রিয়াটি* তাৎক্ষণিক সংলাপ প্রক্ষেপণে, তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশে, সুর-ছন্দ ও সংগীতের সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

উপরোক্ত তুলনামূলক পর্যালোচনাসূত্রে অনুশীলন উপাদানের প্রায়োগিক কৌশল এবং প্রক্রিয়ায় যেমন একাধিক সাদৃশ্য নির্ণয় করা সম্ভব। অপরদিকে অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা এবং উপযোগিতার বিচারে উপাদানগুলোকে একাধিক প্রকারভেদে নির্ধারণ করা সম্ভব। যেমন– 'ইচ্ছাছায়া', 'চক্রামন', ও 'দম' ধ্যানভিত্তিক এই তিনটি উপাদান কার্যত মনের স্থিরতা, বিশ্বাস ও আস্থা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর কার্যকর হয়। 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া', 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ', 'বক্রহাঁটু ও বহুমুখী সঞ্চলন প্রক্রিয়া' এবং 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' উপাদান চারটি কুশীলবের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গের নানাবিধ ভঙ্গি, চলন, সঞ্চলন, মুভমেন্টের শৈলী-নির্মাণ ও বিন্যাস সক্ষমতায় কার্যকর হয়। 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব' এবং 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' উপাদান দুটি কুশীলবের দেহের অন্তস্থ ভাব-রস ও শৌর্যের বিন্যাস ও প্রকাশ সক্ষমতাকে সক্রিয় করে তোলে। 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা', 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ' এবং 'বক্রহাঁটু ও বহুমুখী সঞ্চলন প্রক্রিয়া' কুশীলবের দেহের সুর, ছন্দ, লয় ও ভঙ্গিগত বিন্যাসের ধারণাকে সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত করে। 'পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া' ও 'কান দিয়ে দেখা ও চোখ দিয়ে শোনা' উপাদান দুটি ইন্দ্রিয়গত সংবেদশীলতা এবং মনোযোগের স্থিরতায় কার্যকর হয়। এবং 'রে-রে প্রক্রিয়া' কুশীলবের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতার প্রকাশকে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

সুতরাং তুলনামূলক পর্যালোচনাসূত্রে ১৭টি *উপাদানের* প্রায়োগিক কৌশল ও প্রক্রিয়াগত মিল অ-মিল দৃষ্টে এবং অনুশীলনের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা বিবেচনায় জাতিতাত্ত্বিক নাট্য-নিরীক্ষার ফল স্বরূপ অভিনেতার প্রস্তুতিতে সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবে ১২টি *উপাদানকে* চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা হলো। চূড়ান্তরূপে

গৃহীত এই ১২টি অনুশীলন উপাদান হচ্ছে– ১. গারোদের *সাম্বিল প্রক্রিয়া* ও মারমা থালা নৃত্যের *ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার* সমন্বয়ে ‘ঘূর্ণন প্রক্রিয়া’, ২. ‘গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ’, ৩. মারমা জ্যা নৃত্যের *হালকা বক্র হাঁটু* ও *টরসো* এবং মণিপুরী রাসনৃত্যের *বক্র হাঁটুতে অগ্রতলা সঞ্চলন নির্ভর দেহভঙ্গি* এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে ‘বক্র হাঁটু ও বহুমুখী সঞ্চলন প্রক্রিয়া’, ৪. জ্যা নৃত্যের *লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডব* এবং মণিপুরী রাসনৃত্যের *লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ করা* উপাদান দুটির সমন্বয়ে ‘লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ’, ৫. মারমা পাঙখুং নাট্যের *বর্ননাত্মক নৃত্য* এবং বাঘ নৃত্যের *নৃত্যধর্মী সক্ষমতা* উপাদান দুটির সমন্বয়ে ‘নৃত্যধর্মী সক্ষমতা, ৬. ‘ইচ্ছাছায়া’, ৭. ‘চক্রামন’, ৮. ‘দম’, ৯. ‘পুনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া’, ১০. ‘ভাব-দেহের মূর্তকরণ’, ১১. ‘কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা’, এবং ১২. ‘রে-রে প্রক্রিয়া’।

৪.৩ : সম্ভাবনা নিরূপণ

বক্ষ্যমাণ গবেষণার নির্ধারিত পরিধির অন্তর্গত তিনটি পৃথক জাতি-সংস্কৃতির (মারমা, মণিপুরী এবং গারো) ১২টি পরিবেশনার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতিতাত্ত্বিক নাট্যের পরম্পরাগত পরিবেশন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মৌল সূত্রগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এবং বিশ্লেষণের এই সূত্র ধরেই কার্যত 'নাট্য-নিরীক্ষায়' অবতীর্ণ হয়ে যে সকল নাট্যমূলক উপাদান– প্রক্রিয়া ও কৌশল কুশীলবের দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক তথা মনো-দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ কার্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হয় এবং যে সকল পরম্পরাগত অনুশীলন প্রক্রিয়ায় কুশীলবের আসর উপস্থিতি বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বলে বিশ্লেষণসূত্রে দৃষ্ট হয়, এমন ১৭টি *উপাদান* চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার অধীনে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১৭টি উপাদান অন্তর্গত পরিবেশন–প্রক্রিয়া ও প্রায়োগিক কৌশলের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং অনুশীলনের কার্যাকারিতা, উপযোগিতার বিবেচনায় ১২টি *উপাদানকে* চূড়ান্তরূপে কুশীলব/অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

তবে বক্ষ্যমাণ গবেষণায় গৃহীত ১২টি *উপাদানকে* ১২টি একক অনুশীলন (exercise) হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং অভিনেতার দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, ভাব-আবেগ, মনোযোগ, সুর-ছন্দ, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীলতা, ধ্যান, দম, চলন-সঞ্চলন, ভরকেন্দ্র-ভারসাম্য অথবা তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের প্রস্তুতিকল্পে ১২টি *উপাদানকে* অনুশীলনের ১২টি সূত্র বা উৎস হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। এর ফলে নির্বাচিত ১২টি *উপাদানের* প্রতিটি একককে একাধিক গুচ্ছবদ্ধ বা ধারাবাহিক অনুশীলনের (exercise) সূত্র বা উৎস হিসেবে কার্যকর করার বা প্রয়োগ করার সম্ভাবনা তৈরি করে।

যেমন– মারমা (থালা নৃত্য) এবং গারো (সাম্বিল মিসারা) পরিবেশনার অন্তর্গত 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া'কে কেবল হাত এবং কোমরে আবদ্ধ না রেখে শরীরের একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যুক্ত করা সম্ভব এবং একই সাথে কুশীলবের কল্পনার আশ্রয়ে এই 'ঘূর্ণন প্রক্রিয়া'কে একাধিক মনো-দৈহিক অভিব্যক্তি প্রকাশের অনুশীলনের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

মণিপুরী (থাঙ তা খেলা) ও (রাসনৃত্য) এবং মারমা (জ্যা নৃত্য) পরিবেশনার অন্তর্গত 'গতিতে স্পাইরাল বা সর্পিল প্যাটার্ন নির্মাণ' ও 'বক্র হাঁটু ও বহুমুখী সঞ্চলন প্রক্রিয়া' এই দুটি অনুশীলন উপাদান জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনার অন্তর্গত নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত কতিপয় ভঙ্গি, চলন, সঞ্চলন, গতি ও ছন্দকেই কেবল স্বতঃস্ফূর্ত করে না, বরং উপাদান দুটির প্রায়োগিক কৌশল ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং উপযোগিতা বিবেচনায় রেখে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুমুখী একাধিক গুচ্ছবদ্ধ চলন, সঞ্চলন, ভঙ্গি, গতি ও ছন্দের

অনুশীলন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করা সম্ভব। *বক্র হাঁটুর* কারণে এই দুটি প্রক্রিয়া কুশীলবের দেহের একাধিক ভরকেন্দ্র এবং ভারসাম্যের সাথে গতি এবং ছন্দের সমন্বয় তৈরিতে কার্যকর হয়। তাছাড়া এই দুটি প্রক্রিয়ার সাথে কুশীলবের কল্পনা, ভাব-রস এবং শৌর্যের মেলবন্ধনে অনুশীলন দুটিকে বহুমুখী সক্ষমতা এবং সম্ভাবনায় উন্নীত করা সম্ভব।

মণিপুরী (রাসনৃত্য) এবং মারমা (জ্য নৃত্য) পরিবেশনার অন্তর্গত 'লাস্য ও লাস্যময়-তাণ্ডবের বিমূর্ত প্যাটার্ন নির্মাণ'-এর মাধ্যমে কুশীলবের কাল্পনিক/মনো-দৈহিক অভিব্যক্তির গঠনমূলক, সচেতন শৈলীবদ্ধ শারীরিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অর্থাৎ এই অনুশীলনে প্রদত্ত একাধিক বিষয়কে (স্পাইরাল বা সর্পিল মুভমেন্ট, ফিগার এইট মোশন ইত্যাদি অথবা কল্পিত কোনো বিষয়কে গ্রহণ করা যায়) *লাস্যময়-তাণ্ডব* শৌর্যের বিমূর্ত রূপ/আকার/প্যাটার্ন নির্মাণের ধারাবাহিক কাল্পনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে অতঃপর কুশীলবের দেহের ভাষায়/ছন্দে বহুমুখী প্রদর্শন সক্ষমতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

মারমা (পাঙখুং ও বাঘ নৃত্য) পরিবেশনা অন্তর্গত 'নৃত্যধর্মী সক্ষমতা' উপাদানটি কেবল জাতিতাত্ত্বিক কতিপয় বর্ণনাত্মক রূপকল্প এবং প্রাণীর আচরণ ভিত্তিক ভঙ্গির প্রদর্শনকেই সম্ভব করে তা নয়, বরং এই উপাদানটির মাধ্যমে কুশীলবের মৌখিক ভাষা সৃষ্ট অভিব্যক্তির বিপরীতে দেহের ভাষা/সুর/ছন্দের আশ্রয়ে প্রদত্ত বা কল্পিত কোনো বিষয়কে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রকাশ করা সম্ভব।

মারমা ধ্যান ভিত্তিক পরিবেশনার অন্তর্গত 'ইচ্ছাছায়া', 'চক্রামন' এবং 'দম' উপাদান তিনটির প্রায়োগিক কৌশল এবং প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কল্পিত/প্রদত্ত নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করে কুশীলবের মনোযোগের কেন্দ্র নির্ধারণ, কেন্দ্রে স্থির থাকা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা এবং প্রাণায়ামের কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মারমা (পাঙখুং) পরিবেশনার অন্তর্গত 'পূনঃপুন গঠন সম্পাদন প্রক্রিয়া' অনুসরণ করে এক প্রকার *পরমানন্দীয় আবেশের* মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি ক্রিয়ায় নিমগ্ন/একাত্ম বা লীন হওয়ার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। কার্যত এই প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট একটি সুর, ছন্দ বা ভঙ্গির পুনঃপুন আবর্তন, সংযোজন এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি/কুশীলব/অভিনেতাকে প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন মনো-দৈহিক সীমানা অতিক্রম করে 'ভিন্ন'/'নতুন' পরমানন্দীয় মনো-দৈহিক বাস্তবতায় উন্নীত করে।

মণিপুরী (নটপালা) পরিবেশনার অন্তর্গত 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' উপাদানটি এক বা একাধিক চরিত্রকে শরীরের ভঙ্গি/ভাষায় সুনির্দিষ্ট 'ব্যক্তিত্বরূপে' প্রদর্শনের (চরিত্রায়ণের) প্রচলিত অভিজ্ঞতার বিপরীতে কুশীলবকে দেহের কাব্যময় সুরেলা ভাষা, সুর ও ছন্দ প্রদর্শনের মাধ্যমে চরিত্রের ভাব-দেহের প্রদর্শন অভিজ্ঞতাকে কার্যকর

করে তোলে। ফলে 'ভাব-দেহের মূর্তকরণ' অনুশীলন উপাদানটির চর্চার মাধ্যমে কুশীলব/অভিনেতার ভাব-রস, সুর-ছন্দ সমৃদ্ধ বর্ণনাত্মক শরীরকে সক্রিয় এবং সাবলীল করে তোলা সম্ভব।

মণিপুরী (থাঙ তা খেলা) পরিবেশনার অন্তর্গত 'কান দিয়ে দেখা এবং চোখ দিয়ে শোনা' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কুশীলবের ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনশীল সক্ষমতাকে সীমাহীন সম্ভাবনায় উন্নীত করার সুযোগ তৈরি করে।

এবং গারো (রে-রে) পরিবেশনার অন্তর্গত 'রে-রে প্রক্রিয়া' অনুসরণ করে একাধিক বিষয় ওপর কুশীলবের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীল সক্ষমতার উন্নয়ন করা সম্ভব। কিন্তু 'রে-রে প্রক্রিয়া' অনুশীলনের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা আরও অধিক এই কারণে যে, এই প্রক্রিয়াটি প্রচলিত গদ্য সংলাপের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক কথোপকথনের বিপরীতে সুর ও ছন্দের নির্দিষ্ট একটি কাঠামোতে অবিচল থাকার শর্তে যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপাত্মক গীত পরিবেশন প্রক্রিয়ায় কুশীলবের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতাকে সক্রিয় করে তোলে। সুতরাং অনুশীলন উপাদান হিসেবে 'রে-রে প্রক্রিয়া' কুশীলবের সুর, ছন্দ এবং গীত বিষয়ক সক্ষমতার পাশাপাশি তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন শক্তির প্রদর্শন সম্ভবনাকেও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

'পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণ' শীর্ষক বর্তমান আলোচনার অন্তে এসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতিতাত্ত্বিক 'নাট্য-নিরীক্ষার' অংশ হিসেবে তিনটি জাতি-সংস্কৃতির (মারমা, মণিপুরী এবং গারো) সর্বমোট ১২টি পরিবেশনার বিশদ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণসূত্রে গৃহীত প্রাথমিক পর্যায়ের নির্বাচিত ১৭টি *উপাদানের* তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে চূড়ান্তরূপে সর্বমোট ১২টি *উপাদানকে* অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদানের সূত্র বা উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যায়। চূড়ান্ত বিবেচনায় ১২টি অনুশীলন উপাদানের নির্বাচন এবং অনুশীলনের সূত্র বা উৎস হিসেবে গ্রহণের সম্ভাবনা নিরূপণের এই প্রক্রিয়া সূত্রেই কার্যত গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে করি। ফলে সার্বিক এই গবেষণার মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতিতাত্ত্বিক নাট্য ও নাট্যমূলক কতিপয় চিহ্নিত উপাদানের সাথে শহরকেন্দ্রিক অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদানের প্রায়োগিক-উপযোগিতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে নাট্য-নিরীক্ষামূলক এই গবেষণার মাধ্যমে জাতিতাত্ত্বিক (ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী) সংস্কৃতির সাথে শহরকেন্দ্রিক (সংখ্যাগরিষ্ঠ) সংস্কৃতির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক বা মেলবন্ধনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

উপসংহার

জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা হতে এমন কোনো উপাদান কি অন্বেষণ করা সম্ভব নয়, যা ঐতিহ্যিক এবং পরম্পরাগত চর্চায় কুশীলবের পরিবেশন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মৌল সূত্র হিসেবে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে এবং একই সাথে যা শহরায়তনিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী নাট্যকলায় অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবেও হতে পারে সমভাবে উপযোগী এবং কার্যকর?

ভূমিকা অংশে উত্থাপিত উদ্দীপনামূলক এই গবেষণা-প্রশ্নটিকে পুনরায় উল্লেখ করে এই পর্যায়ে একটি উপসংহার রচনা করা যেতে পারে। অতঃপর এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের সূত্র ধরেই "বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মণিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটির সামগ্রিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার দিকে পুনরায় ফিরে তাকানো যেতে পারে। তবে গবেষণার উদ্দীপক প্রশ্নটিকে এক. *জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় এমনকি কোনো উপাদান অন্বেষণ করা সম্ভব নয়, যা ঐতিহ্যিক এবং পরম্পরাগত চর্চায় কুশীলবের পরিবেশন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মৌল সূত্র হিসেবে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে?* এবং দুই. *একই সাথে যা শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী নাট্যকলায় অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবেও হতে পারে সমভাবে উপযোগী এবং কার্যকর?* এই দুটি অংশ বা পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদনুসারে অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। ফলে ভূমিকা অংশে উত্থাপিত উদ্দীপনামূলক এই গবেষণা-প্রশ্নটির উত্তর অন্বেষণের নিমিত্তেই কার্যত গবেষণা কর্মটিকে চারটি অধ্যায় বিভাজনে সম্পাদন করা হয়। এবং এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে *মারমা, মণিপুরী* এবং *গারো* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সর্বমোট **১২**টি পরিবেশনা বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা-প্রশ্নের প্রথম পর্যায়ের উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তুলনামূলক *পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণের* মাধ্যমে উত্থাপিত প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম তিনটি অধ্যায় যথাক্রমে প্রথম অধ্যায় 'মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা', দ্বিতীয় অধ্যায় 'মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা' এবং তৃতীয় অধ্যায় 'গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা' শীর্ষক আলোচনার কাঠামো ও বিষয় বিন্যাস এক এবং অভিন্ন রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি অধ্যায়ই পর্যায়ক্রমিক তিনটি উপাধ্যায়, যেমন– ক. 'জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়', খ. 'ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ' এবং গ. 'পর্যালোচনা' শীর্ষক বিষয় বিভাজনে আলোচনা করা হয়। তবে গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য– (জাতিতাত্ত্বিক নাট্য এবং নাট্যমূলক একাধিক পরিবেশনার বিশদ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য, কৌশল এবং প্রক্রিয়াগত দিক থেকে কার্যকর *উপাদান* চিহ্নিত করা এবং অভিনেতার প্রস্তুতিতে অনুশীলন উপাদান হিসেবে এর উপযোগিতা নির্ণয়

করা) বিবেচনায় রেখে 'ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ' উপাধ্যায়ের আলোচনাকে 'ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন', 'দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ', এবং 'পরিবেশন ও বিশ্লেষণ' এই তিনটি বিষয় বিভাজনে বিশদ বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়– পর্বের আলোচনার মাধ্যমে তিনটি জাতি-সংস্কৃতির (পর্যায়ক্রমে মারমা, মণিপুরী ও গারো) ভাষা, ধর্ম, দর্শন, কৌম-চেতনা, কৃত্য আচার-অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থানগত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু দিক তুলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, ভাষা, উৎসব-অনুষ্ঠান নানাবিধ বিষয় জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার আলোচনাকে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে এবং আলোচনায় প্রদত্ত যুক্তি-তর্ক, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশিত/মুদ্রিত এবং প্রচলিত তথ্য-উপাত্ত, মত-দ্বিমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে 'জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়' শীর্ষক আলোচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, এই আলোচনার মাধ্যমে জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় প্রাচীন, পৌরাণিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্যমূলক উৎসব-আচার-অনুষ্ঠানের এমন কিছু সূত্র/উৎস চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, যে সূত্রগুলো কার্যত জাতিতাত্ত্বিক নাট্য বা নাট্যমূলক পরিবেশনার রীতি-পদ্ধতি, গঠন-কাঠামোকে ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট করে তুলতে সহায়তা করে। বস্তুত কিভাবে একটি কৌম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় সমগ্র জীবনাচার আনুষ্ঠানিক বা 'পরিবেশনামূলক' হয়ে ওঠে এই বিষয়টির অনুসন্ধান করাই ছিল এই পর্বের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

ক্ষেত্র সমীক্ষা : পরিবেশনা বিশ্লেষণ– শীর্ষক আলোচনায় মারমা, মণিপুরী এবং গারো এই তিনটি পৃথক জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বেশ কিছু পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণকৃত পরিবেশনার মধ্য থেকে সর্বমোট ১২টি পরিবেশনাকে (৭টি মারমা পরিবেশনা, ৩টি মণিপুরী পরিবেশনা এবং ২টি গারো পরিবেশনা) বিশদ বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে পর্যবেক্ষণ এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুর, ছন্দ, তন্ত্র, মন্ত্র, নৃত্য, গীত, কাব্যযুক্ত জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনায় যে সকল প্রায়োগিক কৌশল, প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য কুশীলবের মনো-দৈহিক প্রদর্শন এবং অভিব্যক্তিতে বিশেষ ও বহুমাত্রিক গুণের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করে বলে প্রতীয়মান হয়েছিল কেবল সেই সকল পরিবেশনাকে 'নাট্য-নিরীক্ষা'র বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ১২টি পরিবেশনাকে অতঃপর ১. ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন, ২. দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ, এবং ৩. পরিবেশন ও বিশ্লেষণ এই তিনটি কাঠামোগত বিভাজনে বিশদ বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণ করা হয়।

'ক্ষেত্র, উৎস, বিবর্তন' বিষয়ক আলোচনাসূত্রে নির্বাচিত প্রতিটি পরিবেশনার রীতি-পদ্ধতি, গঠন-কাঠামোর প্রাচীন, পৌরাণিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এর বিকাশ ও বিবর্তনের প্রধান ধারাসমূহকে নির্দেশ করা হয়। 'দল-সংগঠন, প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ' বিষয়ের আলোচনাসূত্রে পরিবেশনার সাথে কুশীলবের সাংগঠনিক, সামাজিক এবং পেশাগত সম্পর্কের স্বরূপ, পরিবেশন প্রক্রিয়ায় পরম্পরার ক্রিয়াশীলতা, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের

পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, সর্বোপরি কৌমবদ্ধ একটি ধর্মীয়-সামজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবেশন-প্রক্রিয়ায় কুশীলবের আসর উপস্থিতিতে যে সকল মনো-দৈহিক গুণাবলী বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে তার বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। এই পর্বের আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশনার অন্তর্গত একাধিক বৈশিষ্ট্য, কৌশল অথবা প্রক্রিয়াকে মৌল *উপাদান* হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং অনুশীলন উপাদান হিসেবে পরবর্তী আলোচনায় অন্তর্ভুক্তির যুক্তি তুলে ধরা হয়। তৃতীয় ও শেষ পর্বে 'পরিবেশন এবং বিশ্লেষণ' বিষয়ক আলোচনার শুরুতে নির্বাচিত ১২টি পরিবেশনা যে সকল প্রথাগত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়, রীতি-পদ্ধতিতে এবং কৌশল অবলম্বনে প্রদর্শিত হয়ে থাকে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বিবরণ প্রদান করা হয়। অতঃপর পূর্ববর্তী আলোচনায় চিহ্নিত *উপাদান*সমূহের প্রায়োগিক কৌশল ও প্রক্রিয়া যাচাই করে অভিনেতার প্রস্তুতিতে সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়।

পর্যালোচনা– শীর্ষক উপাধ্যায়ে পূর্বোক্ত আলোচনায় চিহ্নিত সকল *উপাদান-এর* ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় এর প্রায়োগিক ও কৌশলগত কার্যকারিতা নির্দেশের মাধ্যমে ১৭টি উপাদানকে প্রাথমিকভাবে অনুশীলন উপাদান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ পর্যালোচনার এই অংশের মাধ্যমে মারমা পরিবেশনা (৭টি) থেকে ১০টি উপাদান, মণিপুরী পরিবেশনা (৩টি) থেকে ৫টি উপাদান এবং গারো পরিবেশনা (২টি) থেকে ২টি উপাদানসহ মোট ১৭টি নির্বাচন করা হয় এবং অভিনেতার প্রস্তুতিতে সহায়ক অনুশীলন উপাদান হিসেবে এগুলোর কৌশল ও প্রক্রিয়াগত কার্যকারিতা নিরূপণ করা হয়।

চতুর্থ এবং শেষ অধ্যায়ে 'পর্যালোচনায় সম্ভাবনা নিরূপণ' শীর্ষক আলোচনাটিকে *বৈশিষ্ট্য, কৌশল এবং প্রক্রিয়ার নিরিখে নির্বাচিত অনুশীলন উপাদানের পুনঃ আলোচনা* এবং *তুলনামূলক পর্যালোচনা* এই দুটি বিষয় বিভাজনে সম্পাদন করা হয়। এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে মূলত পূর্ববর্তী অধ্যায়ের নিরীক্ষাসূত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য, কৌশল এবং প্রক্রিয়ার উপস্থিতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় অনুশীলন উপাদান নির্বাচন করা হয়েছিল সেই বিষয়গুলোকে পুনঃ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং পরবর্তী অংশে অর্থাৎ তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক আলোচনায় নির্বাচিত ১৭টি *উপাদানের* সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং বিশেষত্ব ও ভিন্নতা নির্ণয়ক আলোচনার মাধ্যমে শহরকেন্দ্রিক অভিনেতার মনো-দৈহিক প্রস্তুতিতে এই সকল অনুশীলন উপাদানের প্রায়োগিক উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রক্রিয়া, কৌশল, উপযোগিতা এবং কার্যকারিতার গুণগত সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিবেচনায় অতঃপর ১৭টি *উপাদানের* মধ্য থেকে চূড়ান্তরূপে সর্বমোট ১২টি *উপাদান* গ্রহণ করা হয় এবং এই ১২টি উপাদানকেই জাতিতাত্ত্বিক নাট্য *উপাদান* হিসেবে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় প্রয়োগ-উপযোগী অনুশীলন উপাদানের সূত্র বা উৎস হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা কর্মের দিকে এক নজরে তাকালে দেখা যাবে যে, তিনটি পৃথক জাতিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ১২টি পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূলত কতিপয় (১২টি) *উপাদানকে* চিহ্নিত করে অভিনেতার মনো-দৈহিক

প্রস্তুতিতে অনুশীলনের সূত্র বা উৎস হিসেবে প্রয়োগের যুক্তি অনুসন্ধান করা হয়েছে। ফলে উপাদানগুলোর চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও গ্রহণের যুক্তি, কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সূত্রেই ভূমিকাংশে উত্থাপিত গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সম্ভাবনা নিরূপণের মাধ্যমে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় এই সকল উপাদানের প্রয়োগ-উপযোগিতা নির্ণয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণার সার্বিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তিনটি জাতিতাত্ত্বিক নাট্য এবং নাট্যমূলক পরিবেশনার সমৃদ্ধি, সীমাবদ্ধতা, গুরুত্ব ও সম্ভাবনা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে, অপরদিকে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় এই সকল পরিবেশনার প্রয়োগ-সম্ভাবনা নির্ণয়ের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন এবং আত্তিকরণের নতুন দিক উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে বলে বিশ্বাস করি। কেননা এই গবেষণা কর্মটি 'অন্য' বা 'অপর' সংস্কৃতিকে মেনে নেওয়া অথবা পর্যটন-বিনোদনের দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল 'উপভোগ' করার বিপরীতে গ্রহণ, সমন্বয় এবং চর্চায় সম্পৃক্ত করার পথ উন্মুক্ত করেছে।

একজন নাট্যকর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই একটি অপূর্ণতা এবং অভাব বোধ বহন করে চলেছিলাম যে, অভিনেতার মনো-দৈহিক, ভাব-আবেগ, সুর-ছন্দ-লয়, ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনশীলতা, চলন-সঞ্চলন, শৌর্য, ভর-ভারসাম্য, ধ্যান, দম, মনোযোগ, তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের প্রস্তুতি এবং অনুশীলন পদ্ধতিতে সর্বদাই কেন ইউরো-আমেরিকান বা পাশ্চাত্য নির্দেশিত একগুচ্ছ বা ধারাবাহিক কতিপয় অনুশীলন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে? কেন জাতি-সংস্কৃতির বহু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশনার অন্তর্গত প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বনে অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক 'অনুশীলন উপাদান' নির্ণয় করা সম্ভব নয়? এই রূপ এক অপূর্ণতার বোধকে পূর্ণ করার লক্ষ্যেই মূলত এই গবেষণা কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আশা করি তিনটি পৃথক জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনার নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে অন্তত ১২টি *উপাদান* চিহ্নিত করে অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলনের সূত্র বা উৎস হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। যদিও বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর সংখ্যার তুলনায় মাত্র তিনটি গোষ্ঠীকে (মারমা, মণিপুরী এবং গারো) সার্বিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও কিছু সংখ্যক জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশেনাকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলে অভিনেতার প্রস্তুতি সহায়ক অনুশীলন উপাদান অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে সংখ্যা, বৈচিত্র্যে, উপযোগিতার মানদণ্ডে আরও অধিক সমৃদ্ধ করা সম্ভব হতো বলে বিশ্বাস করি। বস্তুত মাত্র তিনটি জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতিকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই এই গবেষণা পরিধির বাইরে থেকে যায়। ফলে সংখ্যা, বৈচিত্র্য এবং উপযোগিতার বিচারে এই অভিসন্দর্ভকে অধিক সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সময়ের বাধ্যবাধকতা, কৃত্যমূলক পরিবেশনার সাথে কুশীলবের সংশ্লিষ্টতা হ্রাস পাওয়া বা প্রদর্শনে অনীহা প্রকাশ করা,

কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিন, ক্ষণ, তিথি অনুসরণ করে কৃত্যমূলক পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করতে না পারা, সর্বোপরি দীর্ঘ সময় ধরে এবং একটানা ক্ষেত্র সমীক্ষা অঞ্চলে অবস্থান করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না পারা প্রভৃতি ব্যর্থতার কারণে নির্বাচিত তিনটি জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির বেশ কিছু পরিবেশনাও এই গবেষণার অন্তর্গত করা সম্ভব হয়নি। এগুলো যেমন এই গবেষণার একটি বড় সীমাবদ্ধতা, অপরদিকে আবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও ইঙ্গিত বহন করে। কেননা বক্ষ্যমাণ গবেষণার প্রায়োগিক কার্যকারিতা বিবেচনায় এনে ভবিষ্যতে আগ্রহী কোনো গবেষক হয়তো জাতিতাত্ত্বিক সংস্কৃতির সংখ্যা ও পরিধি বৃদ্ধি করে প্রয়োগ উপযোগিতার ক্ষেত্রটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করি। তথাপিও অনুশীলনের সূত্র বা উৎস হিসেবে যে ১২টি *উপাদান*কে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, এই উপাদানগুলোকে একগুচ্ছ ধারাবাহিক চর্চায় বা অনুশীলন (exersise) উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় অথবা 'অনুশীলন প্রক্রিয়ায়' যুক্ত করা সম্ভব। অধিকন্তু নাট্যশিক্ষক/পরিচালক/নির্দেশক প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৃজনশীল যুক্তি ও কল্পনার ওপর নির্ভর করে জাতিতাত্ত্বিক নাট্য *উপাদানের* আশ্রয়ে কার্যকর 'অনুশীলন' (exercise) উদ্ভাবন/সৃজনের মাধ্যমে 'অনুশীলন প্রক্রিয়াকে' অপার সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারেন। ফলে জাতিতাত্ত্বিক নাট্য উপাদানের আত্তীকরণ এবং সমন্বয়ের সৃজনশীল 'অনুশীলন প্রক্রিয়ার' সূত্রেই সার্থক হয়ে উঠতে পারে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় জাতিতাত্ত্বিক নাট্যের প্রয়োগ-উপযোগিতা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ২য় খণ্ড, (মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৩)

২. অচ্যুতচরণ চৌধুরী, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, (শ্রী উপেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩১৭)

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, অষ্টম সংস্করণ, (এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৮)

৪. আজাদ বুলবুল, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপাজাতীয় সংস্কৃতি*, (মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৫)

৫. আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮)

৬. আফসার আহমদ, *চাঁদ নয়, রাধা নেমে এসেছিল মহারাস-পূর্ণিমার আসরে*, (শুভাশিস সিনহা সম্পাদিত, *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা*, রাসলীলা বিষয়ক সংখ্যা, মণিপুরী থিয়েটার, নভেম্বর, ২০১১)

৭. আইয়ুব হোসেন, চারু হক (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী*, (ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮)

৮. আলি নওয়াজ, *গারো উপজাতি ও তাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন*, (মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬)

৯. ইলিরা দেওয়ান ও মানস চৌধুরী, *‘শান্তিচুক্তি’র পর : বাংলাদেশের বিদ্যোৎসাহী মহল এবং রাষ্ট্রের অবিশ্লেষিত ক্ষমতা*, (মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া সম্পাদিত, *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩)

১০. ইসরাফিল শাহীন, *অভিনয় তত্ত্ব*, অপ্রকাশিত গ্রন্থ

১১. এ কে শেরাম, *মণিপুরীদের ঐতিহ্যময় নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*,(মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯)

১২. ক্য শৈ প্রু, *মারমা উপজাতি পরিচিতি*, (অঙ্কুর ১ম সংখ্যা, রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১)

১৩. কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য ঐতিহ্য*, অনুঃ নারায়ণ চৌধুরী, (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৫)

১৪. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪)

১৫. চিংলামং চৌধুরী, *মারমা নৃগোষ্ঠীর গীতিনাট্য: পাঙখুং* (বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শিরোনামে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

১৬. জাফার আহমাদ হানাফী, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, (শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩)

১৭. তামান্না রহমান, *মণিপুরী নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের সংস্কৃতি*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯)

১৮. থোঙাম ধীরেন, *বাংলাদেশের মণিপুরী জাতি*, (মণিপুরী এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শ্রীমঙ্গল, ২০০৮)

১৯. থিওফিল নকরেক, *গারো সংস্কৃতির জীবনবাদ ও পর্যালোচনা*, (নন্দিতা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫)

২০. দর্শনা ঝাভেরী, কলাবতী দেবী, *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন*, (মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা, ১৯৯৩)

২১. দীনেশচন্দ্র সেন, *বহৎ বঙ্গ*, (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩৫)

২২. দেবযানী চলিহা, *মণিপুরী নৃত্যে দু'টি ধারা*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯)

২৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২)

২৪. পপেন ত্রিপুরা, *'আদিবাসী' মানে 'আদিবাসিন্দা' নয়*, (আদিবাসী বার্তা, ০৯.০৮. ২০১৬, মঙ্গলবার, সময়- ১০.২১ মিনিট www.adibashibarta.com/home/details/1024/)

২৫. প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*, (রোদেলা, ঢাকা, ২০১২)

২৬. বার্লিং, *মান্দিরা কোথা হতে এসেছে*, (অনুঃ কিবরিয়াউল খালেক, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাঃ), *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬)

২৭. বিধি পিটার দাংগ, *গারো সৃষ্টিতত্ত্ব*, (মুস্তাফা মজিদ সম্পা., *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬)

২৮. বাঁধন আরেং, *মান্দি কৃষ্টি-সংস্কৃতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, (উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৭)

২৯. মাহমুদুল হাসান ও সুমুন সাঈদ ফেরদৌস, *'ইন্ডিজেনাস'– এর অনুসন্ধান : বাংলাদেশের বিদ্যায়তনিক জগতের দোনোমনা*, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া (সম্পা.), *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩)

৩০. মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া (সম্পা.), *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র,* (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩)

৩১. মুস্তাফা মজিদ, *আদিবাসী সংস্কৃতি,* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯)

৩২. মং ক্য শোয়ে নু, *মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,* (সাংগু; উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, বর্ষ: ছয়, সংখ্যা: এক, বান্দরবান)

৩৩. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), *চর্যাগীতিকা,* (স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৮৭ সন, ঢাকা)

৩৪. মং ক্য শোয়ে নু নেভী, *মারমা নৃত্যের বৈশিষ্ট্য,* উ চ নু (সম্পা.), (সাংগু, বর্ষ- ছয়, সংখ্যা-এক, টি সি আই, ১৯৯৮, বান্দরবান)

৩৫. মং সিং ঞো, *মারমাদের সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসে ও দেব দেবীর অবস্থান : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা,* (সাংগু, বর্ষ- সাত, সংখ্যা- এক (ষষ্ঠ খণ্ড), বান্দরবান, ১৯৯৯)

৩৬. মতেন্দ্র মানকিন, *গারো দুয়াল গোত্রের সংস্কৃতি,* (মুস্তাফা মজিদ সম্পা. *গারো জাতিসত্তা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬)

৩৭. মাহবুবুল হাসান, *গারো উপজাতি একটি অনক্ষর সমাজব্যবস্থা,* (মুস্তাফা মজিদ সম্পা. *গারো জাতিসত্তা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬)

৩৮. মণীন্দ্রনাথ মারাক, *গারো উপজাতি গারো সংস্কৃতি,* (বাংলাদেশ পরিষদ, ময়মনসিংহ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার প্রতিবেদন, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৬)

৩৯. মণীন্দ্রনাথ মারাক, *গারো নামের ইতিবৃত্ত,* (জানিরা- প্রথম খণ্ড, জুন ২০১৪, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোনা)

৪০. মিনা মোঃ নজরুল ইসলাম, *নাচের কথা,* (মিনা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪)

৪১. রমাবতী রামুর ইতিকথা- বোধিমিত্র বড়ুয়া, (চারুলতা ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

৪২. রণজিত সিংহ, *বাংলাদেশে মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি,* (উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪)

৪৩. রূপগোস্বামী, *উজ্জ্বলনীলমণি,* (শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনুদিত, বহরমপুর, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ)

৪৪. রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিল, *গারোদের আদি ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর ও ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক,* মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.) *গারো জাতিসত্তা,* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬)

৪৫. রহমত উল্লাহ, *গারো সম্প্রদায় : বাংলাদেশেরে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী,* (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১০)

৪৬. লুৎফর রহমান, *নৃগোষ্ঠী নাট্য : গারো,* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫)

৪৭. শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, (ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭)

৪৮. শাহমান মৈশান, *সেলিম আল দীন*, (বণিক বার্তা, বিশেষ সংখ্যা/কালপুরুষ পর্ব-৪, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

৪৯. শুভাশিস সিনহা, *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা; রাসলীলা বিষয়ক সংখ্যা*, (মণিপুরী থিয়েটার, নভেম্বর, ২০১১, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)

৫০. শামসুদ্দিন চৌধুরী (অনু.), *মাইকেল চেখভের অভিনয় পদ্ধতি*, (পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৩)

৫১. শশীভূষণ দাসগুপ্ত, *ভারতীয় সাধনার ঐক্য*, (কলিকাতা, ১৩৫৮ সন)

৫২. শিপ্রা সরকার, *ম্যালিনোস্কির মাঠ-গবেষণা সামাজিক তত্ত্ব ও অন্যান্য*, (নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯)

৫৩. সাইদুর রহমান লিপন, *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০)

৫৪. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, (শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫)

৫৫. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে আদি নৃ-জীবনের রূপায়ণ*, (উলুখাগড়া, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৬)

৫৬. সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী : ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার*, (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪)

৫৭. সৌরভ সিকদার, "বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা", (Dr. Shima Zaman, edited, *Survival or Extinction? Adivasi Rights in Bangladesh*, National Human Rights Commission (JAMAKON), Dhakak, August 2014)

৫৮. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ১৯৯৪)

৫৯. সুগত চাকমা, *ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা*, (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০১১)

৬০. সুভাষ জেংচাম, *বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪)

৬১. সুভাষ জেংচাম, *গারো সমাজ ও সংস্কৃতি*, (সূচীপত্র, ঢাকা, ২০১০)

৬২. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মণিপুর-পুরাণ*, মুস্তাফা মজিদ সম্পা. *আদিবাসী সংস্কৃতি*, (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯)

৬৩. সুকুমা সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,* (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৮)

৬৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড, (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৫)

৬৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. *ভরত নাট্যশাস্ত্র ১,* (নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০)

৬৬. সেলিম আল দীন, *গবেষণাগার নাট্য : একটি মারমা রূপকথা,* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫)

৬৭. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ,* (ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮)

৬৮. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য,* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬)

৬৯. সাইমন জাকারিয়া, মৎ প্রণীত, চল মন বৃন্দাবন নাচিয়া নাচিয়া, (প্রণমহি বঙ্গমাতা, শুক্রবারের সাময়িকী, প্রথম আলো, কাওরান বাজার, ঢাকা, ১২ এপ্রিল, ২০০২)

৭০. সাইমন জাকারিয়া, *বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের রাস উৎসব,* (মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা, রাসলীলা সংখ্যা, মণিপুরী থিয়েটার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নভেম্বর ২০১১)

৭১. সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা–* চতুর্থ পর্ব, (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮)

৭২. সাইমন জাকারিয়া সম্পা. *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪,* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯)

৭৩. হাসান ফেরদৌস, *সাদা মানুষেরা ক্ষেপে উঠেছে কেন?* (প্রথম আলো, ঢাকা, বধুবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

৭৪. হাফিজ রশিদ খান, *আদিবাসী জীবন, আদিবাসী সংস্কৃতি,* (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা,২০০৯)

৭৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া,* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০)

৭৬. Abul Barkat, "Political Economy of Indigenous Peoples in Bangladesh", (Dr. Shima Zaman, Edited, *Survival or Extinction? Adivasi Rights in Bangladesh),* National Human Rights Commission JAMAKON, Dhaka, 2014)

৭৭. Amena Mohsin, "Development Plans, Environment and the Hill Peoples: Chittagong Hill Tracts" (Mesba Kamal, edited, *Reflections on Diversity and Citizenship Bangladesh and Beyond,* Shrabon Prokashani, Dhaka, 2005)

৭৮. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin , *Key Concepts in Post-Colonial Studies*, (Routledge, London and New York, 2004)

৭৯. Claire Schrader (edited by), *Ritual Theatre; The Power of Dramatic Ritual in Personal Development Groups and Clinical Practice*, (Jessica Kingsley Publishers, London, 2012)

৮০. Clarence Maloney, *Tribals of Bangladesh and Synthesis of Bangali Culture, (*Mahmud Shah Qureshi (edited), *Tribal Culture in Bangladesh,* Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1984)

৮১. Clifford Geertz, *the interpretation of cultures*, (Fontana Press, London, 1993)

৮২. David G. Cashin, *Nathist Folklore and Sufism in Bengal*, Firoz Mahmud (Editor), *Folklore in Context; Essays in Honor of Shamsuzzamn Khan*, (UPL, Dhaka, 2010)

৮৩. Edward Braun, *Meyerhold : A revolution in theatre*, (Methuen Drama, 1995)

৮৪. Elaine Aston and George Savona, *Theatre As Sign-System: A Semiotics of Text and Performance*, (Routhledge London, 1991)

৮৫. Eugenio Barba & Nicola Savarese, *A Dictionary of Theatre Anthropology: The secret art of the performer*, (Routledge, London, 1991)

৮৬. Graham M. Schweig, *Dance of Divine Love*, (Princeton University Press, New Jersey, 2005)

৮৭. Homi K. Bhabha. *The location of culture*, (Routledge, London and New York, 1994)

৮৮. http://nusantara-cultures.blogspot.com/2011/06/tari-piring-piringplate-dance.html#sthash.B6J0WKXf.dpuf, 08.08.2015

৮৯. https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.159457397446434.36608.120095854715922, 08.08.2015

৯০. https://www.youtube.com/watch?v=5Ooz1GPreT0, Nupur Singha, *Indian Monipuri Dance : The first position for monipuri dance,* date- 8/3/2016, time- 11 pm

৯১. James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, (Holt, Rinehart and Winston, Florida, 1979)

৯২. Jarzy Grotowski, *Towards a Poor Theatre,* Eugenio Barba (edited), (Methuen London Ltd, London, 1986)

৯৩. JOE BOYLAN, a theatre blog, *The Ritual roots of plastic performance*, (www.vosleska.tumblr.com, September 2, 2013)

৯৪. Joseph Chaikin, *The Presence of The Actor*, (Theatre Communications Group, New York, 1972)

৯৫. Jurij Alschitz, *Training forever*, part 1, (European Association for Theatre Culture, Berlin, 2013)

৯৬. K. Ayyappa Paniker, *Indian Narratology*, (Indira Gandhi National Centre for Arts, Delhi, 2003)

৯৭. K. N. Panikkar, *Sanskrit Theatre Style: Modernity*, Classical Sanskrit Theatre Symposium ; Proceedings, (Centre For Asian Theatre, Dhaka, March, 2002)

৯৮. Kapila Vatsyayan, *The Square and the Circle of the Indian Arts, (*Roli Books International, New Delhi, 1983)

৯৯. Kapila Vatsyayan, *Traditions of Indian Folk Dance*, (India Library, 1976)

১০০. Major A. Playfair, *The Garos,*(D. J Publication, Tura, Meghalaya, 2011)

১০১. *Mayanmar-English Dictionary*, (Department of the Myanmar Language Commission, Mayanmar)

১০২. Michael Chekhov, *On the technique of acting*, (A Harper Resource Book, New York, 1985)

১০৩. Paul Rebillot and Kay, M. *The call to Adventure Bringing the Hero's Journey to Daily life.* (San Frncisco, CA: Harper Collins, 1993)

১০৪. Pille Runnel (edited), *Rethinking Ethnology and Folkloristics,* (Tartu Nefa Ruhm, Estonia, 2001)

১০৫. Real Emotions, (Theatre Topics, September, 1993 Volume 3 Number 2.)

১০৬. Richard Schechner, *Between theatre and Anthropology,* (University of Pennsylvania Press, Philadelphia,1989)

১০৭. Richard Schechner, *Performative Circumstances From the Avant Garde To Ramlila,* (Seagull Books, Calcutta, 1983)

১০৮. Richerd Schechner, *Performance Studies: An Introduction,* (Routledge, London, 2002)

১০৯. Richerd Schechner, *Performance Theory,* (Routledge, Newyork and London, 1994)

১১০. Rustom Bharucha, *The Theatre of Kanhailal : Pebt & Memories of Africa,* (Seagull, Calcutta, 1998)

১১১. S. B. Dasgupta, *Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature,* (Calcutta, 1946)

১১২. Smt. Nayana Jhaveri, *Guru Bipin Singh,* (Manipuri Nartanalya, Calcutta, 1979)

১১৩. Susana Bloch, *ALBA EMOTING: A Psychophysiological Technique to Help Actors Create and Control Real Emotions,* (Theatre Topics, September 1993, Volume 3 - Number 2, ISSN 1054-8378)

১১৪. Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity; Indigenous Theatre of Bangladesh*, (UPL, Dhaka, 2000)

১১৫. Syed Jamil Ahmed, *Reading Against the Orientalist Grain : Performance and Politics Entwined with a Buddhist Strain,* (Anderson Printing House Pvt. Ltd. Kolkata, 2008)

১১৬. Tadashi Suzuki, *The way of Acting,* translated by J. Thomas Rimer, (Theatre communications group, New York, 1985)

১১৭. Tone Bleie, *Tribal Peoples Nationalism and the Human Rights Challenge : The Adivasis of Bangladesh,* (The University Press Limited, Dhaka, 2005)

১১৮. Victor Turner, *The Ritual Process,* (Aldine Publishing Company, Chicago, 1969)

সাক্ষাৎকার

১১৯. অমিত চৌধুরী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, সময়- সকাল ১০.১৯ মিনিট, স্থান- নাটমণ্ডল, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১২০. অং ক্য চিং মারমা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৫.৯.২০১৪, দুংক্ষি বৈদ্যপাড়া, রেইছা, বান্দরবান

১২১. এল. বিদ্যা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ১৩/৭/২০১৫, ভানুবিল, মাঝের গাঁও, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ

১২২. কামিলুস মানকিন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ১০ এপ্রিল ২০১৫ গ্রাম : দীঘলবাগ, পো : ঘোষগাঁও, থানা : ধোবাউরা, ময়মনসিংহ

১২৩. কৃষ্ণকুমারী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১২/৭/২০১৫, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মাধবপুর, শিব বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১২৪. গোপীমোহন সিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১২৫. চ্য থুই প্রু, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৬/১০/২০১৪ টি সি আই মহড়া কক্ষ, বান্দরবান

১২৬. জ্যোতি সিনহা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১৩/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১২৭. নগেন্দ্র মান্দি (৪৯), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ১০ এপ্রিল ২০১৫ গ্রাম : দীঘলবাগ, পো : ঘোষগাঁও, থানা : ধোবাউরা, ময়মনসিংহ

১২৮. পরাগ রিচিল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ২ জানুয়ারি ২০১৫ সাল, মধুপুর গড়, গ্রাম চুনিয়া, প্রবীণ সাংসারেক জনিক নকরেক-এর বাড়ি

১২৯. বাবুল চৌধুরী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

১৩০. বিধান সিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১২/০৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৩১. মংমং মারমা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩০/১০/২০১৪, নওয়াপোতং পাড়া, তারাচা ইউনিয়ন, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান

১৩২. মং ক্য শোয়েনু নেভী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২/১১/২০১৪, গেস্ট হাউজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটোর আর্টস্ (বিটা), বান্দরবান

১৩৩. মেবুল দারু, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ– ২/১/২০১৫, চুনিয়া গ্রাম, মধুপুর, টাঙ্গাইল

১৩৪. রাশকান্ত সিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১০/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৩৫. শুভাশিস সিনহা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১৩/৭/২০১৫, মণিপুরী থিয়েটার, ঘোড়ামাড়া, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৩৬. সুইটি দাস, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ০৬/০৭/ ২০১৫, সাধনা প্রশিক্ষণ কার্যালয়, বনানী, ঢাকা

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা : মারমা, মণিপুরী ও নাট্য-নিরীক্ষা
ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালা

৬টি ক্ষেত্র বিবেচনায় নির্ধারিত প্রশ্নমালা–

১) ক্রীড়া, সুর, সঙ্গীত ও নৃত্য
২) ভাব-রস
৩) প্রাণায়াম, তন্ত্র-মন্ত্র, কৃত্য
৪) মঞ্চ/আসর উপস্থিতি (শৌর্য, ভারসাম্য, বর্ধন)
৫) পালা/আখ্যান

সাধারণ প্রশ্ন :

- নাম, বয়স, পেশা, ধর্ম, সংযুক্তির বছর

স্থান	কুশীলব	নাম	বয়স	লিঙ্গ	পেশা	ধর্ম	সংযুক্তির বছর

- আপনার কী কোনো গুরু আছে? আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন?
- এই শিক্ষা কেন আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ?

১. জাতিতাত্ত্বিক খেলাধুলা, সুর, সঙ্গীত, নৃত্য

- আপনাদের এখানে কী কী ধরণের খেলা প্রচলিত রয়েছে যা আপনি নিজে খেলেছেন/দেখেছেন বা এখনো খেলেন?
- ছড়া কাটতে কাটতে বা সুর-ছন্দের তালে তালে খেলতে হয় এমন খেলা কী আপনি কখনো খেলেছেন, বা খেলতে দেখছেন অথবা শুনেছেন?
- খেলাটি অংশগ্রহণকারীদের শরীর ও মনে কী কী ধরনের প্রভাব তৈরি করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
- খেলাটি কী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক বা সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি করে? (উদাহরণ)
- এই খেলার জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিত জ্ঞান, স্বতঃস্ফূর্ততা, মনযোগ কীভাবে কার্যকর হয়?
- এই খেলাটি কী অংশগ্রহণকারীদের তাৎক্ষণিক চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে সহায়তা করতে সক্ষম বলে মনে করেন? কীভাবে? (উদাহরণ)

*** সুর

- সুরগুলো কার কাছ থেকে শিখেছেন এবং কতদিন ধরে শিখেছেন?
- সুর/সঙ্গীত শেখার বিশেষ কোনো কৌশল বা পদ্ধতিটি আছে?
- শেখার/শেখানোর জন্য আপনাকে বিশেষ কী কী চর্চা করতে/করাতে হয়?
- আপনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের চর্চা বা অনুশীলন সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় বলে মনে করেন?
- সুর/ সঙ্গীত চর্চা দম/ কণ্ঠ অনুশীলনে কি ভাবে সহায়ক হতে পারে?

Dhaka University Institutional Repository

*** ছন্দ

- তাল/ছন্দ শেখার/শেখানোর বিশেষ কোনো পদ্ধতি এবং ভাষা রয়েছে কী? বা আপনি কী উপায় শেখেন/ শেখান?
- আপনার পরিবেশনায় ছন্দের ব্যবহারে কোনো ভিন্নতা বা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করেন? থাকলে তা কী রকম?
- পরিবেশনার সময়ে তাল/ছন্দ আপনাকে কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে?
- দক্ষতা অর্জনে বা শরীর মনে স্বতঃস্ফূর্ততা অর্জনে কোন ধরনের ছন্দের চর্চা অধিক কার্যকর বলে মনে করেন?

*** নৃত্য

- আপনি নৃত্য শিখছেন/শেখাচ্ছেন কত বছর ধরে?
- আপনার নৃত্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী বলে মনে করেন?
- নৃত্যের সাহায্যে চরিত্র/ঘটনা/বিষয়ের অর্থ বা ভাব প্রকাশ করতে 'বিশেষ কোনো ভঙ্গি বা মুদ্রার ব্যবহার করেন কী? (উদাহরণ)
- আপনার নৃত্যের সাধারণ শরীর ছন্দ/ভঙ্গিমা থেকে 'বিশেষ শরীর ভঙ্গিমা' বা মুদ্রাগুলোকে কীভাবে পৃথক/চিহ্নিত করেন? এর কোনো নামকরণ বা ব্যাখ্যা আছে কী?
- নৃত্য চর্চা/ মুদ্রা/শরীর ভঙ্গিমার জন্য পৃথক কোনো অনুশীলন বা প্রস্তুতি আছে?
- আপনার নৃত্য চর্চায় কোন ধরণের মুদ্রা/শরীর ভঙ্গিমাকে পারিপর্শ্বিক অন্যান্য নৃত্য থেকে পৃথক/ভিন্ন বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ?
- নৃত্য চর্চার জন্য কী কী শরীর অনুশীলন করে থাকেন বা নির্দিষ্ট/ বিশেষ অনুশীলন প্রক্রিয়া কী কী?

২. ভাব-রস

- ভাব ও রস কী?
- আপনার পরিবেশনায় ভাব ও রস কেনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে?
- কখন আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি পরিবেশনার/গল্প/কাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে/ মিশে গেছেন?
- কখন বুঝতে পারেন যে, দর্শক আপনার/আপনাদের পরিবেশনার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে?
- দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা, জটিলতা, প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যখন আপনার মনযোগ/ভাব/আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখন আপনি কী করেন? তখন কী উপায়ে দর্শককে আখ্যানের সাথে যুক্ত করেন?
- কোন প্রক্রিয়ায় বা কৌশলে আপনি কাহিনী বা চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন?
- কাহিনী বা চরিত্রে একাত্ম হওয়ার জন্য আপনার প্রস্তুতি কী?
- ভাব ও রসের চর্চায় অন্য কোনো অনুশীলন পদ্ধতি বা কৌশলের কথা জানেন কী? (উদাহরণ)

৩. তন্ত্র-মন্ত্র/দম

১) সামাজিক জীবনে তন্ত্র/মন্ত্র কেন প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
২) তন্ত্র-মন্ত্রের সাথে দমের বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে কী?
৩) আপনার পরিবেশানায় দম কী কী উপায়/প্রক্রিয়ায় কার্যকর হয়ে ওঠে?
৪) দম চর্চায় আপনার বিশেষ অনুশীলন পদ্ধতি বা কৌশলগুলো কী কী?
৫) শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণে দমের গুরুত্ব কতটুকু বা কোনো গুরুত্ব আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?
৬) দমের চর্চা/ব্যবহার কীভাবে আপনাকের স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে? বা আপনার স্বতঃস্ফূর্ততায় দম কীভাবে সহায়তা করে?
৭) তন্ত্র-মন্ত্রের চর্চায় আপনার শারীর ও মনে বিশেষ কী কী পরিবর্তন হয় বলে আপনি মনে করেন? (উদাহরণ)

Dhaka University Institutional Repository

৮) তন্ত্র-মন্ত্রের কারণে আপনার কণ্ঠে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর কোনো ধরণের প্রভাব বা পরিবর্তন লক্ষ করেছেন কী?

৯) মনযোগ স্থাপন করা ও ধ্যানস্থ হতে তন্ত্র-মন্ত্র কতুটুক কার্যকর বলে আপনি মনে করেন এবং কীভাবে? (উদাহরণ)

১০) বিশ্বাস স্থাপনে বা বিশ্বাস দৃঢ় করতে তন্ত্র-মন্ত্র কী উপায়ে সহায়তা করতে পারে?

৪. আসর/মঞ্চ (স্থানীয় পরিভাষা কি?) উপস্থিতি : শৌর্য, বর্ধন, ভারসাম্য

১) আসরে অভিনয়/পরিবেশনার সময় আপনার শরীর ও মনে বিশেষ কী পরিবর্তন অনুভব করেন যা দৈনন্দিন জীবন থেকে আলাদা? এই পরিবর্তনকে কীভাবে চিহ্নিত করেন?

২) আসরে উপস্থিতির সাথে সাথে শরীর ও মনে বিশেষ কোনো শৌর্যের উপস্থিতি লক্ষ করেন কী? যদি করেন তবে তার উৎস কী? বা কীভাবে এই শৌর্য উপলব্ধি করতে পারেন?

৩) আসর বা মঞ্চে প্রবেশের পূর্বে শারীর ও মনের জন্য আপনি বিশেষ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেন? করলে তা কী কী?

৪) আসরে পরিবেশনাকালীন শরীরের ‘ভর কেন্দ্র’ কোথায় ও কী কী ভাবে কার্যকর হয়?

৫) কীভাবে বুঝতে পারেন যে আপনার ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হচ্ছে বা হয়েছে, কীভাবে একে চিহ্নিত করেন বা এর কোনো নাম আছে?

৬) শরীরের ‘ভরকেন্দ্র’ বা ভারসাম্য সুরক্ষায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কী কী অনুশীলন করে থাকেন?

৭) এই ভরকেন্দ্র চর্চার সাথে দমের কোনো সম্পর্ক আছে কী? থাকলে কীভাবে?

৮) আসরে আপনার শরীর যে ‘বর্ধিত’ আচরণ করে তা কী আপনি বুঝতে পারেন? কীভাবে?

৯) এই বর্ধনের কারণ কী বা এর মূলে কি রয়েছে?

১০) বর্ধন কী কেবল শরীরেই অনুভব করেন নাকি তা মনেও অনুভব করেন? কীভাবে?

১১) আসরে উপস্থিতির কারণে আপনি কী বিশেষ কোনো চাপ/উত্তেজনা অনুভব করেন?

১২) আসরের এই চাপ মোকাবেলার আপনার বিশেষ কোনো কৌশল আছে কী? থাকলে তা কী কী?

১৩) আসরের উপস্থিতির পূর্বে এই চাপ মোকাবেলায় কোনো প্রস্তুতি বা অনুশীলন করেন কিনা?

১৪) চাপের কারণে শরীরের ভারসাম্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেন কী? এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

১৫) মঞ্চ উপস্থিতকালীন এমন কোনো শরীর ভঙ্গী বা ছন্দ চিহ্নিত করতে পারেন, যার জন্য প্রাত্যহিক জীবনের থেকে ভিন্ন ও বিশেষ ধরণের ভর বা ভারসাম্য, শক্তি বা দমের প্রয়োজন হয়? এদের কোনো নামকরণ করা হয়েছে, বা করতে পারেন?

১৬) ভারসাম্য সুরক্ষায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কী কী অনুশীলন করে থাকেন?

৫. পালা/আখ্যান

১) পরিবেশনার পূর্বে আপনি কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকেন?

২) আপনার প্রস্তুতি-সহায়ক চর্চাগুলো কী কী?

৩) প্রাত্যহিক জীবন বা পেশাগত কাজ আর পরিবেশনার সময়ে আপনার শরীর বা মনোগত অবস্থা কী একই রকম থাকে? যদি কোনো পার্থক্য থাকে তবে কী ধরণের এবং কেন?

৪) এই প্রস্তুতির সাথে ধর্ম/কৃত্য /আখ্যান/পরিবেশনার বিষয়বস্তুর কোনো সম্পর্ক বা প্রত্যক্ষ যোগ আছে কী?

৫) দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন শরীর ভঙ্গিমা, অভ্যাস, আচরণ আছে কী যা পরিবেশনাতেও লক্ষ করে থাকেন?

৬) পরিবেশনাতে এমন কোন শরীর ভঙ্গীমা বা ছন্দ আছে যা করতে আপনি বেশি বেশি করেন বা করতে ভাল লাগে?

৭) স্থান কাল দর্শকভেদে আপনার শরীর আচরণে/ভঙ্গীমায় কোনো পরিবর্তন হয় কী?

আলোকচিত্রে মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– ১

মারমা থালা নৃত্য এবং
নৃত্যের কৌশল প্রদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রে মারমা জাতিতাত্ত্বিক
পরিবেশনা- ২

বাঘ নৃত্য

বাঘ নৃত্য

আলোকচিত্রে মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা- ৩

মারমা কৃত্যনাট্য পাঙখুং

আলোকচিত্রে মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– ৪

নানান মুদ্রা এবং ভঙ্গিতে জ্যা-নৃত্যের মহড়া

নানান মুদ্রা এবং ভঙ্গিতে জ্যা-নৃত্যের মহড়া

আলোকচিত্রে মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– ৫

দম সাধনা

আলোকচিত্রে মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা- ৬

মারমা ধ্যান পরিবেশনা–চক্রামন ধ্যান

আলোক চিত্রে মারমা জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা- ৭

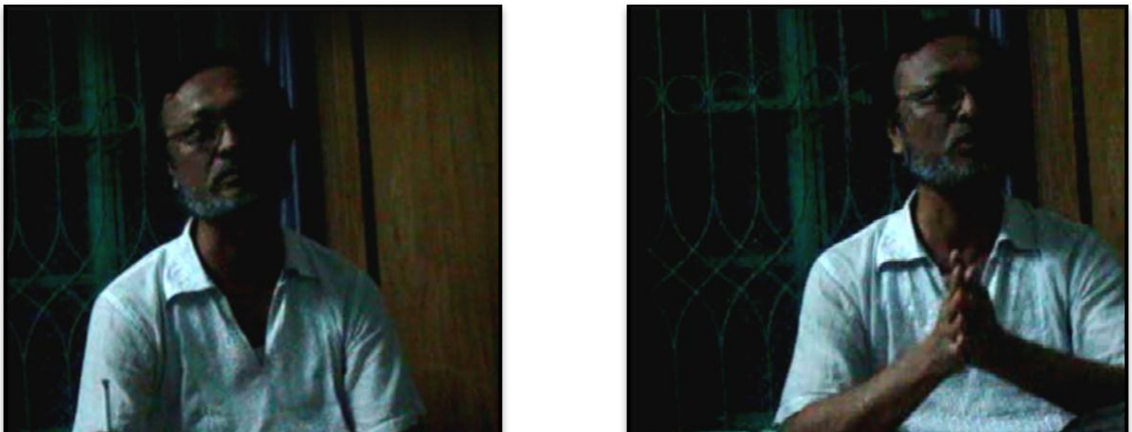

ইচ্ছাছায়া ধ্যান

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রে মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– ১

রাসনৃত্যের প্রশিক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রে মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– ২

মণিপুরী নটপালা

আলোকচিত্রে মণিপুরী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা- ৬

মণিপুরী থাঙ-তা খেলার মহড়া

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রে গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– ২

গারো রে রে পরিবেশনা

গবেষকের কয়েকটি মুহূর্ত

আলোকচিত্রে গারো জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনা– ২

সাম্বিল মিসারা নৃত্য